অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ALIK MANUS A Bengali Novel
by SYED MUSTAFA SIRAJ
published by Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street. Calcutta 700 073

প্রথম প্রকাশ :

বৈশাখ, ১৩৫৫

ISBN-81-7079-674-1

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপ সেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আব্দুর রউফ

প্রীতিভাজনেষু

Hatred is one of the passions that can master a life, and there is a temperament very prone to it, ready to see life in terms of vindictive melodrama, ready to fine stimulus and satisfaction in frightful demonstrations of 'justice' and 'revenge'.

H.G. wells

কালো জিন এবং শাদা জিন বৃত্তান্ত

দায়রা জজ ফাঁসির হুকুম দিলে আসামি শফিউজ্জামানের একজন কালো আর একজন শাদা মানুষকে মনে পড়ে গিয়েছিল। এদেশের গ্রামাঞ্চলে শিশুরা চারদিকে অসংখ্য কালো মানুষ দেখতে-দেখতে বড় হয় এবং নিজেরাও কালো হতে থাকে। কিন্তু শাদা মানুষ, যার লোম ভুরু ও চুলও প্রচণ্ড শাদা, ভীষণ চমকে দেয়।

এর আগে শফিউজ্জামান 'বিপজ্জনক ব্যক্তি' ঘোষিত হন। একবার তাঁকে সাত বছরের জন্য জেলা থেকে নির্বাসিত করা হয়। ইংরেজের আইন একেক সময়ে ভারি অদ্ভুত চেহারা নিত।

কিন্তু শফিউজ্জামান ছিলেন আরও অদ্ভুত। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন মুসলিমদের ধর্মগুরু। শিষ্যরা তাঁকে বুজুর্গপির বলে মনে করত, যদিও পিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনিই জেহাদ করে বেড়াতেন মুলুকে-মুলুকে। তাঁর পুরো নামটি প্রকাণ্ড। সৈয়দ আবুল কাশেম মুহম্মদ বদি-উজ-জামান আল হুসায়নি আল-খুরাসানি।

বদিউজ্জামান ছিলেন যেমন অমায়িক, মিষ্টভাষী আর ভাবপ্রবণ, তেমনি খামখেয়ালি, জেদি আর হঠকারী। বারবার ঠাঁইনাড়া হওয়া ছিল স্বভাব। শফিউজ্জামানের জন্ম কাঁটালিয়া নামক পদ্মাতীরবর্তী এক গ্রামে। যখন তাঁর তিন বছর বয়স, তখন বদিউজ্জামান গেরস্থালি তুলে নিয়ে পোখরায় যান। শফির পাঁচ বছর বয়সে পোখরা থেকে বিনুটি-গোবিন্দপুর, দশ বছর বয়সে নবাবগঞ্জ, বারো বছর বয়সে কুতুবপুর, ষোলতে খয়রাডাঙ্গা, আর পরের বছরই মৌলাহাট। শফির জন্মের আগেও এরকম ঘটেছে। তাঁর মা সাইদ-উন-নিসা, সংক্ষেপে সাইদা, সেইসব ঘটনা শফিকে হয়তো অনেকটা রঙ চড়িয়েই শোনাতেন। প্রথম স্টিমার দেখা ও ইলিশ খাওয়া আর প্রথম জঙ্গলের বাঘের মুখোমুখি হওয়ার রোমহর্ষক গল্প। একবার গোরুর গাড়িতে টাপরের পেছনকার পরদা তুলে হাত বাড়াচ্ছেন আর হাতে কচি আম ঠেকছে, এত আমের গাছ রাস্তার দুদিক থেকে ঝুঁকে এসেছে টাপরের ওপর। সেই আম খেতে-খেতে শেষে পেটে নাড়ি কচলানো ব্যথা। বুজুর্গ স্বামীর দোওয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া জল খেয়েই শেষে সেরে গেল। সারবে না কেন ? মৌলানার সঙ্গে আসমান থেকে জিনেরা নিশুতি রাতে দলিজঘরে দেখা করতে আসত। জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়ত শাদা রোশনি। জিনেদের কণ্ঠস্বর ছিল গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো

অর্থাৎ ধাতব ও সঙ্গীতময়। তাদের ভাষা সাইদা বুঝতেন না। তাঁর শাশুড়ি মাঝরাত্তিরে বউবিবিকে জাগিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলতেন, জিনের সঙ্গে বদুর বাত-করা শুনতে চেয়েছিলে। ওই শোনো ! সাইদা তখনও নাকি বালিকা। তাঁর স্বামীর বয়স তাঁর বয়সের আড়াইগুণ প্রায়। সাইদা বলতেন, আমাকে একবার জিন দেখাবেন বলায় উনি রাগ করে এক হপ্তা 'ইত্তেকাফ' নিয়েছিলেন।

'ইত্তেকাফ' 'শফি দেখেছেন। ব্যাপারটা আসলে নির্জনে মৌনীভাবে ঈশ্বরচিন্তা। কিন্তু বদিউজ্জামান তো পাহাড় বা অরণ্য এলাকার বাসিন্দা ছিলেন না যে পাহাড়ের গুহায় বা জনহীন জঙ্গলের ভেতর কুটির করে এক সপ্তাহের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ঈশ্বরচিন্তায় বসবেন। তিনি যেতেন মসজিদে। সব মসজিদই এদেশে পূর্বদুয়ারি। দক্ষিণপূর্ব কোনায় মশারি খাটিয়ে ঢুকে পড়তেন। মুসল্লি শিষ্যরা ওই কয়েকটি দিন যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নমাজ পড়ে যেত। নৈলে মসজিদ তো নমাজান্তে সামাজিক আলোচনার মজলিশ, কখনও বিচারসভাও। সেকারণে হই-হট্টগোলও চূড়ান্ত রকমের হয়ে থাকে। হুজুর 'ইত্তেকাফ'-ব্রত নিলে তারা তাঁকে বরং সাহায্য করত। মসজিদ এলাকায় জোরে কথা বলতে দিত না কাউকে। লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি কালো মশারির ভেতর আব্বা হারিয়ে গেলে বালক শফি খুব অবাক হয়ে যেত। তার বড়ভাই নুরুজ্জামান সুদূর দেওবন্দ মাদ্রাসায় তালেব-উল-আলিম — শিক্ষার্থী। মেজভাই মনিরুজ্জামান জন্ম-প্রতিবন্ধী। মুখ দিয়ে লালা বেবুত। নড়বড় করে পাছা ঘষটে উঠোন থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে ঘর, শেষে রান্নাশালে গিয়ে মায়ের পিঠে সেঁটে যেত। তাই শফিকেই আব্বার খাবার পৌঁছে দিতে হতে মসজিদে। একে তো মসজিদের ভেতর আবছায়া, তাতে ওই কালো মশারি। খাবার পাশে রেখে শফি চোখদুটো তীক্ষ্ণ করে ভেতরটা দেখতে চাইত। আব্বার সঙ্গে কথা বলা বারণ। বললেও তিনি জবাব দেবেন না। কিন্তু শফিব ইচ্ছে করত, মশারিটা একবার খপ করে তুলে দেখেই পালিয়ে যায়।

ভেতবে কী করছেন আব্বা ? ওখানে কোনো জিনও ঢুকে পড়েনি তো ? কিংবা ভেতরে আব্বা আছেন তো ? মুহুর্মুহু এইসব প্রশ্ন জাগত মনে। কখনও অজানা ভয়ে তার গা ছমছম করে উঠত। সেইসব মুহূর্তে তার ইচ্ছে করত, প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে উঠবে। অনেক কষ্টে এই ইচ্ছেকে দমন করত শফি। তারপর কোন মুসল্লি এসে পড়লে তাকে দেখে সে ভুরু কুঁচকে জিভ বের করে মাথা নাড়তে নাড়তে তার একটা হাত ভরে টানত এবং বাইরে নিয়ে যেত। ফিসফিসিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করত। শফি বলত, এঁটো থালা নিয়ে যেতে হবে না ? সেজন্যেই তো বসে আছি। মুসল্লি বলত, সে ভার আমার। যানদিকিনি আপনি। ঘর যানদিকিনি।

ধর্মগুরুর বাড়ির ছেলে বলে কাচ্চাবাচ্চাদেরও লোকে আপনি-টাপনি করত। কিন্তু শুধুই মুখের ভক্তি নয়। বালক শফি দেখেছে, সারাবছরই কত জায়গার লোক দেখা করতে আসছে হুজুরের সঙ্গে। টাকাকড়ি ভেট দিচ্ছে পায়ের কাছে। কেউ আসছে গোরুরগাড়ি বোঝাই খন্দ ফলমূল নিয়ে। দলিজঘরের বারান্দায় জমে উঠছে শস্যের বস্তা। শাক-সবজির স্তূপ। পুকুরের মাছ। মুরগি-মোরগ। আস্ত খাসি। আর কোরবানির পরবে তো দলিজঘরের একপাশে খেজুরতালাই বিছানো থাকত। আর তাতে জমে উঠত মাংসের পাহাড়। সত্যি পাহাড়। শফির চেয়ে উঁচু।

দয়ালু মৌলানা কিন্তু অনেকটাই বিলি করে দিতেন গরিব-গুরবোদের। রোজই ভিখিরির ভিড়, ফকিরফাকরার ভিড়, মুসাফির লোকের ভিড় দলিজের সামনের চত্বরে। ওরা সবাই মুসলিম ছিল না। হিন্দুসমাজের নিচুতলার নিরন্নরাও এসে দাঁড়াত। কুনাইপাড়ার একচোখ কানা সরলাবুড়ি, যাকে মায়ের হুকুমে সল্লাপিসি বলতে বাধ্য হয়েছিল শফি, ইদ বা কোরবানির দিন সে খুব ভোরবেলাতেই এসে বসে থাকত ওই চত্বরে। একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ ছিল সেখানে। তখনও পাখ-পাখালি ডেকে ওঠেনি। বদিউজ্জামান দলিজঘরেই রাত কাটাতেন। সবে উঠে চাপাগলায় ঈশ্বরের প্রশস্তি উচ্চারণ করছেন। তামাচিনির বৃহৎ বদনা আর ময়ূরমুখো ছড়িটি হাতে নিয়ে মসজিদে ফজরের নমাজে যাবেন বলে দরজা খুলতেই 'আঁই বাবা!'

ওই ছিল সল্লাকানির সাড়া দেওয়া। এসেছে জানাতে আচমকা বেড়ালের ম্যাঁও করে চেঁচিয়ে ওঠার মতো ওই দুটি শব্দ। নিঝুম দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সাইদা মেঝেয় বসে সুরে ধরে বাংলা পুঁথি পড়ছেন। শাশুড়ি কামরুন্নিসা চোখ বুজে শুয়ে কান করে শুনছেন। চৌকাঠের কাছে একদঙ্গল পাড়ার মেয়ে জুটেছে। শুনতে শুনতে কেউ ঢুলছে। ভাদুর মা তো বারান্দায় গড়িয়েই পড়ত। ওদিকে ভাদু মাঠ থেকে ফিরে সারা পাড়া মা মা করে গর্জে বেড়াচ্ছে। এদিকে বাদশাহ নমরুদ খাটিয়ার শীর্ষে মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে তিনটে শকুনকে লোভ দেখিয়ে আসমানে উঠেছেন, হাতে তীরধনুক, খোদার বুকে তীর মারবেন। আর খোদা মুচকি হেসে ফেরেশতাকে বলছেন, বেচারা নমরুদকে খুশি করো। ওর ছুঁড়ে মারা তীরের ডগায় রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাও। তখন ফেরেশতারা রক্ত চেয়ে বেড়াচ্ছেন হন্যে হয়ে। শেষে মাছ দিল রক্ত। আর খোদা বললেন, হে মাছ, এরপর থেকে মরা অবস্থাতেও তুমি হারাম বলে গণ্য হবে না। সেই সময় আচমকা 'আঁই মা!'

ভাদুর মা তড়াক করে উঠে বসে চুল বাঁধতে লাগল। সদুর বউয়ের ঢুলুনি কেটে লালা মুছতে থাকল। বাকি মেয়েরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। কামরুন্নিসাও ফোকলা দাঁতে হাঁসতে মুখ তুলে বললেন, কৈ, সরো সরো। দেখি সল্লাকানিকে। সাইদা চাপাগলায় হুঁশিয়ারি দিলেন, চুপ চুপ। গলাবাজি কোরো না তো তোমরা। শুনতে পেয়ে নসিহত (ভর্ৎসনা) করবেন।

বদিউজ্জামান দলিজে। তাই এই হুঁশিয়ারি। শফি মায়ের আঁচল টেনে বলে, আম্মা! বলুন না, তারপর কী হল? তীরে মাছের রক্ত মাখিয়ে কী করল?

সাইদা চোখ পাকিয়ে বলেন, রক্ত না, খুন।

কেন আম্মা?

হিঁদুরা রক্ত বলে।

এসব ঘটনা কুতুবপুরে থাকার সময়। গ্রামটা ছিল বড়ো। হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান-সমান। মাঝখানটাতে নোম্যানস ল্যান্ডের মতো একটা চটান। নিমগাছের জঙ্গল। কী খেয়ালে বদিউজ্জামান কনিষ্ঠ পুত্রকে সেখানে নিসিং পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করিয়েছিলেন। নিমের জঙ্গলের ভেতরে পায়েচলা পথ। চৈত্র মাসে নিমফুল ফুটে মিষ্টি গন্ধে মউমউ করত। গন্ধটা যখনই কোথাও পেয়েছে, শফির নাকে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপটা মেরেছে নিসিং পণ্ডিতের তামাকের গন্ধ। এক গন্ধ আরেক গন্ধের পেছনে ওত পেতে আছে। একটা কালো মানুষের পেছনে যেমন একটা শাদা-মানুষ।

চটানটাকে বলা হত মানকের চটান। মানিক নামে কোনো লোক ছিল হয়তো। মানকের চটান পেরুলেই ছোট্ট ঘরে পাঠশালা। তালপাতার ছোট-ছোট চাটাই যার-যার তার-তারটা। সাইদা নিজের হাতে যত্ন করে শফির চাটাই বুনে দিয়েছিলেন। সফি সেই চাটাই ছিঁড়ে চিবুত। তার চেয়েও ধেড়ে পড়ুয়াদের ভিড়ে সে সবসময় সিঁটিয়ে থাকত।

শফির বৃত্তি পরীক্ষার আগেই বদিজ্জামান তল্পি গুটোলেন কুতুবপুর থেকে খয়রাডাঙ্গার মুসলমান জমিদার ইটের বাড়ি দিচ্ছেন হুজুরকে। সেখানে মিনার আর গম্বুজওয়ালা বিশাল মসজিদ। পাশে মাদ্রাসা, সারবন্দি তালেবুল আলিমদের থাকার ঘর। চত্বরে ফোয়ারা। ফুলবাগিচা। দুনিয়ায় যেন বেহেশতের একচিলতে প্রতিবিম্ব।

দেউড়িতে রোজ সন্ধ্যায় নমাজের পর নহবত বাজে। জমিদার আশরাফ খানচৌধুরি হুজুরের কথায় নহবত বন্ধ করে দিয়েছেন। ফরাজিমতে দীক্ষা নিয়েছেন। গান-বাজনা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কড়া পরদার হুকুম জারি হয়েছে। খোঁড়াপিরের আস্তানায় হত্যে দেওয়া, মানত, আগরবাতি, পিদিম, কবরে মাথা ঠেকানো, জ্যৈষ্ঠের শেষ রবিবারে বৈকালিক মেলা — সবকিছু বন্ধ। পিরের খাদিম বা সেবক, যাঁর মাথায় জটা ছিল, গেরুয়া কাপড় পরতেন, ঝাড়ফুঁক করতেন, মাদুলি দিতেন, বেগতিক দেখে সদর শহরে পালিয়ে গেছেন। গুজব রটেছিল, বদুমৌলানা একশো লোক নিয়ে থান ভাঙতে আসছেন। সদরে আবুতোরাব উকিলের মেয়ের কাঁধ থেকে হারামজাদা এক জিনকে ধরে জটাধারী খাদিম শিশিতে ভরেন এবং গঙ্গায় ফেলে দেন। কৃতজ্ঞ উকিল আদালতে তাঁর পক্ষ থেকে দরখাস্ত ঠুকেছেন নাকি। তা ঠুকুন। বদুমৌলনা গঙ্গা থেকে শিশিবন্দি জিনটাকে উদ্ধার করবেন। তারপর কী হবে বোঝাই যায়।

এসব কথা শুনতেও পেতেন বদিউজ্জামান। কিন্তু এড়িয়ে থাকতেন। তিনি ফরাজি ধর্মগুরু। পূর্ববাংলার প্রখ্যাত ফরাজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজি শরিয়তুল্লার মুরিদ — শিষ্য। প্রচণ্ড পিউরিটান। হাত দুটো নাভির ওপরে রেখে নমাজ পড়েন। সুরা ফাতেহা আবৃত্তির পর উচ্চকণ্ঠে 'আমিন' বলেন। প্রার্থনারীতি ও ধর্মীয় আচরণে অসংখ্য এমন পার্থক্য মেনে চলেন অন্য তিনটি মজহাব বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে। তবে জিনে তাঁর আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ পবিত্র কোরানে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, আমি জিন ও ইনসান (মানুষ) সৃষ্টি করেছি। জিন বানানো হয়েছে আগুন থেকে, মানুষকে মাটি থেকে। জিনরা অগ্নিজাতক। তারা আলোর মানুষ। বাস করে সপ্তস্তবক আসমানের কোনও একটি স্তবকে। (আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় অন্য একটি গ্যালাক্সিতে) কাজেই জিন আছে। জিন থাকলে দুনিয়ায় তাদের আনাগোনা ঠেকাবে কে ?

নিসিং পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে বরং খুশিই হয়েছিল শফি। কথায়-কথায় বেত মারতেন পণ্ডিত। শফি ভীষণ অবাক হয়ে যেত। তাকে পাড়ার দাড়িচুল-পাকা বুড়োরাও আপনি বলে। এমন কি শফি বিশ্বাস করত, তাদের বাড়ির লোকেরা মরবে না। কুতুবপুরে থাকার সময় তার আর একটি ভাই হয়েছিল। একবছর পরে একদিন সে পাঠশালা থেকে ফেরার সময় তার মরে যাওয়া শুনে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। এ তো অসম্ভব ব্যাপার। বাড়ি ফিরে কান্নাকাটি শুনে সে থ। তারপর প্রায়ই

কবরখানায় গিয়ে ছোট্ট কাঁচা কবরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঢিল ছুড়তে শুরু করত সামনের শ্যাওড়াগাছটার দিকে। শেষে রাগেদুঃখে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলত।

পণ্ডিতের বেতের কথা শফি বাড়িতে চেপে যেত। ভাগ্যিস মুসলমানপাড়ার কোনও ছেলে পাঠশালায় পড়তে যেত না। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক। তাই ছোটরা মসজিদে একজন ওস্তাদজির কাছে আরবি পড়তে যেত। ওস্তাদদজিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল হুজুরের সুপারিশে। তিনি একদা তাঁর তল্পিবাহক 'তালেবুল আলিম' ছিলেন। এদিকে মেয়েরা পড়তে আসত সাইদার কাছে। উঠোনে সারবেঁধে বসে দুলে দুলে তারা পড়ত ; আলেফ জবর আ। বে জবর বা। তে জবর তা।

কুতুবপুর থেকে চলে যাওয়ার কথা শুনে শিষ্যদের সে কী হাউহাউ করে কান্না !

এসব সময় বদিউজ্জামানের চিরাচরিত একটি আনুষ্ঠানিক রীতি ছিল। একেবারে শেষ সময়ে মসজিদে নমাজের পর ভাষণ শুরু করতেন ; বেরোদানে ইসলাম — ইসলামের ভ্রাতৃবৃন্দ ! আল্লাহ পাক আমাকে জিন্দেগি-ভর রাহি মুসাফির করেছেন। যদি বলেন, আপনার দেশ কোথায় ? আমার কোনো দেশ নেই ভাইসকল ! আমার দেশ সারা দুনিয়া।

এরপর হুজুর গ্রামবাসী মোমিনবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন আবেগ মাখা কণ্ঠস্বরে। প্রতিটি ছোটবড় ঘটনা উল্লেখ করে বুকে হাত রেখে বলতেন, সব আমার দেলে গাঁথা রইল। ভুলি নাই। ভুলব না। তবে আমার আবার সময় হয়েছে, 'উঠো মুসাফির, কদম বাঢ়াও, আগেসে এক মঞ্জিল হ্যায়।'

শিষ্যবৃন্দ (সমস্বরে) ॥ হুজুর ! হুজুর ! এ কী বলছেন ! এ যে আসমান থেকে বাজ এসে পড়ল মাথায়।

(প্রবল কান্নার ধ্বনি)

হুজুর ॥ ভ্রাতৃবৃন্দ ! আল্লাহ্ বলেছেন, কিছু চিরস্থায়ী নয়। কেউ কাউকে বেঁধে রাখতে পারে না। তাই আল্লাহ বলেছেন, কোনোকিছুর জন্য শোক হারাম। মৃতের জন্য শোক হারাম। নষ্ট হওয়ার জন্য শোক হারাম। কিছু হারানোর জন্য শোক হারাম। যে তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে, তার জন্য শোক হারাম।

(কান্নার ধ্বনির শ্বাসপ্রশ্বাসে রূপান্তব। চতুর্দিকে ফোঁস-ফোঁস নাক ঝাড়ার আওয়াজ।)

সর্দারশিষ্য (কাঁধের ডোরাকাটা রুমালে চোখ মুছে) ॥ হুজুর, এদফা আপনার মঞ্জিল কোথায় ?

হুজুর (বিষণ্ণ হেসে) ॥ খয়রাডাঙ্গা।

সর্দারশিষ্য (নাক মুছে) ॥ জায়গা ভালো। জমিদার মোছলমান। কিন্তু আমরা যে এতিম হয়ে গেলাম হজুর !

হজুর (চোখ মুছে) ॥ আল্লার হাতে আপনাদের রেখে যাচ্ছি। নজর রাখবেন, যেন আউরত লোকেরা বেপর্দা না হন। গানবাজনা যেন না শোনা যায়। মোহররমে আর যেন তাজিয়া জুলুস গ্রামে না ঢোকে। কেউ যেন পিরের থানে মানত দিতে না যায়। কেউ নমাজ কামাই করলে জরিমানা করবেন। দোসরা বার করলে সাত হাত নাক খবদা সাজা দেবেন। তেসরা বার করলে পঁচিশ কোড়া মারবেন। আর

তারপর করলে গ্রাম থেকে নিকালে দেবেন শয়তানকে।...

· হুজুর চলে গেলে সেসব অবশ্য কিছুই করা হত না। কারণ তাতে দলাদলি ও হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল। মেয়েরা আবার বেপরদা হয়ে মাঠে মরদ-ব্যাটাদের নাশতা দিয়ে আসত। শাদি লাগলে ঢোল বাজিয়ে গীত গাইত আগের মতোই। নাচত এবং সঙ দিত। পাশের গাঁয়ের হানাফি মজহাবের জোয়ানরা মোহররমের মিছিল এনে খবর পাঠাত ঢুকবে নাকি এবং অনুমতিও পেত। তবে প্রধান ফরাজিরা দেখে না-দেখা বা শুনেও না-শোনার ভান করে আড়ালে গিয়ে বসত। বাংলা পুঁথিগুলো বানান করে-করে সুর ধরে পড়তঃ 'লাখে লাখে মরে লোক কাতারে কাতার/ শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার।....' সেই কবে এসে ইরফান মৌলবি বাংলা মক্তব খুলেছিলেন। তখনই কিছু লোকের যা বাংলা হরফ শেখা, শ্লেটে দাগড়া দাগড়া 'স্বরে অ, স্বরে আ।' পাঁচন আর লাঙ্গলের মুঠিধরা হাতে দড়কচা পড়ে গেছে। ধান পুঁতে হাতে-পায়ে হাজা।

খয়রাডাঙ্গায় গিয়ে একটা বছর না কাটতেই আবার তল্পি গুটোলেন বদিউজ্জামান। জমিদার সাহেব হুজুরকে দেখে আসন ছেড়ে সালামের জবাব দেননি। সেদিনই সন্ধ্যায় কজন অনুগত শিষ্যকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, এশার নমাজের পর রওনা হবেন সেকেড্ডা। খানকতক গাড়ি এখনই দরকার।

বদিউজ্জামানের সংসার সবসময় তৈরি থাকত, কখন হুকুম জারি হবে, উঠে পড়ো, গুটিয়ে নাও। কিন্তু খয়রাডাঙ্গা থেকে যেমন করে উঠে পড়তে হয়েছিল, সে যেন একটা শেকড় ওপড়ানোর ব্যাপার। সেই প্রথম ইটের ঘরে থাকা। প্রথম নিজস্ব একটি ইঁদারা। আর শফির বয়স তখন প্রায় ষোল। পৃথিবীর কিছু কিছু কুয়াশা তার চারপাশ থেকে অপসৃত। সেই প্রথম সে বন্ধুতার স্বাদ পেয়েছে যৌনতা বুঝেছে। তার কষ্ট হচ্ছিল খয়রাডাঙ্গা ছেড়ে চলে যেত। এখানকার মেয়েরা তার চোখে পরি হয়ে উঠেছিল।

মৃদু আপত্তি করেছিলেন সাইদা। কিন্তু বদিউজ্জামান অমনি অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন, খামোশ বুড়বক ঔরত!

কামরুন্নিসা তখন চলচ্ছক্তিরহিত। ধরে ওঠাতে হয়। খাইয়ে দিতে হয়। অর্ধাঙ্গে পক্ষাঘাত। শুধু বললেন, কেন বেটা? বদিউজ্জামান জবাব দিলেন না। জোব্বাব আস্তিন গুটিয়ে কেতাব গোছাতে থাকলেন। এইসব সময় তাঁবেদার জিনেরা এসে যেত মানুষের চেহারায়। সামান্য সময়ের মধ্যে লটবহর তারা ছাড়া কে গোছাতে পারবে?

অনেক পরে শফি বুঝতে পেরেছিল আব্বার খয়রাডাঙ্গা ছাড়ার কারণ কী। খোঁড়া পিরের প্রতি নবদীক্ষিত ফরাজিদের গোপন ভক্তি থেকে গিয়েছিল। তারা বাইরে ফরাজি হলেও ভেতর-ভেতর হানাফি। তাছাড়া মাদ্রাসার আলেমরা বদিউজ্জামানের একাধিপত্য বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তার চেয়ে বড় কথা, তাঁরা ফরাজি মত মেনে নেননি। এমন কী 'বাহাছ্' অর্থাৎ প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধেরও ডাক দিয়েছিলেন। জমিদারসাহেব বিব্রত বোধ করছিলেন। বদিউজ্জামানের বহু ব্যাপারে বাড়াবাড়ি দেখে বিরক্ত হচ্ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত। বাংলা উপন্যাস ভালবাসতেন। বিকেলে আরাম-কেদারায় বসে থাকতেন এবং মাদ্রাসা থেকে পালা করে একজন

পড়ুয়া এসে তাঁকে উপন্যাস পড়ে শোনাত। এমন কি আলবোলায় তামাক খাওয়া তাঁর আজীবন অভ্যাস, কিন্তু ফরাজি হওয়ার পর ধূমপান হারাম গণ্য। বদিউজ্জামান নাকি তাঁর কাছে গেলে তামাকের গন্ধ পেতেন এবং ধর্মগুরুসুলভ ভর্ৎসনা, যাকে বলা হয় 'নসিহত', করতেন। লোকের সামনে শাস্ত্রীয় এই ভর্ৎসনা সহজ মনে মেনে নিতে পারছিলেন না জমিদারসাহেব।

মাসটা ছিল চৈত্র। আগের বর্ষায় ভাল বৃষ্টি হয়নি। রাস্তাঘাট শুকনো খটখটে। বারো ক্রোশ দূরে সেকেড্ডা যেতে সিধে নাকবরাবর রাস্তাই বেছে নেওয়া হয়েছিল। শীতলগাঁয়ের কাছে মৌরালা নদী পেরুলে তিনক্রোশের একটি অনাবাদি মাঠ পড়ে। উলুশরার মাঠ। আসলে মাঠ নয়, উলুকাশের জঙ্গল। শীতের শেষে সেখানে গাড়ি চলার রাস্তা হয়ে যায়। রাস্তা বলতে শুধু কাশবন ভেঙে দুটি চাকার দীর্ঘ আঁকাবাঁকা দাগ। তারপর আবার উঁচু মাটির আবাদি মাঠ। সেখানে আবার স্থায়ী সড়ক। সেকেড্ডা পৌঁছুতে পরদিন বিকেল হয়ে যাবে।

এবার তল্পি গুটোনোর সময় সেই আনুষ্ঠানিক রীতির ব্যতিক্রম ঘটালেন হুজুর। তবু খবর পেয়ে ছোটখাট একটা ভিড় হল। গম্ভীর হুজুর দুচার কথার কৈফিয়ত দিলেন। কিন্তু অন্ধকারে কোনো ক্রন্দন শোনা গেল না। না কোনো দীর্ঘশ্বাস। সাতখানা গোরুর গাড়ি, দুখানায় টাপর চাপানো। পেছনে পাঁচখানা গাড়িতে গেরস্থালির লটবহর। শেষে গাড়ির পেছনে বাঁজা গাইগোরু মুন্নি টানটান করে বাঁধা। নিঃসন্তান প্রাণীটি ছিল ভীষণ বৈরাগিনী। দড়ি ছেঁড়ার তাল করত। বারবার নিখোঁজ হয়ে বিস্তর ভোগাতও শফিকে।

ধাড়ি ছাগল কুলসুম সওয়ার হয়েছিল দ্বিতীয় গাড়ির টাপরের পেছনে। তার দুদিনের ছানাদুটোকে এক প্রধান শিষ্য পেছনের খোলাগাড়িতে কোলে নিয়ে বসে ছিল। বেচারি সারারাত ঘুমোতে পারেনি। কিন্তু খয়রাডাঙ্গার শিষ্যদের মধ্যে সেই ছিল হুজুরের সবচেয়ে অনুগত মানুষ। পুণ্যের লোভ ছিল তার অসম্ভব বেশি। ভোরবেলা যখন এই অদ্ভুত কারাভাঁ শীতলগাঁয়ের নদীটির ধারে পৌঁছুল, তখন তার মার্কিন থানের লুঙ্গি এবং ফতুয়া হলুদ হয়ে গেছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রায় বুজে-যাওয়া নদীর শুকনো বালিতে গাড়িগুলো দাঁড়ানোমাত্র সে ছানা দুটিকে নিয়ে লাফ দিল। সেখানেই তাদের ছেড়ে দিয়ে নদীর হাঁটুজলে উপুড় হয়ে পড়ল।

ছানাদুটি লম্ফঝম্ফ করে মাকে ডাকছিল। কুলসুমকে নামিয়ে দেওয়া হল তাদের কাছে। তখন কুলসুম ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তাদের দুধ খেতে দিল এবং খুদে লেজ দুটোকে দুধারে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শুঁকতে থাকল।

বদিউজ্জামান ক্ষীণ নদীস্রোতের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চটি খুলে রেখে তামচিনির বদনাটিতে জল ভরলেন। কিনারায় বসে উপাসনার প্রক্ষালন 'ওজু' সেরে নিলেন। সাতখানা গাড়ির সাতজন গাড়োয়ান আর তিনজন শিষ্য নদীতেই ওজু করল। তারপর হুজুরের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার বালির ওপর ফজরের নমাজ শুরু হল। সামনে হুজুরের পরিচিত ময়ূরমুখো ছড়িটি পোঁতা।

ঠিক এইসময় নদীর ওপারে পশ্চিমে ঈষৎ উঁচুপাড়ের ওপর ভোরের ধূসর আলোয় একটি ছায়ামূর্তি ফুটে উঠল।

দ্বিতীয় টাপর চাপানো গাড়ির ভেতর ছিলেন সাইদা, তাঁর রুগ্ণা শাশুড়ি আর

কিশোর শফি। সাইদা গাড়ির আড়ালে বদনা নিয়ে নেমেছিলেন। প্রার্থনাকারীরা অন্যদিকে রয়েছে দেখে আশ্বস্ত হলেন। তারপর বাকি দিকগুলিকে দেখে নিলেন। সেসব দিকে কোনো বেগানা মরদলোক আছে কি না এতে নিঃসশয় হওয়ার পর পা বাড়ালেন নদীর দিকে। এসব সময় তাঁকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়া পাখির মতো লাগে। নড়বড় করে পা ফেলেন। দুনিয়ার প্রকাশ্য মাটিতে হাঁটতে তাঁর যেন কষ্ট হয়। বহুকাল ধরে পাতার তলায় চাপাপড়া ঘাসের মতো বিবর্ণ তাঁর গায়ের রঙ। সামান্য দূরে একটি কাশঝোপ তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কিছুতেই যেন পৌঁছুতে পারছিলেন না সেখানে। সারারাত গাড়ির ঝাঁকুনিতে শরীর অবশ। গিঁটে গিঁটে ব্যথা হয়ে গেছে। আর এই নরম বালি। বিব্রত বোধ করছিলেন সাইদা। এখনই যে সুরুজ বেরিয়ে পড়বে পুবে! দাগকাটা দুধের সরের মতো সেখানে মেঘ জমে আছে আর ক্রমশ লাল আভা ফুটে উঠছে। সাইদা যেন পয়গম্বর এব্রাহিমের পরিত্যক্তা নির্বাসিতা স্ত্রী বিবি হাজেরার মতো বিশাল মরুভূমিতে জলের খোঁজে ছুটে চলেছেন।

শফি সারারাত ঘুমোতে পারেনি। খয়রাডাঙ্গা তাকে পেয়ে বসেছিল। কতবার তার ইচ্ছে করছিল, চুপিচুপি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিল সে। মাদ্রাসার পেছনে বটগাছটার তলায় মৌলবি নাসিরুদ্দিনের মেয়ে জহুরা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার স্বপ্নটা ভেঙে গেল। একটানা শোঁ শোঁ ঘস ঘস অদ্ভুত শব্দ শুনে সে উঠে বসল! পর্দা ফাঁক করে দেখল বালির চড়ার ওপর গাড়ি চলেছে।

গাড়ি থামলে সে লাফ দিয়ে নেমেছিল। তারপর ঘুরে নদীর ক্ষীণ স্রোতটার দিকে তাকাতেই স্বপ্নের কষ্টটা চলে গেছে। সে দৌড়ে নদীর জল ছুঁয়েছিল। তারপর আব্বা তাকে ডাকলেন, শফিউজ্জমান!

শফি সাড়া দিয়ে বলল, জি!

ওজু করো বেটা! আমরা এখানেই ফজরের নমাজ পড়ব।

নমাজে দাঁড়িয়ে সামনে নদীর ওপারে তাকিয়েই শফি চমকে উঠেছিল। ছাইমাখানো আলোয় কালো এক মূর্তি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। শফির মনে হল, তার চোখদুটোকেও সে দেখতে পাচ্ছে। জন্তুর চোখের মতো কি? যেন নীল চকচকে দুটি চোখ এবং তা শুধু শফিকেই দেখছে। শিউরে উঠল শফি।

করজোড়ে মোনাজাতের সময়ও আঙুলের ফাঁক দিয়ে শফি লক্ষ্য রেখেছিল কালো মূর্তিটার দিকে। সে তেমনি দাঁড়িয়ে।

নমাজ শেষ হওয়ার পর একজন গাড়োয়ান তাকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, এ ভাই! উলুশরার মাঠে রাস্তা হয়েছে?

লোকটার গলা শুনে আরও চমকে উঠল শফি। খ্যানখেনে এমন কণ্ঠস্বর কি মানুষের? সেও চেঁচিয়ে বলল, হয়েছে!

গাড়োয়ান তবু জিগ্যেস করল, হয়েছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে! তবে কিনা—

তবে কিনা?

নদীটা ছোট। তত কিছু চওড়া নয়। হাওয়া বন্ধ ছিল। আস্তে কথা বললেও

শোনা যেত। কিন্তু গ্রামের মানুষজনের চেঁচিয়ে কথা বলাই অভ্যাস। ততক্ষণে ওপারের উঁচুপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা স্পষ্ট হয়েছে। তার পরনে একফালি ন্যাতা। ঝাঁকড়া চুলেও একটা ন্যাতা জড়ানো। কিন্তু সে সাঁওতাল বা মুশহর নয়, সেটা তার কথাতেই বোঝা যাচ্ছিল। খুব স্পষ্ট আর জোরালো তার উচ্চারণ। আকাশের নিচে নদীর ওপর তার কণ্ঠস্বর গম-গম করছিল, যেন ধ্বনি নয়, প্রতিধ্বনি।

গাড়োয়ান আবার চিৎকার করল, তবে কিনা ?

সে একটু ঘুরে হাত তুলে বলল, পাকুড়গাছের কাছে যেয়ে ডাইনের লিকে গাড়ি ঘোরাতে হবে। নৈলে—

নৈলে ?

বাঁয়ের লিকে গেলে গুপিডাঙ্গার নামুতে কেঁওলির বিল। তবে কিনা যাওয়া হবে কোথা ?

সেকেন্ডা-মখদুমলগর।

সে তো বিরভুঁই জেলায়।

তাই বটে।

হঠাৎ লোকটা হনহন করে চলে গেল। ঠিক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতো। শফির বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। চোখ বড়ো করে উঁচুতে নীলধূসর আকাশের বিশাল পটের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা ভীষণ শূন্য করে দিয়েছে আকাশটাকে। কালো একটা রহস্যময় কে ও ?

শফি আড়চোখে আব্বাকে দেখে নিল। মা বলেছিলেন, দুরকম জিন আছে। ভাল জিন, মন্দ জিন। ভাল জিনের গায়ের রঙ ফিট শাদা, ধপধপে কাফনের থানের মতো। কালো জিনের গায়ের রঙ মাটির হাঁড়ির তলার মতো। ভুসকালো বদিউজ্জামান তাঁর কেতাববোঝাই টাপর দেওয়া গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তখনও তসবিহ্ (জপমালা) জপছেন। ন্যালা মেজভাই মনিরুজ্জামান টাপরের ভেতরে থেকে মুখ বের করে হাত চুষছে আর খ্যা খ্যা করে হাসছে। সাইদা গাড়ির আড়াল দিয়ে এইমাত্র মেজছেলের খোঁজ নিতে এলেন। একটাই ভয় ছিল। বিছানায় পেচ্ছাপ করে দেয় আঠারো বছর বয়সের ছেলেটি। পবিত্র কেতাবগুলি যদিও চট আর কাপড়ে বাঁধা রয়েছে, কিছু বলা যায় না। সাইদা ফিসফিস করে বললেন, ইস্তেঞ্জা (মূত্রত্যাগ) করবি বেটা ? কানে গেলে বদিউজ্জামান জপ থামিয়ে বললেন, খাওয়ার ইন্তেজাম করো। সাইদা চলে গেলেন নিজের গাড়িতে। গাড়ির তলা দিয়ে তাঁর এলোমেলো পা ফেলা এবং লাল চটি দুটো দেখতে পেল শফি।

আব্বার কোনো ভাবান্তর না দেখে অবাক হয়েছিল শফি। নিশ্চয় একটা কালো জিন এসেছিল। ও কখনও মানুষ হতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে তুমুল চেঁচামেচি করে গাড়িগুলোকে নদীর চালু পাড় বেয়ে যখন ওপারে ওঠানো হল, আবার শফির গা শিউরে উঠল। এ কোথায় চলে এসেছে তারা ? যতদূর চোখ যায়, ধূসর উলুকাশের বন। জনমানুষহীন খাঁ খাঁ নিঝুম এক দুনিয়া। এখানে এক কালো মানুষের কথা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে। খুব আদিম এই ভূখণ্ডে মানুষের পায়ের ছাপ খুঁজে মিলবে না। সাতখানা গাড়ি সার বেঁধে চলেছে। সাতজোড়া চাকায় একটানা ঘস ঘস ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ। তার সঙ্গে

উলুকাশের ঘষা-খাওয়া শোঁ শোঁ শনশন অদ্ভুত ধারাবাহিক শব্দ। অবাধ এই তৃণভূমিতে এতক্ষণে সূর্যের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সবার আগে এবার কুলসুমকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে একজন প্রবীণ শিষ্য। ছানাদুটিকে অদ্ভুত দক্ষতায় বুকে চেপে রেখেছে সে। মুন্নি শেষ গাড়িটির পেছনে আগের মতোই বাঁধা। এতক্ষণে শফি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল। সাইদা পর্দা ফাঁক করে দেখেই প্রায় চেঁচাতে যাচ্ছিলেন। বলদের পিঠের ওপর এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়তে আছে? এক্ষুণি বুকের ওপর চাকা চলে গিয়ে কলজে ফেটে যেত না বাছার? গাড়োয়ান হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

শফি একা হতে চাইছিল। চ্যালেঞ্জের একটা ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল। শেষ গাড়ির পেছনে চলে গিয়ে সে ঝোপ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিল। ডালটা শক্ত করে ধরে সে তৃণভূমিতে চারদিকে তাকিয়ে কালো জিনটিকে খুঁজতে থাকল।

ভয় পেয়ে শফি এরকম করত। একবার সন্ধ্যার পর গোরস্তানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে তেমনি হঠাৎ বুখে দাঁড়িয়েছিল সে। চিড়খাওয়া গলায় চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, চলে আয, দেখি। পরে খুব লজ্জা পেয়েছিল সে। যদি কেউ শুনে থাকে, তাকে মেজভাইয়ের মতো পাগলা ভাববে যে? কিন্তু মজার কথা, পরে তাকে মেহেদি নামে একজন লোক বলেছিল, হ্যাঁ গো, সেদিন গোরস্তানে কার সঙ্গে তকরার করছিলেন? শফি বলেছিল, ও কিছু না চাচা! কিছু না।

উলুশরার মাঠে সকালের আলোয় তারপর সে 'কালা জিনে'র কথা ভুলে গেল। ক্রমশ সে একটা নতুন আর অচেনা দুনিয়ার ঢুকে পড়েছিল। টের পাচ্ছিল, এ কোনো মানুষের দেশ নয়। ঘাসফড়িংগুলো কিড় কিড় করে ডাকছিল। ডাকছিল পাখপাখালি। কাঁটাগাছের ফুলন্ত ঝোপ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছিল কাশের ডগা ছুঁয়ে। একখানে খরগোশ দেখে গাড়োয়ানরা হল্লা করতে লাগল। একজন হুজুরের কাছে জানতে চাইল, খরগোশ হালাল না হারাম। হুজুর ফতোযা দিলেন, জরুর হালাল। কিন্তু তখন খরগোস উধাও। শফি-একটা শেয়াল দেখল। একটা খেঁকশিয়ালি তার পায়ের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল। একটা ঢ্যামনা সাপ ছুটে গিয়ে ব্যানাবনে ঢুপে পড়ে। শফি বুঝতে পারছিল এটা মানুষের দুনিয়া নয়। সে ছিপটিটাকে শক্ত করে ধরে সতর্কভাবে হাঁটছিল। মাঝেমাঝে মুন্নিকে ছিপটির ঘা মারছিল নেতাহ অকারণে। পোকামাকড়ের ডাক, পাখপাখালির ডাক, সাতখানা গোরুর গাড়ির ঘসটানো ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ, উলুকাশের শোঁ শোঁ শনশন আওয়াজের মধ্যে দিয়ে শফি চলেছে তো চলেছে। কখন হাওয়া উঠেছে। কাশবন দুলতে লেগেছে। কত অদ্ভুত নতুত-নতুন শব্দ। রোদ পড়লে মাথার টুপিটা খুলে পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে রাখল শফি।

তারপর হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে পর-পর সাতখানা গাড়ি থেমে গেল।

শফি কী হয়েছে দেখার জন্য দৌড়ে সামনে চলে গেল। তারপর থমকে দাঁড়াল। সামনে জল।

বদিউজ্জামান অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। আগের লোকটিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। কুলসুম এই সুযোগে দড়ি ঢিলে পেয়ে হাঁটু বাঁকা করে জল খেয়ে নিচ্ছে।

গাড়োয়ান বোবাধরা গলায় বলে উঠল, হা আল্লা!
একটু স্তব্ধতা হকচকানি। তারপর কথা ফুটল লোকগুলোর। একজন চিৎকার করে উঠল, হারামি! নাফরমান।
সেই কালো লোকটি যে ভুলপথে পাঠিয়ে দিয়েছে, বুঝতে পারছিল সবাই। গাড়োয়ানরা তার উদ্দেশে ক্রোধ বর্ষণ করতে থাকল। তাদের মনে ভীষণ এবং জঘন্য গালাগালি। কিন্তু হুজুরের সামনে মুখখিস্তি করা চলে না। শফি তার আব্বাকে আবার লক্ষ্য করছিল। বদিউজ্জামানের নিষ্পলক দুটি চোখ জলের দিকে। ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। হাতের তসবিহ্‌দানা স্থির। ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে আছে। শফি মনে মনে বলল, আব্বা! আমি জানতাম।
সে ঘুরে দ্বিতীয় গাড়ির দিকে তাকাল। টাপরের পরদার ফাঁকে মায়ের একটা চোখ দেখা যাচ্ছে। শফির ইচ্ছে করল, মায়ের কাছে গিয়ে কালা জিনের কথাটা তোলে। কিন্তু কারুর কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়েনি দেখে সে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। আর তার মনের ভেতর ঘুরে বেড়াতে থাকল 'আমি জানতাম' এই শব্দটা।
একজন জলে একটু নেমেই ব্যস্তভাবে উঠে এল। বলল, সর্বনাশ হুজুর। অগাধ পানি।
আরেকজন বলল, খাগড়ির সোঁতা না এটা?
তাই বটে।
কিন্তু এত পানি থাকার তো কথা না।
সেটাই আশ্চর্য লাগছে।
একজন ডাইনে-বাঁয়ে দূরে তাকিয়ে বলল, মনে হচ্ছে কোথায় লোকে বাঁধ দিয়ে পানি আটকেছে। বোরোধান পুঁতেছে।
হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই তো হারা রঙ ঝিকমিকোচ্ছে! তাকিয়ে দ্যাখো অসিমুদ্দিন!
অসিমুদ্দিন তাকিয়ে দেখল। সে বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ। তার কপালে নমাজপড়ার কালচে ছোপ। পরনে খাটো লুঙ্গি গায়ে কোরা থানের পাঞ্জাবি। মাথায় তালশির দিয়ে তৈরি টুপি। সে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ডাকল, হুজুর পিরসাহেব!
জি! বদিউজ্জামান আস্তে সাড়া দিলেন।
শয়তান আমাদের মুসিবতে ফেলে দিয়েছে।
জি!
হুজুর! এ মুসিবত থেকে বাঁচার রাস্তা আপনার হাতে। আপনি একটা কিছু করুন।
শফি বুতে পারছিল লোকটা কী বলতে চাইছে। উত্তেজনায় চঞ্চল, হয়ে উঠল সে। কালো জিনের কারচুপি সম্ভবত ধরতে পারছে ওরা। কিন্তু আব্বা চুপ কেন? জিনেরা তো তাঁর কথা শোনে!
এইসময় সাইদার চাপা ফুঁপিয়ে ওঠা শুনতে পেল শফি। তারপর আব্বার গর্জন শুনল। বেঅকুফ নাদান ঔরত! বেশরম কাঁহেকা!
অসিমুদ্দিন ডাকল, হুজুর!
গর্জন করার পর কান্নাটা থেমে গিয়েছিল। বদিউজ্জামান চোখ বন্ধ করেছেন। ঠোঁট কাঁপছে। নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে। তারপর সুর ধরে উচ্চারণ করলেন,

আউজুবিল্লাহে শয়তান-ইর রাজিম। বিশমিল্লাহে রহমান-ইর রহিম।

বদিউজ্জামানের কণ্ঠস্বর ছিল জোরালো, উদাত্ত। জমিদারি মসজিদের মিনারে উঠে কোনো-কোনো ফজরে আজান দিতেন নিজেই। সারা খয়রাডাঙ্গার ঘুম ভেঙে যেত। মধুরস্বরে কোরান আবৃত্তিকারদের বলা হয় কারি এবং কোরান যাঁদের মুখস্থ তাঁরা হাফিজ। বদিউজ্জামান ছিলেন কারি এবং হাফিজ দুই-ই।

কোরানের সুরা ইয়াসিন আবৃত্তি করছিলেন তিনি। বিপদে-আপদে এই সুরা আবৃত্তি করা হয়। নীলধূসর চৈত্রের আকাশের নিচে সেই গম্ভীর ও উদাত্ত ধ্বনি ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারদিকে। বলদগুলোও যেন শ্বাস ফেলতে ভুলে গিয়েছিল। চারপাশে কাশবনে শনশন হাওয়ার শব্দ, বনচড়ুইয়ের ঝাঁকের অস্ফুট ডাকাডাকি, ঘাসফড়িঙদের প্রচ্ছন্ন চিৎকার, তার মধ্যে সঙ্গীতময় ওই পবিত্র দৈবী-ধ্বনিপুঞ্জ। খাগড়ির সোঁতার ওপারে দুটি শাদা সারস মর্মর পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে অলৌকিক ঘটনাটি ঘটল। একেই বলে বুজুর্গের মোজেজা— দিব্যশক্তির নিদর্শন। পরে চাপা গলায় লোকগুলিকে বলাবলি করতে শুনেছিল শফি, এ মোজেজাই বটে। হুজুরের অসাধ্য তো কিছু নাই।

বহুবছর পরে শফি ইংরেজ সাহেব দেখেছিল। কিন্তু উলুশরার কাশবনে খাগড়ির সোঁতারও পারে যাকে দেখেছিল, তার সঙ্গে ইংরেজ সাহেবের কোনো তুলনাই হয় না। আরও পরে সে প্রথম ধুতরোর ফুলের গড়ন প্রকাণ্ড চোঙবসানো গ্রামোফোন যন্ত্র দেখেছিল এবং রেকর্ডে 'জন্মাষ্টমী' নামে নাটক শুনেছিল। সেই ধাতব কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ খুব চেনা মনে হয়েছিল — আগেও কোথায় যেন শুনেছে। কিন্তু মনে পড়েনি। তখন শফির মন ভারাক্রান্ত, মগজে অন্য দুনিয়ার ঝড়।

ভরা সোঁতার ওপারের শাদা সারসগুলি হঠাৎ উড়ে যাওয়ায় সবার দৃষ্টি পড়েছিল সেদিকে। উঁচু কাশবনের ভেতরে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল অসম্ভব শাদা এক মানুষ। দিনের উজ্জ্বল আলোয় তার শাদা চুল, শাদা ভুরু, শাদা চোখের পাতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার মুখে গোঁফদাড়ি ছিল না। সে চিৎকার করে বলল, রাস্তা ভুল হয়েছে। তারপর হাত তুলে ইশারায় এপারে সোঁতার বাঁদিকটা দেখিয়ে বলল, কিনারা ধরে চলে যান।

বদিউজ্জামান আবৃত্তি বন্ধ করেননি। কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনেছিলেন মাত্র। অসিমুদ্দিন বলল, এদিকে তো লিক (চাকার দাগ) নাই ভাইজান!

ওপারের শাদা লোকটি বলল, তাতে কী? গাড়ি ডাকান। আমি এপারে থেকে সঙ্গে যাচ্ছি।

গাড়ির মুখ ঘোরানো হল। কাশের বন ভেঙে গাড়িগুলো সোঁতার সমান্তরালে চলতে থাকল। এবারে পায়ে হাঁটার সমস্যা। তাই সবাইকে গাড়িতে উঠতে হল। কুলসুমকে রাতের মতো চাপানো হ'ল সাইদার টাপরের পেছনে। শফি চাপল মায়ের গাড়িতে গাড়োয়ানের পেছনে। সাইদা পরদার ফাঁকে [illegible] ওপরের শাদা লোকটিকে দেখছিলেন। তাঁর চোখের চাউনিতে বিস্ময় ঝিলিক দিচ্ছে। শফি ফিসফিস করে ডাকল, আম্মা!

কী বেটা?

শফি চুপ করে গেল। সে জিনের কথা বলবে ভেবেছিল। কিন্তু তার কথা
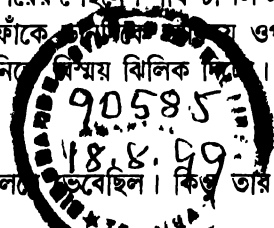
শুনে যদি শাদা জিন অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে আব্বা হয়তো তাকে ভীষণ বকবেন।

শাদা মানুষটির পরনেও একফালি ন্যাতা। শাদা চুলগুলো খোঁচাখোঁচা। কিছু জড়ানো নেই। সে মাঝেমাঝে কাশের ভেতরে ঢাকা পড়ছিল। তখন অসিমুদ্দিন চেঁচিয়ে তাকে ডাকছিল, ভাইজান! ভাইজান!

তখনই সে কাশের পরদা ফাঁক করে সাড়া দিচ্ছিল, আছি, আছি। চলেন, চলেন। তার শাদা দাঁতে রোদ্দুর ঝকমকিয়ে উঠছিল।

পোয়াটাক চলার পর সত্যি একটা বাঁধ দেখা গেল। বাঁধের ওপাশে সোঁতার বুকে গাঢ় সোনালি বালির চড়া। শাদা লোকটি বলল, এইখানে পার হয়ে আসেন। আর ওই যে দেখছেন বাবলাবন, ওখানে গেলেই আবার লিক পাবেন। তা যাবেন কোথা আপনারা?

সেকেড্ডো-মখদুমলগর।

গাড়িতে উনি কে?

হুজুর পিরসাহেব।

লোকটা কপালে হাত ঠেকিয়ে বদিউজ্জামানের উদ্দেশে বলল, সালাম হুজুর! তারপর সে কাশবনের ভেতর ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ তার শাদা মাথাটা দেখা গেল। তারপর সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অসিমুদ্দিন মৃদু হেসে চাপাগলায় বলল, সবই হুজুরের কেরামতি। আমিন! রব্বুল আলামিন!

উলুশরার মাঠে একজন কালোমানুষ বিপদে ফেলেছিল, একজন শাদা মানুষ এসে তাদের উদ্ধার করে গিয়েছিল। সদরে দায়রা আদালতে ফাঁসির হুকুম শোনার পরই শফিউজ্জামানের চোখে ভেসে উঠেছিল চৈত্রমাসের সেই আশ্চর্য দিনটি। সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে একটি আশ্চর্য সময়। প্রাচীন একটি মোজেজা। আব্বা যদি আজ বেঁচে থাকতেন।...

বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব

সেই কালো জিন আর শাদা জিনের কাহিনী পরবর্তী সময়ে পল্লবিত হয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে আর যে পিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাজি মৌলানা বদিউজ্জামান জেহাদ করে

বেড়িয়েছেন, ক্রমশ প্রকারান্তরে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর ফুঁদেওয়া জল নেওয়ার জন্য বহুদূর থেকে লোকেরা এসে ভিড় জমাতে থাকে। জুম্মাবারে তাঁর পাগড়ি ছুঁয়ে 'তওবা' করার জন্য মসজিদের ভেতর থেকে বাইরে অব্দি একটা কিউ সৃষ্টি হয়। তাঁর পাগড়ির রঙ হয়ে ওঠে সবুজ। কারণ পয়গম্বরের প্রিয় রঙ ছিল সবুজ। তাই তিনি জনসমাবেশে সবুজ পাগড়ি পরে হাজির থাকতেন। পরে তাঁকে তাওবা-অনুষ্ঠানের বহর দেখে পাগড়িটিকে অসম্ভব দীর্ঘ করতে হয়েছিল। মাথায় পরার পর পাগড়িটিকে ঈষৎ বেমানান মনে হলেও উপায় ছিল না। আসলে ইসলামি তওবা খ্রিস্টানি কনফেসনেরই মতো। পাপ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা। তওবা করার সময় লোকেরা এত জোরে কান্নাকাটি করত যে একদিন হরিণমারার দারোগা মুকুন্দ সিং মসজিদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ভীষণ চমক খেয়ে থমকে দাঁড়ান এবং ধরেই নেন একটা খুনখারাপি হয়েছে। সাইদা বেগম এই গল্পটা খুব রঙ চড়িয়েই শোনাতেন তাঁর দুপুরের আসরে। জিনদুটির গল্পের চেয়ে মেয়েরা দারোগাবাবুর গল্পটিরই বেশি পক্ষপাতিনী ছিল। কারণ এই দারোগার গল্পে একটা ঘোড়া ছিল, যাকে একবার জিনে ধরেছিল।...

তবে এও ঠিক, কালো জিন আর শাদা জিনের অলৌকিক কাহিনী পল্লবিত হওয়ার মূলে ছিলেন সাইদা এবং খয়রাডাঙার সেই অসিমুদ্দিন। দুজনেই কাহিনীর বীজ বুনেছিলেন। সাইদা মেয়েদের মনে আর অসিমুদ্দিন পুরুষদের মনে। তাব চেয়ে বড় কথা, বদিউজ্জামান যে সেকেড্ডা-মখদুমনগর যেতে মাঝপথে বাদশাহি সড়কের ধারে মৌলাহাটেই সেবার আটকে যান, তার পেছনেও যেন জিনদুটির কিছু কারসাজি ছিল।

সাইদা আর অসিমুদ্দিন দুজনেই বিশ্বাস করতেন একথা। বস্তুত চৈত্রমাসের সেই দিনটিতে পর-পর দুবাব মোজেজা বা দিব্যশক্তির নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। উলুশরার তৃণভূমি পেরিয়ে সাতখানা গোরুর গাড়ির অদ্ভুত কারাভাঁ যখন বাদশাহি সড়কে পৌঁছয় তখন দলের প্রত্যেকটি লোক ছিল চঞ্চল আর হাসিখুশি। এবার যে-কোনো বাধার বিরুদ্ধে জান কোববান করে শহিদ হতে তারা তৈরি ছিল। শফি হাত থেকে সেই ছিপটিটি ফেলেনি। সে বারবার সন্দিগ্ধভাবে পিছু ফিরে দেখছিল, যদি কোনো জিন তাদের অনুসরণ করে থাকে, সে কালো না শাদা। আর অসিমুদ্দিন চাপা স্বরে সঙ্গীদের বলছিল, সে খাগড়ির সোঁতা পেরিয়ে দাবানলের মতো আঁকা-বাঁকা একটি ভগ্নরেখা আবিস্কার করে এসেছে। এমন কী তার বিশ্বাস, শাদা জিনটিকে চোখের কোনা দিয়ে যেন আকাশ থেকেই নামতে দেখেছিল সে। আর সে ভেবেছিল, দিনের বেলায় 'তারা খসে পড়া' সম্ভব কি না। স্বর্গ থেকে নির্বাসিত শয়তান যখন আকাশের আনাচে-কানাচে গিয়ে স্বর্গে অনুপ্রবেশের ছিদ্র সন্ধান করে, তখন সতর্ক স্বর্গপ্রহরী ফেরেশতা তার দিকে নক্ষত্র ছুড়ে মারে। শয়তান প্রাণভয়ে পৃথিবীতে পালিয়ে আসে। রাতের আকাশে সেটাই তো দেখা যায়। তারপর অসিমুদ্দিন হাত তুলে বলেছিল, ওই দেখা যায় মৌলাহাট! সেবার শুখার বছর ওখান থেকেই ধান কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুনিয়ার কোথাও আবাদ ছিল না। মৌলাহাটে ছিল। ক্যানে কী — অসিমুদ্দিন আবার হাত তুলে বলেছিল, ওই দ্যাখো শেরের দীঘির পাড়। ওই দীঘির পানির থই নাই। সেই পানিতে চাষবাস হয়েছিল। আর ওই দ্যাখো লদী।

লদীর নাম বাম্ভনী। যদি বলো এমন নাম ক্যানে — তো সেই কথাটা বলি শোনো।

শফি সঙ্গ ধরেছিল অসিমুদ্দিনেব। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছিল এই লোকটি গল্পের জাদুকর। এক ব্রাহ্মণ আর এক পিরের অলৌকিক লড়াইয়ের কথা শুনে সে অবাক হয়েছিল। গল্পটি ঈষৎ অশালীন, কিংবা হয়তো কিছু তাৎপর্য ছিল, যা বোঝার মতো বোধবুদ্ধি ছিল না শফির। ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, আমি প্রস্রাবে নদী তৈরি করতে পারি। আর পির বলেছিলেন, আমি সেই নদী বুখে দিতে পারি। নদী তৈরি হল এবং পির দিলেন পাথর দিয়ে বুখে। এই অদ্ভুত লড়াই-যখন তুঙ্গে, তখন রফা করতে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র আর হজরত আলি। রফা হল পাথরের বাঁধ থাকবে, তবে নদীর বয়ে যাওয়ার জন্য বাঁধে পাঁচটা ছিদ্র হবে। মৌলাহাটের ওধারে নদীর ওপর যে জিনিসটাকে এখন সাঁকো বলা হয়, সেটাই সেই পিরের বাঁধ। গল্পটা শুনে সবাই হাসতে লাগল। তখন অসিমুদ্দিন চোখে ঝিলিক তুলে জিগ্যেস করল, তাহলে কে জিতল ? ব্রাহ্মণ, না পির ? ঠিক করতে না পেরে সবাই একবাক্যে বলল, দুজনেই সমান। শুধু শফি বলল, ব্রাহ্মণ। তখন অসিমুদ্দিন হাসতে হাসতে বলল, আমরা মোছলমানরা চিরকাল বোকা। শুধু গায়ের জোরটুকুন আছে। বুদ্ধি বলতে নাই। তারপর অসিমুদ্দিন পায়েব তলার সড়কটা দেখিয়ে আবার একটা গল্প বলেছিল। সেটা বাদশাহি সড়কের গল্প। সেও হিন্দু মুসলমানের গল্প।

উত্তরের দেশের বাদশাহ দক্ষিণদেশে গেছেন। দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজত্ব। একশো মন্দির। বাদশাহ মন্দির ভেঙে ফিরে যাচ্ছেন, মন্দিরের ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিশাপ দিলেন, বাড়ি ফিরলেই তোমার মরণ। অসিমুদ্দিন বড় করে শ্বাস ফেলে বলল, বাড়ি ফিরলেই আমার মরণ ? বাদশাহ খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন। ভাবছেন, খুবই ভাবছেন, ভেবেই যাচ্ছেন। হঠাৎ এল এক ফকির। ফকির মুচকি হেসে বলল, অ্যাই বাদশা ! বাড়ি ফিরলেই যদি মরণ, তবে ফেরার পথে সড়ক বানা। কোরোশ-অন্তর দীঘি খোঁড়। সেই দীঘির পাড়ে মসজিদ বানিয়ে দে। মহলে ফিরতে-ফিরতে তুই চুল পেকে দাঁত ভেঙে থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে যাবি। বাম্ভনের অভিশাপ ঝুট হয়ে যাবে। আর বাস্ ! অসিমুদ্দিন খিকখিক করে হাসতে লাগল। এই যে দেখছ হেঁটে যাচ্ছি আমরা, এই সেই সড়ক। আর ওই নজর হচ্ছে সেই এক দীঘি। দীঘির পাড়ে জঙ্গলের ভেতরে ওটা কী দেখছ ? গুম্বুজ ! মসজিদের গুম্বুজ !... অসিমুদ্দিন শুখার বছরে ধান কিনতে এসে দেখে গেছে, সেই মসজিদে শেয়ালের আস্তানা। চামচিকের নাদি পড়ে আছে। দেখে কষ্ট হয।

অসিমুদ্দিন ! হুজুর ডাকছিলেন। জলদগম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর। আগের গাড়িতে তিনি বসে আছেন গাড়োয়ানের পেছনে। হাতে তসবিহ্‌দানা — জপমালা। চোখদুটি অর্ধমুদিত। তাঁকে ভীষণ গম্ভীর দেখাছিল।

অসিমুদ্দিন ছাগলছানা দুটি কাদির আলিব কোলে দিযে লম্বা পায়ে এগিয়ে এল। ডাকছেন হুজুর ?

অসিমুদ্দিন ! আমরা শেরের দীঘির ঘাটে খানা সেরে নেব। জোহরের নমাজ পড়ব। তারপর রওনা দেব।

প্রধান শিষ্য সেই বার্তা পৌঁছে দিতে-দিতে পিছিয়ে শেষ গাড়ির কাছে এল। সবাই বলল, ইনশাল্লাহ্। আর গাড়োয়ানরাও বলল যে বলদগুলো মাঠের আল-

কাটা লিকে হেঁটে বড় পরিশ্রান্ত। তারা ঠিক একথাই ভাবছিল। কিন্তু সাহস করে বলতে পারছিল না। নকিব নামে এক গাড়োয়ান করুণ হেসে বলল, তাড়াতাড়ি গাড়ি বাঁধতে ধুরিতে তেল দেওয়া হয়নি। তাই গাড়িটা বড় আওয়াজ দিচ্ছে। এবার গাড়ি বেঁধে ধুরিতে তেল দিতে হবে। নৈলে কখন মড়াত্ করে ভেঙে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আশঙ্কা সত্যি হয়েছিল। দীঘির শানবাঁধানো ঘাটের শিয়রে এক প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। সেই বটতলায় সাতখানা গাড়ি এলোমেলোভাবে ঢুকতে না ঢুকতে সত্যিই মড়াত্ করে নকিব গাড়োয়ানের গাড়ির ধুরি ভেঙে গেল। ভাগ্যিস সে-গাড়িতে শুধু গেরস্থালির জিনিসপত্র ছিল। কিন্তু এ এক বিপদই বলতে হবে। ধুরিটা এমনভাবে ভেঙেছে যে তাপ্পি মেরে কাজচলা গোছেরও করা যাবে না। তাড়াহুড়োয় কেউ বাড়তি ধুরি নিতে ভুলে গেছে। নতুন ধুরি মৌলাহাট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু তাতে সময় লাগবে। গাড়ির ধুরি বাঁধা সামান্য কাজ নয়।

আবার মুখগুলি বড় গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। আবার কালো জিনের পাল্লায় পড়া গেছে, তাতে সন্দেহ ছিল না কারুর। খুব ব্যস্তভাবে সবাই নকিবের গাড়িটিকে খালি করে জিনিসপত্র বটতলায় গুঁড়ির কাছে জড়ো করছিল। গাড়ি খালি হলে নকিব আর ফজল গ্রামের দিকে চলে গেল নতুন ধুরির খোঁজে। শফি তার বুজুর্গ পিতাকে লক্ষ্য করছিল। বদিউজ্জামান ছায়ায় একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর পিছনে ঘুরে উঁচু পাড়ের দিকে তাকালেন। ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ভেতর বাদশাহি মসজিদের গম্বুজটাকে দেখলেন সম্ভবত। গম্বুজে একটা ফাটল ছিল। তারপর শফি দেখল, তার পিতা ময়ূরমুখো ছড়িটি নিতে এলেন গাড়ি থেকে। ছড়িটি হাতে নিয়ে তিনি ধীর পদক্ষেপে পাড়ে উঠে গেলেন। ঝোপের ভেতর তাঁর শাদা আলখেল্লা ঝলমলিয়ে উঠছিল। শফির গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। একটা কিছু ঘটতে চলেছে আবার। সে ভাবতে পারছিল না এবারে কী ঘটবে। আব্বা কি শাদা জিনটিকে দেখতে পেয়েছেন? সাইদা আর কামরুন্নিসার গাড়িটা বটগাছের গুঁড়ির আড়ালে বাঁধা হয়েছিল। সেখানে অসিমুদ্দিন শিগগির অন্য একটা গাড়ির টাপরের সঙ্গে একটা শাড়ি আটকে রীতিমতো জেনানা মহল বানিয়ে দিয়েছে। সেই পর্দার ফাঁকে সাইদার পা দেখতে পাচ্ছিল শফি। ছুটে গিয়ে মাকে তার আব্বার ওই রহস্যময় গমনের কথা বলবে ভাবছিল শফি। কিন্তু ঠিক তখনই দীঘির ঘাটের দিকে তার চোখ গিয়েছিল। সে জলের শব্দ শুনে থাকবে। ঘুরে দেখল দুটি মেয়ে ঘাটের সামনে কালো জলে সাঁতার কাটছে। দুজনেরই বুকে দুটি পেতলের কলসি উপুড় করা। কলসি আঁকড়ে ধরে তারা উপুড় হয়ে ভেসে পা ছুড়ছে। কালো জল শাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। একজনের গায়ে বেশি জল এসে পড়ায় আপত্তি করতে গিয়েই সে শফিকে দেখল এবং কলসিটিকে ছেড়ে জলের ভেতর দাঁড়িয়ে গেল। অবাক চোখে সে শফিকে দেখছিল। অপর মেয়েটিও এতক্ষণে শফিকে দেখতে পেয়েছে। সেও একইভাবে দাঁড়িয়ে শফিকে দেখতে থাকল। তারপর শফিই অবাক হয়ে গেল। দুটি মেয়ের মুখের গড়ন হুবহু এক। শফি যমজ ছেলে দেখেছিল কুতুবপুরে থাকার সময়। এই মেয়েদুটিও কি যমজ? সে ভাবছিল, কাছে গিয়ে দেখবে সত্যি তাই নাকি। কিন্তু বিশেষ করে অচেনা মেয়েদের — যারা শাড়ি পরে আছে, তাদের কাছে যাওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিল না। তারপর তার মাথায় বুদ্ধি খেলেছিল।

সে একদৌড়ে মায়ের কাছ থেকে তামচিনির বদনাটা চেয়ে নিল এবং সোজা গিয়ে ঘাটে নামল। ঘাটের ধাপ জায়গায়-জায়গায় ভাঙা। শ্যাওলা গজিয়ে আছে। সে মুখ নামিয়ে ধাপে নামছিল। সেই সময় মেয়েদুটি হেসে উঠল। একজন বলল,পা পিছলে যাবে! অন্যজন ভুরু কুঁচকে তাকাল সঙ্গিনীর দিকে, অচেনা ছেলের সঙ্গে কথা বলায় তার আপত্তি। শফি সাবধানে নেমে জল ভরার জন্য বসল। তখন তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, সে বলল, তোমাদের বাড়ি কোথা গো?

শফি বলল, আমরা সেকেড্ডা যাব।

প্রথমা খিলখিল করে হেসে উঠল। শুধোচ্ছি বাড়ি কোথা, বলে কী সেকেড্ডা যাব। দ্বিতীয়াও এবার না হেসে পারল না।

শফি বুঝল তার জবাব ঠিক হয়নি। একটু হেসে সে বলল, আমরা আসছি খয়রাডাঙা থেকে।

প্রথমা বলল, খয়রাডাঙায় বাড়ি! আমরা গেছি সেখানে। পীরের থানে, মেলা বসে পউষ মাসে — সেই মেলায় গেছি।

শফি বলল, আর মেলা তো বসে না।

দ্বিতীয়া একটু অবাক হয়ে বলল, বসে না? কেন বসে না বলো তো?

শফি গম্ভীর হয়ে বলল, আমার আব্বা পিরের থান ভেঙে দিয়েছেন!

প্রথমা বাঁকা হেসে বলল, কে তোমার আব্বা? ইশ! থান ভেঙে দিয়েছে। ভারি আমার মুরোদ।

মেয়েদুটির বয়স বারো-তেরোর বেশি নয়। তারা শফিকে তুমি-তুমি করায় শফির আত্মসম্মানে লাগছিল। সে মুখ উঁচু করে বলল, আমার আব্বা বড় মৌলানা।

দ্বিতীয়া বলল, মৌলানা বলে থান ভাঙতে হবে? এমন তো শুনিনি কখনও। রুকু, ছেলেটা কী বলছে শোন।

রুকু মুখ টিপে হাসছিল। জল কুলকুচি করে আকাশে ছুড়ে বলল, থান কেউ ভাঙে? ও আমাদের সঙ্গে তামাশা করছে।

শফি জলভরা বদনা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। খুব গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা থান টান মানি না। আমরা ফরাজি।

দুই বোন একসঙ্গে চমকে উঠে বলল, কী বললে?

আমরা ফরাজি।

দুজনে আবার হেসে উঠল। রুকু একটু তেজি। সে সুর ধরে ছড়া কাটল :

ফরাজিদের নমাজপড়া
ঢেঁকির মতন মাথানাড়া॥

শফির কান লাল হয়ে উঠল। অনেক জায়গায় হানাফি সম্প্রদায়ের ছেলেরা এই ছড়া গেয়ে তাকে উত্যক্ত করত। সে ভীষণ খেপে গিয়ে ঢিল ছুড়ে ভাগিয়ে দিত তাদের। এরা যদি ছেলে হত, সে হাতের বদনাটা ছুড়ে মারত। কিন্তু এরা মেয়ে। তাছাড়া এরা যে যমজ দুটি বোন তা সে বুঝতে পেরেছে। সে তাদের উপেক্ষা করল। আর এইসময় গাড়োয়ানরা বালতি হাতে ঘাটের দিকে আসছিল। তাই দেখে মেয়ে দুটি শাড়ি টেনে মাথা ঢাকল। তারপর ঝটপট কলসিতে জল ভরে ঘাটের একটা পাশ দিয়ে ভয়পাওয়া ভঙ্গিতে উঠে গেল। তারা ঘাটের মাথায় ভিড় দেখে

থমকে দাঁড়াল একটু। তারপর সেদিকে না গিয়ে দীঘির ধারে-ধারে ভেজা শাড়ির শব্দ করতে-করতে পালিয়ে যাওয়ার মতো হেঁটে গেল। তারা মসজিদের ওপাশে ঝোপের ভেতর দিয়ে চলে গেলে তখন শফি ফিরে এল বটতলায়। রাগে দুঃখে অস্থির সে। মেয়েদের কাছে জীবনে এই প্রথম সে অপমানিত।

আর এরপরই হুজুর পির বদিউজ্জামানের দ্বিতীয় মোজেজা দেখা গিয়েছিল। মোজেজা ছাড়া আর কী বলা যায় একে ? নকিব আর ফজল গ্রামে নতুন ধুরির খোঁজে গিয়েছিল। ওরা যখন ফিরে এল, তাদের সঙ্গে একশো লোক। লোকগুলির মুখেচোখে ঐশী নিদর্শন অনুসন্ধানের প্রচণ্ড আকুলতা, আর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আকাশে। তারা ছবিতে আঁকা মানুষের মতো স্থির আর শব্দহীন। সেই জনতাকে দেখে অসিমুদ্দিন কিন্তু প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কারণ সে-যুগে ফরাজিতে দীক্ষিতদের ওপর কোথাও-কোথাও হামলা ঘটত। সে দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে হুজুরকে খুঁজতে গিয়েই চমকে উঠল। অভিভূত হল সে। তার ঠোঁটদুটি কাঁপতে থাকল। তার সারা শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল। দীঘির উঁচু পাড়ে শাহি মসজিদের প্রান্তে একখণ্ড পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন বদিউজ্জামান। ওইখানে কোনো বৃক্ষলতা নেই। চৈত্রের নীলধূসর আসমানের গায়ে আঁকা শাদা আলখেল্লা আর শাদা পাগড়িপরা মূর্তিটিকে দেখে মনে হয় ওই মানুষ দুনিয়ার নন। অসিমুদ্দিন সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারল আবার একটি মোজেজা ঘটতে চলেছে। সে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, আলহামদুলিল্লাহ্ ! হে ঈশ্বর, সকল প্রশংসা শুধু তোমার। আর মৌলাহাটের সেই জনতাও অভিভূত। তারা ঘুম-ঘুম কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনি তুলল, আলহামদুলিল্লাহ ! আলহামদুলিল্লাহ ! তারপর তারা গাম্ভীর্য আর সম্ভ্রমে এগিয়ে গেল সেই দিকে। পরগম্বর ইশা মানুষকে মেষপালের উপমা দিয়েছিলেন। বস্তুত মৌলাহাটের এই মানুষগুলি মেষপালের মতো দীঘির পাড় বেয়ে উঠে যাচ্ছিল। তারা ফারসি-হরফখোদিত কালো গ্রানাইট শিলাটির সামনে গেলে বদিউজ্জামান প্রথমে সম্ভাষণ করলেন, আস্-সালাম। তারপর বদিউজ্জামান তাঁর বিশাল দুই হাত প্রসারিত করে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে বললেন, বেরাদানে ইসলাম !...

এরপর তিনি যে ভাষণটি দেন, মৌলাহাটের মুসলমানেদের কাছে বংশপরম্পরায় একটি কিংবদন্তি-ভাষ হয়ে ওঠে। তারা বলত, হুজুর আমাদের কানে গরম সীসার মতো কিছু কথা ঢেলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমরা অন্য কথা শুনতে পাই না। যদি বা শুনতে পেতাম, আমাদের কানের দুয়ার বন্ধ।

কিশোর শফি বটতলায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছিল। পর্দার ফাঁক থেকে সাইদাও উঁকি দিয়ে দেখছিলেন। তিনিও অসিমুদ্দিনের মতো প্রথমে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, লোকগুলি নিশ্চয় হানাফি মজহাবের এবং তাই তারা ফরাজি ধর্মগুরুকে হয়তো আক্রমণ করতে যাচ্ছে। পক্ষাঘাতগ্রস্তা কামরুন্নিসা জিগ্যেস করেছিলেন, কী হল বউবিবি ? অত পায়ের শব্দ হচ্ছে কেন ? আমার বদুর কি কোনো বিপদ হল ? কামরুন্নিসা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।....বউবিবি ! তুমি কথা বলছ না কেন ? সাইদার বুক কাঁপছিল। বিরক্ত হচ্ছিলেন শাশুড়ি বিবিজির প্রতি। একই উদ্বেগসংকুল দৃষ্টিতে সাইদা খুঁজছিলেন শফিকেও। শফি পর্দার ভেতর মায়ের কাছে চলে এলে সে নিরাপদ। কারণ ওরা স্ত্রীলোকদের ওপর হামলা করবে না। তিনি শফিকে দেখতে

পেয়ে শরিয়তি অনুশাসন তুচ্ছ করে ঈষৎ চড়া গলায় ডাকলেন, শফি ! শফি ! পর্দাব্যূহের ফাঁকে তাঁর পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে আর কোমল হাতখানিও নড়তে লাগল। সেই হাতে তিনগাছি করে সবুজ কাচের চুড়ি ছিল। চুড়ির শব্দে বটতলায় আবিষ্ট অসিমুদ্দিনের চমক ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে সে চাপা স্বরে এবং মৃদু হেসে বলল, আল্লাহ আমাদের। ডর করবেন না মা-জননী ! বাছা শফি-উজ্জামান ! জলদি যেয়ে দেখুন, আম্মাজান তলব করেছেন।

শফি গ্রাহ্য করল না। সে দীঘির উঁচু শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তার আব্বা আর সামনে বসে-পড়া মেষপালটিকে দেখছিল। দেখতে-দেখতে যমজ বোনেদের কথাই ভাবছিল সে। তারা যদি এবার এই দৃশ্যটা দেখতে পেত ! রাগ-দুঃখ-অপমান ভুলে তারা শফির মনটা নির্মল হল। সে মনে-মনে বালিকাদুটিকে ক্ষমা করে দিল। আর অসিমুদ্দিন তার উদ্দেশে চাপা গলায় বলে, উঠল, কী দেখছেন বাপজান ? তামাম মৌলাহাট ফরাজি হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহে রব্বুল আলামিন ! এমন কী ঝটপট দুহাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে মুখে ঘষতে থাকল। শুধু গাড়োয়ানদের কোনো দৃকপাত ছিল না। তারা নিঃশব্দে দীঘি থেকে জল এনে বলদগুলিকে জাবনা খেতে দিচ্ছিল। নকিব তার ভাঙা ধুরিটাতে বারবার হাত বুলিয়ে পরখ করছিল। পরে সে বলেছিল, হুজুর সাহেবের কথা শোনামাত্র আমার ধুরির কথা চাপা পড়েছিল। চাদ্দিকে অমনি ছুটোছুটি, হাঁকডাক, ওরে সব আয়, বদুপির এসেছেন ! বদুপির এসেছেন ! বলতে বলতে সে এক ঝড় বইয়ে দিলে। আর ফজল বলেছিল, নকুর কথা ধরো না। কী হয়, কী বলে ! আসলে হাটতলায় একটা শালিশি বসেছিল। অনেক লোক ছিল সেখানে। আমি একজনকে আড়ালে ডেকে কালো জিন শাদা জিনের কথাটা বললাম। হুজুরের কেরামতির কথা বললাম। তবে তো—

একটা কিছু ঘটেছিল, তাব প্রকৃত বর্ণনা আর পাওয়া যাবে না। শুধু এইটুকু বোঝা যায়, মৌলানা বদিউজ্জামান মৌলাহাট অঞ্চলে বদুপির নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু গল্পও পল্লবিত হয়ে থাকবে। যেমন, জিনেরা তাঁর সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতে আসত, গোরস্থানে মৃতেরা তাঁর 'আসসালামু আলাইকুম' সম্ভাষণের জবাব দিত। তবে তার চেয়ে বড় কথা, মৌলাহাটের পায়ের তলায় ব্রাহ্মণী নদীতে পিরের সাঁকোটি পিরতন্ত্রের মহিমা প্রচার করে এসেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। তারা বংশপরম্পরা প্রতীক্ষা করত সেইরকম কোনো অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়ান। আর চৈত্রের সেই দুপুরে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের পটে শাদা পোশাকপরা গৌরবর্ণ সুন্দর সেই পুরুষকে দেখামাত্র তারা বুঝতে পেরে থাকবে, এই সেই মোজেজাসম্পন্ন মানুষ, যাঁর কথা তাদের পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহরা বলে এসেছে। তারা যখন মিছিল করে তাঁকে গ্রামে নিয়ে যাচ্ছে, তখন দেখা গেল রাস্তার দুধারে আরও মানুষ সারবন্ধ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। স্ত্রীলোকেরা জানালা-দরজার ফাঁকে বা পাঁচিলেব চাযের মই ঠেকিয়ে তাতে সাবধানে উঠে গিয়ে উঁকি মারছিল। কিছু বেহায়া বা স্বৈরিণী স্ত্রীলোক পুরুষদের ভিড়েই দাঁড়িয়েছিল। পুরুষেরা তাঁদের তাড়া করে বাড়িতে ঢোকাল। আরও বহু পুরুষ উঁকি মেরে থাকা স্ত্রীলোকদেব্র হাত-ইশারায় সরে যেতে বলল। তারা ভ্রূ কুঞ্চিত করে হুঁশিয়ারি দিয়ে আগে-আগে হাঁটছিল।

বস্তুত মৌলাহাটের মুসলমানদের জীবনে সে ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বদিউজ্জামান সোজা গিয়ে মসজিদে ঢুকেছিলেন। প্রকাণ্ড মসজিদটি পাকা। প্রাঙ্গণে ইঁদারা ছিল। জোহরের নামাজের সময় এত ভিড় হল যে রাস্তা অব্দি তালাই বিছিয়ে নামাজ পড়তে হয়েছিল।

আর তখন দীঘির ঘাটে বটতলায় শুধু দুটি গাড়ি। একটি সাইদা আর তাঁর শাশুড়ির। অন্যটি বেচারা নকিবের। বাকি গাড়িগুলি লোকেরা এসে নিয়ে গেছে। সাইদার পর্দার অন্য প্রান্ত বটের ঝুরির সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। সাইদা তাঁর প্রতিবন্ধী মেজ ছেলেকে গুড়মুড়ি খাওয়াচ্ছিলেন। শফি নকিবের কাছে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি স্ত্রীলোককে চাদর মুড়ি দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখল সে। স্ত্রীলোকেরা পর্দার আড়ালে সাইদার কাছে গেলে নকিব করুণ হেসে বলল, আম্মাজানদের বেবস্থা হল। এবারে আমার হলে বাঁচি।

একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক পর্দা থেকে বেরিয়ে সোজা নকিবের কাছে এল। ঘোমটার আড়াল থেকে সে বলল, বিবিজিদের গাড়িখানা বলদ জুতে নিয়ে এসো বাবা!

নকিব বলল, তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু এ গাড়ির ধুরি যে ভাঙা! এত সব জিনিস পড়ে রইল।

স্ত্রীলোকটি শফিকে দেখে মিষ্টি হেসে বলল, এই ছেলেটা থাকবে। তুমি এসো বাপু! বিবিজিরা বললেন, নমাজের অক্ত (সময) যাচ্ছে। জলদি করো!

সাইদাদের নিয়ে গাড়িটি চলে গেল। ওই গাড়ির আসল গাড়োয়ান তখন গ্রামের মসজিদে নামাজ পড়ছে। শফি তার ওপর বিরক্ত হয়ে বসে রইল। সে এখানে থাকলে অন্তত নকিব তার কাছে থাকত। নির্জন বটতলায় দুটি জাবনা-খাওয়া গোরু, একটা ভাঙা গাড়ি আর গেরস্থালির জিনিসপত্রের পাহারায় তাকে একা রেখে সব চলে গেল! অভিমানে গম্ভীর হয়ে রইল সে।

শেষ বসন্তে বটগাছটিতে চিকন কচি পাতা, আর সাতভাই নামে মেটে-ধূসর রঙের পাখিগুলি কলরব করছিল। বাদশাহি সড়কে ধুলো উড়ছিল। মাঝে মাঝে শূন্য মাঠ থেকে ঘূর্ণি হাওয়া খড়কুটো, শুকনো পাতা আর ধুলোর শরীর নিয়ে সড়ক পেরিয়ে যাচ্ছিল। ওপাশে পোড়ো জমিতে কোঙাগাছের নীল-শাদা ঝকঝকে জঙ্গলের ওপর গিয়ে প্রচণ্ড হুলস্থূল। তারপর কোথায় হনুমান ডকল। শফি তার ছিপটিটা শক্ত করে ধরে হনুমানের দলটাকে খুঁজতে থাকল। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। এবার তাকে একা পেয়ে সেই কালো জিনটা যদি হনুমান লেলিয়ে দেয়। দীঘির ঘাটে ততক্ষণে একজন-দুজন করে মেয়েরা স্নান করতে এসেছে। তাকে দেখে তারা ঘোমটা টেনে কিছু বলাবলি করছিল। শফির অস্বস্তিটা তাদের দেখতে পেয়েই চলে গেল। তখন সে পাখিগুলিকে তাড়া করল। একটি কাঠবেড়ালির পেছনে লাগল। আসলে সে আর তত বালক নয় সে প্রকৃতির এইসব ছোটখাট জিনিসগুলি তার আগ্রহেব সঞ্চার করে, কিংবা সেগুলি তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে। সে তাকে একলা ফেলে রেখে যাওয়ার অভিমান এড়াতে চাইছিল। সে অবাক হচ্ছিল ভেবে, তার মাও তাকে কিছু বলে গেলেন না! তার কথা সবাই ভুলে গেল কেন?

হয়তো সেই শেষ বসন্তের দিনটিতে সেই প্রথম শফি এই বিরাট পৃথিবীতে একা হয়ে গিয়েছিল, পিছিয়ে পড়েছিল দলভ্রষ্ট হয়ে — তারপর বাকি জীবন সে

একা হয়েই বেঁচে ছিল। জীবনে বহুবার অস্থিরতার মধ্যে ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত শফিউজ্জামানের আশ্চর্যভাবে মনে পড়ে যেত মৌলাহাটের দক্ষিণপ্রান্তে শাহি মসজিদের নিচে প্রকাণ্ড বটতলায় একলা হয়ে পড়ার ঘটনাটি। সেদিন যেন সবাই তাকে ভুলে গিয়েছিল। তারপর থেকেই ভুলেই রইল।

কিন্তু স্নানার্থিনীরা যখন চলে যাচ্ছে, তখন তাদের একজন শফিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে এক বৃদ্ধা। সে থপথপ করে একটু এগিয়ে এসে শফিকে একটু দেখল তারপর ফোকলা মুখে একটু হেসে বলল, বড় সোন্দর ছেলে। কে বাবা তুমি ?

এক যুবতী খিলখিল করে হেসে উঠল। দাদি ! পছন্দ হয় নাকি দেখো। দেখে—

বৃদ্ধা ঘুরে কপট ক্রোধে মুঠি তুলে বলল, মর হারামজাদি ! লোভ হচ্ছে যদি তুই কর।

যুবতীটিও এগিয়ে এল। বলল, তুমি পিরসাহেবের সঙ্গে এসেছ বুঝি ?

শফি গম্ভীরমুখে বলল, আমি পিরসাহেবের ছেলে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ভিজে থানের কাপড় মাথায় টেনে ঘোমটা দিল। যুবতীটি গ্রাহ্য করল না। সে বলল, তুমি এখানে কী করছ ? তোমার আম্মাজানরা তো দরিবুবুর বাড়িতে আছেন। তোমাকে কেউ ডেকে নিয়ে যায়নি ?

শফি বিরক্ত হয়ে বলল, দেখতে পাচ্ছেন না গাড়ির ধুরি ভেঙে গেছে ?

যুবতী ভাঙা গাড়ি, বলদ দুটি আর জিনিসপত্রের স্তূপটি দেখে নিয়ে বলল, ও। বুঝেছি ! তা তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। এসো, এসো। কত বেলা হয়েছে। এখনও হয়তো পেটে কিছু পড়েনি ! এসো।

শফি বলল, না।

সে কী ? যুবতীটি হাসল। কিচ্ছু চুরি যাবে না। আমাদের মৌলাহাটে চোর নাই। আর পিরসাহেবের জিনিসে হাত দিলে তার হাত পুড়ে যাবে না ? তুমি এসো তো আমার সঙ্গে।

বৃদ্ধাও বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিচ্ছু চুরি যাবে না বাবা। আপনি যান আয়মনির সঙ্গে। আয়মনি, তুই নিয়ে যা বাছাকে। আহা, মুখ শুকিয়ে একটুখানি হয়ে গেছে। আয়মনি, নিয়ে যা ভাই !

আয়মনি নিঃসঙ্কোচে শফির কাঁধে হাত রেখে টানল। তার হাতে একগোছা কাচের রঙিন চুড়ি। তার ভিজে হাতের স্পর্শ ফিকে আড়ষ্ট করছিল। সে পা বাড়াল। আয়মনি তার কাঁধ ছাড়ল না। রাস্তার ওধারে চষাজমির আলপথে গিয়েও শফির কাঁধটা সে পেছন থেকে ছুঁয়ে রইল।

চষা জমিগুলির শেষে একটা পোড়ো জমি। ঘন কোঙা আর কেয়াবনে ভরা সেই জমির বুক দিয়ে একফালি পথ। শফির আগে তিনজন সদ্যঃস্নাতা স্ত্রীলোক হাঁটছিল। বৃদ্ধা সবার শেষে। কেয়াবনের ভেতর গিয়ে আগের স্ত্রীলোকেরা বারবার ঘুরে শফিকে দেখে নিচ্ছিল। কেয়াবনের পর মাটির বাড়িগুলি খড়ের চাল মাথায় চাপিয়ে ঠাসবন্দি দাঁড়িয়ে ছিল। সবু একফালি গলিরাস্তায় ঢুকে টিনের চাল চাপানো একটি বাড়ির দরজার সামনে অগ্রবর্তিনীরা থেমে গেল। এবার আয়মনির হালকা পায়ে সামনে গিয়ে বলল, এসো। দরজার ভেতর ছোট্ট উঠোনে একপাল মুরগি

চরছিল। আয়মনি মুরগিগুলিকে হটিয়ে দিল। তারপর আবার বলল, এসো।

বারান্দায় তক্তাপোষে এক প্রৌঢ় বসে বাঙলা পুঁথির পাতা ওল্টাচ্ছিল। শক্ত সমর্থ এক মানুষ সে। তার শরীরটি তাগড়াই। খালি গা। পরনে শুধু লুঙ্গি। তার মুখে একরাশ দাড়ি। সে অবাক হয়ে তাকাল। তখন আয়মনি মৃদু হেসে বলল, বাপজি, বলো তো এই ছেলেটা কে ?

প্রৌঢ় লোকটি একটু হাসল।....কে রে আয়মনি ? আমি তো চিনতে পারছি না।

আয়মনি রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের পিরসাহেবের ছেলে। ঘাটের বটতলায় বেচারা একা দাঁড়িয়ে ছিল — না খাওয়া না দাওয়া ! ডেকে নিয়ে এলাম।

আয়মনির বাবা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।....আসুন, আসুন বাবা ! কী কাণ্ড দেখ দিকিনি ! ওদিকে-সবাই পিরসাহেবকে নিয়ে মত্ত। কারুর কি খ্যাল নাই এদিকে ? এইমাত্র মসজিদ থেকে আসছি। জানতে পারলে তো—

আমনি বলল, বাপজি ! শিগগির বটতলায় যাও দিকিনি ! ধুরি ভেঙে গাড়ি পড়ে আছে। জিনিসপত্র পড়ে আছে। কারুর খ্যাল নাইকো। তুমি যেয়ে দেখো কী ব্যবস্থা হল।

আয়মনির বাবা বারান্দার আলনা থেকে একটা ফতুয়া টেনে ঝটপট পরল। তাক থেকে তালশিরের তৈরি টুপিটাও নিয়ে পরতে ভুলল না। তারপর সে বেরিয়ে গেল। শফিকে তক্তাপোষে বসিয়ে আয়মনি শুকনো কাপড় পরতে গেল ঘরের ভেতর। শফি দেখল, তক্তাপোষে পড়ে থাকা পুঁথিটা 'কাছাছল অম্বিয়া'। পয়গম্বর এবং বুজুর্গ পুরুষদের কাহিনী। আয়মনি শুকনো শাড়ি জড়িয়ে পেতলের বদনায় জল আনল। বলল, হাতে মুখে পানি দিয়ে নাও ভাই ! এবেলা আর গোসল করতে হবে না।

শফি উঁচু বারান্দায় বসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে ফেললে আয়মনি তাকে একটা গামছাও দিল। একটু পরে সেই তক্তাপোশে মাদুর আর তার ওপর ফুল-লতা-পাতার নকশাওয়ালা একটুকরো দস্তরখান বিছিয়ে তাকে দেখতে দিল। আয়মনি পাখা নেড়ে হাওয়া দিতে দিতে বলল, তোমাকে খাওয়াবার কপাল হবে সে কি জানতাম ? তাহলে তো মুরগি জবাই করে রাখতাম। সে কথা বলতে বলতে বারবার হাসছিল। তার কোনোরকমে আটকে রাখা ভিজে চুল থেকে টপটপ করে জল ঝরে পিঠের দিকের কাপড় ভিজে যাচ্ছিল। আয়মনি বলছিল, আম্মাজানের জন্য ভেবো না। ওঁরা দরিবুবুর বাড়িতে আছেন। ওই যে দেখছ তালগাছ, ওটাই দরিবুবুর বাড়ি। দরিবুবুরা বড়লোক। কোনো অযত্ন হবে না। দরিবুবুর বাড়িতে এক্ষুনি খবর পাঠাচ্ছি — তোমার নাম কী ভাই ?

শফি আস্তে আস্তে বলল, শফিউজ্জামান।

আয়মনি আবার হেসে উঠল। অত খটোমটো নাম আমার মনে থাকবে না। আমি শফি বলব। কেমন ?

শফি একটা তরকারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইল," এটা কী। আবার হাসিতে ভেঙে পড়ল আয়মনি। মোলান খাওনি কখনও ? রূপমতীর বিল

থেকে বেচতে এসেছিল আজ। বিলের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে তো! বিলে খালি পদ্ম আর পদ্ম। তুমি দেখে অবাক হবে দুনিয়ার সব পদ্ম কি রূপমতীর বিলেই পুঁতে দিয়েছিল খোদা? সেই পদ্মের শেকড়ের ভেতর থাকে মোলান। কেউ কেউ বলে মুলান। চিবিয়ে দেখো, কী মিষ্টি, কী তার স্বাদ! আমি তো কাঁচাই খেয়ে ফেলেছি। আর শফি, তুমি ভাই এগুলো খাচ্ছ না। খাও। খেয়ে বলো তো কী জিনিস? হুঁ — পারলে না তো? চ্যাং মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে মাসগুলান মুসুরির ডালের সঙ্গে বেটে বড়া করেছি। তুমি আমলি খাও তো? আমলি-দেওয়া পুঁটি মাছ পেলে আমার তো আর কিছু রোচে না।

আমলি বা তেঁতুল কীভাবে সংগ্রহ করেছে আয়মনি, সেই গল্প বলতে থাকল। ওদিকে একটা পুকুর আছে। তার নাম জোলাপুকুর। ওদিকটায় জোলাদের পাড়া — সেই যারা তাঁত বোনে। তো সেই পুকুরের পাড়ে অনেক তেঁতুলগাছ আছে। হনুমানের পাল এসে তেঁতুল খায়। যদি তুমি ঢিল ছোড়, হনুমানগুলান কী করবে জান? তোমাকে তেঁতুল ছুড়ে মারবে.। তখন তুমি আঁচল ভরে কুড়োও যত খুশি। হাস্যমতী আয়মনির ভিজে চুল খুলে গেল হাসির চোটে। বলল, শফি, তুমি তো পিরসাহেবের ছেলে। কত ভালোমন্দ খেয়েছ। আমরা সামান্য চাষাভূষো মানুষ। তোমার সম্মান করার মতো কীই বা আছে?...বলে আযমনি আবার ভাত আনতে গেল। শফির খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড। আর আমলি-দেওয়া পুঁটিমাছটাও ছিল সুস্বাদু। তার আর কোনো অভিমান ছিল না। সে শুধু আয়মনিকে দেখছিল। একটু শৌখিন মনে হচ্ছিল, যুবতীটিকে। তার কানে সোনার বেলকুঁড়ি ঝিলমিল করতে দেখে মনে পড়ছিল, তার মায়ের কানেও এমন বেলকুঁড়ি নেই। সামান্য পাথর বসানো দুটো দুল আছে, তা হয়তো সোনার নয়। সাইদার হাতের চুড়িগুলিও তাঁর শাশুড়ির জেদে পরা। নৈলে বদিউজ্জামান মৃদু নসিহত করতেন। তাঁর মতে, অলঙ্কারকে ভালোবাসলে শয়তান হাসে। শয়তানকে হাসবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। আর হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, পয়গম্বরের বালিকাবধূ বিবি আয়েশার শৌখিনতায় পয়গম্বর তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, ওই বাহ্যিক সৌন্দর্য কোনো সৌন্দর্য নয়। কারণ তা তোমাকে মৃত্যুর পর আর অনুসরণ করবে না। পক্ষান্তরে মৃত্যুর পর যা তোমার অনুগামী হবে, তা হল তোমার আত্মার সৌন্দর্য। বিবি আয়েশা একবার কানের দুল হারিয়ে ফেলে কী বিপদে না পড়েছিলেন! দুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এদিকে পয়গম্বর সদলবলে রওনা হয়ে গেছেন। যে উটের পিঠে চাপানো তাঞ্জামে আয়েশার থাকার কথা, তা পর্দা-ঢাকা। ফলে উটচালক বুতে পারেননি বিবি আয়েশা কোথা। শেষে এক ব্যক্তি সেখানে দৈবাৎ এসে পড়েন এবং হুজুরাইনকে দেখে সসম্ভ্রমে নিজের উটে চাপিয়ে পয়গম্বর সকাশে পৌঁছে দেন। পরিণামে বিবি আয়েশার নামে কলঙ্ক-রটনাকারীরা কলঙ্ক রটনাব ছিদ্র পায়। আর ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ঘোষিত হয়। কলঙ্ক-রটনাকারীদের জন্য লানৎ (অভিসম্পাত) বর্ষিত হয়। পবিত্র কোরানে একটি সুরা আছে এ-বিষয়ে। সাইদা, তুমি হুশিয়ার! আমার হুজুর পয়গম্বর সাল্লেলাহ আলাইহেস্সাল্লাম বিবি আয়োকে একটু শিক্ষা দিয়েছিলেন মাত্র।

শফি শেষ গ্রাস মুখে তুলে থমকে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। উঠোনে যারা এসে দাঁড়িয়েছে এবং শফির দিকে মিটিমিটি হেসে তাকিয়ে আছে,

তারা সেই যমজ বোন ! এক বোন অপর বোনের অবিকল প্রতিবিম্ব যেন। শফির শরীর মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল। আয়মনি বলল, আয় বুকু ! রোজি আয় ! এই দ্যাখ, কাকে ধরে এনেছি। আর ও শফি, এই দেখ দরিবুবুর দুই বেটি। দিলরুখ আর দিল আফরোজ। আমরা বলি বুকু আর রোজি।

বুকু বারান্দায় উঠল। রোজি রান্নাঘরে আয়মনির কাছে গেল। আর বুকু একটু হেসে শফিকে বলল, তখন তুমি রাগ করেছিলে ?...
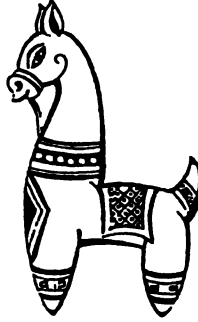
নতুন বাসস্থান

শফি ভাবছিল, কে রোজি আর কে বুকু, সেটা আয়মনি চিনতে পারে কী ভাবে ? দুজনের পরনে একই রঙের তাঁতের শাড়ি এবং তারা জামাও পরেছে একই রঙের। স্নান করে ওদের মুখের রঙে চেকনাই ফুটেছে বলেও নয়, দুই বোনের গায়ের রঙ ফরসা। সাইদা বেগমের মতো ফ্যাকাসে ফরসা নয়, একটু লালচে। চাষীবাড়ির মেয়েদের গায়ে কখনও জামা দ্যাখেনি শফি। তা ছাড়া চাষীবাড়ির মেয়েদের গলার স্বরের সেই রুক্ষতাটাও রোজ-বুকুর গলার স্বরে নেই। শফির সন্দেহ জাগছিল এতক্ষণে, এরা নিশ্চয় মিয়াবাড়ির মেয়ে।

কিন্তু মিয়াবাড়ির শাড়ি পরা মেয়েরা দীঘির ঘাটে স্নান করতে বা জল আনে যাবে, এটাও ভাবা যায় না। শফি ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল।

এদিকে বুকু অনর্গল কথা বলছিল। সে জানতে চাইছিল কিছু। আয়মনি ভাত খেয়ে রোজিকে নিয়ে এ বারান্দায় এলে শফির আড়ষ্টতা কেটে গেল। আর সেই সময় বুকু আয়মনিকে বলল, তোমাদের পিরসায়েবের ছেলে বোবা, আয়মনির খালা ! বুকু হাসতে লাগল। একটা কথারও জবাব দেয় না। খালি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে যে !

আয়মনি বারান্দার মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে পানের বাটা থেকে পান সাজতে থাকল। আর ঠোঁটের কোনায় চাপা হাসি। রোজি বুকুর পাশে বসে বলল, পির সায়েবের ছেলে আমাদের ওপর রেগে কাঁই হয়ে আছে।

আয়মনি বলল, ক্যানে ?

তখন ঘাটে সেই ছড়াটা বলেছিলাম। 'ফরাজিদের নামাজ পড়া/ঢেঁকির মতন...'

বুকু রোজির মুখ চেপে ধরে বলল, বড্ড বেহায়া তুই ! আবার কেন রাগাচ্ছিস ওকে ?

আয়মনি সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকালে শফি এতক্ষণে একটু হাসল। আস্তে বলল, এবার কিন্তু তোমাদেরই ঢেঁকির মতন মাথা নাড়তে হবে। আব্বার পাল্লায় পড়েছ, দেখবে কী হয় ?

বুকু দ্রুত বলল, কী হবে বলো তো ?

রোজি বলল, আমি বলছি শোন্ না। আর কেউ বেরুতে পারব না বাড়ি থেকে। সবচেয়ে বিপদ হবে আয়মনির খালার।

আয়মনি পান গালে ঢুকিয়ে বলল, আমার কিছু হবে না। তোমরা নিজেদেরটা সামলে চলো। এই যে হুট করতেই দুজনে বেরিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াও, বড়োবাড়ির মেয়ে সব — বিয়ে দিলে অ্যাদ্দিন ছেলেপুলের মা হয়ে যেতে ? সে কপট ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে ফের বলল, তোমাদের পায়ে বেড়ি পরাতে বলছি দরিবুবুকে। থামো একটু !

বুকু ঠোঁট বাঁকা করে বলল, ইশ ! অত সোজা ! আমি ফরাজি হবোই না !

রোজি বলল, শুনলি না ? সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি আসবেন পিরসায়েব। সব মেয়েকে তওবা করাবেন।

তার মানে ? বুকু হকচকিয়ে গেল। সে শফির দিকে ঘুরল। এই ছেলেটা, বলো না তওবা জিনিসটা কী ?

ব্যাপারটা আয়মনি বুঝিয়ে দিল। সে তার শ্বশুরগাঁয়ে একবার মেয়েদের তওবা-অনুষ্ঠান দেখেছিল। পর্দার আড়ালে মেয়েরা মৌলবিসায়েবের পাগড়ির ডগাটা ধরে রেখেছিল। মৌলবিসায়েব একবার করে একটা কথা আওড়াচ্ছিলেন আর মেয়েরাও চাপা গলায় সেটা আওড়ে যাচ্ছিল। তবে সে মৌলবিসায়েব হানাফি মজহাবের। ফরাজি মজহাবে কী হয়, আয়মনির জানা নেই। আয়মনি গল্পটা খুব রসিয়ে বর্ণনা করে শফিকে বলল তোমাদের মজহাবে কী হয় বলো না ভাই ?

শফি বলল, একইরকম।

রোজি বলল, পিরসায়েব মেয়েদের মুখ চিনে রাখেন না ?

শফি অবাক হয়ে বলল, না তো।

বা রে ! মেয়েদের তওবা করিয়ে জনে-জনে ডেকে মুখ চিনে রাখবেন, তবে তো রোজ কেয়ামতের পর হাশরের ময়দানে পিরসায়েব ওদের মুরিদ বলে চিনতে পারবেন ! তখন আল্লাকে আর নবিসায়েবকে বলবেন, এদের দোজখে নিয়ে যাবেন না যেন। এরা আমার মুরিদ।

শফি হাসল।...বাজে কথা। আব্বা শুনলে খেপে যাবেন।

কেন ? তোমার আব্বাও তো পিরসায়েব।

বুকু রোজির কথার ওপর বলল, খয়রাডাঙার পিরের থান ভেঙেছেন। পির কখনও পিরের থান ভাঙে ?

রোজি অবিশ্বাসে মুখ বাঁকা করে বলল, বাজে কথা ! হাত ঝলসে যাবে না থানে হাত দিলে ?

শফি বলল, আব্বার হাত ঝলসায়নি।

আয়মনি কৌতুক করে বলল, মসজিদের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসো না হাতখানা।

রোজি কথায় না করে বলল, এই তো হাটতলার কাছে খোঁড়াপিরের থান আছে। একবার হাত দিয়ে দেখুক না কেউ। কাজিসায়েবের কী হয়েছিল মনে নেই? থান থেকে লুকিয়ে পয়সা তুলতে গিয়েছিল, বাস! একটা হাত নেতিয়ে গেল।

শফি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি থানে হাত দেব, চলো। দেখবে,আমার কিছু হবে না।

রোজি তার স্পর্ধা দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বুকু একটু হেসে বলল, তোমার কেন হবে? তুমি যে পিরসায়েবের ছেলে।

শফির গর্ববোধটা ফুটে উঠল। বুকুকে তা' ভালো লাগছিল। এসেই বলেছে, তুমি কি রাগ করেছিলে — তখনই শফির তাকে ভালো লাগার শুরু। তার মনে মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সেই কথাটা। এখন আবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। বুকুকে দীঘির ঘাটে তেজী মেয়ে মনে হয়েছিল। অথচ আসলে শান্ত, বুদ্ধিমতীও। শফি বসে পড়ল আবার।

কিন্তু নিজের স্মৃতি ও ধারণার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাটা সে মেলাতে পারছিল না। অনাত্মীয় মেয়েদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ তার কখনও হয়নি। সবখানে মৌলানা বদিউজ্জামানের ছেলে হিসেবে সে যেন একটা পর্দার অন্যপাশে থেকেছে। মৌলাহাটে ব্যাপারটা যেন অন্যরকম। এখানকার মেয়েরা বাইরে চলাফেরা করে, সেটা নতুন কিছু নয় তার কাছে। কিন্তু তার সঙ্গে মুখোমুখি মেয়েরা বসে কথা বলবে, তর্ক করবে, এটা বড্ড বেশি নতুন।

রোজি গুম হয়ে বসে ছিল। একটু পরে হঠাৎ উঠে চলে গেল। বুকু তাকে ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে ডাকছিল। কিন্তু রোজি ফিরল না দেখে সে মুখটা একটু করুণ করে বলল, চলি আয়মনিখালা। তারপর শফির দিকে ঘুরে একটু হেসে বলল, চলি। রাতে আমাদের বাড়ি খেতে যাবে, তখন দেখা হবে।

আয়মনি বলল, জেয়াফৎ নাকি রে বুকু?

বুকু মাথাটা সামান্য দুলিয়ে চলে গেল। শফির মনে হল একটা আশ্চর্য আর সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা ভেঙে গেল যেন। বাড়িটা একেবারে শূন্য আর আগের মতো রুক্ষ হয়ে পড়ল।

আয়মনি বলল, 'যামা' বোন তো! দুঘড়ি আগে-পরে জম্মো। আগে রোজি, তারপর বুকু। তাই একলা-একলা কেউ থাকতে পারে না। ওই যে রোজি বেরিয়ে গেল — তুমি ভাবছ, সে চলে গেছে? কক্ষনো না। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কোথায়। বুকু যাবে, তবে তার সোয়াস্তি। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

শফি আনমনে বলল, ওরা কি মিয়াবাড়ির মেয়ে?

তুমি ঠিকই ধরেছ। আয়মনি হাসতে লাগল। তবে দো-আঁশলাও বলতে পারো।

দো-আঁশলা মানে?

আয়মনি চাপাস্বরে বলল, ওদের বাপ ছিল মিয়াসাহেব। মা আমার মতো চাষীবাড়ির মেয়ে। নানগাঁ-কনকপুরে বাড়ি। সেখানে ইস্কুল আছে। সেই ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিল চৌধুরির ছেলে। পড়াটড়া ফেলে দরিবুবুকে নিয়ে চলে এসেছিল।

সে অনেক খিটকেলের কথা। আমার তখন বয়স কম। সব কথা মনে নাইকো। তাছাড়া তোমাকে বলিই বা কী করে ?

শফি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা বুঝি বড়লোক ?

তা বলতে পারো। মৌলাহাটের মিয়া বলতে ওই দুঘর। চৌধুরিসায়েবরা আর কাজিসায়েবরা। কাজিরা ফতুর হয়ে গেছে। চৌধুরিরাও যেত। দরিবুবু চাষীর মেয়ে। মাটি চেনে কিনা। মাটির মর্ম বোঝে। দুহাতে আগলে রেখেছে।

রোজি-বুকুর আব্বা বেঁচে নেই ?

না। আয়মনি পানের পিক ফেলে এসে বলল, ওরা এ তল্লাটের সেরা বড়লোক ছিল। বাপজির কাছে শুনেছি, মৌলাহাটের যে বানুক আছে — মানে রেশমের কুঠি, তা জানো তো ? সেই বানুকের মালিক ছিল ওরা। জোলাদের দাদন দিত। আবার তাঁতও বসিয়েছিল। একশো তাঁত — সহজ কথা নয়কো। তুমি একবার ভেবে দ্যাখো ভাই, দিনরাত একশো তাঁতের একশো মাকু চলছে খটাখট্.... খটাখট্.... খটাখট্।

আয়মনি তাঁদের মাকু চালানোর ভঙ্গি করল। তবে সে সেইসব মাকুর শব্দও শোনেনি নিজের কানে। তখন তার জন্মও হয়নি। চৌধুরিদের রেশমের কারবার কীভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন মাঠের জমিজমাই ভরসা। রোজি-বুকুর বাবা তোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরি ছিলেন খরুচে আর শৌখিন মানুষ। বাউরিপাড়ায় গোপনে গিয়ে তাড়ি-মদ গিলতেন। দরিয়াবানু ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আসত প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে। দুই বোনের জন্মের পর কে জানে কেন একটু শায়েস্তা হয়েছিলেন তোফা চৌধুরি। মসজিদের কাছে আবু ওস্তাজি নামে একটা ভবঘুরে লোক এসে মক্তব খুলেছিল। তার কাছেই দুই মেয়েকে পড়তে দিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ ওস্তাজি রাতারাতি কোথায় উধাও হয়ে যায়। আয়মনির মতে, আসলে ওস্তাজি লোকটা ছিল এক সাধক পুরুষ। কোন ছলে মৌলাহাটে চরতে এসেছিল আর কী !

আয়মনি মৌলাহাটের গল্প বলছিল। আর শফি ভাবছিল, মৌলাহাটে যদি তাদের থাকা হয়, তার ভালো লাগবে। কিন্তু আব্বাকে সে ভালোই জানে। যেখানে-সেখানে উনি ডেরা পাততে চাইবেন কি ? সেকেড্ডায় যাব বলে সংসার নিয়ে রওনা নিয়েছেন। যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছান, ততক্ষণ তার শান্তি থাকবে না।

গল্প করতে করতে আয়মনি মাঝেমাঝে উঠে যাচ্ছিল। মুরগিগুলোকে বিকেলের দানা খাইয়ে আসছিল। উঠোনে শুকোতে দেওয়া কাপড় তুলে আনছিল। শফি বুঝতে পারছিল, খুব কাজের মেয়ে এই আয়মনি। একবার শফিকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এল কচি বটের ডাল নিয়ে। ছাগলটাকে খেতে দিল। আদর করল। ছগলটা কবে বিয়োবে, সেই হিসেব সে করে রেখেছে। তাই শুনে শফি তার মায়ের প্রিয় ছাগল কুলসুম আর গাইগোরু মুন্নির কথা তুলল।

আয়মনি দীঘির ঘাটে মুন্নি ও কুলসুমকে লক্ষ করেছিল। বলল, বাপজি যখন গেছে, তখন কোনো চিন্তা নাইকো। এতক্ষণ ওরাও খেয়েদেয়ে পেট ঢোল করেছে। মৌলাহাটে এসে পড়েছে। আর ওদের খাওযার অভাব হবে না। ক্যান জানো তো ?

শফি জানে না।

আয়মনি চোখে ঝিলিক তুলে বলল, দীঘি। দীঘির চড়ায় ঘাসের অভাব

নাইকো। আর ওই নদী। নদীর দুধারেও কত ঘাস। বাছারা খাবে-দাবে। চিন্তা কোরো না।

শফি হাসল।...আমরা তো সেকেড্ডা যাব।

আয়মনি ভুরু কুঁচকে বলল, সেকেড্ডা ? সেখানে ক্যানে গো ?

আমি জানি না কিছু। আব্বা জানেন।

যাওয়াচ্ছে ! আয়মনি বলল। তোমাদের আব্বাকে গাঁওলা আটকে দিয়েছে। রোজি বলে গেল না ? ওমরের বাড়িটা খালি পড়ে আছে। সেই বাড়িতে তোমরা থাকবে। তারপর জায়গা-জমি দিয়ে ঘর বানিয়ে দেবে।...

স্তম্ভ ও এক নারী

তখন মৌলাহাটের মসজিদের ভেতর সেইসব কথাবার্তাই হচ্ছিল। মৌলানা বদিউজ্জামানের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব শোনার জন্য দম বন্ধ করে বসে ছিল লোকেরা। আর মৌলানা বলেছিলেন, আশরের (বৈকালিক) নামাজ পড়ে নিই। তারপর বলছি।

নমাজ পড়ে শেষ হলেও জবাব দেননি বদিউজ্জামান। কেউ-কেউ কেঁদে ফেলেছিল হুজুরের ভাবগতিক দেখে। এমন প্রশান্ত, দিব্য অথচ এমন উদাসীন, কঠিন মুখ তারা কখনও দ্যাখেনি। মৌলাহাটে অনেক মৌলবি-মৌলানা এসেছেন। তাঁদের হাতে দফায়-দফায় তওবা করে তারা মুরিদ (শিষ্য) হয়েছে। কিন্তু পাকাপাকিভাবে চিরজীবন মুরিদ হয়ে থাকার মতো গুরু তারা পায়নি। সব গুরুর আগমন ঘটে শীতের ধান ওঠার পর। গাড়ি ভরতি ধান আর পয়সা-কড়ি নিয়ে তাঁরা চলে যান। শিষ্যরা টের পায়, যেন ধানের জন্য ওইসব গুরুর আগমন। দৈবাৎ বেমরশুমে যে কেউ না এসেছেন, এমন নয়। কিন্তু তিনিও অভাবী গুরু। পয়সাকড়ি নিতেই আসা। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়নি কোনও দিব্যছটা ওখানে ঝিলিক তুলেছে। অথচ বদুপিরের মুখে যেন ঝলমল করছে দূর আসমান থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি। ঈষৎ গম্ভীর ওই মুখে যখনই মৃদু হাসি দেখা যাচ্ছে, তখনই বুকেব ভেতরটা কেঁপে ওঠে — কী এক মোজেজার (দিব্যশক্তির) নিদর্শন মনে হয়।

আশরের নমাজের পর হুজুর বলেছিলেন, মগরেবের (সন্ধ্যা) নামাজের পর যা বলার বলবেন। তারপর মসজিদ থেকে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এসেছিলেন। হাতে ময়ূরমুখো কাঠের ছড়িটি ধরা। খয়রাডাঙার অসিমুদ্দিনকে মৃদুস্বরে কিছু বলেছিলেন। অসিমুদ্দিন সেই বার্তাটি ঘোষণার জন্য প্রাঙ্গণের ইঁদারার ধারে একটুকরো পাথরে উঠে দাঁড়িয়েছিল।....মৌলাহাটের মোমিন-মোছলমান ভাইসকল ! হুজুরকে এবার আপনারা একলা থাকতে দিন। আর হুজুর বলেছেন কী একবার সেই পিরের সাঁকোয় যাবেন — ওনার ইচ্ছে হয়েছে। মেহেরবানি 'করে কেউ যেন ওনাকে বিরক্ত করবেন না। আপনারা মগরেবের সময় আবার মসজিদে আসুন।

তারপর মৌলানা বদিউজ্জামানকে একা বাদশাহি সড়ক ধরে হেঁটে যেতে দেখা

গিয়েছিল। চৈত্রের উষর মাঠে শেষ বিকেলের রোদে কালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটা প্রাচীন স্তম্ভ। স্তম্ভগুলো পাথরে তৈরি। নদী একটু তফাতে সরে গেছে। পাথরের স্তম্ভগুলো বালির চড়ায় কিছুটা ডুবে রয়েছে। সড়কও তফাতে সরে গেছে। বদিউজ্জামান সড়ক থেকে নেমে স্তম্ভগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্রাম থেকে অনেকেই অবাক চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। তারা আশা করেছিল অলৌকিক কিছু ঘটতে চলেছে, তাই দেখে তাদের জীবন ধন্য হবে এবং বংশপরম্পরা সেই কাহিনী চালু হয়ে যাবে। অসিমুদ্দিনও মসজিদের প্রাঙ্গণের পাঁচিলে ভর করে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল।

আসলে বদিউজ্জামান নির্জনে একবার ভেবে দেখতে চেয়েছিলেন, কী করবেন। মৌলাহাটে থাকবেন, নাকি সেকেড্ডা চলে যাবেন। প্রথম-প্রথম এমন উদ্দাম খাতির সবাই করে থাকে। তারপর থিতিয়ে আসে সব উচ্ছ্বাস। তার চেয়ে বড়ো কথা, মৌলাহাটের হালচাল তিনি কিছুটা জানতেনও। এখানকার মেয়েরা নাকি বড্ড বেশি স্বাধীনচেতা। ফৈজু মৌলবি তাঁকে মৌলাহাটের কথা বলেছিলেন একবার। তিনি নাকি একবেলা থেকেই চলে গিয়েছিলেন ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ফৈজুদ্দিন হানাফি মজহাবের মৌলবি। তাঁর বেলা যদি এই হয়, বদিউজ্জামানের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে ? ফৈজুদ্দিন বলেছিলেন, মেয়েগুলান বড়ই বেহায়া ভাইসাব ! বে-আবরু হয়ে গোসল করে। মৌলবি-মৌলানাদের নিয়ে ছড়া বাঁধে। এমন ঠাঁই ভূভারতে নেই।

বালির চড়ায় পাথরের স্তম্ভগুলোর কাছে গিয়ে বদিউজ্জামান থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা স্তম্ভের গোড়ায় ঝুঁকে একটি মেয়ে কিছু করছিল। সে তাঁকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার ভিজে চুল, পরনের শাড়িও ভিজে। নদীতে স্নান করে এসে পিরের সাঁকোয় মানত করছিল। বদিউজ্জামান ব্যাপারটা দেখামাত্র খাপ্পা হয়েছিলেন। গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, কে তুমি ? এখানে এসব কী করছ ?

মেয়েটি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছিল, মানত দিচ্ছি।

তুমি কোথায় থাকো ? কী নাম ?

ক্যানে ? নামে আপনার কী দরকার ?

তুমি মুসলমান, না হিন্দু ?

মেয়েটি মেজাজে তেজী। বলেছিল, যাই হই, তাতে আপনার কী ?

বদিউজ্জামান তার স্পর্ধায় অবাক। দেখলেন, সে স্তম্ভের গোড়ায় একটা পিদিম জ্বেলে দিল। কয়েকটা খুদে মাটির ঘোড়া রাখল। তারপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তার প্রণামের ভঙ্গি দেখে বদিউজ্জামানের মনে হল, মেয়েটি নিশ্চয় হিন্দু। তাই আর তার সঙ্গে কথা বললেন না। অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

প্রণাম শেষ করে মেয়েটি আবার নদীর দিকে গেল। নদীতে তত জল নেই। বালির চড়ার মধ্যে একহাঁটু জল বয়ে যাচ্ছে। সেই জলে সে পা ছড়িয়ে বসে আপন মনে জল নিয়ে খেলতে থাকল। মেয়েটির বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে। তার সিঁথিতে সিঁদুর নেই দেখে মৌলনা বদিউজ্জামান তাকে অবিবাহিতা ভাবলেন। একটু পরে সে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি লক্ষ্য করলেন, মৌলাহাটের দিকেই চলেছে। মৌলাহাটে কি হিন্দু আছে ?

সে বাদশাহি সড়কে পৌছুঁলে বদিউজ্জামান সেই স্তম্ভটার কাছে গেলেন।

চটিজুতোর ডগা দিয়ে জ্বলন্ত পিদিমটা উলটে দিলেন। মাটির ঘোড়াগুলোকে যথেচ্ছ লাথি মারলেন। তারপর স্তম্ভের গায়ে সিঁদুরের ছোপ চোখে পড়ল। সেখানে জুতো ঘষে তবে তাঁর রাগ পড়ল। স্তম্ভটা ভেঙে ফেলার কথা ভাবতে ভাবতে গ্রামের দিকে পা বাড়ালেন বদিউজ্জামান।

তখন তিনি মৌলাহাটে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তে স্থির। মসজিদের কাছাকাছি পৌঁছুলে অসিমুদ্দিন এবং আরও কয়েকজন এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। বদিউজ্জামান মৃদুস্বরে মৌলাহাটের একজনকে জিগ্যেস করলেন, ওই সাঁকোর থামে হিন্দুরা পুজো করে নাকি ?

জি, মোছলমানেরাও মানত-টানত করে।

একটু আগে একজন জেনানকে দেখলাম পুজো করছে। এ গাঁয়ে হিন্দু আছে নাকি ?

জি হুজুর, কয়েকঘর বাউরি আছে। বাদবাকি সব মোছলমান।

অন্য একজন একটু হেসে বলল, একটু আগে ভিজে কাপড়ে গেল তো ? হুজুর, ও হল আবদুলের বউ।

স্তম্ভিত বদিউজ্জামান বললেন, কী ?

জি হুজুর। খুব হারামজাদি মেয়ে। বড়-ছোটো মানে না। এমন ওর তেজ।

আবদুল কোথায় ? ডাকো তাকে।

অপর একজন বলল, আবদুল হুজুর চলাফেরা করতে পারে না। কুষ্ঠরোগী।

কাজিবাড়ির বড় কাজিসায়েব সন্ধ্যার নামাজে আসছিলেন। তাঁকে দেখে এগিয়ে গেলেন বদিউজ্জামান। মৌলাহাটের প্রধান মুরুব্বি বলতে তিনিই। পিরের সাঁকোর ব্যাপারটা তাঁর কাছেই তুলবেন মৌলানা।....

আকস্মিক বার্তা

সে রাতে রোজি-রুকুদের বাড়ি শফি যখন খেতে এসেছে, সাইদা বেগম বললেন, কোথায় ছিলি রে তুই ? কতবার কতজনকে খবর পাঠালাম।

জবাব রুকু দিল।....ও তো আয়মনি খালার বাড়িতে ছিল। আমরা আবার গিয়ে ডেকে নিয়ে এলাম।

আয়মনি ? সে কে ?

কাসেমের বেটি। জানেন আম্মা ? আয়মনি খালা স্বামীর বাড়ি—

রোজির চিমটি খেয়ে চুপ করে গেল রুকু। রোজি ফিসফিস করে বলল, এসেছে। আম্মার কাছে গল্প করছে।

দরিয়াবানু ওরফে দরিবিবি ডাকছিলেন মেয়েদের। দুজনে চলে গেলে সাইদা ছেলের পাশে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, দুপুরে খেলি কোথায় ?

আয়মনিখালার বাড়িতে।

হাসলেন সাইদা।...খালা পাতিয়ে ফেলেছিস এরি মধ্যে ?

শফি আস্তে বলল, আব্বা কী ঠিক করলেন জানেন আম্মা ?

মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে-খুঁটতে সাইদা বললেন, সেকেড্ডা যাওয়া হবে না। দরি-আপা বলছিল, মসজিদে মগরেবের নমাজের সময় কথা হয়েছে। একটা খালি বাড়ি আছে নাকি।

দুইবোন তক্তাপোশে খাওয়ার জন্য দস্তরখান নিয়ে এল। বিছিয়ে দিয়ে চলে গেলে সাইদা চাপা স্বরে বললেন, নুরুর বাড়ি আসার কথা ছিল। খয়রাডাঙায় গেলে দেখবে আমরা চলে এসেছি। ও যদি সেকেড্ডা চলে যায়, হয়রান হবে!

শফি বলল,বড় ভাই আসবে নাকি?

আসবে। তুই জানিস না?

আমাকে বলেছ? বলো কোনো কথা?

সাইদা ছেলেকে একটু টেনে আদর দিতে-দিতে বললেন, ওদিন নকি মৌলবি এলেন দেওবন্দ শরিফ থেকে। ওনার হাতে খত ভেজেছিল নুরু। দেওবন্দ কি এখানে? রেলগাড়ি, স্টিমার, তারপর ঘোড়ার গাড়ি। দশটা দিনের রাস্তা। তবে এবার নুরু এলে আর ওকে যেতে দেব না। তোর আব্বা যা করেন, করবেন।

আয়মনি এল। মুখ টিপে হেসে বলল, বিবিজি, সালাম! আপনার ছেলে বড় লক্ষি। কতকথা হল সারাবেলা। মনে হয় যেন কতকালের মায়ের পেটের ভাই। তো বলে কী, আম্মোও রোজি-রুকুর মতো তোমাকে খালা (মাসি) বলব। বেশ, তাই বলো — মন যদি চায়।

সাইদা আয়মনিকে দেখছিলেন। একটু পরে বললেন, খোকা-খুকু কটা গো মেয়ে?

জি? খোকাখুকু? আয়মনি মুখে আঁচল চাপা দিল হাসির চোটে।

রোজি-রুকু খাঞ্চা বোঝাই করে পোলাওয়ের থালা, কোর্মার বাটি এনে রাখল। রুকুর কানে কথাটা গিয়েছিল। বলল, আয়মনিখালার খোকা-খুকু কিচ্ছু নেই জানেন আম্মা? কেন নেই ওকে জিগ্যেস করুন না।

সাইদা জিগ্যেস করলেন, কেন গো মেয়ে?

আয়মনির মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। মুখে হাসি এনে বলল, সেসব দুঃখের কথা একদিন বলব বিবিজি। ছেলের সামনে ওসব কথা থাক। রোজি-রুকু, বড্ড বেশরম ওপু তোমরা।

দুই বোন ওকে ভেংচি কেটে চলে গেল। শফি উজ্জ্বল মুখে বলল, খালা! আমরা সত্যি তোমাদের গাঁয়ে থেকে গেলাম, জানো?

থাকবে বৈকি! তুমি এত ভালো ছেলে! তোমাকে কি যেতে দিতাম ভাবছ?

সাইদা একটু হেসে বললেন, কে ভালো ছেলে? শফি? চেনো না তো। দেখবে।

শফি ঘাড় গোঁজ করে খেতে থাকল। সাইদা আয়মনিকে তার দুষ্টুমির কথা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে মসজিদ থেকে খবর এল, মৌলানা বদিউজ্জামান আজ রাতে মসজিদেই থাকবেন।

খবরটা শুনেই সাইদা চমকে উঠলেন।...

দেওয়ান সাহেবের আবির্ভাব

বদিউজ্জামান মাঝে-মাঝে মসজিদেই রাত্রিযাপন করতেন। সেইসব সময় তাঁকে দূরের মানুষ বলে মনে হত। এমনিতেই তাঁর চেহারায় সৌন্দর্য আর ব্যক্তিত্বের ঝলমলানি ছিল। কিন্তু গাম্ভীর্য তাঁকে দিত এক অপার্থিব ব্যঞ্জনা। লোকেরা ভাবত, এ মানুষ এই ধুলোমাটির পৃথিবীর নয়। আর শফিও দূর থেকে মুগ্ধ চোখে তার পিতাকে লক্ষ করত। বদিউজ্জামান মৌলাহাটের প্রথম রাত্রিটি মসজিদে কাটানোর পর মায়ের হুকুমে সকালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিল শফি। কিন্তু তিনি তাকে দেখেও যেন দেখলেন না। শিষ্যপরিবৃত মৌলানা মৃদুগম্ভীর স্বরে তাদের সঙ্গে কী আলোচনা করছিলেন। শফি একটু দাঁড়িয়ে থেকে মনমরা হয়ে চলে এসেছিল।

ওমরের বাড়িতে যখন শফিদের ঘরকন্না পাতা হল, তখনও বদিউজ্জামান মসজিদবাসী। সেখানেই আহার নিদ্রা, সেখানেই বাস। তবে ঘরকন্না গুছিয়ে তুলতে সাইদা পটু ছিলেন। দরিয়াবানুও ছিলেন তাঁর পাশে। কয়েকটি দিনেই গ্রামের প্রান্তে পোড়ো বাড়িটির চেহারা ফিরে গেল। বাড়ির খিড়কিতে ছিল একটি হাঁসচরা পুকুর। তার তিনপাড়ে বাঁশের বন। বাঁশের বনের শীর্ষে দেখা যেত খোঁড়া পিরের মাজারের প্রকাণ্ড বটগাছটির মাথা। এক দুপুরে চুপিচুপি রুকু ও রোজির প্ররোচনায় শফি সেই মাজারে গিয়েছিল।

রোজি তখন সেই তর্কটা তুলেছিল। কী শফি ? থান থেকে ওই আধপয়সাটা তুলতে পারবে তো ?

উঁচু ইটের জীর্ণ মাজার। আগাছা আর ঘাসে ঢাকা। তার নিচে একটা কালো পাথরের ওপর সেদিন মোটে একটা তামার আধপয়সা ছিল। শফি হাত বাড়াতে গেলে রুকু ভয় পেয়ে তার হাত চেপে ধরেছিল। রুকুর মুখে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণার ছাপ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল শফি। তারপরই রোজির ভ্রূকুঞ্চিত চাহনির সামনে রুকু অপ্রস্তুত হয়েছিল শফির হাত ধরেছে বলে। হাত ছেড়ে দিয়েছিল সে।

মেয়েদের হাতের ছোঁয়া শফিকেও চমকে দিয়েছিল। বিশেষ করে রুকুর হাতের ছোঁয়া! তার মনে হয়েছিল, আরও কিছুক্ষণ হাতটা ধরে থাকল না কেন রুকু ? সেই লোভেই আবার হাত বাড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু তখন রোজি বোনকে একপাশে

টেনে সরিয়ে নিয়ে গেছে। রোজির নাসারন্ধ্র স্ফীত। শফির এই সাহস দেখে সে মনে-মনে ক্ষুব্ধ। যদিও তর্কটা সেই তুলেছে।

শফি বুঝতে পেরেছিল, সে তামার আধপয়সাটায় সত্যি-সত্যি হাত দিক, রোজি এটা চায় না। কিন্তু যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, তাকে একটা চরম পরিণতি দেওয়ার জন্য জেদ তাকে পেয়ে বসলেও সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে বাধা এল।

মাজারের অন্যদিকে থেকে বেরিয়ে এল একটা যুবতী। তার হাতে একটা কাটারি। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দুই বোনই তাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়েছিল। তারা হাসবার চেষ্টা করছিল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে শফিকে দেখে বলল, এ বুঝি তোমাদের পিরসায়েবের ছেলে ?

রোজি-বুকু মাথাটা নেড়েই শফিকে অবাক করে দৌড়ে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। শফি ক্ষুব্ধভাবে তাদের দেখেছিল। মেয়েটি বলল, কী ভাই ? নাম কী তোমার ?

শফি মৃদুস্বরে বলল, শফিউজ্জামান।

বড্ড খটোমটো নাম ! মেয়েটি হাসতে লাগল। এখানে কী করছিলে তোমরা ?

শফি বলল, পিরের থানের পয়সা নিলে নাকি হাত পুড়ে যায়, তাই দেখতে এসেছিলাম।

মেয়েটি দ্রুত চোখ ফেরাল সেই কালো পাথরটার দিকে। তারপর পয়সাটা দেখামাত্র ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আঁচলের খুঁটে বেঁধে ফেলল। তার মুখে দুষ্টুমির হাসি। চাপা গলায় বলল, কাউকে বোলো না যেন পিরসায়েবের ছেলে। কিরে দিলাম।

এই মেয়েটি যে কুষ্ঠরোগী আবদুলের বউ, সেটা পরে জেনেছিল শফি। আবদুলের বউ-এর নাম ইকরা। কেউ-কেউ তাকে ইকরাতন বলেও ডাকত। যেদিন মজলিশে তার বিচারের জন্য ডাক পড়েছিল, সেদিন শফি শুনেছিল, তাকে ইকরাতন বিবি বলে ডাকা হচ্ছে। তবে সেকথা অনেক পরের। সেদিন খোঁড়াপিরের মাজারে ইকরাকে খুব ভাল লেগেছিল শফির। ফিরে গিয়ে রোজি-বুকুর কাছে তার থান থেকে পয়সা নেওয়ার ঘটনাটা দিয়ে বর্ণনা করেছিল। ইকরার হাত তো পুড়ে যায়নি।

রোজি বলেছিল ইকরা যে ডাইনি। আয়মনিখালার কাছে শুনো। ইকরা রাতদুপুরে গাছ চালিয়ে নিয়ে কোন্ দেশে চলে যায়। আবার ফিরে আসে ভোরবেলা আজানের আগে।

কোন্ গাছটা চালিয়ে নিয়ে যায়, সেটাও দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েছিল রোজি। ইকরাদের বাড়ির পেছনে ঘরের চাল ঘেঁষে একটা লম্বাটে শ্যাওড়াগাছ আছে। নিশুতি রাতে ইকরা উলঙ্গ হয়ে চুল এলিয়ে সেই গাছটাতে চড়ে বসে। মন্তর পড়ে। আর গাছটা মূলছাড়া হয়ে আসমানে উঠে যায়। তারপর শূন্যে ভাসতে ভাসতে চলে কোন্ অজানা দেশে।

শফি প্রথম-প্রথম হেসে উড়িয়ে দিত। পরে তার আবছা মনে হত, হয়তো ব্যাপারটা সত্যি। জিন যখন আছে, তখন ডাইনিও থাকতে পারে। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করত সে। ইকরার দিকে তার মন পড়ে থাকত।

খিড়কির ঘাটের মাথায় বসে দুই বোন শফিকে ডাইনির গল্প শোনাত। ঘাটে সাইদা আপনমনে কাপড় কাচতেন। পুকুরটা গ্রামের শেষে বলে একেবারে খাঁ-খাঁ। পুরুষেরা পিরপরিবারের খাতিরে পুকুরের কাছাকাছি কেউ পারতপক্ষে আসত না। বাঁশ কাটার দরকার হলে আগাম জানিয়ে রাখত। দৈবাৎ কেউ এসে পড়লে জোরে কেশে বা গলা ঝেড়ে সাড়া দিত। আর ঘাটের আসরে কোনো-কোনোদিন এসে যোগ দিত আয়মনিও। তখন আয়মনিই কথক। এরা তিনজন শ্রোতা। কাপড় কাচতে-কাচতে মুখ ঘুরিয়ে সাইদা বলতেন, অ শফি ! তুই এখনও বসে আছিস ? তোকে বললাম না কাজেমের দোকানে বলে আয় ?

শফি বলত, যাচ্ছি।

কিন্তু তখন আয়মনি চাপা স্বরে আগের রাতে মসজিদের মাথায় আলোর ছটা দেখার গল্প শুরু করেছে। মসজিদে বদুপিরের রাত্রিযাপনের পর গ্রামে এই ঘটনাটা রটে গিয়েছিল। রাত্রে নাকি জিনেরা আসে তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে। জিনেদের শরীরের সেই ছটা স্বচক্ষে দেখার মতো লোকের অভাব ঘটছিল না। ক্রমশ বদিউজ্জামানের বুজুর্গ সাধকখ্যাতি আরও মজবুত হয়ে উঠছিল জনমনে। হাটবারে লোকের মুখেমুখে এইসব কথা দূরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল দিনেদিনে।

ইকরা বাঁশবনে বা খোঁড়াপিরের মাজারে কেন ঘুরে বেড়ায়, তার একটা ব্যাখ্যা ছিল। সে আসলে জড়িবুটি সংগ্রহ করে ওই জঙ্গল থেকে। সে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বউঝিদের কাছে ওইসব আজব জিনিস বেচে আসে। তার বদলে চালডাল হাঁসমুরগির ডিম পায়। কখনও পায় আনাজপাতি, একটা কুমড়ো বা দুটো বেগুন। তার কুঠো স্বামী আবদুল সারাদিন দাওয়ায় পড়ে থাকে আর খোনাস্বরে আপনমনে গান গায়।

একদিন শফি খোঁড়াপিরের মাজারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোজি-রুকুর প্রতি শাসন বেড়েছে বলে তারা আগের মতো হুট করে যেখানে-সেখানে বেরতে পারে না। শফি আসলে ডাইনি মেয়েটাকেই দেখতে গিয়েছিল।

কিন্তু কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও তাকে দেখতে পায়নি সে। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বাঁশবনের শেষ দিকটায় চলে গিয়েছিল। সেই সময় কেয়াঝোপের আড়ালে একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়েছিল তার।

ঘরটার অবস্থা জরাজীর্ণ। চাল ঝাঁঝরা। খড়ের ফাঁকে কোঙাপাতা গোঁজা। উঠোন ঘিরে পাঁচিল নেই। ঘন শেয়াকুলকাঁটার বেড়া। শফির কানে এল, খোনাস্বরে কেউ গোঁ-গোঁ করে গান গাইছে। তার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। সে ঝটপট একটা দোওয়াও আওড়ে ফেলল মনে-মনে। তারপর সাহস করে উঁকি মেরে দেখল দাওয়ায় নোংরা বিছানায় একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার চেহারাটি বীভৎস। হাত-পা কুঁকড়ে রয়েছে। ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে সে গান গাইছে দেখে শফি আবাক। এই তাহলে ইকরার স্বামী আবদুল।

একটু পরে আবদুল তাকে দেখতে পেয়ে গান থামাল। সেও কয়েক মুহূর্ত ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল শফির দিকে। তারপর ভুতুড়ে গলায় বলে উঠল, কে বাপ তুমি ?

শফি বলল, আমি পিরসায়েবের ছেলে।

আবদুল নড়বড় করে উঠে দেয়ালে হেলান দিল। তার কুৎসিত মুখে হাসি।

সালাম বাপ, সালাম! আসেন, মেহেরবানি করে ভেতরে আসেন। আপনাকে একটুকুন দেখি।

বেড়াটা সরিয়ে শফি উঠোনে গেল। ছোট্ট পেয়ারাগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আবদুল ?

জি বাপ। আমিই সে। আবদুল তাকে দেখে প্রশংসা করতে থাকল। আহা হা! শুনেছিলাম বটে পিরসায়েবের বেটার কথা। কী নাক, কী মুখ, কী ছুরত বাপের আমার! দেখে মনে হয় কী, এ দুনিয়ার কেউ লয়কো। ও বাপ, আপনাকে দেখেই আমার শরীরের যন্তনা ঘুচে গেল গো!

সে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। শফি বলল, তুমি কাঁদছ কেন আবদুল ?

আবদুল বলল, মোনের সুখে বাপজি গো! কেউ তো আমাকে দেখতে আসে না। তাতে আপনি হলেন পিরসায়েবের বেটা! ও বাপ! আজ আবদুলের ঘরে আসমানের তারা ছিটকে এসেছে দিনদুপুরে। হায় হায়! এ মানুষকে আমি কোথা ঠাঁই দিই ?

আবদুল বদুপিরের দোয়া চেয়ে ব্যর্থ। পিরসাহেব বলেছেন, আগে তার আউরতকে বোত-পরস্তি (পৌত্তলিকতা) ছাড়তে হবে। তাঁর কাছে তওবা করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়তে হবে। তবেই তার মরদের ওপর তাঁর করুণা হবে। আবদুল সেইসব কথা বলতে থাকল দুঃখের সঙ্গে। শোনার পর শফি খুব গম্ভীর হয়ে বলল, আব্বাকে সে বলবে। অথচ শফি জানে, সে-ক্ষমতা তার আদতে নেই। তার মায়েরও নেই। আব্বার সঙ্গে কথাবার্তা বলাই তার পক্ষে একটা অসম্ভব ঘটনা। বদিউজ্জামানের সঙ্গে তার সে-সম্পর্ক এখনও স্থাপিত হয়নি। বড়ভাই নুরুজ্জামানের কথা অবশ্য আলাদা।

কিছুক্ষণ পরে শফি আবদুলের একটা কথা শুনে চমকে উঠেছিল। আবদুল নিজের হাতদুটো দেখতে-দেখতে বারবার বলছিল, বড়ো গোনা করেছিলাম এই হাতে। তারই ফল, বাপ!

কী গোনা, আবদুল ? শফি জানতে চেয়েছিল।

জবাব আবদুল তাকে দেয়নি। শফি আর পীড়াপীড়ি করেনি। সে সারাক্ষণ শুধু ডাইনি মেয়েটাকে খুঁজছিল এদিক-ওদিক তাকিয়ে। কিন্তু মুখে জিগ্যেস করতে বাধছিল। একসময় সে আবদুলের একঘেয়ে বিরক্তিকর কাঁদুনি আর ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরে অতিষ্ঠ হয়ে চলে এসেছিল।

এর কয়েকদিন পরে শফি রোজিদের বাড়ি গেছে, দলিজঘরের বারান্দায় একটা লোককে দেখতে পেল। লোকটি আরামকেদারায় বসে খয়রাডাঙার জমিদারসাহেবের মতো বই পড়ছিল। তার চেহারা দেখে শফির সন্দেহ হয়েছিল লোকটি কি হিন্দু ? মুখে দাড়ি ছিল না। পরনে ধোপদুরস্ত পোশাক। পাশে একটা ছড়িও দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। তার দিকে একবার তাকিয়েই লোকটি আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখল।

রোজিদের বাড়িতে শফির গতিবিধি ছিল অবাধ। সে আড়চোখে লোকটিকে দেখতে-দেখতে সদরদরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বারান্দায় দু-বোন দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। শফিকে দেখতে পেয়ে তারা পরস্পর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চোখ টেপাটিপি

করল। তারপর রোজি একটু হেসে চাপা গলায় বলল, শফি, দলিজে কাউকে দেখতে পেলে না?

শফি মাথা নাড়ল। তখন রুকু বলল, বারুচাচাজি এসেছে। জানো? খুব শিক্ষিত লোক। ইংরেজি পাস। নবাববাহাদুরের কাছারির দেওয়ানসাহেব।

রোজি বলল, তোমার কথা বলেছি চাচাজিকে। রুকু, খবর দিয়ে আয় না রে শফি এসেছে।

রুকু চলে গেল খবর দিতে। দরিয়াবানু অন্যঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা রোগাটে চেহারার লোককে তম্বি করছিলেন। শফির দিকে ঘুরে বললেন, কী গো ছেলে! আজকাল আসাই যে ছেড়ে দিয়েছ। বিবিজি বলছিলেন, খালি টো-টো করে কোথা-কোথা ঘুরে বেড়াচ্ছ। পিরসাহেব ঘরসংসারে মন দিচ্ছেন না বলে তুমি পর মেলে দিয়েছ!

দরিয়াবানু হাসতে লাগলেন। রোগাটে লোকটি এই সুযোগে তার কোনো কথাটা আবার তোলার চেষ্টা করল। অমনি দরিয়াবানু চোখ কটমটিয়ে বললেন, বেরো মুখপোড়া বাড়ি থেকে। দুবিঘে মাটিতে দুবিশ ধান ফলাতে পারিস না। আবার বড়ো-বড়ো কথা! এবার ও জমি চষবে কাজিডাঙার মধু। তাকে কথা দিয়েছি।

সেই বয়সে সবকিছুতে শফির কৌতূহল ছিল তীব্র। কিন্তু ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার আগেই চটির শব্দ তুলে বাইরে থেকে রোজি-রুকুর সেই বারুচাচাজি এসে বললেন, কই গো? কোথায় তোমাদের পিরসাহেবের ছেলে?

দুই বোন ইশারায় শফিকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব দিতে হবে। কিন্তু শফির পিতার শিক্ষা, আল্লাহ ছাড়া কারুর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকানো বারণ। সে আস্তে বলল, আসসালামু আলাইকুম!

বারুমিয়া হো হো করে হেসে উঠলে। একেবারে খুদে মৌলানা যে গো? কী নাম তোমার?

রুকু বলে দিল, শফিউজ্জামান।

রোজি বলল, আমরা শফি বলি।

বারুমিয়া বললেন, এসো এসো। তোমার সঙ্গে গল্প করি। বারান্দায় এসো।

শফি সংকোচ করছে দেখে নিচে নেমে এলেন বারুমিয়া। হাসতে-হাসতে বললেন, আমার নাম চৌধুরি আবদুল বারি। খুব নাছোড়বান্দা লোক, বাবাজীবন! এসো, তোমার সঙ্গে বাতচিত করে দেখি তুমি কতটা লায়েক হয়েছ।

দরিয়াবানু ঘোমটা টেনেছিলেন মাথায়। জিভ কেটে বললেন, হল তো? এবার পিরসাহেবের ছেলের মাথায় বোত-পরস্তি ঢুকিয়ে দেবেন ভাইজান।

বারুমিয়া বললেন, তোমরা আমাকে কী ভাবো বলো তো দরিয়া খাতুন? ওগো ছেলে, মেয়েদের কথায় কান দিয়ো না। এসো।

বারুমিয়ার বগলে ছড়ি, হাতে কী একটা বই। দলিজঘরের ভেতর দিয়ে শফিকে বাইরে নিয়ে গেলেন। বাইরের বারান্দায় একটা তক্তাপোশ ছিল। শফিকে টেনে সেখানে বসিয়ে নিজে পাশে বসলেন। তারপর বললেন, তারপর শফিউজ্জামান! লেখাপড়া কদ্দুর হল?

শফি মৃদুস্বরে বলল, ফোর্থ ক্লাসে পড়ছিলাম।

কোন স্কুলে ?

খয়রাডাঙায়।

হুঁ। তারপর এখানে এসে সময় নষ্ট করছ ? আব্বাসাহেবকে বলোনি পড়ার কথা ?

শফি চুপ করে রইল। তার ভবিষ্যৎ তার পিতার হাতে এটাই সে জেনে এসেছে এতদিন।

বারুমিয়া বললেন, পিরমৌলানারা বুজুর্গ সাধকপুরুষ। তাঁদের লাইন আলাদা। অথচ তোমাকে ইংরেজি পড়তে দিয়েছিলেন। দিয়েও খেয়াল নেই যে বছর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন গো ? মাত্র দুক্রোশ দূরে হরিণমারায় হাইস্কুল আছে। রোজ যাতায়াত না করতে পার, ওখানে কারুর বাড়ি থাকার ব্যবস্থা করা শক্ত না। আজই পিরসাহেবের কাছে কথাটা তুলব।

বলেই ফিক করে হাসলেন বারুমিয়া। — তবে খোলাখুলি বলছি বাপু, আমার ওসব পিরবুজুর্গে বিশ্বাস নেই। তুমি নাস্তিক মানে বোঝো ?

শফি তাকাল।

নাস্তিক মানে যার আল্লাখোদায় বিশ্বাস নেই। আমি তোমাদের ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। আল্লাখোদা বলে কোথাও কিছু নেই। মানুষ হল নেচারের সৃষ্টি। নেচার বোঝো তো ?

শফি এমন উদ্ভট কথা কখনও শোনেনি। সে বিব্রতভাবে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিল। দরজায় দুই বোন উঁকি দিচ্ছিল। তাদের মুখ যেন শাদা হয়ে গেছে। জেনেশুনে শফিকে বারুচাচাজির কাছে ঠেলে দিয়ে তারা বড়ো অপরাধী যেন।

বারুমিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো ছেলে ! দুজনে একচক্কর নদী অব্দি ঘুরে আসি। তোমার মুখে বাপু কী যেন জাদু মাখানো আছে। দেখে বড়ো আপন মনে হয়।

শফি হয়তো তর্ক করবার জন্যই সেদিন বারুমিয়ার বৈকালিক ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিল। অথচ লোকটিকে তার হঠাৎ খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। অনেক পরে শফির মনে হত, পৃথিবীতে কোনো-কোনো লোক আছে — তাকে কেন যেন ভীষণ চেনা মনে হয়। মনে হয় তার সবকিছুই লোকটির জানা। অসহায়ভাবে ধরা পড়ে যেতে হয় তার কাছে। অথবা আত্মসমর্পণ করতে হয় অগাধ বিশ্বাসে।

বাদশাহি সড়কে যেতে-যেতে বারুমিয়া অনর্গল তাকে যা সব বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন, তা শফি তার স্কুলের বইতে পড়েছে। পড়তে হয় বলেই পড়েছে। কিন্তু মন দিয়ে গ্রহণ করেনি। সে দিন মাস ঋতুর চক্র, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নক্ষত্রমণ্ডলীকে জানে আল্লার রাজ্যের হুকুমদারিতে গাঁথা। এক ফেরেশতা সূর্যকে টানতে-টানতে পৃথিবীর আকাশ পার করে নিয়ে যান। আরেক ফেরেশতা চাঁদকে এমনি করে টেনে নিয়ে চলেন। সে জানে, মৃত্যুর সময় সাংঘাতিক ফেরেশতা আজরাইল এসে মানুষের প্রাণ 'কবজা' করেন। অথচ বারুমিয়া বলছিলেন এমন সব কথা, যা এসবের একেবারে উল্টো।

পিরের সাঁকোর কাছে গিয়ে বারুমিয়া হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, তোমার আব্বাকে এসব আবার বোলো না। পিরমৌলানারা এ বারু চৌধুরিকে দেখলেই

হাতিশালা থেকে। তখন মত্ত হাতিটা মাঠের পুকুরে গিয়ে পড়েছে। এদিকে গ্রাম একেবারে জনশূন্য।

তারপর কী হল চাচাজি ?

মাদি হাতিটাকে দেখে বাহাদুর খাঁ — মানে আমার হাতিটার রাগ পড়ে গেল।

কেন চাচাজি ?

বড়ো হও আরও, তখন বুঝবে। প্রকৃতিরই সে আরেক খেলা।

আপনি হাতি চেপে আসেননি কেন চাচাজি ?

এখন যে আমি ছুটিতে।

আমাকে হাতিতে চাপাবেন ?

নিশ্চয় চাপাবো।—

চৌধুরি আবদুল বারি ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। জাফরাগঞ্জে নবাববাহাদুরের দেওয়ানখানায় একটা ঘরে থাকতেন। একেবারে একা মানুষ। মাঝে-মাঝে হঠাৎ কী খেয়ালে চলে আসতেন দূরসম্পর্কের আত্মীয়বাড়ি। দরিয়াবানুর স্বামী ছিলেন তাঁর কী সম্পর্কে ভাই। কয়েকটা দিন হুল্লোড় করে কাটিয়ে যেতেন মৌলাহাটে। সেবার এসে শফিকে তিনি পেয়ে বসেছিলেন। আর শফিও তাঁর প্রতি মনেপ্রাণে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল।

পরদিন সকালেই মসজিদ থেকে শফিকে ডাকতে এল একটা লোক। শফি গিয়ে দেখেছিল, মসজিদের বারান্দায় গালিচা পেতে বসে আছেন তার আব্বা। একটু তফাতে মেঝেয় গ্রামের মুরুব্বিরা সসম্ভ্রমে বসে আছে। আর গালিচার একধারে বসে আছেন বাবুমিয়া।

শফি গিয়ে আসসালামু আলাইকুম বললে বদিউজ্জামান ইশারায় ছেলেকে বসতে বলেছিলেন। বাবুমিয়া মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন, তোমার স্কুলের বন্দোবস্ত হয়ে গেছো শফি! আজই তোমাকে হরিণমারা নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন পিরসাহেব।

শফি তার আব্বার দিকে তাকাল। বদিউজ্জামানের হাতে জপমালা তসবিহ। ঠোঁট কাঁপছিল। তসবিহ জপা থামিয়ে মৃদুস্বরে বসেছিলেন, দেওয়ানসাহেব ঠিকই বলছেন। আমার আপত্তি নেই। ইংরেজের খ্রীস্টানি এলেম কিছু জানা দরকার। তা না হলে ওদের জব্দ করা যাবে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের জেহাদ এখনও খতম হয়নি।

শফি দেখল, বাবুমিয়ার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটেছে। বাবুমিয়া পরমুহূর্তে সেই ভাব লুকিয়ে বললেন, হুজুর পিরসাহেব! আপনি তো জানেন, নবিসাহেব স্বয়ং বলেছেন, এলেম বা বিদ্যাসংগ্রহের জন্য দরকার হলে চীন মুলুকেও যাও।

জি হাঁ। বদিউজ্জামান সমর্থন করলেন। তবে তার চেয়ে বড়ো কথা আমরা ওহাবি। ইংরেজ আমাদের দুশমন।

জানি হুজুর! বিনয় করে বললেন বাবুমিয়া। সেজন্যই তো ইংরেজের বিদ্যা শিখেও ইংরেজের চাকরি নিইনি। মুসলমানের খিদমত করছি।

বদিউজ্জামান বললেন, তবে আপনাদের নবাববাহাদুরটি ইংরেজের নফর। সেবার আমাকে তলব দিয়েছিলেন। আমি যাইনি। তাছাড়া ওঁরা হলেন শিয়া। ওঁরা

শয়তানখেদানো দোওয়া পড়েন। তা শোনো গো ছেলে, পড়তে চাও হরিণমারা হাইস্কুলে ?

শফি বলেছিল, হুঁউ।

ঠিক আছে। আমিই কথা তুলব পিরসাহেবের কাছে।

বারুমিয়া নদীর চড়ায় হাঁটতে-হাঁটতে কিছুদূর গিয়ে বলেছিলেন, ওই দেখো সূর্যাস্ত হচ্ছে! বড়ো সুন্দর, তাই না ?

সূর্যাস্তের ব্যাপারটা সেই প্রথম সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছিল শফি। তার মনে হয়েছিল, সত্যি তো! এমন একটা ব্যাপার রোজই ঘটছে ; অথচ কেন তার চোখ পড়েনি ? নদীর মাঝখানে একটা টিপি ছিল। টিপিটা ঘাসে ভরতি। সেখানে দুজনে উঠে গিয়েছিল। তারপর বারুমিয়া তার হাত ধরে টেনে বলেছিলেন, এখন আর কথা নয়। চুপচাপ বসো। নাকি তুমি মগরেবের নমাজ পড়তে চাও ?

বারুমিয়ার মুখে বাঁকা হাসি লক্ষ্য করেছিল শফি। কিন্তু আজ কে জানে কেন তার নমাজ পড়তে ইচ্ছে করছিল না। সে একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বিশাল মাঠের ওপর সূর্যাস্তের হালকা আলো নরম কুয়াশার মধ্যে মুছে যাচ্ছিল ক্রমশ। নদীর বুক বালির চড়ায় ভরা। একপাশে ঝিরঝিরে জলের একটা ফালি। বালির ওপর পাখিরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। জনহীন মাঠের মাঝখানে সেই সময়টা তাকে পেয়ে বসছিল। তার মাথায় কোনো কথা আসছিল না। মগরেবের নমাজ পড়লে এই আচ্ছন্নতাটা সে কাটিয়ে উঠতে পারত হয়তো। অথচ সে-মুহূর্তে তার বারুমিয়া হয়ে যেতেই ইচ্ছা। সূর্য যখন দিগন্তরেখা থেকে একেবারে মুছে গেল, তখন সে একটা চাপা শ্বাস ফেলেছিল।

বারুমিয়া বলেছিলেন, কী গো ? কথা বলছ না কেন ?

শফি মৃদু হেসে বলেছিল, আপনিই তো কথা বলতে বারণ করলেন।

আচ্ছা! তার পিঠে সস্নেহে থাপ্পড় মেরেছিলেন বারুমিয়া। ...নেচারের কথা বলছিলাম তোমাকে। নেচার হল বাংলায় প্রকৃতি। এই প্রকৃতি জিনিসটা কী, এসব জায়গায় এসে বোঝা যায়। আমি নবাববাহাদুরের দেওয়ানি করি। হাতির পিঠে চেপে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক আমাকে ঘুরতে হয়। তো—

হাতির পিঠে ?

হ্যাঁ। হাতির পিঠে। তো আগে কথাটা বলি। তো একবার মৌরিখোলার মাঠে যেতে-যেতে হাতিটা হঠাৎ খেপে গেল। মাহুত কিছুতেই সামলাতে পারে না। রাস্তা ছেড়ে হাতি আমাকে নিয়ে চলল মাঠের ওপর দিয়ে। বেগতিক দেখে হাওদা থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম। হাতি তো চলে গেল মাহুতকে নিয়ে। আমি হাঁটতে-হাঁটতে গিয়ে দেখি এমনি এক নদী। কী ভালো যে লাগল!

তারপর ?

বারুমিয়া হাসলেন। — হাতিটা সামনের গাঁয়ে গিয়ে ততক্ষণে হুলুস্থুল বাধিয়েছে। আমি পরে সেখানে গিয়ে সব শুনলাম। মাহুতকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে। তার অবস্থা আধমরা। ভাগ্যিস, সেই গাঁয়ে ছিল এক জমিদারবাড়ি। তাঁদের বন্দুক ছিল। বন্দুকের আওয়াজ করে হাতিটাকে গ্রামছাড়া করা হল। সেখানেই রাতে থাকলাম। খবর পাঠালাম সদরে। দুদিন পরে একটা মাদি হাতি এল নবাবের

বললেন, হজরত আলিরই নাকি পয়গম্বরী পাওনা ছিল। ফেরেশতা জিব্রাইল ভুল করে — তওবা, তওবা! ওসব কথা মুখে আনাও পাপ।—

কিছুক্ষণ পরে বাইরে বেরিয়ে বারুমিয়া শফির কাঁধে হাত রেখে চাপা হেসে বললেন, যাক গে। আমাব সবিশেষ পরিচয় পিরসাহেব পাননি। পাওয়ার আগেই তোমাকে নিয়ে ভরত্তি কঁবে তো দিয়ে আসি। চলো, আজ রোজিদের বাড়ি দুমুঠো খেয়ে নেবে। যাবার সময় আম্মাকে বলে আসবে।

দুপুরের আগেই টাপরদেওয়া গোরুর গাড়িতে দুজনে রওনা হয়েছিল বাদশাহি সড়ক ধরে হরিণমারা। শফির মনে প্রবল একটা উত্তেজনা। অথচ সে শান্ত থাকার চেষ্টা করছিল। সবে গ্রীষ্ম এসেছে। ধু-ধু মাঠে চাকার ধুলো উড়িয়ে গাড়িটি ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। শফির মনে হচ্ছিল, এবারকার এই যাওয়াটিই যেন সত্যিকার নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তার মন নুয়ে পড়ছিল বারুচাচাজির দিকে। আর বারুমিয়া রুক্ষ গ্রীষ্মের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তার রূপ দেখে মগ্ন। এক আশ্চর্য মানুষ!

One men illumines you with his ardur/another sets in you his sorrow/O Nature!

—Baudelaire

রাতের প্রথম যামে 'এশা'র নমাজের পর কিছুক্ষণ প্রবীণ মুসল্লিরা হুজুরের সান্নিধ্যে কাটিয়ে পুণ্য অর্জনের ফিকিরে থাকেন। প্রায় একমাস হয়ে গেল এখনও হুজুর বদিউজ্জামান স্ত্রীর রান্না খাওয়ার সুযোগই পাচ্ছেন না। মৌলাহাট অবস্থাপন্ন মানুষের গ্রাম। ভক্ত শিষ্যবৃন্দ হুজুরকে তাঁর বাড়ির খাওয়া খেতে না দেওয়ার জন্য যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিরক্তি ধরে গেলেও বদিউজ্জামান বাধা দিতে পারেন না। এ রাতের খানা এসেছিল এক সম্পন্ন গৃহস্থ মনিরুলের বাড়ি থেকে। মসজিদ শুধুমাত্র ভজনালয়। সেখানে খাওয়াদাওয়ার বিধি নেই। মসজিদকে শয়নকক্ষ করাও বেশরিয়তি। তবে কিনা রোজার সময় দৈনন্দিন উপবাসভঙ্গকালে মসজিদের বারান্দায় বসে আহারগ্রহণ করা চলে। এদিকে মৌলানারা বুজুর্গ ব্যক্তি। তাছাড়া বদুপির নামে কিংবদন্তিসিদ্ধ

পুরুষের কথাই আলাদা। তিনি নিভৃত মসজিদকক্ষে লণ্ঠনের আলোয় খাওয়াদাওয়া সেরে বাইরে যখন প্রক্ষালন করতে এলেন, দেখলেন প্রধান কিছু ভক্ত বারান্দা ও খোলা চত্বরে বসে তাঁর সান্নিধ্যের প্রতীক্ষা করছে। এতক্ষণ চাপা স্বরে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। হুজুরকে দেখে স্তব্ধ হল সসম্ভ্রমে। হুজুর অনুচ্চ স্বরে ঈশ্বরের প্রশস্তি উচ্চারণ করতে-করতে খোলা চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাত্রিটি ছিল ঘন অন্ধকার। আকাশে জ্বলজ্বল করছিল নক্ষত্রমণ্ডলী। বদিউজ্জামান অভ্যাসমতো সেই জ্যোতিষ্করাজ্য দর্শন করছিলেন। এইসব সময় কী এক প্রচণ্ড আবেগ তাঁকে পেয়ে বসে। মুহুর্মুহু বিস্ময়ে তিনি শিহরিত হন। ওই সেই জ্যোতির্ময় অনন্ত স্থানকালের প্রান্তসীমা, যেখানে একদা এক রাতে পবিত্রপুরুষ পয়গম্বর সুন্দরী নারীর মুখমণ্ডলবিশিষ্ট পক্ষিরাজ অশ্ব 'বোররাখে'র পিঠে চেপে ঈশ্বরের আমন্ত্রণে 'উত্থিত' হয়েছিলেন! এক রোমাঞ্চকর বিস্ময় বদিউজ্জামানকে শিহরিত করে। ওই অনন্ত স্থান-কাল পেরিয়ে গেলে কোথায় সে পরম জ্যোতির্ময় সিংহাসন 'আরস', যাতে সমাসীন এই 'কুলমখলুকাত' — বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার, যিনি আল্লাহ, যিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, এই বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন!

আর শিষ্যরা তাঁকে অন্ধকারে নক্ষত্রমুখী দেখে প্রতিরাতেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন কোনও-না-কোনও বিস্ময়কর বার্তা শুনে পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে। আজ তাঁরা দেখলেন, হুজুর একটু বেশি সময় ধরে আসমানে নজর রেখেছেন। তিনি নিশ্চয় কোনও 'মোজেজা' প্রত্যক্ষ করছেন। তারাও সেটি দেখার জন্য সাগ্রহে আকাশদর্শনে উন্মুখ হল। সেই সময় বদিউজ্জামান হঠাৎ ডাকলেন, আনিসুর রহমান! মনিরুল! আপনারা আছেন কি?

বারান্দায় আলো নেই। বেঁটে একটি 'লানটিন' বা লণ্ঠন জ্বলছিল মসজিদের ভিতর। আলো-আঁধারি রহস্যময়তা মসজিদ চত্বরে। ডাক শুনে আনিসুর মনিরুল এবং বাকি প্রবীণেরা সাড়া দিলেন। বদিউজ্জামান মৃদু হেসে বললেন, হাওয়াবাতাস বন্ধ। আসুন, এখানে বসা যাক।

মসজিদ চত্বরে 'অজু' করার জন্য একটি অপ্রশস্ত চৌবাচ্চা আছে। সেটির পরিত্যক্ত এবং জরাজীর্ণ দশা। তার পাড়ে হুজুরকে বসতে দেখে নিচের এবড়ো খেবড়ো মেঝেয় শিষ্যরা বসে পড়লেন। মসজিদটি প্রাচীন। আজানের মিনারটি কবে ভেঙে পড়েছে। সম্প্রতি মসজিদের আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। শিগগির কাজ শুরু হয়ে যাবে। শিষ্যরা নিচে বসলে বদিউজ্জামান ব্যস্তভাবে বললেন, এ কী! আপনারা নিচে বসছেন কেন? আমরা সবাই খোদার বান্দা। এখানে বসুন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা হুজুরের সঙ্গে ঈষৎ দূরত্ব রেখে চৌবাচ্চার নিচু পাড় ঘিরে বসলেন। তখন বদিউজ্জামান বললেন, একটা কথা বলা দরকার মনে করছি। কদিন থেকেই কানে আসছে, শফিউজ্জামানের ইংরাজি স্কুলে পড়া নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে—

আনিসুর এখন মৌলাহাটে হুজুরের প্রধান শিষ্য। প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। তিনি দ্রুত বললেন, তওবা! তওবা! এমন কথা কোন বেতমিজের জবান দিয়ে নিকলেছে শুনলে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

মনিরুল এবং অন্যেরাও একবাক্যে সায় দিলেন। বদিউজ্জামান একটু হাসলেন। বললেন, প্রশ্ন জাগতেই পারে। সত্যিই তো? আমরা ওহাবি ফরাজি। ইংরেজ আমাদের দুশমন। ইংরেজি হল কি না খ্রিস্তানি 'নাছারা'র (ন্যাজারেথের যিশু-অনুগামীদের) কুফরি এলেম।

আনিসুর কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানেন। হুজুর! আপনি কি দেওয়ানসাহেবকে বলেননি, নাছারাদের টিট করতে হলে নাছারি বিদ্যা শেখা দরকার?

মনিরুল উষ্মা দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ — কথাটা আমারও কানে এসেছে। আসলে দেওয়ানসাহেব যখনই আসেন, কাদু ওস্তাজিকে ঠাট্টা করে বলেন, 'আলেফ-বে' শিখিয়ে কী হবে ওস্তাজি? বাংলা-ইংরেজি পাঠশালা করে মক্তব তুলে দিন। তাই বোধ করি কাদু ওস্তাজি রাগ করে বলেছেন, হুজুর মৌলানাকে গিয়ে বলুন না চৌধুরিসাহেব। তাঁর ছেলে তো হরিণমারা স্কুলে ভরতি হয়েছে।

আরেক প্রধান শিষ্য বদরুদ্দিন লাফিয়ে উঠলেন। এক্ষুণি কাদু ওস্তাজিকে গাঁছাড়া করছি! ভারি আমার মক্তব খুলেছে! পেটের ধান্দা খালি। দয়া করে আমরা তাকে মক্তব খুলে দিয়েছি। নৈলে ভিখ মেঙে বেড়াত গাঁয়ে-গাঁয়ে।

বদিউজ্জামান ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ছিঃ বদরুদ্দিন! কাদেরসাহেব মুসল্লি মানুষ। গোনাহের কাজ করবেন না!

অপর শিষ্য হাফিজ বললেন, বড়ো একগুঁয়ে মানুষ বটে। এখনও তওবা করে হুজুরের কাছে ফরাজি হলেন না। নামুপাড়ার লোকেরা যে ফরাজি হল না এখনও কিংবা ধরুন আলাদা মসজিদে নমাজ পড়ছে, সেও ওস্তাজির সাহসে। নয় কি না বলুন আপনারা?

বিতর্ক এককথায় থামিয়ে বদিউজ্জামান বললেন, আজ রাতে আল্লার মেহেরবানিতে ঝড়-পানি হবে মনে হচ্ছে। ওই দেখুন, আসমানের কোনায় ঝিলিক দিচ্ছে। হাওয়া-বাতাস বন্ধ।

মৌলাহাটের এই মানুষগুলো সবাই কৃষিজীবী। সারা চৈত্রমাস গেছে। মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ঝড় এসেছে। সবই ধুলো-ওড়ানো, গাছপালার ডাল মুচড়ে দেওয়া পাতাছেঁড়া হিংস্র রাঢ়মাটির স্বভাবগ্রস্ত ঝড়। আকাশ ভয়ঙ্কর লাল করে দেওয়া সেইসব ঝড় মৌলাহাটের প্রত্যাশায় মুঠোমুঠো ধুলো ছড়িয়ে চলে গেছে। গত জুম্মাবারই তো কথা উঠেছিল মাঠে গিয়ে বৃষ্টির জন্য নমাজ পড়ার। হুজুর বলেছিলেন, সবুরে মেওয়া ফলে। আল্লার করুণা সময় হলেই দুনিয়াকে ভিজিয়ে দেবে। এ রাতে হুজুর আসলে আসমানে তাকিয়ে তাহলে সেই সংকেতই টের পেয়েছেন। লোকগুলো মুহূর্তে সবকিছু ভুলে দিগন্তের দিকে তাকাল। তারা আবার শিহরিত হল নৈঋতে ঝিলিক দেখে। কেউকেউ মসজিদপ্রাঙ্গণঘেরা ভাঙা পাঁচিলের কাছে গিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকল অস্ফুট উচ্চারণে। তারপর বদিউজ্জামান ঘোষণা করলেন, মেহেরবানি করে আপনারা বাড়ি যান। আমি এবার নফল (অতিরিক্ত) নমাজে বসব।

অনেক রাত পর্যন্ত বদিউজ্জামান নফল নমাজ পড়েন। তারপর বহুক্ষণ লানটিনের আলোয় কোরান পাঠ করেন। অতি মৃদু সুরেলা সেই পাঠ। রাতের প্রকৃতির সব ধ্বনির সঙ্গে সেই ধ্বনি একাকার হয়ে ওঠে। প্রাঙ্গণের পাঁচিলের ওপর

কিছু নিচু গাছ ও আগাছার ঝোপ রাতের হাওয়ায় শনশন কী এক অপার্থিব ধ্বনি তোলে। পেছনের তালগাছের বাগড়ায় সর-সর শব্দ হয়। রাতপাখি ডাকতে-ডাকতে ডানার শব্দ করে উড়ে যায়। মসজিদের শীর্ষে ঘুলঘুলি থেকে বুনো কবুতরগুলো ঘুম-ঘুম স্বরে হঠাৎ কখনও ডেকে ওঠে। বাদশাহি সড়কে দূরদেশের গাড়োয়ানের ঘুমজড়ানো গলার গান ভেসে আসে। আর সারবদ্ধ গাড়ির চাকার টানা ঘসঘস শব্দ রাতের নিঝুমতায় চাপা ও গভীরতর হতে-হতে দূরে মিলিয়ে যায়। যাম ঘোষণা করে ব্রাহ্মণী নদীতীরে শেয়ালের পাল। সবাই রাতের বিশ্বপ্রকৃতির শ্রুতি-ও শ্রুতিপারের এক ধারাবাহিক অর্কেস্ট্রা। আর তার মধ্যে বদিউজ্জামানের মৃদু কোরান ধ্বনির কোনও ভিন্নতা থাকে না। পাঠ শেষ করে সেটা অনুভব করেন বদিউজ্জামান। কিছুক্ষণ বাইরে এসে দাঁড়ান। নক্ষত্রের দেশে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। তারপর সেই বিস্ময়কর আবেগে আপ্লুত হয়ে অবেশেষে ফিরে আসেন শয্যায়। তাঁর মনেও থাকে না স্ত্রীপুত্রপরিবারের কথা। খালি মনে হয় তাঁর জন্ম এ পৃথিবীতে কী এক ব্রতপালনে। অথচ এতদিন পরে হঠাৎ আজ রাতে তিনি বিচলিত বোধ করছিলেন।

তিনি শফির কথাই ভাবছিলেন কদিন থেকে। বড়ো ছেলে নুরুজ্জামান নিজের তাগিদেই সুদূর দেওবন্দ শরিফে এলেম অর্জনে গেলেও তাঁর মনে কোনও দ্বিধা বা বিষণ্ণতা জাগেনি। নুরুজ্জামান বাল্যকাল থেকে পিতার আদর্শের অনুরাগী। নিজের সঙ্গে তার পার্থক্য আজও খুঁজে পান না বদিউজ্জামান। অথচ শফিউজ্জামানকে বরাবর মনে হয় এক ভিন্ন ও অপরিচিত সত্তা। তার সঙ্গে নিজের কোনও মিল নেই। তাকে যে মক্তবে নয় পাঠশালায় ভরতি করে দিয়েছিলেন, শুধু এই গভীর গোপন কারণে — তা তো কাউকে বলা যাবে না।

আজ যখন সত্যিই মসজিদের পেছনের দেয়াল মধ্যরাতের কালবোশেখি এসে ধাক্কা দিল, কেন যেন শফির কথাই মনে পড়ে গেল তারও তীব্রভাবে। শয্যা থেকে উঠে বসলেন বদিউজ্জামান। নিবু-নিবু লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে ঈশ্বরের ধ্যানে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারবার ওই কিশোর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। আর তখন বাইরে প্রকৃতি উত্তাল। মসজিদের জানালা শুধু পূর্বদিকেই। তবু প্রমত্ত ঝড় ঘুরপাক খেতে-খেতে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে উঠে বারান্দার জীর্ণ থামের পলেস্তারা খসিয়ে ভেতরে উঁকি দিচ্ছিল। তিনটি দরজা ও দুটি জানালা বন্ধ করে দিলেন। শুধু একটি দরজা খোলা রইল। সেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের ওই উপদ্রবকে দেখার চেষ্টা কবলেন বদিউজ্জামান।

বিস্ময়ের কথা, প্রাকৃতিক উপদ্রবের সময় অভ্যাসমতো আজ পবিত্র কোরানের 'সুরা ইয়াসন' আবৃত্তির কথাও তাঁর মনে এল না। তাঁর শুধু মনে হচ্ছিল শফি এখন হরিণমারায় কেমন ঘরে আছে, কী করছে। নবাববাহাদুরের দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরি তাঁকে আশ্বস্ত কবে বলেছেন, শফি খুব ভালো জাযগায় আছে। খোন্দকার হাশমত আলি অবস্থাপন্ন মানুষ। বনেদি 'আশাবফ' (উচ্চবর্ণীয়) পরিবার। তাঁদের বাড়ি থেকে শফির পড়াশোনায় কোনও অসুবিধে হবে না। আর পিরসাহেবের ছেলেকে তাঁরা প্রচুর যত্ন-আত্যিও করবেন। তবু বদিউজ্জামান কেন যেন আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না।

পাবছিলেন না কতকটা সাইদা বেগমের কথা ভেবেও বটে। মেজো ছেলে

মনিরুজ্জামান জন্মপ্রতিবন্ধী। বড়ো ছেলে ছোটোবেলা থেকেই বাইরে। তাই সাইদার কাছে শফির মূল্য অনেক বেশি। এক মুহূর্ত চোখের বাইরে রাখতে পারেন না। বদিউজ্জামানের সন্দেহ হয়েছিল, এবার যেন স্বামীর ওপর তীব্র অভিমানেই শফিকে চোখছাড়া হওয়ার দুঃখ সইতে মনকে তৈরি করেছেন। স্বামী যখন হুকুম দিয়েছেন (দরিয়াবানু আর চৌধুরিসাহেবের কথামতো) তখন তিনি তো অসহায়। বাধা দেবার সাধ্য কী তাঁর?

এই ঝড়ের রাতে বদিউজ্জামান এই কথাটা তীব্রভাবে টের পাচ্ছিলেন। আর সেই বিচলিত সময়ে অনিবার্যভাবে তাঁর মনে পড়ে গেল, প্রায় একমাস হতে চলল তিনি মসজিদবাসী। সেই একদিন নতুন বাসস্থান দেখে এসেছেন মাত্র। তারপর আর সাইদার সঙ্গে তাঁর দেখা নেই। এ কী করছেন তিনি? বদিউজ্জামান নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন। তিনি কি তাহলে তাঁর 'সুফি' এবং 'মজনুন' (ঈশ্বর-প্রেমে উন্মাদ) ছোটোভাই ফরিদুজ্জামানেই পরিণত হলেন অবশেষে?

বালিকা সাইদাকে বিয়ে করেই বিপত্নীক মৌলানা প্রায় তিন বছর নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন। সেই ঘটনাটি মাঝে-মাঝে মনে পড়ায় বিব্রত বোধ করতেন বদিউজ্জামান। এ রাতে সেই অপরাধবোধও তাঁকে আড়ষ্ট করে ফেলল। চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে প্রাঙ্গণ থেকে আকাশব্যাপী তুমুল প্রাকৃতিক আলোড়ন দেখতে দেখতে ক্রমশ একটা আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসল, জনপদের প্রান্তে নির্জনে অবস্থিত এই জীর্ণ প্রাচীন মসজিদসুদ্ধ তাঁকে যেন 'গায়রত' (ধ্বংস) করে ফেলতেই আল্লাহ এই প্রলয় সৃষ্টি করেছেন। গর্জন করছে মুহুর্মুহু নক্ষত্রঢাকা প্রমত্ত মেঘ। ঝলসে উঠছে ফেরেশতাদের জ্যোতির্ময় খরসানের মতো ক্ষিপ্ত বিদ্যুৎরেখা। যে-কোনো মুহূর্তে মসজিদ বুঝি ওই মিনারের মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। তিনি তো সর্বত্যাগী সাধকপুরুষ নন। তিনি ভ্রান্ত মতানুগামী সুফিও নন। তিনি ওহাবপন্থী ফরাজি মুসলিম। ইহলোকের সবরকম নৈতিক সুখ উপভোগ করাই তো যথার্থ ইসলাম। তিনি তাঁর নিরুদ্দিষ্ট সুফি ভাইয়ের মতো 'নারীবিদ্বেষী' তো নন। বরং পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, কৃষক যেমন শস্যক্ষেত্রের দিকে গমন করে, পুরুষ তার নারীর দিকে একই নিষ্ঠা ও প্রেমে অনুগমন করবে বলেই আদিমানব আদমের বুকের বাঁ পাঁজর থেকে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ তিনি এ কী করছেন? কেন করছেন?...

আর সেই ঝড়ের সাইদাও তখন ভাবছিলেন শফির কথা। এমন সব রাতে একপাশে মনি অন্যপাশে শফি — আর মনি তো প্রাণীমাত্র ; শফি তাঁকে আঁকড়ে ধরে ফিশফিশ করে শুধোত, আম্মা, এখন কোন ফেরেশতা ঝড় করছে, বলুন না! ও আম্মা, বলুন না কেন ঝড় হয়? পানি ঝরায় যে ফেরেশতা, তার নাম কী আম্মা? তারপর বাজ পড়লেই সে মায়ের বুকে মুখ গুঁজত। আর সাইদা বলতেন, আর শুধোবি ও কথা? ওই শোন, কোড়া পড়ল শয়তানের পিঠে। শয়তান তোর মুখ দিয়ে কথা বলাচ্ছে যে!

সেই শফি একা কার বাড়িতে শুয়ে আছে ভেবে চোখ ফেটে জল আসছিল সাইদার। ঝড়, মেঘের গর্জন যত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল, তত তিনি নিজেকে দারুণ একা আর অসহায় বোধ করছিলেন। তারপর একসময় হঠাৎ তাঁর মাথার ভেতর

একটা কথা এসে বাইরের ওই বিদ্যুতের মতোই একমুহূর্তের জন্য ঝলকে উঠল। নুরুকে, তারপর শফিকে তাঁর কাছ ছাড়া করার পেছনে তাঁর স্বামীর কোনও চক্রান্ত নেই তো ? তাঁকে কি এমনি করে একা করে ফেলতে চাইছেন মৌলানা কোনও গোপন উদ্দেশ্যে ? মেজোছেলে মনি তো সাইদার আশ্রয় হতে পারবে না কোনোদিনও। শাশুড়ি কামরুন্নিসা কবরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। মৌলানার ছোটো ভাই ফরিদুজ্জামানকে সাইদা দেখেননি। শাশুড়ির কাছে তাঁর কথা শুনেছেন মাত্র। শাশুড়ি বেগম দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, বউবিবি ! এই খান্দান যেন মাজনুন ফকিরেরই খান্দান। এরা আল্লা-আল্লা করেই দুনিয়াদারির মুখে ঝাঁটা মারতে ওস্তাদ ! বদুকে একটু কাছে টেনে রেখো, মা ! নইলে আখেরে পস্তে কূল পাবে না। কামরুন্নিসা বলতেন, ফরিদ ! আমার ফরিদ ! তাকে যদি দেখতে বউবিবি ! তোমার ছোটো বেটার চেয়ে খাপসুরত ছেলে ছিল সে। সেই ছেলে যোয়ান হয়ে মাথায় রাখল আওরতলোকের মতন লম্বা-লম্বা চুল। সারারাত গোরস্থানের ধারে গিয়ে বসে জিকির (জপধ্বনি) হাঁকত। আর সে কী গলা, সে কী গান ! বুকে চিমটে ঠুকত আর মারফতি গান গাইত। তখন বদু একদিন জোর করে লোকজন নিয়ে গিয়ে তার চুল মুড়ো করে দিলে। চিমটে কেড়ে নিলে। সে বড়ো দুঃখের কথা বউবিবি ! বদুকে কম ভেবো না ! সোদর ভাইটাকে জুলুম করে শরিয়তে টানতে গেল। আর সোনার বাছা আমার পালিয়ে গেল কোথায়। আর তাকে জিন্দেগিভর দেখতে পেলাম না। বউবিবি, বদুকে আমি গোরে গিয়েও মাফ করতে পারব না।

ঝড়ের রাতে শাশুড়ির সেইসব কথা মনে এলে সাইদা চমকে উঠেছিলেন। তাহলে কি তাঁর স্বামীও সংসারত্যাগী মাজনুন হতে চলেছেন ? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এতকাল ধরে তাঁকে যতখানি বুঝেছেন, মৌলানা মাজনুনদের একেবারে উলটো। সাইদা অকুণ্ঠিতভাবে দ্রুত স্মরণ করলেন স্বামীর সঙ্গে রাত্রিযাপনের সেইসব তীব্র সুন্দর সময়গুলোকে। বরং তাঁর তো মনে হয়েছে, মৌলানা এসব গোপনীয় শারীরিক ব্যাপারে কি নির্লজ্জ আর প্রবল পুরুষ হয়ে ওঠেন। তাঁকে কদাচিৎ শয্যায় পাশে পান বলেই সাইদার মনে যেমন রাক্ষসীর ক্ষুধা জেগে ওঠে, মৌলাদাকেও তেমনি মনে হয় ভয়ঙ্কর ক্ষুধার দাউদাউ আগুন। আর সাইদাব মনে হয় ওই প্রজ্বলনে নিজেকে ছাই করতে পারলেই পরম সুখ।

তাহলে কি মৌলানার কাছে এতদিনে তাঁর আকষণ ফুরিয়ে গেছে ? উনি কি ভেতর-ভেতর নিকাহের (বিয়ে) মতলব করেছেন ? মৌলাহাটে আসার পর সাইদা লক্ষ করেছেন এখানকার মেয়েরা পরদানসীনা নয়। এদের মধ্যে স্বৈরিণী ও স্বাস্থ্যবতী সুন্দরীরাও বড়ো কম নেই। তার চেয়ে ভাবনার কথা, এখানকার পুরুষগুলোর হাবভাব কেমন যেন সন্দেহজনক। তারা ওঁকে আমরণ আটকে রাখার জন্য ব্যস্ত। তাহলে কি তারাই ওঁকে কৌশলে প্ররোচিত করছে কারুর সঙ্গে নিকাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ?

ভীষণ গর্জনে বজ্রপাত হল। থরথর করে কেঁপে উঠলেন সাইদা। প্রতিবন্ধী ছেলেকে আঁকড়ে ধরে অন্ধকার ঘরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। পাশের ঘরে পক্ষাঘাতগ্রস্তা শাশুড়ি আছেন। কবে কখন তাঁর মৌলানাপুত্র এসে বউবিবির পাশে রাত্রিযাপন করবেন ভেবেই বরাবর তিনি আলাদা শুয়ে থাকেন। মৌলাহাটে আসার পর কোনো-ন-কোনো বয়স্কা মেয়ে, তারা বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা, পির-

জননীর পাশে শুয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে। এ রাতে আয়মনি এসে শুয়েছে। একটু আগে সে বেরিয়ে এসে সাইদার ঘরের বন্ধ কপাটের ওধার থেকে জেনে গেছে, বিবিজির ডর লাগছে কি না। মেঘের গর্জন বাড়লে সাইদা আবার তার সাড়া পেয়ে বিরক্ত হলেন। বললেন, তোমার চোখে কি নিদ নাই, আয়মণি ? চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারছ না ?

আর সাইদা যখন ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, তখনই বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল বাইরে। প্রথমে দড়বড় করে ঘোড়সওয়ারদলের ছুটে যাওয়ার মতো, তারপর হাওয়ার শনশনানির মতো ঝরঝর ধ্বনি। মেঘের ডাকে যেন ছন্দ এল। কিন্তু হাওয়া থামল না। তার একটু পরেই আবার আয়মনির ডাক শুনলেন সাইদা। সে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিল। এবার তার কণ্ঠস্বর চাপা। বিবিজি ! ও বিবিজি ! লম্ফ জেলে শিগগিরি উঠুন দিকিনি ! আমার লম্ফ বুতে গেল।

সাইদা দ্রুত চোখ মুছে উঠে বসলেন। শলাইকাঠি ঘষে লম্ফ জাললেন। তাঁর বুক ধড়াস করে উঠেছে। শাশুড়ি-বেগমের কি মউত হতে চলেছে, তা না হলে আয়মনির গলার স্বর অমন কেন ?

দরজা খুললেন কাঁপা-কাঁপা হাতে। অন্যহাতে লম্ফের শিখাও প্রবলভাবে কাঁপছে। সামনে আয়মনিকে এক পলকের জন্য দেখলেন। উঠোনে বিদ্যুতের ঝলসানিতে ঘন বৃষ্টিরেখা বাঁকা। আর আয়মনির মাথায় এমন ঘোমটা টানা যে তার চোখ ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সে দ্রুত ছিটকে গেল। আর সামনে যাঁকে দেখলেন সাইদা, তাঁকে স্বপ্নের মূর্তি মনে হল। ভিজে শাদা পোশাকপরা ম্রিয়মাণ মূর্তিটিকে খর্বাকার বিভ্রম হল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন সাইদা বেগম। আর সেই কুঁকড়েথাকা, বিষণ্ণ ঝড়ের রাতের আগন্তুক জড়ানো গলায় কী উচ্চারণ করে সাইদাকে ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। তখন সাইদা আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠে বুঝলেন, এই কাকতাড়ুয়াবৎ মূর্তিটি তাঁর স্বামীরই।

পরাক্রমশীল এক 'দেও' (দৈত্য), এতকাল সাইদা যার সামনে অবচেতন ভয় আর সংস্কারলালিত ভক্তিতে বিনত থেকেছেন, এই ঝড়বৃষ্টির রাতে তাঁর দিকে নির্লিপ্ত চাহনিতে তাকিয়ে ছিলেন।

আর বদিউজ্জামান ওই নতুন চাহনি দেখে ঈষৎ বিস্মিতও হয়েছিলেন। কিন্তু যে অতর্কিত আবেগ এমন রাতে তাঁকে ঐশী আবহমণ্ডল থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে কাদামাটিতে গড়া নিছক আদম-সন্তানে পরিণত করেছে, সেই আবেগই তাঁকে একটু হাসি দান করল। মৃদু হাস্যে তিনি বললেন, কী হল সাইদা ? দেখছো না আমি ভিজে গেছি ? আমাকে শিগগির শুকনো কিছু 'লেবাস' (পোশাক) দাও। জাড় মালুম হচ্ছে।

একটিও কথা না বলে সাইদা ছোট্ট কাঠের সিন্দুকটি খুললেন। ভাঁজ করে রাখা শাদা একটি তহবন্দ্ (লুঙ্গি) আর দড়ির আলনা থেকে একটি তাঁতের নতুন গামছা এনে দিলেন। লম্ফটি সিন্দুকের ওপর রেখে তিনি দরজার কাছে গিয়ে বৃষ্টি দেখার ছলে আয়মনিকে খুঁজলেন। আয়মনি আবার তাঁর শাশুড়ির ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। দরজা বন্ধ। চাপা স্বরে কথা বলছে কামরুন্নিসার সঙ্গে তাও কানে এল সাইদার।

বদিউজ্জামান দ্রুত পোশাক বদলে নিতে-নিতে আড়ষ্টস্বরে বললেন, আমার সেই কামিজটা ? তখন সাইদা দরজা থেকে মুখ না ঘুরিয়ে আস্তে বললেন, সিন্দুকে আছে।

অমনি বদিউজ্জামান তাঁর কাছে এসে দরজা বন্ধ করে দুহাতে স্ত্রীর দুই কাঁধ ধরে তাঁকে ঘোরালেন নিজের দিকে। সাইদা একমুহূর্তের জন্য স্বামীর উজ্জ্বল গৌর বুকের কাঁচাপাকা রোমগুলির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আঃ ! মনি আছে।

মনিরুজ্জামান অবশ্য গাঢ় ঘুমে কাঠ। রাতে জ্বালাতন করে বলে দরিয়াবানুর পরামর্শে পাশের গ্রাম দুনিতলার কবরেজের বড়ি খাওয়ানো হয়। বড়িটিতে আফিম মেশানো। বদিউজ্জামান একথা জানেন না। তাই চকিতভাবে ঘুরে বিছানায় মেজো ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর তার কুঁকড়ে পাশফিরে শুয়ে থাকা দেখে আবার স্ত্রীকে আকর্ষণ করলেন। তখন সাইদা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু তফাতে সরে গেলেন।

বিস্মিত, ব্যথিত বদিউজ্জামান চাপাস্বরে বললেন, তোমার কী হয়েছে সাইদা ? তুমি এমন করছ কেন ?

সাইদার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। লম্ফের আলো তত উজ্জ্বল নয়। আলো অন্ধকারে তাঁর এই অদ্ভুত চেহারা বড়ো অবিশ্বাস্য লাগছিল বদিউজ্জামানের। তিনি স্বভাবে একরোখা, তেজী এবং আবেগপ্রবণ মানুষ। স্থির দৃষ্টে স্ত্রীকে দেখতে-দেখতে ভাবছিলেন, কী কথা এবার বলবেন ? তিনি নির্জন মসজিদ থেকে এই দুর্যোগের রাতে এমন করে কেন ছুটে এসেছেন, সেকথা বলার জন্য ব্যাকুল। অথচ সাইদার হাবভাব দেখে তিনি এত অবাক যে মুখে কথা আসছে না। কষ্ট করে আবার একটু হাসলেন শুধু। আর সাইদা হিসহিস করে বলে উঠলেন, আমার কাছে আপনার কী দরকার ? তারপরই দুহাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর পিঠের দিকটা কাঁপতে থাকল।

নাদান আওরত ! বদিউজ্জামান ম্লান হেসে এগিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন। তুমি কি জানো না, কোরান শরিফে আল্লাহ বলেছেন—

কান্নাজড়িত স্বরে সাইদা বললেন, চুপ করুন ! ওসব বুলি মসজিদে শোনান গিয়ে। আমার কাছে নয়।

নাউজবিল্লাহ্ ! সাইদা ! কী বলছ তুমি ! এ যে গোনাহ্ !

সাইদা বেগম ঘুরে দাঁড়ালেন। গোনাহ্। আর নিজের বিবির ভালোমন্দ না তাকিয়ে মাস-কাল ধরে মসজিদে পড়ে থাকাটা বুঝি নেকি (পুণ্য) ? আবার না তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাইদা। — আমার বাছাদের দূর-দূরান্তে পাঠিয়ে আমার কোলছাড়া করে ঢেওয়া নেকি ? আর ওই মনি — তার কী হাল, আর বিবিজি — যাঁর পেট থেকে পড়ে দুনিয়ার মুখ দেখেছেন — তিনি হরবখত কাঁদছেন. মউতের আগে বেটার হাতের পানি মুখে পাব না — এও বুঝি নেকির কাজ ?

বদিউজ্জামান কাতরস্বরে বললেন, আমাকে ভুল বুঝো না সাইদা ! এসো তোমাকে শুয়ে-শুয়ে সব বাতলাব। এসো।

সাইদাকে টেনে এনে মেঝেয় পাতা বিছানায় বসালেন। তারপর একটু চমকে উঠে বললেন, এঘরে তক্তাপোশ নেই দেখছি ! মহিউদ্দিনকে বলেছিলাম—

বাধা দিয়ে সাইদা বললেন, আমি ছপ্পরখাটে শোব। আর বিবিজি মেঝেয় শোবেন ? তক্তাপোশ ওঘরে আছে।

স্ত্রীর মুখচুম্বনের চেষ্টা করতে গিয়ে বাধা পেলেন বদিউজ্জামান। শুকনো হাসলেন। কিন্তু তুমি এমন বেরহম (নিষ্ঠুর) কেন হলে সাইদা ? আমি তো হরবখত এত্তেকাফ নিয়ে মসজিদে হপ্তাভর থেকেছি। কখনও তো তুমি এমন করোনি।

হঠাৎ সাইদা মুখ নিচু করে বললেন আপনি নিকাহ্ করবেন — আমি বুঝতে পেরেছি।

বদিউজ্জামান আবার হাসলেন — আড়ষ্ট শুকনো হাসি।...আমার হুজুর পয়গম্বরসাহেব কতগুলো নিকাহ্ করেছিলেন তুমি তো জানো ! কিন্তু আমি নাদান আদমি সাইদা ! এই দেখো না, তোমার ওপরই কত অবিচার করি — আবার নিকাহের কথা কি আমার ভাবা সাজে ? তবে তোমার ভাবা উচিত ছিল, এমনকরে ঝড়পানির মধ্যে কেন ছুটে এলাম তোমার কাছে।

অস্ফুটস্বরে সাইদা বললেন, কেন ?

একটু চুপ করে থাকার পর শ্বাস ছেড়ে বদিউজ্জামান বললেন, তুমি শফির কথা বলছিলে। হঠাৎ কেন কে জানে ঝড়টা ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে শফির কথা মনে এসে গেল। আমার বুকটা কেমন করতে লাগল। সাইদা, অমনি মনে হল শফিকে তুমি নজর-ছাড়া করতে পারো না। তাহলে কী অবস্থায় তোমার দিন কাটছে। কত কষ্ট তোমাকে সইতে হচ্ছে !

সাইদা কান্না চেপে বললেন, খোদার মেহেরবানি যে আপনি কথাটা ভেবেছেন।

ভেবেছি। ভেবেই মনে হয়েছে, আমি গোনার ভাগী হচ্ছি। তোমাকে বঞ্চনা করছি।

আপনি বুজুর্গ মানুষ। সাইদার বাঁকা ঠোঁট থেকে কথাটা ব্যঙ্গমিশ্রিত হয়ে বেরিয়ে এল।

ছিঃ ! তামাশা কোরো না সাইদা।

সাইদা একটু চুপ করে থাকলেন। বাইরে অঝোর বৃষ্টির শব্দ এখন। মাঝে-মাঝে মেঘ ডাকছে। পিঠে স্বামীর হাতের আদর অনুভব করছিলেন সাইদা। তবু আজ তাঁর দেহ যেন নিঃসাড়। অবিশ্বাস তাঁকে ঘিরে রেখেছে। কিছুক্ষণ পরে বললেন, তামাশা করছি না। আমি জানি জিনেরা এসে আপনার সঙ্গে কথা বলে। আপনি বজুর্গ না তো কী ?

ওসব কথা থাক, সাইদা ! রাত হয়েছে। শুয়ে পড়া যাক। ফজরের আগেই আমাকে মসজিদে যেতে হবে।

মসজিদে তো অনেকদিন থাকলেন। এবার বাড়ি ফিরবেন না ?

বদিউজ্জামান কথাটা বলেই শুয়ে পড়েছিলেন। সাইদা শুলেন না ! তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে লম্ফটা আনার জন্য উঠতে গেলেন। কিন্তু বদিউজ্জামান তাঁকে উঠতে দিলেন না। বললেন, আজ তোমাকে একটু দেখি। কতদিন তোমাকে দেখিনি, সাইদা !

আপনি কবে বাড়ি ফিরবেন, আগে বলুন ?

সাইদা, সত্যি বলছি — হয়তো আমার এক্তিয়ারে আর কিছু নেই।

ভীষণ চমক খেয়ে সাইদা বললেন, কেন ?

জানি না। বদিউজ্জামান আচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে বললেন। কী একটা ঘটছে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। খালি মনে হচ্ছে, এই মসজিদে আমার জিন্দেগির একটা পরদা খুলে যাচ্ছে। যা কখনও বুঝিনি, তা সব বুঝতে পারছি !....নাঃ ! আমার খামোশ থাকা উচিত।

এ ধরনের কথাবার্তা সাইদা কখনও স্বামীর মুখে শোনেননি। তাঁর বুগুর্জপনা বা কেরামতির কথা সবই শাশুড়ির কথায় কিংবা অন্য লোকের কাছে পরোক্ষে আঁচ করেছেন মাত্র। তাই তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন সাইদা। তারপর কী এক হঠকারিতাবশে তিনি বলে উঠলেন, আমাকে নাদান আওরত ভেবে আপনি যা বললেন, আমি তা মানব না। আমি জানি আপনি কেন আমার কাছ-ছাড়া হয়ে আছেন এতদিন।

ছিঃ সাইদা ! আবার ওই কথা ! বলে বদিউজ্জামান নিজেই উঠে গিয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর স্ত্রীকে আকর্ষণ করলেন। নিজের জৈবসত্তার তীব্রতা তাঁকে অস্থির করে ফেলছিল ক্রমশ।

কিন্তু সাইদা বাধা দিয়ে বললেন, আপনি যাই বলুন, নিকাহ্ করার মতলব হয়েছে, আমি জানি।

সাইদা ! আল্লার দোহাই, তুমি চুপ করো !

সাইদা ক্রমশ প্রগলভা আর আর সাহসী হয়ে উঠছিলেন বদিউজ্জামানের পরিবর্তিত আচরণ আর ভাবভঙ্গি দেখে। অন্ধকারে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, মেয়েটি বুঝি কুঠো আবদুলের বউ ?

কী বললে ? বদিউজ্জামান মুহূর্তে নিঃসাড় হয়ে গেলেন। বাইরের আকাশের বজ্র যেন তাঁরই মাথায় পড়ল।

হ্যাঁ, ওই মেয়েটার পেছনে যেভাবে লেগেছেন শুনতে পাই—

বদিউজ্জামান সরোষে অন্ধকারে স্ত্রীর গালে থাপ্পড় মারলেন। থাপ্পড়টা সাইদার মাথায় লাগল। তারপর বদিউজ্জামান শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সশব্দে দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেলেন। খালি পায়েই ছুটে এসেছিলেন মসজিদ থেকে। এখন তাঁর পরনে শুধু তহ্বন্দ্, খালি গা, খালি পা।

আর সাইদা তেমনি বসে আছেন। মাথা দুহাঁটুর ফাঁকে। খোলা দরজা। উঠোনে ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। ঝড়ের ভীষণতা শান্ত হয়ে গেছে। শুধু মাঝে-মাঝে একদমক করে বিভ্রান্ত হাওয়ার ঝাপটা নিতে গাছপালা দুলে উঠছে। সাইদার মনে হচ্ছিল বিশাল খোলামেলা প্রান্তরে বসে বৃষ্টিতে অসহায় ভিজছেন।

ভোরে যখন বৃষ্টি থেমেছে, আয়মনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে সাইদাবেগমের ঘরের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। দরজা খোলা। আর নগ্ন মাটির মেঝেয় চুল এলিয়ে উপুড় হয়ে মাথা কোটার ভঙ্গিতে পড়ে আছেন বিবিসাহেবা।...

Man's like the earth, his hair like grasse is grown
His veins the rivers are, his heart the stone!

...খানবাহাদুর দবির-উদ্দিন চলে যাওয়ার পরই পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। কারণ পৃথিবীর ঘৃণ্যতম পদার্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে জানতাম এই লোকটিকে। আর বাবু চৌধুরির মুখে শুনতে-শুনতে মুখস্থ হয়ে-যাওয়া ওই সতেরো-শতকী ইংরেজি পদ্যটি প্রতিধ্বনিত হত তাঁর কথা মনে এলেই। স্বীকার করতে বাধ্য, কোনও এক প্রস্তরীভূত মুহূর্তকে এই পদ্যবন্ধ বুঝি ছুঁয়ে আছে, কিংবা ধরা আছে এর মধ্যে আমার মতোই মানুষের চেরাগলার আর্তনাদ, যা শুনে কাল মধ্যরাতের রোগা শান্ত্রীটি তার লম্বা নাক সেলের গরাদের ফাঁকে ঢুকিয়ে কুতকুতে চোখের মমতা দিয়ে আমাকে দেখছিল !

খানবাহাদুর চলে গেলে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে আব্বার আরবি শ্লোকপাঠের মতো পদ্যটি মনে-মনে আওড়ানোর পরই একটি 'মোজেজা' ঘটল। হঠাৎ দেখলাম, নিরেট স্তব্ধ ফ্যাকাশে দেয়াল কুয়াশার মতো নীলচে হতে-হতে অবিশ্বাস্য রোদের তীব্রতায় মিলিঁয়ে গেল। ভেসে উঠল হলুদ কল্কেফুলের জঙ্গল, নবাবি মসজিদের গম্বুজ, হরিণমারা প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলের সামনেকার ত্রিকোণ শীর্ষভাগ, যাকে হেডমাস্টার বিষ্ণুচরণ রায়-স্যার বলতেন ইতালীয় স্থাপত্যের অনুকরণ —'তুমি হাজারদুয়ারি প্যালেস যদি দেখো থাকো লালবাগ শহরে, দেখবে নবাববাহাদুর হুমায়ুন জাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি।' আসলে আমি তখন ষোলো বছর বয়সের সেই শরীরকে দেখতে পাচ্ছি। আমার সেই মায়া-শরীরকে দেখে বুঝতে পারছি, তার দণ্ডিত ভবিষ্যৎ, তার জঘন্যতম কীর্তিকলাপ, হত্যাকাণ্ড, তার নারীকে ভালোবাসার এবং অবাধ রমণে লিপ্ত হওয়ার সেই সময়টিকে, তার রাজনৈতিক বিদ্রোহ, তার ধর্মকে-লাথি-মারা নাস্তিক্য — সবকিছুই ওই পরাবাস্তবতাময় কুয়াশার মধ্যে মুছে গেছে। ঘণ্টা বাজছে। স্কুলের ছুটির ঘণ্টা। ঘণ্টা বাজছে। দেওয়ান বাবু চৌধুরির হাতির গলার ঘণ্টা। ন্যাংটো, আধন্যাংটো ছেলেপুলে আর তাদের গতরজীবী বাবা-মায়েরা ভিড় করে চলেছে হাতির পেছনে। তারা সুর ধরে ছড়া গাইছে ; 'হাতি তোর গোদা-গোদা পা/হাতি তুই নেদে দিয়ে যা'। আর আমার অবোধ গ্রামীণ সারল্যর্ভরা ষোলো বছর বয়সের হৃদয়টুকু নতুন এক আবেগে মুহুর্মুহু শিউরে উঠছে। তারপর হাতিটি

হাঁটু ভাঁজ করে বসল আর বারুমিয়া দেওয়ান মিটিমিটি হেসে বললেন, আয় শফি! দুরুদুরু বুকে আমি হাতির হাওদায় উঠলে বারুমিয়া আমাকে সামনে বসিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। হাতির মাহুত কী সব আওয়াজ দিতে থাকল। আর বিশাল কালো জন্তুটি উঠে দাড়াল। পৃথিবী দুলতে লাগল। আমার চোখে সেই দুলন্ত পৃথিবী, ইতালীয় স্থাপত্যের অনুকরণ, ভিড়, হইহল্লা, নবাবি মসজিদের গম্বুজ, জমিদার বিজয়েন্দুনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র সৌম্যেন্দুনারায়ণ — যাকে ক্লাসে সবাই হাবুল বলে ডাকত, তার দুচোখের তাচ্ছিল্য পর্যন্ত দুলছিল, কাঁপছিল, দূরে সরে যাচ্ছিল। আর বারুচাচাজি যখন জিগ্যেস করলেন, তোর কি ভয় করছে শফি, আমি জোর গলায় বললাম, না। তখন বারুচাচাজি বললেন, ভয় পাস নে। এ হাতি সেই হাতি নয়। হরিণমারা গ্রাম ক্রমে পিছনে চালচিত্র হতে-হতে ঘন নীল-ধূসর পোঁচে পরিণত হলে একবার জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন চাচাজি ? বারু চৌধুরি বললেন, নেচারের ভেতর।

বারুচাচাজি হাসছিলেন। শফি, এটা কী দেখতে পাচ্ছিস ? বলে হাওদার পাশ থেকে যে লম্বাটে জিনিসটা বের করলেন, শিউরে উঠে দেখলাম সেটা একটা বন্দুক। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, বারুচাচাজির পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে ছাইরঙা হাফ শার্ট, মাথায় শোলার টুপি। অমনি আমার গা ছমছম করল। মনে পড়ছিল, নবাবগঞ্জে থাকার সময় ঠিক এই পোশাকপরা একটি লোককে দেখে গ্রামের সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে মাঠে-বনে-বাদাড়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিদেব কী ভয় না করত লোকেরা!

বন্দুকের নলে আঙুল ছোঁয়াতেই টের পেলাম অসাধারণ ঠাণ্ডাহিম, যদিও সেটা শীতঋতু নয়। তারপর বললাম, আপনি কেন এ পোশাক পরেছেন চাচাজি ?

বারুমিয়া একটু হেসে বললেন, উলুশরার মাঠে বাঘ আছে শুনেছি। তবে বাঘের চেয়ে সাংঘাতিক জানোয়ার কী জানিস ? মানুষ!

অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

আসলে তখনও মানুষ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। বদুপিরের সন্তান হিসেবে যত মানুষ দেখেছি, তারা বিনত, নম্র, মৃদুভাষী। তারা হিন্দু হলে কপালে হাত ঠেকিয়ে 'আদাব' বলেছে, মুসলিম হলে 'সালাম' অথবা 'আস্‌সালামু আলাইকুম' সম্ভাষণ করেছে। আমি লালপাগড়ি মাথায়, খাকিপোশাক পরা পুলিশ দেখেছি, দারোগা দেখেছি। তারা লোকের কাছে যত ভয়াবহ হোক, আমি তাদের কখনও ভয় পাইনি। কারণ তারা কেউ-কেউ আব্বাকে সম্মান জানিয়েছে এবং তাঁর দোয়া-ফোঁকা জলও পান করেছে। এইসব কারণেই আমি বারুচাচাজির কথায় চমকে উঠেছিলাম। আর জবাবে বারুচাচাজি আস্তে আস্তে বললেন, আমি নবাববাহাদুরের দেওয়ান জানিস তো ? মহলে-মহলে গিয়ে নায়েবদের খাজনার তহবিল জমা নিই। এই হাওদার তলায় সেইসব টাকাকড়ি আছে। তাই কয়েকবার ডাকাতরা হামলা করেছিল।

হ্যাঁ, ডাকাতরা সাংঘাতিক মানুষ আমি জানতাম। তাই চুপ করে থাকলাম। এই সুবিশাল কালো জানোয়ার আর এই ঠাণ্ডাহিম বন্দুকের নল ডাকাতদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভেবে ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। কিন্তু এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, হাতির

সামনে চলেছে জোব্বা ধরনের পোশাকপরা, কোমরে একটা চওড়া বেল্ট্‌আঁটা, মাথায় পাগড়িবাঁধা একটা লোক। লোকটার কাঁধে একটা বল্লম। তার প্রকাণ্ড গোঁফ আর গালপাট্টা। তাকে দেখিয়ে জিগেস করলাম, ও কে চাচাজি ?

'সাতমার'। বাবুচাচাজি বললেন, ওদের সাতমার বলে। ওর নাম কী জানিস, কাল্লু পাঠান। ওকে আমি উল্লু পাঠান বলি। বাবুচাচাজি হাসতে লাগলেন। লালবাগের পিলখানায় ওর ডেরা। লোকটা যেমন বোকা, তেমনি বদমায়েশ। ওর বিবি হল তিনটে। ছোটোবিবির বয়স মোটে বারো।

বাবুচাচাজি এত জোরে হেসে উঠলেন যে সাতমার কাল্লু পাঠান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, হুজৌর ?

কুছ নেহি ! তুম আপনা কদম বাঢ়াও।

বললাম, ও বাঙলায় কথা বলতে পারে না ?

জবাবটা দিল কাল্লু পাঠানই। বুঝলাম তার কান তীক্ষ্ণ। সে সহাস্যে বলল, কুছু-কুছু পারে হুজৌর !

ঢালু হয়ে ধাপে-ধাপে নেমে গেছে উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের বিস্তীর্ণ মাঠ। একটা সংকীর্ণ রাস্তা নেমে গেছে নিচের দিকে। দূরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম নীল-ধূসর সেই উলুকাশের বন। একদিন যার মধ্যিখান দিয়ে আমরা মৌলাহাটে এসে পৌঁছেছিলাম। আমার ইচ্ছে করছিল, বাবুচাচাজিকে সেই কালোজিন-শাদাজিনের গল্পটা বলি। কিন্তু সেই মুহূর্তে উনি মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, তুমি জিগ্যেস করছ না শফি, হঠাৎ আমি কোথা থেকে এসে তোমাকে কেন আচমকা তুলে নিলাম !

ওঁর দিকে ঘোরার চেষ্টা করে বললাম, হাতির পিঠে বসে থাকতে ভালো লাগছে না ! এত দুলছে !

আমাদের দুজনের প্রশ্নোত্তর সেদিন এমনি অসংলগ্ন ছিল যেন। কিংবা আমরা পরস্পর ঠিক প্রশ্নের ঠিক উত্তরই দিচ্ছিলাম — বুঝি না। বাবুচাচাজি বললেন, হুঁ। তুমি কি শুনেছ তোমার বড়ো ভাই বাড়ি এসেছে ?

চাচাজি, ফেরার সময় মৌলাহাট হয়ে এলে—

শফি, তোমার—মানে তোমাদের দুভাইয়ের, নুরুজ্জামান আর শফিউজ্জামানের শাদির ইন্তেজাম হয়েছে, জানো ?

চাচাজি, বড়ো ভাই মুখে লম্বা-লম্বা দাড়ি রেখেছে নিশ্চয় ?

শফি, হেসো না। বাবু চৌধুরির কণ্ঠস্বর ক্রমশ ভরাট হয়ে উঠেছিল। আমি দরিয়াবানুকে খুব বোঝালাম। ওকে তো জানো, বড্ড গোঁধরা মেয়ে। তোমার বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে রোজির আর তোমার সঙ্গে বুকুর শাদির কথা পাকা হয়ে গেছে। আগামী সাতুই অঘ্রাণ শুক্রবার তোমাদের শাদি।...

হাতি একটা সংকীর্ণ সোঁতা পেরুচ্ছিল। সাতমার কাল্লু পাঠান জোব্বা গুটিয়ে পায়ের নাগরাজুতো খুলে হাস্যকর ভঙ্গিতে জল পেরুচ্ছিল। ওপারে কয়েকটুকরো ধানখেতের ভেতর হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে থাকা দুটি লোক মাথা কাত করে হাতি দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছিল। একঝাঁক বুনো হাঁস সোঁতার জল থেকে শনশন করে উড়ে ফুলন্ত কাশবনের ওপর দিকে ঘননীল আকাশে মিশে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কোথায় ডাকছিল একলা কোনও হট্টিটি পাখি ট্টি ট্টি

ট্রি...ট্রি ট্রি ট্রি। আর আমি দেখছিলাম এইসব নানারঙের নানা ঘটনার টানাপোড়েনে গাঁথা বারু চৌধুরির 'নেচার'কে কেউ বা কিছু এক অগাধ বিষাদে আচ্ছন্ন করে আছে। কুয়াশার মতো বিস্তৃত সেই বিষাদ, হরিণমারার জমিদারবাড়ির চত্বরে শোনা বেহুলা-লখিন্দর যাত্রাপালার আসরে চারুমাস্টারের বেহালার বাজনার মতো গম্ভীর-করুণ এক সুর। ওই ধারাবাহিক ট্রি ট্রি ট্রি...ট্রি ট্রি ট্রি হট্টিট্টি পাখির ডাকে কি নীল আকাশজোড়া শূন্যতারই কণ্ঠস্বর ? যেকারণে কাল্লু পাঠানের সোঁতাপেরুনো এবং দুই আধন্যাংটো চাষার ভঙ্গিও আমাকে শেষ পর্যন্ত হাসাতে ব্যর্থ হল ?

আর বারুচাচাজি কথা বলছিলেন ষড়যন্ত্রসংকুল কণ্ঠস্বরে।....এ হতে পারে না শফি ! তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে মুসলমানকে। তুমি নিশ্চয়ই স্যার সৈয়দ আহমদের কথা পাঠ্য বইতে পড়েছ। দেওবন্দ যেখানে তৈরি করছে ছদ্মবেশী ভিখিরির দল, সেখানে আলিগড় তৈরি করছে নয়া জামানার প্রতিনিধিদের। কেন ছদ্মবেশী ভিখিরি বলছি, বুঝতে পারছিস তো শফি ? তুই মৌলানাবাড়ির ছেলে। তুই বুদ্ধিমান। তোর বোঝা উচিত, এভাবে অন্যের দান হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকাটা মনুষ্যত্বের অবমাননা। নুরুজ্জামানকে আমি বুঝিয়েছি। তাকে বলেছি, এটা ইসলামের প্রকৃত পন্থা নয়। নুরুজ্জামান মহা তর্কবাগীশ হয়ে ফিরেছে। কথায়-কথায় সে কোরানহাদিশ কোট করে। কিন্তু এটুকু বোঝে না, মুরিদ(শিষ্য)দের ওটা ভক্তি নয়, আসলে দয়া। শফি, তোর আব্বাও এটা হয়তো টের পান। তাই তোকে ইংরেজি স্কুলে পড়তে দিয়েছেন। তোর আব্বার মধ্যে বড্ড বেশি পরস্পর-বিরোধিতা। তিনিই বলেন, হিন্দুস্থান মুসলমানের 'দারুল হারাব', আবার তিনিই পয়গম্বরের কথা আওড়ান ; 'উতলুবুলইল্‌মা আলাওকানা বিস্ সিন'। এলেম বা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন মুলুকে যেতে হলেও চলে যাও। না শফি, নুরুজ্জামানকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তোকে আমি আবিষ্কার করেছি — তোকে আমি হারাতে চাই না। তোকে আমি নিয়ে পালিয়ে যাব লালবাগ শহরে। নবাববাহাদুরকে বলে তোকে ওঁদের 'নবাববাহাদুর ইনসটিটিউশনে' ভরতি করে দেব। ওটা ওঁদের পারিবারিক স্কুল। বাইরের ছাত্রদের নেওয়া হয় না। তবু আমি ওঁকে রাজি করাব। শফি, তুই এখনও নাবালক। শাদি দিলে তোর লেখাপড়া কিছুতেই হবে না, বাবা !

কাশবনের ভেতর থেকে দুটো শামুকখোল উড়ে গিয়ে একলা-দাঁড়ানো একটা নিষ্পত্র গাছের ডালে বসলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, চাচাজি ! শামুকখোল মারবেন না বন্দুকে ?...

পরে বুঝতে পেরেছিলাম, দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরি কেন সেদিন আমাকে হাতির পিঠে চাপিয়ে উলুশরার জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতি বিলাসী মানুষটি প্রকৃতির ভেতরে গিয়ে আমাকে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলেন গোপনে। কারণ তিনিই জানতেন, প্রকৃতিই মানুষকে প্রকৃত গোপনীয়তা দিতে পারে।

কিন্তু রুকু — দিলরুখ, তাকে ওই ষোলবছর বয়সের কী দুর্দান্ত ভালোবেসে ফেলেছিলাম, তা তো বারুমিয়া জানতেন না। আমিও প্রথম-প্রথম জানতাম কি ? হরিণমারার কাজি হাসমত আলির বাড়িতে থেকে প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলে পড়ছি। তাঁর দহলিজঘরে আমার আস্তানা। তক্তাপোশে বিছানা পাতা। তাকে বই। দেয়ালে

মক্কা-মদিনাব ছবি সাঁটা। আব যে-স্বর্গীয বাহন পযগম্ববকে সাত আসমানেব পবে আল্লাব সামনে পৌঁছে দিযেছিল, তাবও একটি ছবি ছিল। বাহনটিব নাম বোববাখ। তাব মুখ সুন্দবী নাবীব, শবীব পক্ষিবাজ ঘোডাব। তাব চুলগুলো ছিল এলিযে পডা। আমি তাব মুখে বুকুকে দেখতাম। দিনেব পব দিন দেখতে-দেখতে ওই মুখ বুকুব মুখ হযে উঠেছিল। আমাব বুক ঠেলে আবেগ আসত। মনে হত, কেঁদে ফেলি। বুকুকে দেখাব জন্য অস্থিব হতাম। ছটফট কবতাম। তাকে স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম সে আমাব সঙ্গে কথা বলছে না। বাগে-দুঃখে আমাব ইচ্ছে কবত তাকে প্রচণ্ডভাবে মাবি। আব একবাতে দেখলাম, তাকে কববে শোযানো হচ্ছে। কে যেন বলছে, শফি, তুমি ওকে শেষ দেখা দেখে নাও, এবং সে কববে শোযানো শাদা কাফনপবা বুকুব মুখেব কাপড সবিযে দিলে আমি চিৎকাব কবে উঠলাম। আমাব পাশে শুত হাসমত সাহবেব ছেলে আমাব সহপাঠী ববিউদ্দিন -- ববি যাব ডাকনাম। সে বলত, তোমাব পেছনে জিন লেগেছে শফি। বোজ বাতে তুমি খোযাব দেখে গোঙাও। তোমাব আব্বাজানেব কাছে তাবিজ নিযে এসো।

এই ববিই আমাকে সঠিকভাবে যৌনতা চিনিযে দিযেছিল। প্রতি বাতে সে অশ্লীল গল্প কবত। আমাব গোপন অঙ্গটি দেখতে জববদস্তি কবত। ব্যর্থ হলে নিজেবটি দেখাত। সে আমাকে জঘন্যতম অনুবোধ জানাত। সাধাসাধি কবত। আমি একবাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে টেব পেযেছিলাম, সে আমাব শবীবেব একটি অঙ্গ নিযে কিছু কবতে চাইছে। আমি তাকে ধাক্কা মেবেছিলাম। সেই প্রথম আমি কাউকে আঘাত কবি শাবীবিকভাবে। কিন্তু দিনে ববি ছিল অন্য ছেলে। স্কুলে হিন্দু ছেলেদেবই সংখ্যা বেশি। তাদেব সঙ্গে একমাত্র তাবই মাখামাখি ছিল। ক্রমশ ববিব মাবফত হিন্দু ছেলেদেব সঙ্গে আমাব ভাব হযেছিল। আব ববিই আমাকে প্রথম বিডি ফুঁকতে শেখায। স্কুলেব পেছনে একটা মন্দিব ছিল। মন্দিবটা ছিল ভেঙে পডা অবস্থায। ঘন কল্কেফুলেব জঙ্গলেব ভেতব সেই ভাঙা কালীমন্দিবেব পেছনে ববি বিডি ফুঁকতে যেত। কযেকটি হিন্দু ছেলেও যেত। দলবেঁধে সবাই বিডি টানত। বাঘ যেমন নাকি মানুষেব বক্তেব স্বাদ পেলে মানুষখেকো হযে ওঠে, আমিও ক্রমশ প্রচণ্ড বিডিখেকো হযে উঠেছিলাম। মাঝে-মাঝে ভয পেযে ভাবতাম, আব্বাব অনুগত কোনও জিন যদি এ গোপন খবব ওঁব কানে তোলে, আমাব একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে।....

উলুশবাব মাঠ থেকে সেদিন আমাকে বাবুচাচাজি হাসমত সাহেবেব বাডিব সামনে পৌঁছে দিলে আমাব খাতিব বেডে গিযেছিল ওবাডিতে। কিন্তু বাবুচাচাজি চলে যাওযাব পবই আমাব বুকেব ভেতব একটা ঝড বইতে লাগল। বুকুব সঙ্গে আমাব শাদি হবে ? এ কি সত্যি ? বুকু আমাব বউ হবে এবং সে আমাব পাশে শোবে এবং আমি তাকে — এ কি সত্যি হতে পাবে ?

সে কি কাম ? নাকি প্রেম ? ববিকে সে-বাতে কথাটা বলামাত্র সে দাবুণ উত্তেজিত হযে উঠেছিল। জঘন্যতম সব ব্যাপাব সে আমাকে হাতেনাতে শেখাতে চাইল, আব আমি আত্মসমর্পণ কবলাম। কিছুক্ষণ পবেই আমি চমকে উঠলাম। লজ্জায সংকোচে কাঠ হযে গেলাম। বুকুব সঙ্গে আমি এসব অশালীন কিছু কবব ভাবতেই খাবাপ লাগল। মনে-মনে মিনতি কবে বললাম, বুকু। তুমি মাযেব কাছে শোনা সেই আকাশচাবিণী পবি, বাডিব পিছনে তালগাছে যে মধ্যবাতেব জ্যোৎস্নায

বিশ্রাম নিতে বসত আর খড়খড় সরসর শব্দে তালের বাগড়াগুলো নড়ত। বুকু সেই পরি, যার বাসস্থান আকাশের দ্বিতীয় স্তরের পরিস্তানে, যেখানে ফুটে আছে লক্ষকোটি নক্ষত্র দিয়ে গড়া প্রলম্বিত ছায়াপথ।....

খানবাহাদুর দবিরউদ্দিন চলে যেতেই আমি যে খোলামেলা পৃথিবীকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেলাম, সেখানে মানুষের গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো নিস্ফল। দবিরউদ্দিন আমাকে কলকাতার উচ্চ আদালতে আপিলের খবর এনেছিলেন। আমি তাঁকে মনে-মনে গাল দিয়ে বললাম, শুওরের বাচ্চা! ইংরেজশাহির পা-চাটা গোলাম কুত্তা! আমাকে কেউ ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারে না, তুমি জানো না?

এই যে অবাধ দুনিয়ার হাট করে খোলা দরজা দিয়ে আমি ছুটে চলেছি, আমার ষোলো বছর বয়সের শরীরটাকে ফিরে পেয়েছি, আমার এই স্বাধীনতা প্রকৃতি থেকে আমার বুকের ভেতর ঢোকানো হয়েছিল। খানবাহাদুর, তুমি মাথামোটা এক খয়েরখাঁ। তুমি যে এত ধর্ম-ধর্ম করো, সব তোমার শেখা বুলি। পয়গম্বরের ছেলেবেলার একটি গল্প বলতেন আব্বা। বালক পয়গম্বর যখন রাখাল ছিলেন, হঠাৎ সেই উপত্যকায় নেমে এল দুই ফেরেশতা। তাঁকে ধরে ফেলল তারা। চিত করে শোয়াল। তারপর তাঁর বুক চিরে ফেলে তাঁর কলজে থেকে অসৎ টুকরোটি কেটে নিয়ে সৎ এবং স্বর্গীয় একটি টুকরো জুড়ে দিল! এ একটি শল্যচিকিৎসা। ফেরেশতারা উধাও হয়ে গেলে সঙ্গী রাখাল বালকেরা আতঙ্কিত হয়ে খবর দিল পয়গম্বরের ধাইমা বিবি হালিমার কাছে। বিবি হালিমা ছুটে এসে দেখলেন, বালকটি শুয়ে আছে। কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই তার বুকে। আর এই ঘটনার নাম 'সিনা-চাথ্' বা বক্ষবিদারণ। দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরী একটি বিশাল কালো জানোয়ারের পিঠে চাপিয়ে উলুশরার তৃণভূমিতে আমাকে নিয়ে যেন এমন কিছুই করেছিলেন এবং আমার কলজে আমারই অজান্তে বদলে গিয়েছিল। আমার 'সিনা-চাথ্' বুঝতে আরও তিরিশ বছর লেগে গিয়েছিল। আমি বুঝতেই পারিনি আমি কী হয়ে গেছি সেদিন থেকে। অথচ রবিউদ্দিনের সঙ্গে রাতভর দিনভর খালি বুকুর কথা বলেছিলাম। কালীমন্দিরের পেছনের কল্কেফুটের জঙ্গলে বিড়ি টানতে-টানতে বলেছিলাম, বুকুর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে আমি ওসব কিছু করতে পারব না, রবি! আর রবি খি-খি করে হেসে বলেছিল, তোর আব্বাজান তো পির-মৌলানা মানুষ! একজোড়া জিন-পরি পাঠিয়ে দেবেন তোকে হাতে-কলমে শেখাতে। তোর আবার ভাবনা?

হরিণমারার মুসলিমরা ছিল হানাফি সম্প্রদায়। তারা কেউ কেউ আব্বাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত। রবিও করত। কিন্তু তার বাবা খোন্দকার হাসমত আলি ছিলেন আব্বার অনুরাগী মানুষ। লম্বাটে চেহারার এই মানুষটির চিবুকে ছিল ছাগলদাড়ি। মাথায় সব সময় তুর্কি ফেজটুপি পরে থাকতেন। লাল কৌটো-গড়নের টুপিটার শীর্ষে ছিল কালো মাদুলির মতো দেখতে একটুকরো গালা আর তা থেকে ঝুলত রেশমি কালো একগুচ্ছ সুতোর ঝালর। বিনীত, মৃদুভাষী এই লোকটি প্রথম দিন থেকেই আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তার বংশ-পদবি ছিল খোন্দকার। তিনি ছিলেন উচ্চবর্ণীয় আশরাফ, যাঁদের মিয়াঁ বলাই মুসলিমদের মধ্যে রেওয়াজ। হিন্দুরা অজ্ঞতাবশে মুসলিমমাত্রেই মিয়াঁ বলেন দেখেছি। বারুচাচাজি বলতেন, মিয়াঁ বা মিঞা

কথাটা ফারসি। এর মানে হল মধ্য। সমাজের মাঝখানে যারা আছে। কিন্তু জেনো শফি, এই মাঝখানে-থাকা লোকগুলোর মতো বদমাইশ দুনিয়ায় আর থাকতে নেই। এরা গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়। এই যে 'খোন্দকার'-সায়েবকে দেখছ, আমার কথা মানেন-গোনেন, ভয়-ভক্তি করে চলেন, তার কারণ কী জানো? উলুশরার নাবাল মাঠে নবাববাহাদুর যে ঘের (বাঁধ) তৈরির আরজি মনজুর করেছেন, তার মূলে আমি। আর খোন্‌কার আছেন তদ্বিরে, চাষাভুষো গরিব-গুরবোর ইস্তফা-দেওয়া ভুঁইখেত সামান্য সেলামিতে যাতে পেয়ে যান। ঘের হলে উলুশরার মাঠে ফসল ফলবে। নবাবের খাজাঞ্চিখানা উঠবে ভরে।

জমিজমা ভুঁই-খেত এসব আমি তখনও বুঝতাম না। আব্বা গর্ব করে বলতেন, মাটি নিয়ে দুনিয়াদারি আমাদের নয়। খোদাতালা'র দুনিয়ায় সব ছেড়ে শুধু মাটি মেপে বেড়ায় যারা, তারা গোনাহগার পাপী। সেই পাপেই মুসলমানের বাদশাহি বরবাদ হয়েছে। খোনকারসায়েব তাঁর ছাগলদাড়ি মুঠোয় চেপে যখন ছড়ি-হাতে মাঠের জমির আলে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমার মনে হত, আব্বা যদি এখন ওঁকে দেখতেন, কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতেন।....

বাবুচাচাজি আমার কানে ফুসমন্তর দিয়ে চলে যাওয়ার কদিন পরেই দুখু নামে একটি লোক এল মৌলাহাট থেকে। শীর্ণকায় এই খেতমজুরটি ছিল ভারি আমুদে। সে মুচকি হেসে যখন বলল, হুজুর তলব দিয়েছেন, তখনই আমি সতর্ক হলাম। আমার চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। আস্তে বললাম, কদিন পরেই স্কুলে পুজোর ছুটি পড়বে। তখন যাব।

দুখু চোখ নাচিয়ে বলল, সে যখন যাবেন, তখন যাবেন। হুজুর বলেছেন, আপনার আম্মাজানও বলেছেন — পইপই করে বলেছেন, একবেলার জন্য যেতেই হবে। আমাকে ধরে আনতে হুকুম জারি হয়েছে, বাপজি!

শরৎকালের বিকেলে বাদশাহি সড়কের ধারে ক্লাস সিক্সের কজন বন্ধু মিলে আমরা রোজ গিয়ে বসে থাকতাম। রবি, কালীচরণ, বিনোদ আর পোদো। পোদোর আসল নাম ছিল হরেন। কালোরঙের মারকুটে চেহারার পোদো দুখুকে চোখ পাকিয়ে বলল, শফির বাবাকে গিয়ে বলো, শফি বিয়ে করবে না। শালা! গুয়োর ডিম ভাঙেনি, এখনই মেয়েমানুষের পাশে শোবে!

শোনামাত্র আমি চমকে উঠলাম। রবি তাহলে কথাটা রটিয়ে দিয়েছে! তখন স্কুলেপড়া ছাত্রদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এমন কী, বিনোদেরও বিয়ে হয়েছে। সে ময়রাবাড়ির ছেলে। বয়সে সবার বড়ো। সে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। দুখুও খিক-খিক করে বেজায় হাসল। বলল, বাবুমশাই, তা বললে কি চলে? গাঁ জুড়ে রোয়াব উঠেছে, পিরসাহেবের ছেলেদের বিহা।

পোদো আমার গোপন অঙ্গে খামচে ধরে বলল, কী রে? বিয়ে করবি? ছিঁড়ে ফেলব — বল্, করবি?

আমি জোরে মাথা নেড়ে, কিন্তু মুখ নামিয়ে বললাম, না।

দুখু বেগতিক দেখে গোমড়ামুখে বলল, সেটা পরের কথা! হুজুর যখন ডেকেছেন, তখন একবার চলুন। মাজান বড়ো কাঁদেন আপনার জন্য। আর আয়মনি — আয়মনিও কেঁদে 'বিয়াকুল'। বলে আহা, চোখের ছামু থেকে ছেলেটা দূর হয়ে গেল গো!

হঠাৎ আমার মনে হল, বুকু কি কিছু বলে না ? কোনো কথা বলে না কারুর কাছে ? সড়কের দুধারে অপার সবুজ ধানখেত। সাঁকোর ধারে আমরা বসেছিলাম। নিচে স্বচ্ছ জলেভরা কাঁদর। দিনের শেষ আলোয় সবকিছুর ভেতর বুকুকে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম। উত্তরদেশের গাড়োয়ানদের যে দলটি সার বেঁধে গোরুর গাড়ি নিয়ে একটু আগে সাঁকো পেরিয়ে গেছে, তাদের একজনের গান তখনও ভেসে আসছিল দূর থেকে। হরিণমারার জমিদারবাড়ির সিংহবাহিনীর মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজতে থাকল। মুসলিমপাড়ার প্রাচীন নবাবি মসজিদের শীর্ষ থেকে 'মোয়াজ্জিনে'র আজানধ্বনি ভেসে এল। আর দুখু শেখ ব্যস্ত হয়ে কাঁদরের জলে অজু করে নমাজে দাঁড়াল। তার বিস্মিত আর বিচলিত চাউনি দেখে বুঝতে পারছিলাম, পিরসাহবের ছেলেকে তার পাশে নমাজে আশা করেছিল। কিন্তু শেষে হতাশ হয়ে নমাজ পড়তে থাকল। রবি চাপা গলায় বুকু আর আমার সম্পর্কে অশালীন কথা বলতে থাকল বন্ধুদের সঙ্গে। সে কি নিছক কাম ? সে কি প্রেম ? আমার চারপাশ থেকে প্রতিবিম্বিত বুকু হাতছানি দিল। তার মেয়েলি চুলের গন্ধ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবার, যে গন্ধ সে কাছে এসে দাঁড়ালেই ঝাঁঝাল হয়ে নাকে ঢুকেছে এবং কী এক প্রক্ষোভে জর্জরিত হয়েছে আমার আমূল অস্তিত্ব। দুখু নমাজ শেষ করে টুপিটি ভাঁজ করে ফতুয়ার পকেটে গুঁজে আমার কাছে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। রবি বলল, রাত্তিরটা থাকিস। কালীচরণ আর বিনোদ খ্যা-খ্যা করে হাসতে থাকল। শুধু পোদো বলল, মরবি শফি, মারা পড়বি।....

মৌলাহাটে পৌঁছেই দুখু আমাকে প্রথমে মসজিদে আব্বার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন 'এশা'র নমাজ চলেছে। নমাজের প্রতি ততদিনে আমার গরজ কমে গেছে। দুখু মসজিদে ঢুকে চত্বরের চৌবাচ্চায় অজু করতে ব্যস্ত হলে আমি সেই সুযোগে কেটে পড়লাম। সোজা বাড়ি গিয়ে ঢুকলাম। ডাকলাম, মা ! তারপরই শুধরে নিয়ে ডাকলাম, আম্মা !

দেখলাম, মা বারান্দায় সবে নমাজ শেষ করে 'মোনাজাত' — করজোড়ে প্রার্থনা করছেন। একটু তফাতে একটা লম্ফ জ্বলছে। রান্নাঘরের বারান্দাতেও একটি লম্ফের সামনে বসে মেজোভাই মনি দুলছে আর আঙুল চুষছে। তার মুখের দুপাশ লালায় ভেসে যাচ্ছে। তার গালে দাড়ি গজিয়ে গেছে। সে আমাকে দেখে অদ্ভুত গোঙানো গলায় যখন বলে উঠল, ছফি ! তখনই আমার চমক লাগল। আব্বার অনুরক্ত জিনেরা কি তাহলে একদিন মনিভাইয়ের ভেতরকার কালো জিনটিকে তাড়াতে পেরেছে ?

ঘরের ভেতর থেকে দাদি-আম্মার সাড়া পেলাম, কে রে ? নুরু ?

না দাদি-আম্মা ! আমি।

শফি ! পক্ষাঘাতগ্রস্তা বৃদ্ধা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। খুশি ফেটে পড়ছিল তাঁর কণ্ঠস্বরে। ঘরে ঢুকে তাঁর 'কদমবুসি' — পদচুম্বন করামাত্র তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন। হেসে-কেঁদে বৃদ্ধা অস্থির। তারপরই দেখতে পেলাম দরজার সামনে দাঁড়ানো এক ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তিই। মাকে চিনতে পারছিলাম না। সে যেন মায়েরই বিকৃত এক

প্রতিরূপ। কোটরগত চোখ, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, বসা গলা, সরু নাকটিও নেতিয়ে গেছে। পরনে যেমন-তেমন একটা শাড়ি। উঠে এসে কদমবুসি করলে বুকে চেপে ধরলেন। বুকের স্পন্দন অনুভব করলাম। সেই মুহূর্তে দাদি-আম্মা সহাস্যে বলে উঠলেন, তোমার ব্যাটার মুখে বদ্‌বু (দুর্গন্ধ) নিকলাচ্ছে, বউবিবি! ওকে পুছ করে দ্যাখো, বিড়ি-তামুক খেতে শিখেছে ইস্কুলে!

দাদি-আম্মা খুব হাসতে থাকলেন। মা কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। দেখলাম, ঘরখানিতে অনেক বদল ঘটেছে। তক্তায় রাখা আব্বার আরবি-ফারসি কেতাবের স্তূপটি নেই। সেখানে নতুন কিছু তোরঙ্গ আর বেতের পেটরা রয়েছে। তক্তাপেশের বিছানাটি নতুন বলে মনে হল। আলনায় কিছু নতুন শাড়ি ঝুলছে। মা আমাকে নিয়ে বিছানায় বসলেন। তাঁর চোখে জল ছিল। মুছে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, তুই-ও আমাকে ভুলে গেলি, বাছা?

মনে-মনে বললাম, ভুলিনি আম্মা! মুখে বললাম, স্কুলে খুব পড়ার চাপ।

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন, নুরু এসেছে খবর পেয়েছিস?

হুঁ। বারি-চাচাজি বলছিলেন।

নুরু 'ফাজিল' হয়েছে। মায়ের মুখে ঈষৎ গর্বের রেখা ফুটে উঠল কথাটা বলতে।

'ফাজিল' ইসলামি শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি। কিন্তু আমি তাচ্ছিল্য করে বললাম, বড়োভাই এবার খুব ফাজলেমি করে বেড়াবে দেখবেন!

মা ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ছিঃ! বড়োভাই সম্পর্কে আদব-লেহাজ করে কথা বলতে হয়।

বড়োভাই বুঝি মসজিদে?

মা মাথা নাড়লেন। তারপর একটু হেসে বললেন, তোদের দু-ভাইয়ের শাদির ইন্তেজাম হয়েছে। দরিয়াবানুরই জেদ। তোর আব্বাসাহেবও মত দিয়েছেন।

মায়ের একটা চোখ ছিল রান্নাঘরের বারান্দার দিকে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। দেখলাম, মনিভাই লম্পটার দিকে ঝুঁকে ফুঁ দিচ্ছে। মা 'অই! অই!' বলে তার হাত থেকে লম্প কেড়ে নিলেন। তারপর ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম মনিভাইয়ের কাঁধ ধরে টানতে-টানতে নিয়ে আসছেন। মনিভাই টলোমলো পা ফেটে হেঁটে আসছে। এঘরে ঢুকেই সে মেঝেয় বসে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে লাগল। মা আমার পাশে বসে একটু হেসে বললেন, মনির আমার খানিক-খানিক হুঁশবুদ্ধি ফিরেছে।

গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে বললেন, ফের, খবরদার বাবা, তোর আব্বা যেন জানতে না পারেন। দরিয়া-আপার কথায় খোঁড়াপিরের মাজারে গিয়ে সিন্নি চড়িয়েছিলাম। অমনি মনি আমার—

মা! আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

মা বললেন, চুপ। চুপ। দেওয়ালের কান আছে।

আমরা ফরাজি না?

মায়ের মুখে একটা কালো ছাপ পড়ল। ঠোঁট বেঁকে গেল। হিশ-হিশ করে বললেন, এতকাল দুনিয়া জুড়ে পিরদের সঙ্গে জেহাদ করে এবার নিজেই পির সেজে

বসেছেন! মসজিদে রাতের বেলা জিনপরি এসে খিদমত (সেবা) করছে। তাই হুজুরের আর বাড়ি আসা হয় না। ফরাজি! আহলে হাদিস! লা-মজহারি! মোহাম্মদি! তারপর কি না ওহাবি। মুখে কতরকম বুলি! এদিকে—

হঠাৎ মা আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠলেন। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। একটু পরে বললাম, আপনি কাঁদছেন কেন আম্মা?

মা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আয়। ইঁদারার পানি তুলে দিই। হাত-পা ধো!

মা বেরিয়ে গেলেন, তখনও আমি বসে আছি। কিছু বুঝতে পারছি না। তারপর মনিভাইয়ের দিকে চোখ পড়ল। সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। মুখে কেমন একটা হাসি। তারপর সে দুইহাতের আঙুল দিয়ে মিথুন-সংকেত দেখাতে লাগল। এই সংকেতটি খয়রাডাঙার স্কুলে পড়ার সময় আবু নামে এক সহপাঠীর কাছে প্রথম দেখি। মনিভাইয়ের এমন কাণ্ড দেখে লজ্জায়-রাগে-ঘেন্নায় দ্রুত বেরিয়ে গেলাম।

উঠোনের জীর্ণ ইঁদারাটি মেরামত হয়েছে। লম্পের সামান্য আলোয় বাড়িটা নতুন দেখাচ্ছিল। মা নিজেই আমার হাত-পা ধুয়ে দিলেন। দিতে-দিতে বললেন, দেখছিস কত গাঁদাফুলের ঝাড় হয়েছে। সব আয়মনির কাণ্ড। একটু আগে খবর নিতে এসেছিল শফি এল নাকি। সবচেয়ে ওর খুশিটাই বেশি, জানিস? বলে কী, পিরসাহেব তো মসজিদে। আমরা ঢোলক বাজাব, শাদিতে নাচব। গীত গাইব। সং দেব। পিরসাহেব শোনে তো শুনুক। ফরাজি হয়েছি তো কী হয়েছে? 'পুরুষান' (পুরুষানুক্রমে) যা হয়ে এসেছে মৌলাহাটে, তা না হলে চলে?

মা অনর্গল এসব কথা বলছিলেন। কিন্তু আমি শুনতে চাইলাম বুকুর কথা। বুকু কী বলছে? বুকু কি আগের মতো আসছে আমাদের বাড়িতে? বুকু কি খুশি হয়েছে?

মা ওসব কথা কিছুই বললেন না। আঁচল দিয়ে আমার পা, হাত, মুখ মুছিয়ে কাঁধ ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর বাইরে কেউ গম্ভীর গলায় বলে উঠল, আম্মাজি! স্বরটা চেনা মনে হল। কিন্তু আব্বার চেয়ে গম্ভীর আর প্রতিধ্বনিময় সেই কণ্ঠস্বর। আবার সে বলল, শফি এসেছে শুনলাম। কই সে? তারপর দরজায় একজনকে দেখতে পেলাম। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

ঝকমকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখে কালো দাড়ি। মাথায় ফেজ টুপি। পরনে ঘিয়ে রঙের আচকান। পায়ে নাগরা জুতো। এই কি আমার বড়োভাই নুরুজ্জামান? মা আমাকে ঠেলে দিয়ে বললেন, বড়োভাইয়ের সঙ্গে আদব-লেহাজ করতে হয় জানো না? ছিঃ!

আমি ওঠার আগেই নুরুভাই এসে আমাকে আলিঙ্গন করল। বলল, তু কিতনা বাঢ় গিয়া, শফি? তুমকো হাম পছানতাভি নেহি!

মা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, ওই জবানে বাতচিত আর করিস না বাবা! ওই খোট্টামি শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।

নুরুভাই হাসতে-হাসতে বলল, মুসলমানের জবান, আম্মাজান! তারপর আমার পাশে বসে বলল, তুই নাকি ইংরেজি ইস্কুলে পড়ছিস? আব্বাজানকে বললাম, ইয়ে ক্যা কিয়া আপনে? আব্বাজানের বাত সমঝ করা গেল না। কে

এক নবাববাহাদুরের দেওয়ানসাব নাকি তেনাকে কীসব সমঝেছেন, আব্বাজান তাঁর ফাঁদে পড়ে — তো শফি, তোর চেহারায় হিঁদুর ছাপ পড়েছে। তুই কি ইস্কুলে ধোতি-উতি পিঁধিস, নাকি পায়জামা-কুর্তা পিঁধিস ?

আস্তে বললাম, হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরে স্কুলে যেতে হয়।

নাউজুবিল্লাহ্! নরুভাই বলল। অবশ্য সে হাসছিল। তোকে আব্বাজান—

না। বারিচাচাজি কিনে দিয়েছেন।

উও কৌন ? কে সে ?

মা বললেন, সেই তো দেওয়ানসাহেব। দরিয়া-আপা — মানে তোদের হবু শাশুড়ির দেওর হন তিনি। হাতিতে চেপে মহালে-মহালে ঘোরেন। ওনাকে তুই চিনিস নে, নুরু! উনি ইংরেজিপাস পণ্ডিত। হিঁদুরাও ওনার কত কদর করে জানিস ?

নুরুভাই একটু গম্ভীর হয়ে বলল তো ঠিক হ্যায়। নসিব আপনা-আপনা। আম্মাজান, ভুখ লেগেছে। জলদি খানা নিকালেন। অনেকবছর পরে দুভাই পাশাপাশি বসে খাই। দেওবন্দের মেহমানখানায় (অতিথিশালা) খেয়ে মু খারাব হয়ে গিয়েছে। শফি, তুই নাকি কার বাড়ি 'জায়গির' আছিস ?

মা বলে গেলেন, খোনকারসাহেবের বাড়ি। খবর নিয়েছি, ওনারা শরিফ ঘর।

নুরুভাই ঘোষণা করল, আল্লার দুনিয়ায় শরিফ-নিচ, আশরাফ-আজলাফ কিছু নাই। সবাই আল্লাহতায়লার বান্দা। দুনিয়ায় কোথাও ইসলামে এ জিনিস নাই। খালি হিন্দুস্তানের মুসলমান হিঁদুদের দেখে জাত-বেজাত শিখেছে। মুসলমান 'কুফ্‌রি কালাম' (নাস্তিক্যমূলক বিদ্যা) পেয়েছে হিন্দুস্তানে এসে। সব মানুষ সমান। আমরা সবাই বনি-আদম (আদমবংশধর)।

নুরুভাইয়ের এই কথাটাই এতক্ষণে ভালো লাগল।...

বারুচাচাজি বলতেন, 'ইসলাম ইজ দ্য ড্রাসটিক ফরম অব ক্রিসটিয়ানিটি' বলে একটা কথা চালু আছে, জানিস শফি ? তো তোর বড়োভাই মৌলানা নুরুজ্জামান ইজ দা ড্রাসটিক ফরম অব ইওর ফাদার মৌলানা বদিউজ্জামান! পিতৃনিন্দা শুনে রাগ করলি না তো ? নিন্দাছলে স্তুতি। অলঙ্কারশাস্ত্রে একে বলে ব্যাজস্তুতি। তোর পড়ার বইতে নেই ভরতচন্দ্রের সেই কবিতাটা — শিবের ব্যাজস্তুতি ?

হরিণমারা স্কুলে গিয়ে একটা বিপত্তি ঘটেছিল। ঘটিয়েছিলেন বারুচাচাজিই। আব্বাকে জানতে দেননি, আরবি-ফারসির বদলে সংস্কৃত নিয়েছিলাম আমি। তাঁরই কথায়। তাঁর কথায় সায় দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না আমার। আমাকে তিনি বশ করে ফেলেছিলেন। তবে খোনকারসাহেবের ছেলে রবিকেও সংস্কৃত নিতে হয়েছিল। কারণ প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলে গোড়ার দিকে আরবি-ফারসি শিক্ষক নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। মুসলিম ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম। আমার ভর্তি হওয়ার বছর নবাববাহাদুরের অর্থসাহায্যে সেক্রেটারি হিন্দু জমিদার রায়সাহেব প্রথম মৌলবি শিক্ষক রাখেন। তাঁর নাম ছিল ওসিমুদ্দিন। তাঁকে ছাত্ররা বলত, যাশু মৌলবি। কেপ্পনের যাশু এই মৌলবি সম্পর্কে নানান গুজব ছড়াত ছাত্ররা। আমাকে আর রবিকে দুচোখে দেখতে পারতেন না তিনি। তবে পোদোকে বড্ড ভয় করতেন। তারই ভয়েই হয়তো আব্বার কানে আমার সংস্কৃত পড়ার কথাটা তুলতে যাননি।...

লম্বানেকো শাস্ত্রীটি গরাদের ভেতর দিয়ে কুতকুতে চোখে ডাকল, সাব!

মুহূর্তে দেখলাম আমার চারদিকে কালো দেয়াল এগিয়ে এসে ঘিরল। মুখ তুলে দেখলাম, উঁচুতে একটা ছাদ। কোনায় মিটমিটে বিজলিবাতি জ্বলছে।

কুছ তকলিফ হ্যায়, সাব?

না তো ভাই!

সে সরে গেল। তার বুটের শব্দ থামলে আমি আবার সামনে দেয়ালের দিকে তাকালাম। দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সাতমার কাল্লু পাঠান। তার গলার কাছে টাটকা ক্ষত! গলগল করে রক্ত পড়ছে। বুক ভেসে যাচ্ছে। কাটা শ্বাসনালী দিয়ে লাল বুজকুড়ি ফুটে উঠছে। সে বলল, শফিসাব! আর বুজকুড়িগুলো ফাটতে থাকল। ঘড়ঘড় শব্দ।

বলো কাল্লু!

সিতারা — সিতারা হামাকে বলল কী—

কালু পাঠানের বুকে দুমদাম ঘুসি মারতে থাকলাম। আমার হাতে রক্ত লাগল।

লম্বানেকো শাস্ত্রীটি ব্যস্তভাবে ডাকছে শুনতে পেলাম, সাব! সাব!

ঘুরে দেখে স্থির দাঁড়িয়ে গেলাম। আস্তে বললাম, ও কিছু না!...

কোথাও ঢং-ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজল। গোনার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম ঘণ্টাধ্বনি দূরে অপস্রিয়মাণ, আর তা ক্ষীণতম হতে-হতে ভীষণ গম্ভীর অন্ধকার চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। মাথা তুলে দেখি, কালো আকাশ জুড়ে এরাতে বড়ো বেশি নক্ষত্রের ঝাঁক। আর স্তব্ধতা। বড়ো বেশি সেই স্তব্ধতা, যা গাছপালা থেকে শিশিরের ফোঁটা ঝরে পড়ার টুপটাপ ধ্বনিপুঞ্জকেও করতলগত করে। আর হঠাৎ যদি দূরে হেঁকে ওঠে রোঁদের চৌকিদার, তারপর ভেসে আসে কোনও হকচকিয়ে ওঠা কুকুরের ডাক, তবুও এ শবৎকালীন মধ্যবাতেব ওই স্তব্ধতা সেগুলোকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বাবুচাচাজি বলতেন, প্রকৃতি সর্বগ্রাসী।...

আলোর বিন্দুটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। যত স্পষ্ট হচ্ছিল, তত আমার কাঁধে কারুর হাতের ছোঁয়া টের পাচ্ছিলাম। চমকে উঠে আবিস্কার করলাম নুরুভাইকে। আমি তার সঙ্গে মসজিদের দিকেই চলেছি। বারান্দার থামের ফাঁক দিয়ে সুদৃশ্য চীনা লণ্ঠনটি দেখা যাচ্ছে। চত্বরে ঢুকে নুরুভাই একটু কেশে সাড়া দিল। তারপর চত্বরকেন্দ্রেব চৌবাচ্চার কাছ থেকে সাড়া এল, নুরুজ্জামান!

জি।

শফি এসেছে?

জি হাঁ।

অন্ধকাব উঁচু বিরাট ছায়ামূর্তির কাছে গিয়ে পদচুম্বন করলাম। আর সেই বুঝি ছিল এক আশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় বাত, যে-রাতে সেই প্রথম ও শেষবাব আমার পিতা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধবেন।

মসজিদেব বারান্দাব নিচে জুতো খুলে রেখে আমবা দুভাই তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি খালি পায়ে ছিলেন। ভেতরে লণ্ঠনের আলোয় একটি নকশাদার কাশ্মীরি গালিচা দেখলাম। গালিচাটির পরিপ্রেক্ষিত ছিল লাল। সেটি পুরু ও নরম। আব্বা পা-মুড়ে বসে আস্তে বললেন, বসো। একটু দূরত্ব রেখে বসতে যাচ্ছিলাম। আব্বা বললেন, এখানে বসো। আমরা দু-ভাই গালিচার ওপর বসলাম। তখন

আব্বা চোখ বুজলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি তসবিহ্‌দানা (জপমালা)। চোখ বুজে থেকে তিনি বললেন, তোমাদের দু-ভাইয়ের শাদির ইন্তেজাম করেছি।

নুরুভাই আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আস্তে বলল, জি! তার এই 'জি' শব্দে সম্মতি ছিল।

আব্বা আমাকে ডাকলেন, শফিউজ্জামান!

জি? আমার এই 'জি' শব্দে প্রশ্ন ছিল।

আব্বা চোখ না খুলেই বললেন, দেওয়ানসাহেব তোমার শাদিতে নারাজ। দরিয়াবিবির সঙ্গে তাঁর এজন্য কাজিয়া হয়েছে. শুনেছি। দেওয়ানসাহেব নাকি বলে গেছেন, শফিউজ্জামানের সঙ্গে বেটির শাদি দিলে উনি আর এবাড়ি কখনও আসবেন না।

নুরুভাই কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু বলল না। তার মুখে বাঁকা কিছু রেখা ফুটে উঠল।

আব্বা বললেন, ইসলাম বলেছে ছেলে-মেয়ের শাদি দেওয়া বাবা-মায়ের ফরজ (অবশ্য পালনীয়)।

কথাটা বলে আব্বা চোখ খুললেন। আমার দিকে তাকালেন। নুরুভাই তাকাল আমার দিকে। লণ্ঠনের আলোয় তিনটি মুখ পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ। বাইরে দূরে রোঁদের চৌকিদার ডাকল একবার। হেই—ই—ই! জা—আ—গো—ওঃ! তারপর আব্বা ডাকলেন, শফিউজ্জামান!

আমি ফের বললাম, জি! এই শব্দটি এবার ছিল নিরর্থক একটি শব্দমাত্র। যেমন শিশির-পড়ার কিংবা যে-কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির মতোই, যার এমন কঠিন নিজস্বতা আছে যে মানুষ তাকে উপমায় বা প্রতীকে বা কোনোভাবেই চৈতন্যসংক্রান্ত ব্যাখ্যায় পরিণত করতে পারে না। সেটি একটি জড় ধ্বনিমাত্র। জলে ঢিল ছুড়লে যে শব্দ ওঠে, তাকে তুমি — হে লম্বানেকো শাস্ত্রী, জলের আর্তনাদ বলে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারো। কিন্তু আমার ওই জি-শব্দটির তেমন কোনো আরোপিত ব্যাখ্যাও চলে না।

অথচ মানুষের মূঢ়তা এমনই অবিমৃষ্যকারী, এমনই অসহায়তা তার অস্তিত্বের এক মৌল উপাদান — যা সে মাতৃগর্ভ থেকে সঙ্গে নিয়ে জন্মায় যে, সবকিছুকেই চৈতন্যময় ভাবে। আজ আমি অনিবার্য মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি বলেই নয়, এ তো একটা নিজস্ব-সাধিত পরিণতি আমারই অস্তিত্বের, ক্রমশ জেনেছিলাম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জড়প্রক্রিয়ারই এক হঠকারী পরিণাম জীবন নামক একটা ঘটনা — নিছক ঘটনামাত্র!

এই দেখো, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চল্লিশ বছর আগের এক শরৎকালীন মধ্যরাতে মৌলাহাট গ্রামের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন মসজিদের ভেতর লণ্ঠনের আলোয় কাশ্মীরি গালিচায় বসে, পরবর্তীকালে বদুপির নামে যিনি প্রখ্যাত হন এবং যাঁর মাজার শরিফ পর্যন্ত গড়ে ওঠে, অথচ যিনি একদা ছিলেন পিরতন্ত্র বিরোধী কট্টর ফরাজি মৌলানা, তাঁর 'শফিউজ্জামান' সম্ভাষণে প্রশ্ন ছিল! প্রশ্ন ছিল শাদিতে আমার সম্মতি আছে কি না! ভাবা যায় না হে লম্বানেকো শাস্ত্রীভাই, তা তোমার কাঁধে বন্দুকই থাক কিংবা কোমরে ঝুলুক খাপেঢাকা বেয়নেট!

কিন্তু আমার 'জি' শব্দটিকে তিনি, তাঁর মতো বিচক্ষণ জ্ঞানী পুরুষ, একই সাধারণ মূঢ়তায় সম্মতি বলে ধরে নিলেন, যদিও আমি হ্যাঁ বা না কিছু বলতে

চাইনি। কারণ তখন আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন। বারুচচাজি এবং বুকু। আমি ভাবছিলাম কার দিকে যাব — কে আমার প্রিয় ?....

খুব সকালে আমার ঘুম ভাঙাল আয়মনি। তার চেহারার ঝলমলানি দেখে তো আমি অবাক! সে গাভরা রুপোর গয়না পরেছে। রঙিন ডুরে শাড়ি, এমন কী কুর্তাও পরেছে — যত বেঢপ দেখাক আর তার কপালে কাচাপোকার টিপ। তার সারা দেহ ঝিকমিক করছিল হাসিতে। শফি এসেছ ? মানিকসোনা এসেছ ? বলতে বলতে সে আমার হাত ধরে টেনে ওঠাল বিছানা থেকে। সে আমার শাদিতে কত খুশি বোঝানোর জন্য চাপা গলায় একরাশ কথা বলতে থাকল। আমি চুপ করে থাকলাম। অথচ আমার জানতে ইচ্ছে করছিল বুকুর কথা। মুখ ফুটে জিগ্যেস করতে পারছিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আয়মনি নিজে থেকেই জানিয়ে দিল, দুই-বোন এখন পরদাবন্দি। বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ। তারা যে শাদির দুলহান এখন। তাছাড়া গ্রামে কড়া পরদা চলেছে আউরতদের। সবাই ফরাজি হয়ে গেছে কিনা! আর — আয়মনি উপসংহার বলল, এখন দরিবিবির বাড়িমুখো হতে নেই তোমার তুমি যে শাদির নওশা। ওবাড়ির জামাই হবে!

হঠাৎ একটা জোরালো অভিমান আমার বুকের ভেতর চেপে বসল। সেই অভিমান সূর্য ওঠার পর আমাকে বলিয়ে দিল, আম্মা, আমি চললাম। স্কুল কামাই করলে নাম কেটে দেবে। আর আমাকে বেরিয়ে যেতে দেখে মা আর্তনাদের সুরে ডাকলেন, শফি! শফি! আমি পিছু ফিরলাম না।....

ঘোড়া এবং তলোয়ার

গাজি সইদুর রহমান তাঁর দহলিজ-ঘরের উঁচু বারান্দায় আরামকেদারায় বসে স্টেটসম্যান পড়ছিলেন। আগের দিন কলকাতা থেকে তিনি বাড়ি ফিরেছেন। পাশের একটি টুলে আরো খানকতক বাসি স্টেটসম্যান রাখা আছে। সইদুর হরিণমারা তল্লাটে বড়োগাজি নামে খ্যাত। জেলাবোর্ডের মেমবার তিনি। প্রসন্নময়ী এইচ ই স্কুলের

ম্যানেজিং কমিটিরও মেমবার। দক্ষিণের বারান্দায় সকালের ঝকমকে রোদ সবে টেরচা হয়ে ছুঁয়েছে। তাঁর পরনে আলিগড়ি চুস্ত্ পাজামা আর ঢিলেঢালা কুর্তা, পায়ে কলকাতায় কেনা লালরঙের নাগরা-ধাঁচের সুদৃশ্য চটি! বড়োগাজি শৌখিন মানুষ। তাঁর পত্নীর সংখ্যা এখন মোটে দুই এবং সেই বেগমদ্বয়ের সখি-ভাব লোকদের তাজ্জব করেছে এতকাল। ইদানীং নাকি সেই মধুর ভাবটি কোনো গোপন কারণে চটে গেছে এবং বাড়ির বাঁদি কুলসুম পুকুরঘাটে রটিয়েছে, বড়োগাজি ছোটোবেগমকে তালাক দেবেন। কলকাতা থেকে ফেরার পব লোকেরা সেই উত্তেজনাপ্রদ ঘটনার জন্য কান খাড়া করে আছে। শরৎকালের এই সকালে যারাই নিচের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে, তারাই লক্ষ্য করে যাচ্ছে বড়োগাজিকে। তাঁর মুখমণ্ডলে অবশ্য ভরাট গাম্ভীর্য। সেটা ইংরেজি পড়ার জন্য, নাকি দাম্পত্য অশান্তিজনিত, বোঝা কঠিন।

এইসময় বড়োগাজির ভাই ছোটোগাজি মইদুর রহমান মসজিদ থেকে ফজরের নমাজ সেরে তামার প্রকাণ্ড বদনা হাতে বাড়ি ফিরছিলেন! তাঁর পরনে লুঙ্গি, শাদা থানের পিরহান, মাথায় বাবরি চুল, মুখে চাপ-চাপ দাড়ি। তিনি বড়োগাজির তুলনায় একটু বেঁটে এবং মোটাসোটা। তাঁর পায়ে স্থানীয় মুচির তৈরি কাঁচা চামড়ার তোবড়ানো জুতো। জুতোয় ধুলোকাদা এবং লুঙ্গির নিচের দিকে প্রচুর চোরকাঁটা আটকে আছে। বোঝা যায় তিনি নমাজ সেরে জমিতে-জমিতে ধানের অবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন। তাই শিশিরে জুতো আর লুঙ্গি ভিজেছে। নোংরা হয়ে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দায় ছোটোগাজি একটু দাঁড়ালেন। কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করলেন। সেই সময় বড়োগাজি কাগজে চোখ রেখেই বাঁকা হেসে বললেন, মদু নাকি বদুপিরের মুরিদ (শিষ্য) হয়েছে?

ছোটোগাজি চটে গেলেন। বললেন, হুঁ। হয়েছি।

বদুপির শুনেছি আসমান থেকে জিনদের ডেকে দুনিয়ায় আনে!

ছোটোগাজি ফুঁসে উঠলেন। আপনি ইংরিজি পড়েন বটে, তবে আপনার কথাবার্তা নাদান লোকের মতো। বুজুর্গ লোকের খামোখা বদনাম রটালে গোনাহ্ হয় জানেন না?...ছোটোগাজি উদাত্ত কণ্ঠস্বরে বলতে থাকলেন। আপনি যান। গিয়ে দেখুন হুজুর পিরসাহেবকে। তারপর বাতচিত করবেন।

বড়োগাজি হাসলেন।....আচ্ছা মদু, তুমি তো পাঁচওয়াক্ত নমাজ পড়। তোমার কপালে মুসল্লিদের ছাপ পড়েছে। তুমি বলো তো, ফরাজি যারা, তারা কেমন করে পির-টিরে বিশ্বাস করে? কেমন করেই বা তারা পির হয়? আমার কথা শোনো আগে! ওই বদু মৌলানা শুনেছি খয়রাডাঙায় পিরের থান ভেঙে এসেছে। সে নিয়ে এক তুলকালাম হয়েছে। ওকে শেষ অব্দি খয়রাডাঙা থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আর সেই বদুমৌলানা নিজেই পির সেজে বসল! তোমাদের মতো কতকগুলো বুড়বক গিয়ে তার পাগড়ি ধরে মুরিদ হলে!

ছোটোগাজি খাপ্পা হয়ে দলিজঘরের ভেতর দিয়ে অন্দরে ঢুকে গেলেন।

ঠিক এই সময় দুটি ছেলে রাস্তা দিয়ে আসতে-আসতে থমকে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। চোখ পড়ায় বড়োগাজি জিগ্যেস করলেন, কে রে তোরা?

রবি আদাব দিয়ে বলল, আমি রবিউদ্দিন, চাচাজি!

অ। আর ওটা ?

রবি কাঁচুমাচু একটু হেসে বলল, এ শফি ! মৌলাহাটের পিরসাহেবের ছেলে।

বড়োগাজি সোজা হয়ে বসলেন। তারপর হো-হো করে অট্টহাসি হাসলেন।... শুনে ফেললে নাকি গো ছেলে ? তোমারই আব্বার নিন্দে করছিলাম আমার আবার বড্ড বেফাঁস কথাবার্তা বলার হ্যাবিট আছে। রবিকে জিগ্যেস করো। না কী রে, রবি ?

রবি শুধু খিকখিক করে হাসতে লাগল। শফি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বড়োগাজি ডাকলেন, কী নাম গো তোমার ? ও রবি, কী নাম, বললি যেন ?

রবি বলল, শফিউজ্জামান।

ও এখানে কী করে ?

আমার সঙ্গে পড়ে স্কুলে। আমাদের বাড়ি 'জায়গির' আছে।

ভেরি ওয়েল ! কাম অন বয়, কাম হেয়ার ! বড়োগাজি হাত তুলে ডাকলেন শফিকে।

কিন্তু শফি গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রবি তাকে ফিসফিস করে বলল, বড়োগাজি ! মস্ত লোক। চল্ না ! তবু শফি গেল না।

বড়োগাজি হাসতে হাসতে বললেন, অলরাইট ! বলো তো — আমার একটি ঘোড়া আছে ইংরেজি কী ? বলো — দেখি তুমি পিরসাহেবের ছেলে হয়ে কেমন লেখাপড়া শিখেছ। বলো, আমার একটি ঘোড়া আছে।

শফি আস্তে বলল, মাই..মাই হ্যাজ এ...হ...হ—

তুমুল অট্টহাসি হেসে বড়োগাজি বললেন, এ কী রে রবি ? পিরসাহেবের ছেলে এ কী ইংরেজি শিখেছে ! মাই হ্যাজ হয় না — আই হ্যাভ। আমার একটা ঘোড়া আছে — আই হ্যাভ এ হর্স। শোনো গো পিরসাহেবের ছেলে, আমার কাছে রোজ সকালে এসো। ইংরেজি পড়াব। রবি, ওকে নিয়ে আসিস। তুইও পড়বি। মরনিংয়ে আমি ফ্রি থাকি।...

শফি হনহন করে হাঁটতে লাগল। জীবনে এ এক প্রচণ্ড পরাজয়ের লজ্জা তাকে খেপিয়ে দিচ্ছিল। তা ছাড়া একটু আগে সে ওই লোকটার মুখে তার আব্বার নিন্দাও শুনেছে। রবি ধুকুর-ধুকুর করে প্রায় দৌড়ে তার নাগাল নিচ্ছিল। সে ওকে বোঝাতে চাইছিল বড়োগাজি লোকটি এমনি। বড্ড আমুদে আর বাচাল স্বভাবের মানুষ। শফি, ওর এ অব্দি কতগুলো নিকে, জানিস ? এগারোখানা — আল্লার কসম। এখন দুখানা টিঁকে আছে। তার একখানাকে ছাড়ব-ছাড়ব করছে। আসলে ছোটোবেগমটা হল ছোটো ঘরের বেটি। ওর বাপ ছিল বিলপারের বুনো গাঁ কাঁদুরির হোসেন কাঠুরে। জঙ্গলে কাঠ কেটে বেড়াত। আর নসু — মানে তার বেটি, যে এখন বড়োগাজির ছোট বউ, বুঝলি তো — তারও আঠারোখানা নিকে। কোনো লোকের 'ভাত খায়নি।' নিকে করত আর কদিন পরেই লোকটার বুকে লাথি মেরে পালিয়ে আসত। হোসেন কাঠুরে ছিল আসলে মস্ত খুনে ডাকাত। তার ভয়ে লোকটা বাপ-বাপ বলে তালাক দিতে পথ পেত না। একদিন হয়েছে কী শোন্, বড়োগাজি যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে কাঁদুরিতে একটা সালিশি করতে। রাস্তায় দেখা নসুর সঙ্গে। তারপর কী হল কে জানে, হঠাৎ দেখি, নসু বলাই হাজির বউ হয়ে এল আমাদের গাঁয়ে। সেখপাড়ার

বলাই হাজিকে তুই দেখিসনি। থুত্থুড়ে বুড়ো। তার 'ভাত খাবে' কেন জোয়ান মেয়ে? বলাই হাজি নাকি বরকত নামে তার বাড়ির মাহিন্দারের সঙ্গে খড়কাটা ঘরে নসুকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। তাড়া খেয়ে নসু এল পালিয়ে। এসে কোথায় ঢুকল জানিস তো? বড়োগাজির বাড়িতে। সন্ধ্যাবেলা বলাই হাজির রাগ পড়ল। তখন শালা বুড়ো লণ্ঠন হাতে বড়োগাজির বাড়ির দরজায় এসে কান্নাকাটি করে ডাকাডাকি করতে লাগল। বড়োগাজি বললেন, এখন যাও হাজিসায়েব। বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু রাত গেল, দিন গেল। নসু ফেরে না। বলাই হাজি গিয়ে কান্নাকাটি করে। শেষে বড়োগাজি বললেন, হাজিসায়েব। মনে হচ্ছে, নসুবিবি তোমার ভাত আর খাবে না। ওকে বরঞ্চ তালাক দাও। বুঝলি তো শফি, বড়োগাজি হল এ তল্লাটের এক মানুষবাঘ। বাঘের ঘরে পুষ্টু কাউ। হিঃ হিঃ হিঃ!

রবি খুব হাসতে লাগল। নসু হয়ে গেল নাসিমা বেগম। চাষার মেয়ের বরাত! মিয়াঁবাড়ির বেগম! ইদানীং শুনেছি, বড়োগাজির বড়ো বউ, সে আবার কোন সাবডেপুটি ম্যাজিসট্রেটের বোন, তার সঙ্গে দিনরাত খিটিমিটি চলছে নসুর। নসু বলছে, পরদায় বাঁধা সে থাকতে পারছে না। যখন-তখন খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বড়োগাজি তো — (অশ্লীল শব্দ) পেলেই খুশি। বকাঝকা করে না। কিন্তু এবার নাকি নসুর এক কীর্তি দেখেছে।

রবি শফির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, বলাই হাজির মতোই বড়োগাজি কদিন আগে হাতে-নাতে ধরেছে নসুকে। মোমিনপাড়ার বুহুলের সঙ্গে দিনদুপুরে আখের খেতে — আল্লার কসম! বড়োগাজি বন্দুক নিয়ে আখের জমির চারপাশে ঘোরে আর গুলি মারে। চক্কর দেয় আর গুলি মারে। বুহুল কোন ফাঁকে সুরুত করে পালিয়ে গিয়েছিল। নসু বলেছে, মিয়াঁবাড়ির পায়খানায় বসতে পারে না। অভ্যেস নেই কিনা! আখের ভুঁইয়ে হাগতে গিয়েছিল।

রবি শফিকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। হাসির চোটে সে ঝুঁকে পড়ছিল। একটু পরে সে আবার ফিসফিসিয়ে উঠল, আল্লার কসম — নসুকে আমিও একদিন — যখন বলাই হাজির বিবি ছিল, তখন — কী? বিশ্বাস হচ্ছে না?

শফি চুপ করে রইল। শুধু একবার তাকাল রবির দিকে। রবি চোখ নাচিয়ে বলল, বোশেখ মাসের দুপুরবেলা। তখন কী খাঁ খাঁ অবস্থা হয় জানিস তো? হাজি গিয়েছিল বিলের জমিতে বোরো ধান দেখতে। বাড়ি ফাঁকা। দরজায় উঁকি মেরে দেখি, নসু চিত হয়ে শুয়ে আছে। যা আছে কপালে বলে ঢুকে পড়লাম। ও শফি! তোকে কী বলব? নসুর ওপর গিয়ে যেই পড়েছি, নসু আমাকে জড়িয়ে ধরে কামড়াতে লাগল। ও এক রাক্ষুসি মাগি, আল্লার কসম!....

সেদিনই বিকেলে স্কুলে ছুটির পর দলবেঁধে শফি বন্ধুদের সঙ্গে আসছে, পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দলটা রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে গেল। শফি দেখল, কালচে-লাল একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে বড়োগাজি চলে গেলেন। পরনে ব্রিচেস, ছাইরঙা শার্ট, মাথায় একটা অদ্ভুত টুপি — বইয়ের ছবিতে এক ইংরেজ সায়েবের মাথায় যেমন টুপি শফি দেখেছে। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

স্কুলটি গ্রামের বাইরে মাঠের ধারে। তার একপাশে বাদশাহি সড়ক। প্রতিদিন মিয়াঁপাড়ায় একই রাস্তায় শফি আর রবি স্কুল থেকে ফেরে। ফেরার পথেই গাজিদের

একতালা বিশাল বাড়িটা পড়ে। দহলিজঘরটা রাস্তার ধার ঘেঁষে। কিন্তু বড়োগাজিকে সে দেখেনি বা লক্ষ করেনি এতদিন। আজ সেখানে পৌঁছে দেখল, বড়োগাজি নেই, কিন্তু পাশের একটুকরো খোলামেলা ঘাসজমিতে সেই ঘোড়াটিকে টহল খাওয়াচ্ছে একটা লোক। ঘোড়াটি ভালো করে দেখার জন্য শফি দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু রবি তাকে দাঁড়াতে দিল না।

সে-রাতে শফি ঘোড়াটাকে স্বপ্নে দেখল। ঘোড়াটার চোখ টানা-টানা, প্রচণ্ড লাল। আর সেই চোখে কাজল পরানো। ঘোড়াটাকে কেন যেন খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ঘোড়াটির খুব দুঃখ। তার জন্য কান্না পাচ্ছিল শফির।

একরাতে ঠিক এমনি করে বাবুচাচাজির হাতিটিকে স্বপ্নে দেখেছিল শফি। হাতিটির পাঁজরের হাড় দেখা যাচ্ছিল। রুগ্‌ণ সেই পাঁজরবেরকরা হাতিটিকে দেখে শফি হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল। রবি তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার পরও কিছুক্ষণ শফির মনে কান্নার আবেগটা থেকে গিয়েছিল।....

স্কুলে পুজোর ছুটির আগের দিন বিকেলে শফি তার বন্ধুদের সঙ্গে বাদশাহি সড়কে কাঁদরের সাঁকোর ধারে বসে আছে। দিনশেষের কুয়াশামাখানো ধূসর আলোয় আবার বড়োগাজিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখল শফি। সড়কে বর্ষার কাদা শুকিয়ে কোথাও-কোথাও ধুলো জমেছে। অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। চাষিরা উদ্বিগ্ন। উঁচু জমির ধানখেতে মাটি শুকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কাঁদরের জল 'দোন' (দ্রোণী) দিয়ে দিনমান সেচ দিচ্ছে অনেকে। বড়োগাজির ঘোড়াটা ধুলো উড়িয়ে আসতে-আসতে সাঁকোর কাছে থেমে গেল। শফিরা গল্প করছিল। থেমে গিয়ে তাকিয়ে রইল। বড়োগাজি ঘোড়া থেকে নেমে সড়কের নিচে কাঁদরের ধারে গেলেন। দোনে সেচ-দেওয়া চাষি লোকটির সঙ্গে চাপাগলায় কথা বলতে থাকলেন। দোন থামিয়ে লোকটি সেলাম দিয়ে সসম্ভ্রমে কথা বলছে। তারপর শফি ঘোড়াটার দিকে তাকাল। এ ঘোড়াটা তার স্বপ্নে দেখা ঘোড়া নয়। একে তেজী আর রাগী দেখাচ্ছিল। মুখে লাগামপরা ঘোড়াটি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেগুলো একটা হ্রেষাধ্বনির প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু ঘোড়াটি চুপ। তারপর বড়োগাজি কাঁদরের ধার থেকে সড়কে উঠে এলেন। তখন ঘোড়াটিকে চঞ্চল দেখাল। মনে হল, সে বড়োগাজিকে পিঠে নিয়ে বহু ক্রোশপথ পেরিয়ে যেতে তৈরি। ঠিক এই মুহূর্তে শফির মনে হল, এতদিন সে বাবুচাচাজির হাতিটির মতো একটি হাতির সাধ করে এসেছে। কিন্তু হাতি নয়, তার যদি এমন একটি ঘোড়া থাকত ! তার শরীর শিউরে উঠল। বুকের ভেতর একটা চাপা আবেগ দুলে উঠল। আর বড়োগাজি তখন তার সামনে। মুখে মিটিমিটি হাসি। মাথায় ইংরেজ-টুপি, শার্ট-ব্রিচেস-বুটপরা, শকুনের মতো বাঁকা নাক, সাতমার কাল্লুখাঁর মতো গোঁফ-জুলফিওয়ালা মুখ, তামাটে রঙের মানুষটির চোখে চোখ পড়তেই শফি চোখ নামাল। বড়োগাজি বললেন, তুমি মৌলাহাটের পিরসাহেবের ছেলে না ? তারপর পোদোর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি প্রহ্লাদ ঘোষের ছেলে — হুঁ, কী যেন নাম তোমার ?

তুখোড়, গোঁয়ার এবং সাহসী বলে পরিচিত পোদো নেতিয়ে গিয়ে বলল, আজ্ঞে হরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

বড়োগাজি বললেন, আর ওটা কে রে ? চেনা-চেনা মনে হচ্ছে ?

রবি ঝটপট বলল, সমু। বড়োরায়বাবুর ছেলে, চাচাজি।

কী হে ? বড়োগাজি চোখ নাচিয়ে রবি আর শফিকে দেখিয়ে বললেন, তুমিও এই পাতি-নেড়েদের দলে জুটলে কেন ?

সৌম্যেন্দু হাসল। কোত্থেকে আসছেন গাজিজ্যাঠা ?

জবাব না দিয়ে বড়োগাজি শফির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নামটা কী যেন—

শফি গম্ভীরমুখে বলল, শফিউজ্জামান।

ইন্দ্রাণীর কাছারিতে দেওয়ানসায়েবের সঙ্গে দেখা হল। বড়োগাজি বললেন। তোমার সব কথা শুনলাম। শুনে ভালোই লাগল। তুমি কি জান দেওয়ান বাবু চৌধুরি আমার বুজম্ ফ্রেনড ?

শফি তাকিয়ে রইল।

বড়োগাজি হাসলেন। হি ইজ ইওর গার্জিয়ান। দেয়ারফোর আই অ্যাম অলসো ইওর গার্জিয়ান। বুঝলে কিছু ? নাকি 'মাই হ্যাজ এ হর্স' বুঝলে ?

ধেড়ে ছেলেগুলো খ্যা-খ্যা খি-খি করে হাসতে লাগল। শফি মুখ নামিয়ে ঘাস ছিঁড়তে থাকল।.

বড়োগাজি বললেন, দেওয়ানসায়েবের কাছে শুনলাম তুমি ইনটেলিজেনট ছেলে। কিন্তু ট্রেনিং-এর অভাবে তোমার এ অবস্থা। তোমাকে বলেছিলাম আমার কাছে ইংরেজি পড়তে এসো। আসছ না কেন ?

রবি দ্রুত বলল, যাবে। কাল সকালেই নিয়ে যাব।

বড়োগাজি তাঁর ঘোড়ার কাছে গিয়ে জন্তুটার চোয়ালে হাত বুলিয়ে তারপর রেকাবে পা রেখে পিঠে উঠলেন। এতক্ষণে শফির চোখে পড়ল, ঘোড়ার পিঠে জিনের পাশে একটা বাদামি রঙের ভেলভেটের খাপে টাকা তলোয়ার ঝুলছে। ঘোড়াটা চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তারপর শফি আস্তে আস্তে বলল, বড়োগাজির ঘোড়ায় তলোয়ার ঝুলছে কেন রে ?

সৌম্যেন্দু জমিদারবাড়ির ছেলে। সে বলল, বাবাও যখন ঘোড়ায় চেপে কোথাও যান, এমনি সোর্ড থাকে। সে-সোর্ড দেখলে তোমার মুন্ডু ঘুরে যাবে। প্রকাণ্ড ! আমার ঠাকুর্দা ওই সোর্ড দিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন !

রবি বলল, এই সমু ! তোদের হলঘরখানা একবার দেখিয়ে আনব শফিকে। কখন যাব, বল্ ?

সৌম্যেন্দু বলল, পুজোর দিন যাস ! অষ্টমীর দিন রাত্রিবেলা। দেখবি একশো আটখানা পাঁঠা বলিদান হচ্ছে।

ধুস ! রবি বলল। সে নয়। তোদের হলঘরখানা দেখাতে বলছি। জানিস শফি ? কত হরিণের মাথা, আস্ত বাঘ, হাতির পা। উরে আল্ — বলেই সে সামলে নিল। আল্লাখোদা বা মুসলমানি বুলি সে হিন্দু বন্ধুদের সামনে উচ্চারণ করে না।

পোদো হেঁ-হেঁ করে হেসে বলল, শালা নেড়ের বাচ্চা ! আল্লাতাল্লা কথায়-কথায়।

বিনোদ হাসতে-হাসতে বলল, মাইরি বড়োগজি কী জিনিস রে ! নিজে মোছলমান হয়ে রবি আর শফিকে দেখিয়ে আমাদের বলে গেল কী শুনলি তো ?

বলে, পাতিনেড়ে !

কালীচরণ বলল, হ্যাঁ রে রবি ? তোদের নেড়ে কেন বলে রে ?

সৌম্যেন্দু বলল, মোচলমানরা যে গোরু খায়।...

পরে রবি চুপিচুপি শফিকে বলত, হিন্দুদের সব ভালো। শুধু এই একটা জিনিস বড্ড খারাপ লাগে। ঠাট্টা-ইয়ারকি হোক, যাই হোক, গোরু খাওয়া-টাওয়া আর নেড়ে-টেড়ে বলা — এ কিন্তু সহ্য হয় না। ভাবি মিশব না ওদের সঙ্গে। কিন্তু আর কার সঙ্গে মিশব বল ? সেখপাড়ার ছেলেগুলোর সঙ্গে ? যত্তসব চাষাভুষো রাখাল-বাগালের দল ! খালি গোরু-বলদের আর চাষবাসের এঁড়ে গপ্প !

রবি এসব কথা বলে। আবার বিকেল হলেই ছুটে যায় হিন্দুপাড়ার দিকে। ঠাকরুনতলার কাছে প্রথমে পোদোকে ডেকে নেয়। জীর্ণ শিবমন্দিরের চত্বরে একটু অপেক্ষা করতেই এসে পড়ে বিনোদ, কালীচরণ — ইদানীং জমিদারবাড়ির ছেলে সৌম্যেন্দুও জুটেছে। দলবেঁধে বাদশাহি সড়কের দিকে হাঁটতে থাকে।

অথচ শফির একলা থাকার বড়ো ইচ্ছা। রুকুর সঙ্গে বিয়ের কথা শোনার পর থেকে সে একলা হয়ে ওইসব নিয়ে ভাবতে চায়। কিন্তু রবি তাকে সঙ্গছাড়া করার পাত্র নয় ! রবিকে সে পাত্তা না দিয়ে পারে না। তাদের বাড়ি 'জায়গির' আছে সে। একটা আনুগত্যবোধ শফিকে দমিয়ে দেয়।...

পুজোর ছুটি যে এমন করে ঘোষিত হয়, শফি জানত না। খয়রাডাঙা ছিল মুসলিম প্রধান গ্রাম। ওখানে ছিল মাদ্রাসা-স্কুল। হরিণমারা হিন্দুপ্রধান গ্রাম। গণ্ডায়-গণ্ডায় জমিদার। তাঁরা সবাই ব্রাহ্মণ। প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলে পুজোব ছুটি ঘোষণা যে সকালবেলায় হয়, শফি জানত না। সেই গ্রীষ্মকালে ভরতি হওযার পর মরনিং স্কুল করেছে। এদিন ভোরে রবি তাকে ঝটপট শার্ট-পেনটুল পরে স্কুলে যেতে বলায় অবাক হয়েছিল। গিয়ে সে অবাক হল ! স্কুলের গেটে ছাত্ররা দেবদারুপাতা এনে তোরণ গড়ছে। বারান্দার থাম ঘিরেও দেবদারুপাতা,গাঁদাফুল, পদ্মফুল, জবাফুল থরেবিথরে সাজানো। বিশাল এক হলঘরে কাঠের ফুট ছয়েক উঁচু দেয়াল তুলে চারটে ক্লাস। ফাইভ্‌ থেকে এইট। তার ওধারে ফার্স্টক্লাস আর সেকেনড ক্লাস। মধ্যিখানে ওইরকম কাঠের দেয়াল। তার পাশের বড়োঘরটিতে অফিস আর লাইব্রেরি। আজ সকালে হলঘরে ঢুকে ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ শফিকে চমকে দিল। মুহূর্তে তার মনে হল, হিন্দুরা ফুল কেন এত ভালোবাসে ? অথচ তার মৌলানা আব্বা মুরিদদের সামনে ওয়াজনসিহতের সময় আরবিবাক্য উচ্চারণ করের বাঙলায় ব্যাখ্যা করেন, আমার হুজুর মুহম্মদ 'সাল্লাল্লাহ আলাইহেসসাল্লাম' বলেছেন, হে মোমিনগণ ! দিনে যদি দু পয়সা কামাও, তো এক পয়সার রুটি কেনো, আরেক পয়সার ফুল কেনো। আমার রসুলে করিম (সাঃ আঃ) ফুল ভালোবাসতেন। খুশবু (সুগন্ধ) ভালোবাসতেন।...শফির সেই মুহূর্তে মনে হল, তবু ফুলের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই কেন ? আর হিন্দুরাই বা কেন ফুল ভালোবাসে ? হরিণমারায আসার পর জীবনে এই প্রথম এত বেশি হিন্দু সে দেখেছে। হিন্দুবাড়ি — সে হোক না কেন, কুনাই-বাউরি অথবা একেবারে নিরন্ন মুনিশখাটা মানুষ, তার বাড়ির উঠোনে উজ্জ্বল ফুলফোটা গাছ থাকবেই থাকবে। এই শরতের সন্ধ্যাসকাল হিন্দুপাড়ার ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে শফির স্নায়ুকে চমকে দেবেই শিউলির গন্ধ।

সেই শিউলির মালায় সাজানো কাঠের দেয়াল। এত সুঘ্রাণ আর কখনও আবিষ্ট করেনি শফিকে। সৌম্যেন্দু এসে তার কাঁধে হাত না রাখলে এই সুগন্ধের ভেতর ঘনীভূত হয়ে যেত যেন তার সত্তা। সে ভীষণ চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। সৌম্যেন্দুর পরনে ঝকঝকে ফুলশার্ট, সোনার বোতাম, এবং আজ সে ধুতি পরেছে, কিন্তু শার্ট তার ধুতির ভেতর গোঁজা। রামকৃষ্ণ ভূগোলস্যারের মতো। রামকৃষ্ণবাবু বারোমাস ওইভাবে ধুতির ভেতর শার্ট গুঁজে কোট গায়ে স্কুলে আসেন। শফি দেখল, সৌম্যেন্দুর হাতে জড়ানো শিউলিফুলের মালা। কপালে একটু লাল ছোপ। সৌম্যেন্দু বলল, তুমি একলা দাঁড়িয়ে কেন শফি? শফি হাসল, এমনি। সৌম্যেন্দু তার কাঁধ ধরে নিয়ে চলল স্কুলবাড়ির বাইরে। কলকেফুলের জঙ্গলের ভেতর ঢুকে শফি দেখল রবি, পোদো, বিনোদ, কালীচরণ বসে বিড়ি ফুঁকছে। সৌম্যেন্দু পকেট থেকে একটা বিস্ময়কর জিনিস বের করল। সেটি একটি সিগারেটের প্যাকেট। পুরো দলটা হকচকিয়ে গেল। সৌম্যেন্দু সবাইকে একটা করে সিগারেট বিলি করল। শফি বাবুচাচাজিকে সিগারেট খেতে দেখেছে। সিগারেটের গন্ধটা তার ভালো লাগে। জীবনের প্রথম সিগারেট টেনে শফির কিন্তু ভালো লাগল না। সে রবির কাছে বিড়ি টানতে শিখে গেছে। বিড়িই সিগারেটের চেয়ে সুস্বাদু মনে হচ্ছিল তার। তবু সিগারেট খুব সামান্য জিনিস নয় — দামিও বটে! তার চেয়ে বড়ো কথা, সৌম্যেন্দু তাকে এমন করে ডেকে এনে সিগারেট দিয়েছে। সে হাসিমুখে টানতে থাকল।

শফি সেই প্রথম আবিষ্কার করেছিল, পৃথিবীতে অজস্র সুন্দর-সুন্দর ঘটনাবলী ঘটে। আছে বহু চমকেদেওয়া সুখের মুহূর্ত। সেই প্রথম তার মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীতেই আছে এমন সব জিনিস, যার তুলনায় মা-বাবার কাছে শোনা বেহেশতের জিনিসগুলোও হয়তো তুচ্ছ হয়ে উঠবে। এখানে আসার পর শফিকে কেউ আগের মতো 'পিরসাহেবের ছেলে' বলে আপনি-টাপনি করে না। রাস্তা থেকে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায় না কোনো মানুষ। বউঝিরা ঘোমটার ফাঁকে তার দিকে চেয়ে থাকে না। স্কুলের মাস্টারমশাইরাও তাকে পাত্তা দেন না। এমন কী, একদিন পদ্য মুখস্থ বলতে না পারায় তাকে বেনচে উঠে দাঁড়াতেও হয়েছিল। একটা তীব্র অভিমান তাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল। ভেবেছিল, সেদিনই মৌলাহাটে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ক্লাসসুদ্ধ সেদিন পদ্য মুখস্থ বলতে পারেনি। বাঙলার স্যার হরিপদবাবুর গলাটি ছিল জোরালো। গতিক দেখে হেসে ফেলেছিলেন, এ যে দেখছি ঠক বাছতে গাঁ উজোড়। সিট ডাউন! শফি বসছে না দেখে হরিপদস্যার খাপ্পা হয়ে গর্জেছিলেন, সিট্-ডাউন! তারপর শফি বসেছিল। তখন হরিপদবাবু মুচকি হেসে বললেন, তুমি সেই পিরবাবার ছেলে না? পরে রবি চুপিচুপি বলেছিল, হরিমাস্টারের মেয়ে বাণীকে ভুতে পেয়েছে। তোর আব্বার কাছে তাবিজ এনে দিয়েছেন আমার আব্বা। হরিমাস্টার আব্বাকে বলেছে, কেউ যেন জানতে পারে না। জানলে একঘরে করবে। শফি বলেছিল, কেন? খয়রাডাঙার যে পিরের থান ভেঙে দিয়েছেন আব্বা, সেখানে তো হিন্দুরাও মানত দিত। রবি বলেছিল, ধুর বোকা! সে তো মাজার। হিন্দুরা ঢিবি-টিবি দেখলেই পেন্নাম ঠোকে। আর তোর আব্বা তো মানুষ-পির!....

ছুটি ঘোষণার দিন স্কুল থেকে ফেরার পথেই শফি পড়ে গেল বড়োগাজির পাল্লায়। দহলিজের বারান্দায় মাঝখানে খানিকটা গোলাকার অংশ বেরিয়ে এসেছে

খোলা আকাশের নীচে। সেখানে লাইম-কংক্রিটের দুধারে অর্ধবৃত্তাকার বেনচ। মাঝখানে ফাঁকা এবং সিঁড়ির ধাপ। সেই বেনচে বসে বড়োগাজি বাসি স্টেটসম্যান পড়ছিলেন — রবির মতে, যা নাকি স্রেফ লোকদেখানো ভড়ং।

রবি হনহন করে চলে গেল। কিন্তু বড়োগাজির 'শফিউজ্জামান' ডাকটিতে কিছু ছিল, শফি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বড়োগাজি ডাকলেন, কাম অন মাই বয়, কাম অন!

শফি আড়ষ্টপায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল। বড়োগাজি বললেন, সিট ডাউন! তিনি তাঁর পাশের জায়গায় একটি থাপ্পড় স্থান নির্দেশও করলেন। শফি বসল।

বড়োগাজি বললেন, স্কুলের পুজো ভ্যাকেশন হল?

জি।

হাসতে লাগলেন বড়োগাজি।...পিরসায়েবের ছেলে তুমি! জি বলছ! ভেরি ওয়েল! তবে তোমার ওই দেওয়ানসায়েবের চেয়ে আমি এককাঠি সরেস। জি-টি পসন্দ করি না।

শফি মৃদুস্বরে এবং একটু হেসে বলল, তাহলে কী বলব?

বড়োগাজি তার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, তুমি আমাকে গাজি আংকেল বলবে! বলো তো আংকেল মানে কী?

কাকা — স্কুলের অভ্যাসে শব্দটি বলেই শফি শুধরে নিল। চাচা।

বড়োগাজি ঠিক বাবু চৌধুরির প্রতিবিম্বের মতো অট্টহাসি এবং ভঙ্গি করে বললেন, কাকা, চাচা, খুড়ো, জ্যাঠা, মামা — এভরিওয়ান। কিন্তু তুমি কাকা বললে, ওটা কিন্তু মুসলমানি ওয়ার্ড। তুর্কি সুলতানদের আমলে কাকা চালু হয়েছিল। দ্যাট্স এ টার্কি ওয়ার্ড।

বলে বড়োগাজি চোখ নাচিয়ে চাপা স্বরে ফের বললেন, পুজো ভ্যাকেশানে বাড়ি যাচ্ছ তো?

শফি আস্তে মাথাটা শুধু নাড়ল। সে নিজেই জানে না কী করবে।

বড়োগাজি একই ভঙ্গিতে বললেন, সেদিন দেওয়ানসাহেবের কাছে শুনলাম লেট তোফাজ্জেল চৌধুরির যমজ মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের দু-ভাইদের বিয়ে হবে?

শফি চুপ করে থাকল।

তোফাজ্জেলও আমার বন্ধু ছিল। বড়োগাজি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ওকে সবাই তোফা চৌধুরি বলে ডাকত। কেন জান? লাইফটাকে সে আনন্দে কাটাতে চাইত। হি ওয়াজ আ ম্যান অফ প্লেজর।...তো দা পুওর ম্যান ফেস্ড্ আ ভেরি-ভেরি স্যাড ডেথ। রাস্তার মরে পড়ে ছিল।

শফি তাকাল। তাকে তো একথা কেউ বলেনি।

বড়োগাজি আস্তে বললেন, হি ওয়জ আ ফুলিশ ম্যান। তুমি নিশ্চয় আশরাফ-আজলাফ বোঝ।

জি।

আবার•জি? বড়োগাজি কপট ধমক দিলেন। তারপর বললেন, আজলাফ ঘরের মেয়েকে বিয়ে করাটাতে দোষের কিছু নেই। আমিও — তো...বড়োগাজি থেমে গেলেন হঠাৎ। মুখ তুলে সামান্য দূরে একটা তালগাছের দিকে তাকিয়ে থাকলেন

কিছুক্ষণ। তারপর একটু হাসলেন।...দেওয়ানসাহেবের মতে, তোমার বিয়ে করাটা ঠিক হবে না। আর আমার মতেও তাই। আমরা চাইছি, মুসলমান ছেলেরাও ইংরেজি স্কুলে পড়ুক। যে মুসলমান এই সেদিন পর্যন্ত বাদশাহি করেছে, সে মুসলমান হিন্দুর গোলাম হয়ে যাবে — এটা সহ্য করা যায় না। ক-বছর ধরে ফাইট করে হরিণমারা স্কুলে মৌলবি টিচার রাখতে বাধ্য করেছি। মুসলমান ছাত্র আরবি-ফারসিও শিখুক, আবার ইংরেজিও শিখুক। কেন ? না—আরবি-ফারসি শিখলে সে তার পূর্বপুরুষের কালচার-সিভিলাইজেশান কী ছিল, জানতে পারবে। আর ইংলিশ শিখলে সে হিন্দুদের গোলামে পরিণত হবে না। কী ? 'মাই হ্যাজ' ?

শফি চুপচাপ ইংরেজি খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে ছিল। খয়রাডাঙার জমিদারকেও সে ইংরেজি কাগজ পড়তে দেখেছে। চোখে পড়লে বড়োগাজি কাগজগুলো ভাঁজ করে কপট লুকোনোর ভঙ্গিতে বললেন, ওসব পরে — পরে হবে। কথা হচ্ছে, তোমাদের স্কুলে যখন ফাইনাল একজামিনেশন, তখনই তোমার বিয়েব দিন ধার্য হয়েছে। দেওয়ানসাহেবকে আমি বললাম, ঠিক আছে। আই অ্যাম হেয়ার — দা টাইগার অফ হরিণমারা। লোকে আড়ালে আমাকে বলে বাঘাগাজি। জান তো ?

শফি মাথা নাড়ল।

জেনে রাখো। তো—

এইসময় দলিজঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক মৃদুস্বরে বলল, নাশতা, ছার !

বড়োগাজি শফির হাত ধরে ওঠালেন। কাগজগুলো বগলদাবা করে হাসতে হাসতে বললেন, করিমকে কিছুতেই স্যার শেখাতে পারলাম না, বুঝলে ? ছার ! ভেংচি কাটলেন করিমের উদ্দেশে, ছা—আ—র। ধুর হতভাগা। যা, গিয়ে বল, একজন খুদে গেস্ট আছে। বুঝলি তো ?

করিম দাঁত বের করে বলল, বুঝেছি। ম্যামান ছার।

বড়োগাছি তেড়ে গেলেন।...মেহমান বলতেও পারে না। বুঝতে পারলে শফি ? এই তো মুসলমানের অবস্থা। না ঘরকা না ঘাটকা।

ঘরের ভেতর ঢুকে শফি অবাক হয়ে দেখল, স্কুলের লাইব্রেরি-ঘরের মতো সারবন্দি বইভরতি আলমারি। চেয়ার, টেবিল, আরামকেদারা। দেয়ালে বাঁধানো সব অচেনা মানুষের ছবি। শফি আব্বা-আম্মার কাছে জেনেছে, মানুষ বা জীবজন্তুর ছবি মুসলমানের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ)। ঘরের একপাশে একটি নকশাকরা পালঙ্ক। পালঙ্কে সুন্দর বিছানা। কিন্তু বিছানার ওপাশে দেওয়াল ঘেঁসে এলোমেলো প্রচুর বই-কাগজ। শফি ভাবল, বড়োগাজি তাহলে রাতে এখানেই শোন।

টেবিলের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন বড়োগাজি। একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। অন্যদিকে মুখোমুখি নিজে একটা চেয়ারে বসলেন। টেবিলে সুদৃশ্য দস্তরখান। তার ওপর রাখা আছে নকশাদার চীনামাটির থালা আব তশ্‌তরি (ছোটো প্লেট)-তে একরাশ সুখাদ্য। থালায় আছে পরোটা, প্লেটে ভুনা গোশ্‌ত্‌ আর ফিরনি। ফিরনিতে কিসমিস দেওয়া আছে। একটা প্লেটে শাদা ঘন ক্বাথের মতো লাচ্চা সেমাই। শফি খোনকারবাড়ি সকালের নাশতার কথা ভাবছিল। রোজ সকালে রবি আর সে

একথালা মুড়ি-গুড়, কিংবা গুড়ের বদলে দুটুকরো বাতাসা খায়। কোনো-কোনোদিন মিষ্টি আচার দিয়ে পান্তাভাতও। একদিন রবির দুলাভাই (জামাইবাবু) এসেছিল বলে তিনিসুদ্ধ তক্তাপোশে দস্তরখান পেতে পরোটা-সুজি আর আণ্ডার হালুয়া খাওয়া হয়েছিল।

তার চেয়ে বড়ো ঘটনা চেয়ারে বসে টেবিলে খাওয়া। ভৃত্য করিম খাঞ্চায় (ট্রে) সাজিয়ে আরেকপ্রস্থ খাদ্য এনে যত্ন করে সাজিয়ে দিল শফির সামনে। বড়োগাজি ঘোষণা করলেন, নাও, লেটাস বিগিন!

শফি লক্ষ্য করল, বাবুচাচাজির মতো উনিও বিস্‌মিল্লাহ্ উচ্চারণ করলেন না। পরোটা ছিঁড়ে চিবুতে শুরু করলেন। শফি অভ্যাসে বিসমিল্লাহ্ বলে হাত লাগালে বড়োগাজি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন শুধু।

করিম একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শফিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টে দেখছিল। একসময় সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলে উঠল, ইনি মৌলাহাটের পিরসাহেবের ছেলে না? হুঁ — তাই ভাবছি, চেনা-চেনা মনে হয়, অথচ — সালাম বাপজান! সে কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব দিল।

বড়োগাজি ধমক দিলেন।...দেখবি, আজ যেন চা ঠাণ্ডা না হয়। গিয়ে বল্!

করিম যেতে-যেতে কিছু ফিরে বলল, উনি চাহা খাবেন তো ছার?

বড়োগাজি মুখ টিপে হেসে শফিকে বললেন, কী? চা চলবে তো?

শফি মাথা দোলাল। চলবে! চা সে জীবনে একবার খেয়েছে মনে আছে। তার একটি ভাই, যে ছোটোবেলাতেই মারা যায়, তার জন্মের সময় তার আব্বা বাড়িতে ছিলেন না। দূরের কোনো গ্রামে শিষ্যবাড়ি ছিলেন তখন! খবর পেয়ে উনি বাড়ি ফিরেছিলেন। সঙ্গে 'চা' এনেছিলেন। প্রসবের পর মেয়েদের শরীরের রস শুকোতে 'ঝাল' খাওয়ানো হয়। শফি জানে। শুঁটপিপুলের বাটনার সঙ্গে আতপচালের আটা আর গুড় রান্না করা হয়। খেতে বড্ড ঝাল। কিন্তু মিঠে। নাকচোখ দিয়ে জল বেরুলেও শফি তারিয়ে-তারিয়ে খেয়েছিল ঝাল। সেবার আব্বা চা খাওয়ালেন মাকে। কেমন একটা নতুন আর আশ্চর্য স্বাদ-গন্ধ! শুধু চা নয়, কেটলিও কিনে এনেছিলেন তার আব্বা। কেটলির ভেতর চায়ের পাতার গন্ধটা মনে আছে। তারপর আর কোনোদিন তাদের বাড়িতে চা হয়নি। কেটলিটা রাখা থাকত তক্তাপোশের তলায়। লুকিয়ে বের করে ঢাকনা খুলে শুঁকত শফি। যেন পেত সেই আশ্চর্য গন্ধটা। না পেলেও পেত!...

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন বড়োগাজি!...ও কী! ওইটুকু খেয়ে বাঁচবে কী করে? সবটা খাও। তবে না একজন ফাইটার হবে। লড়াই করতে পারবে।

অমনি শফির মনে পড়ে গেল তলোয়ারটার কথা। তখন কথাটা সে তুলল না। বড়োগাজির পীড়াপীড়িতে অন্তত ফিরনিটা সবই খেতে হল। টেবিলের তলায় একটি সেলেপচি বা হাত ধোওয়ার পাত্র রাখা ছিল। কারুকার্যময় উজ্জ্বল পেতলের সেলেপচিটি বড়োগাজি নিজেই টেবিলে তুললেন। শফির হাতে একটি সুন্দর ছোট্ট সোরাহি থেকে জল ঢেলে দিলেন। তারপর নিজের হাত রুমালে মুছে বললেন, ওয়েট আ বিট। করিম টাওয়েল এনে দিচ্ছে।

শফি রুমাল বের করল। এই রুমালটি রুকু তাকে দিয়েছিল। সবার সামনেই

দিয়েছিল। রুমালটি রেশমের। মৌলাহাটে 'মোমিন সম্প্রদায়' বা তাঁতশিল্পীরা আছে। অন্য লোকে তাদের জোলা বলে। তাই রুমালের কাপড়টি ছিল স্থানীয় এবং রুকু তাতে লালসুতোয় আরবি হরফে 'আল্লাহ্' শব্দ, তার তলায় একটি গোলাপ বুনে দিয়েছিল। দুই বোনই এসব কাজে বড্ড পাকা — আয়মনির উক্তি। আর সেই রুমালটিতে এতদিনে মুখ মুছে নোংরা করে ফেলেছিল শফি। বড়োগাজির দৃষ্টি এড়াল না। বললেন, রুমাল কাচো না কেন? সবসময় ফিটফাট থাকবে কেমন?

তারপর আবদুল চা আনল। সুন্দর চায়ের কাপ-প্লেট দেখে শফি আরও অভিভূত। তারপর চায়ে চুমুক দেওয়ামাত্র মায়ের কথা মনে পড়ে গেল তার। বুকের ভেতর একটা তোলপাড় জাগল। সঙ্গে-সঙ্গে সে ঠিক করে ফেলল, ছুটিটা সে বাড়িতেই কাটাবে।

কিন্তু তার আগে তলোয়ারটি দেখে যাওয়ার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসল। বড়োগাজি চা খেতে-খেতে কিছু ভাবছিলেন। শফি তাঁকে কী সম্বোধন করবে ঠিক করতে পারছিল না। চাচাজি বললে উনি রাগ করবেন। একটু পরে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বরে সে আস্তে ডাকল, গাজি আংকল!

ইয়েস! বড়োগাজি মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

আপনার ঘোড়ার জিনে একটা তলোয়ার দেখেছিলাম।

দেখবে তুমি? বলে হাঁক দিলেন, করিম! করিম বখ্‌শ্‌!

করিম অন্দর থেকে দৌড়ে এসে বলল, ছার!

আমার তলোয়ার নিয়ে আয়। বলে শফির দিকে ঘুরলেন বড়োগাজি। বললেন, তলোয়ার ইংরেজি কী?

সোর্ড।

ব্র্যাভো! শাব্বাশ! বড়োগাজি টেবিলে থাপ্পড় মারলেন।...আমাদের ফ্যামিলির পদবি গাজি কেন জান? আমার পূর্বপুরুষ এ অঞ্চলে এসেছিলেন আকবর দা গ্রেটের আমলে। সেনাপতি মানসিংহের আনডারে মনসবদার ছিলেন একজন। তাঁর নাম ছিল ফরিদ খান। এই পরগনার নাম ছিল ফতে সিং পরগনা। ফতে সিং নামে একজন হাড়িবংশীয় রাজা — কুঁজোর সাধ যায় চিত হয়ে শুতে — যাকে দয়া করে পরগনার জায়গিরদার করা হয়েছিল, সে বলল, আমি বদাশাহকে খাজনা দেব না। বোঝ অবস্থা। মানসিংহ এলেন বিদ্রোহদমনে। আব ফরিদ খান মনসবদার তলোয়ারের এক কোপে ঘ্যাচাং করে হাড়িরাজার মুণ্ডুটি কেটে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লিতে বাদশাহের কাছে। বাদশা খুশি হয়ে খেতাব পাঠালেন সিলমোহর করে। অ্যানড দ্যাট ওয়জ দা মোসট অনারেবল টাইটেল অ্যামং দা মোসলেম ঃ গাজি। তুমি পিরসাহেবের ছেলে। ডু ইউ নো হোয়াট ডাজ ইট মিন?

শফি আবৃত্তি করল, কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে যারা মারা যায়, তারা শহিদ। আর কাফেরদের যারা মারতে পারে তারাই গাজি।

দ্যাটস কারেকট। বড়োগাজি মুখে বললেন। আমরা গাজির বংশধর। কথা হচ্ছে, একসময় মোসলেমরা খ্রিস্টিয়ানদের সঙ্গে ক্রুসেড — আই মিন, জেহাদ করেছে। ইনডিয়াতেও ইংরেজের সঙ্গে মোসলেমরা লড়েছে। পলাশির যুদ্ধে হেরে গেছে। সেদিনও এইটটিন ফিফটিসেভেনেও শেষবার লড়াই করেছে। বেঙ্গলে হিন্দুদের

ট্রেচারির জন্যই বাহাদুর শাহ ওয়জ ডিফিটেড। অ্যানড নাও এগেন দা টাইম হ্যাজ কাম। কিন্তু এ লড়াই অন্য লড়াই। ওয়র অফ ব্রেইন। ডু ইউ আনডারস্ট্যানড ?

শফি তলোয়ারটার জন্য অস্থির। সে কিছুই কানে নিচ্ছিল না। করিম বখশ কোষবদ্ধ অস্ত্রটি দুহাতে সসম্ভ্রমে নিয়ে এলে বড়োগজি উঠে দাঁড়ালেন। সেটি হাতে নিয়ে শফিকে ভীষণ চমকে দিয়ে নিষ্কাশিত করলেন। তারপর মহরম অনুষ্ঠানে তলোয়ারখেলার মতো বারকতক সঞ্চালিত করে হাসতে হাসতে বললেন, নাও, দ্যাখো। তবে তলোয়ারের দিন আর নেই রে, বাবা ! এটা নেহাত পূর্বপুরুষের একটা স্মৃতিচিহ্ন — জাস্ট এ স্যুভেনির। র‍্যাদার — এ শো। যেমন আমি ফেলট্ হ্যাট পরি।

শফি তলোয়ারের মুঠো ধরে ওজন পরখ করল। ওজনদার। কিন্তু তার গায়ে কাঁটা দিল। হঠাৎ কী এক উত্তেজনা ভর করল তার শরীরে। মহরম অনুষ্ঠানে সে দেখেছে। তার আব্বার মতে, ওইগুলা শিয়াদের কফরি কাম। হানাফি মজহাবের লোকেরা হুজুগে ওইসব করে-টরে। সুন্নি মজহাব মুহর্রমের দিন রোজা রাখবে। এতিম-ফকিরকে দানখয়রাত করবে। হানাফিরা সুন্নি হয়েও শিয়াদের মতো কাম করে। তাজিয়া বানায়। 'দুলদুল' ছিল হজরত হোসেনের ঘোড়ার নাম। তওবা, তওবা ! কোথায় হজরত হোসেনের দুলদুল, কোথায় এই হাড্ডিসার ঘোড়া ! স্রিফ 'শেরেকি' (ঈশ্বরের অংশীদারি) কাম। বেরাদানে ইসলাম ! মুহর্রমের দিন শোকের দিন। তলোয়ার নিয়ে কুস্তোকুস্তির দিন নয়। কান্নার দিন। প্রায়শ্চিত্তের দিন।

শফির কিছু অনুভূতি, যা ওই ধারালো, নকশাখচিত, ইস্পাতের বাঁকা, দীর্ঘ, সুচ্যগ্র বস্তুটি দেখতে-দেখতে এবং ছুঁতে-ছুতে সারা শরীরকে শক্ত করে ফেলছিল, ক্রমশ একটি বোধ এনে দিল। তার মনে হল, সে তলোয়ারটি দিয়ে সহজেই কাউকে বিদ্ধ করতে পারে। কেটে দু-টুকরো করে দিতে পারে। আর এ মুহূর্তে যেন বা সারা পৃথিবী তার করতলগত। সে ইচ্ছে করলেই শাহ্ (আলেকজানডার) হতে পারে।

আর সেইসময় বাইরে কেউ এসে ডাকল, গাজিসায়েব আছ নাকি ? ও সদু !

বড়োগাজি দরজার দিতে ঘুরে সহাস্যে বলে উঠলেন, হ্যাল্লোও ! এ বোলট ফ্রম দা ব্লু বলব, নাকি মেঘ না চাইতেই পানি বলব ?

শফি ঘুরে দেখে, বারুচাচাজি।

দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরী ঘরে ঢুকেই শফিকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, ও কী রে ? তলোয়ার নিয়ে কী করছিস তুই ? তারপর বড়োগাজিকে বললেন, ডন কুইকজোটিক কারবার কবে ছাড়বে ভাই, সদু ? বয়স তো কম হল না।

শফি তলোয়ার টেবিলে রেখে বারুচাচাজির পদচুম্বন করতে এল। কিন্তু তিনি তাকে বাধা দিলেন। গম্ভীরমুখে বললেন, খোনকারের বাড়ি হয়ে আসছি। খোনকারের ছেলে বলল তুই এখানে আছিস। আয় !

বড়োগাজি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।... চলে যাচ্ছ কী ? কী হয়েছে, বলবে তো ?

বারিমিয়াঁ বললেন, পরে বলব'খন।

বাইরে গিয়ে শফি দেখল একটা কালো ঘোড়া বাঁধা আছে নিমগাছের গোড়ায়। বারুমিয়াঁ সেদিকে পা বাড়িয়ে বললে, মৌলাহাট থেকে আসছি। তোদের বাড়ির খবর

ভালোই। তবে — চল্, যেতে-যেতে বলছি। ইন্দ্রাণীর কাছারিবাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম সেই ভোরে। মৌলাহাটে গিয়ে নাস্তাপানি করিনি। চল্, ইন্দ্রাণীর আগেই ফতেপুর বাজারে কিছু খেয়ে নেব।...

....all my blood has turned
into her black poison/I am
the sinister glass in which
the shrew beholds herself.
—Baudelaire

কালো ঘোড়াটির পিঠে জিনের বদলে পুরু তুলোর গদি এবং তার ওপর নকশাদার গালিচার সঙ্গে লাল জাজিম চাপানো ছিল। ঘোড়াটির কপালে সাজানো ছিল পেতলের ঝকঝকে কলকা গড়নের সাজ। তাতে দুটি তলোয়ার আড়াআড়িভাবে খোদিত এবং শীর্ষে একফালি চাঁদ-তারা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এটি বুঝি মহরম অনুষ্ঠানে সেই দুলদুল। আসলে এইসব প্রতীক ছিল নবাববাহাদুরের নবাবি ঐতিহ্যের ইজ্জতের স্মারক। নবাববাহাদুর তাঁর প্রিয় দেওয়ানকে ঘোড়াটি উপহার দিয়েছিলেন। আর সেই কালো এবং নবাবি ইজ্জতের প্রতীক ঘোড়াটির পিঠে দেওয়ান বারি মিয়াঁ যখন শফিকে দুহাতে তুলে ধরে বসিয়ে দিলেন, শফি বুঝতে পারল, মানুষটির গায়ের জোরও কম নয়।

প্রথমে কিছুক্ষণ ঘোড়াটি কদমে হাঁটছিল। চাষাভুষো মানুষজন সসম্ভ্রমে রাস্তার দুধারে সরে দাঁড়াচ্ছিল। সকলেই আদাব বা সেলাম দিচ্ছিল দেওয়ানসাহেবকে। স্ত্রীলোকেরা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে দেখছিল। শফি বারি চৌধুরীর পেছনে পুতুলের মতো বসে ছিল। সে প্রশ্ন করতে চায়নি, এভাবে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেদিন ঠিক এমনি করে বারিমিয়াঁ তাকে হাতির পিঠে চাপিয়ে উলুশরার জঙ্গলে নিয়ে যান, সেদিনও তো সে প্রশ্ন করেনি!

তবে আজ তার এভাবে যাওয়ার মধ্যে চাপা একটা আড়ষ্টতা ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, সেদিন হাতির পিঠে যাওয়ার সঙ্গে আজকের এই ঘোড়ার পিঠে যাওয়ার মধ্যে একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। হরিণমারা পেরিয়ে গিয়ে শুকনো খটখটে সড়কে

পৌঁছে বারি মিয়াঁ বললেন, আমাকে চেপে ধরে থাক এবার। নইলে ছিটকে পড়ে যাবি। তারপর শফি দেখল কালো ঘোড়াটি ছুটতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল শফি। একটু ভয়ও পেল। নিঃসাড় দুহাতে বারিমিয়াঁকে জোরে আঁকড়ে ধরল সে। আর সেই সময়, জীবনে এই প্রথম গতির সঙ্গে পরিচয় হল তার ; সে গতি এমনই দ্রুততাপূর্ণ, এমনই দুর্দান্ত যে চরাচরের যাবতীয় রঙ-রূপ ও স্থিতি এককার হয়ে উলটো দিকে অপাসৃত হতে থাকল। দুধারের বিস্তীর্ণ ধানখেত, ঘাস, গাছপালা, সবকিছুই হয়ে উঠল দাগড়া-দাগড়া সবুজ রঙের বিশাল একটা পোঁচ। শফি এই প্রথম গতি চিনল এবং জানল। সেই গতি তার শরীরকে কিছুক্ষণের জন্য জড়পিণ্ড করে ফেলল। তার চোখে পার্থিব সবকিছুই নিজস্বতা হারিয়ে একাকার হয়ে উঠল। সে জানল, গতি দুর্বার হলে মানুষ তার দৃষ্টিশক্তি যেন হারিয়ে ফেলে। সে অন্ধ হয়ে ওঠে। বাদশাহি সড়ক এবার ঢালু হয়ে উতরায়ে নেমেছে। জায়গায়-জায়গায় খানাখন্দে জল কাদা রয়েছে। কালো ঘোড়াটি প্রতিটি খানাখন্দ পার হবার সময় গ্রীবা আর মাথাটি উঁচু করে লাফ দিচ্ছিল আর প্রতিবার বারিমিয়াঁ শফিকে হুশিয়ার করে দিচ্ছিলেন। শফি আরও জোরে আঁকড়ে ধরছিল তাঁকে। কিছুক্ষণ পরে রাস্তা আবার শুকনো হয়ে উঠল। চড়াইয়ের দিকে মাথাতোলা রাস্তার দুপাশে এবার বাঁজা ডাঙা, তালগাছের সারি, কোথাও ঢিবির ওপর জীর্ণ মন্দির বা ভেঙেপড়া মসজিদ। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধুলো উড়ছিল। বারি মিয়াঁ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, এদিকটায় এবার চাষবাস হয়নি। নেচার বড়ো খেয়ালি, শফি ! ফতেপুর অব্দি এই অবস্থা।

ফতেপুর চটি বলতে গোটাকতক দোকানপাট। প্রকাণ্ড এক বটের তলায় গোরুমোষের গাড়ি। দুটো এক্কা ঘোড়াগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সওয়ারিদের সঙ্গে কোচোয়ানের দরকষাকষি চলেছে। দেকানপাটের সামনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় কিছু খাচ্ছে। একটা অশত্থগাছের ধার ঘেঁসে একটা মন্দির। তার উঁচু চত্বরে বসে আছে জনাদশেক সাধু। ছাইমাখা শরীর, মাথায় জটা, কোমরে একটুকরো লাল কৌপিন। তারা গাঁজার ছিলিম টানছে। বারি চৌধুরীর ঘোড়া থামতেই সামনের ময়রা-দোকান থেকে একটা কালো ঢ্যাঙা গড়নের লোক, পরনে হাঁটু অব্দি খেঁটে ধুতি, খালি গা, গলায় তুলসীকাঠের মালা, হন্তদন্ত বেরিয়ে এসে আদাব দিল। দোকানের সামনে ছোট্ট বাঁশের মাচা। তার ওধারে একটি আটচালা। আটচালায় একদল লোক বসে তর্কাতর্কি করছিল। তারাও চুপ করে গেল এবং কালো ঘোড়াটিকে অবাক চোখে দেখতে থাকল। ময়রা লোকটি আদাব দিয়েই ঝটপট একটা কম্বল এনে বাঁশের মাচায় বিছিয়ে দিল। তখন বারিমিয়াঁ বললেন, বসব না হরিনাথ। রসকরা বা মনোহরা যা হোক কিছু দাও। বলে শফির দিকে ঘুরলেন। — হরিনাথের রসকরা খুব বিখ্যাত, বুঝলি শফি ? আষাঢ়ে আমাদের ইন্দ্রাণী কাছারিবাড়িতে পুন্যার (পুণ্যাহ)দিন একমণ করে রসকরা লাগে। প্রজারা কাছারিতে ভেট দিতে আসে। তাদের কিঞ্চিৎ মিষ্টিমুখ করাতে হয়।

হরিনাথ একগাল হেসে শফির উদ্দেশে বলল, তা দেওয়ানসাহেব ঠিকই বলেছেন, বাবা ! শুধু ইন্দ্রাণী কেন, হরিণমারার জমিদারবাবুদের বাড়িতে শুভকাজ হলেই এ হরিনাথকে তক্ষুনি তলব। আপনারা বসুন দয়া করে।

বলে সে দোকানে ঢুকল। বারিমিয়াঁ বললেন, কী রে শফি ? তুই মুখ গোমড়া

করে আছিস কেন ?

শফি হাসবার চেষ্টা করে বলল, না তো। এমনি। বারি চৌধুরী মিটিমিটি হেসে বললেন, বড়োগাজির কাছে তলোয়ারখেলা শিখছিলি। আমি হঠাৎ গিয়ে বাগড়া দিলাম বলে রাগ করে আছিস বুঝি ? কাছারিবাড়িতে চল্ না। দেখবি, আমারও তলোয়ার আছে।

শফি আসলে তখনও শরীর থেকে গতির ঝাঁকুনি আর জড়তাটা কাটাতে পারে নি। বারি মিয়াঁ তার হাত ধরে বাঁশের মাচানে পাতা কম্বলের ওপর বসালেন। তারপর পাশে বসে বললেন, রসকরা খেয়েছিস কখনও ?

শফি আস্তে বলল, বড়োগাজির সঙ্গে আমি নাশতা খেয়েছি। আর কিছু খাব না, চাচাজি।

তোকে নাশতা খাইয়েছে বড়োগাজি ? বারি মিয়াঁ হেসে উঠলেন। খুব ভালো। ওকে আমি বলে রেখেছিলাম তোর দিকে নজর রাখতে। কারণ খোনকারের ছেলেটাকে আমি জানি। ভীষণ বখাটে ছেলে। ওর স্বভাবচরিত্রও নাকি ভালো নয়। এই বয়সেই কীসব কেলেঙ্কারি করে বসে আছে। তুই নিশ্চয় জানিস !

শফি অবাক চোখে তাকাল। সে জানে না।

হরিনাথ দুটি শালপাতার ঠোঙা এনে বলল, নিন দেওয়ান সাহেব।

শফি লক্ষ্য করল, সে দেওয়ানসাহেবের ছোঁয়া বাঁচাতে ডানহাতের ঠোঙাটি একটু ওপরে থেকে প্রায় থপাস করে ফেলে দিল। তার অবাক লাগল, বারি চাচাজি দুহাত পেতে ঠোঙাটি লুফে নিলেন। শফি গোঁ ধরে বলল, আমি কিছু খাব না।

হরিনাথ একটু সাধাসাধির ভান করল। কিন্তু শফি হাত বাড়াল না। তখন বারি মিয়াঁ বললেন, ঠিক আছে, হরিনাথ। এতেই হবে। তুমি বরং জলের ব্যবস্থা করো।

বারি মিয়াঁ নিজের ঠোঙা থেকে একটা রসকরা তুলে জোর করে শফির মুখে গুঁজে দিলেন। শফি আড়ষ্টভাবে রসকরাটি গিলে ফেলল। মিষ্টান্নটি সুস্বাদু। কিন্তু এ মুহূর্তে তার কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল না। একটু পরে হরিনাথ একটি কাচের গেলাস এনে কম্বলের ওপর রাখল। বারি মিয়াঁ শফিকে বললেন, গেলাসটা ধর শফি ! হরিনাথ, ওকে জল দাও।

শফি গেলাসটি ধরলে হরিনাথ ঘটি থেকে আগের মতোই ছোঁয়া বাঁচিয়ে জল ঢেলে দিল। শফি গেলাসটা ধরে আছে দেখে বারি মিয়াঁ বললেন, কী ? পানি খাবি নে ?

শফি মাথা নাড়ল।

বারিমিয়াঁ ধমকের সুরে বললেন, তোর কী হয়েছে বল্ তো ? মিষ্টি খেলি অথচ পানি খাবি নে কেন ?

হরিনাথ হেঁ-হেঁ করে হেসে বলল, খাও বাবা জল খাও ! মিষ্টি খেয়ে জল না খেলে অম্বলের ব্যামো হয়। অগত্যা শফি জলটা খেয়ে ফেলল। তার রাগ হচ্ছিল, এই ময়রা লোকটি তাদের অত খাতির করছে। অথচ ছুঁতে চাইছে না। এদিকে কম্বলখানা যে পেতে দিয়েছে, তাতে তারা বসে আছে — এই কম্বলখানাও কি সে ছোঁবে না ? এই সময় তার মনে পড়ে গেল, হরিণমারা স্কুলের গেটে বিস্কুটওয়ালা বদলচাঁদের কথা। বদলচাঁদ তো হাতে হাতে বিস্কুট দেয় মুসলমান ছাত্রদের !...

কিছুক্ষণ পরে বারি মিয়াঁ জল খেয়ে গ্লাসটি কম্বলের ওপর রেখে পয়সা মেটালেন। হরিনাথ দুহাত পেতে লুফে নেওয়ার ভঙ্গিতে পয়সা নিল। আবার আদাব দিল। বলল, অধমের দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন, দেওয়ানসাহেব। কাছারিবাড়িতে গিয়ে দেখা করব'খন। একটুখানি নালিশ আছে।

কালো ঘোড়াটি মাচানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। পাথরের ঘোড়ার মতো সে স্থির। রাস্তার ওধারের বটগাছটি খানিক ছায়া পাঠিয়ে দিয়েছিল মাচান অব্দি। বারি চৌধুরী উঠে গিয়ে ঘোড়াটির গালে মৃদু থাপ্পড় মেরে আদর করতে-করতে বললেন, তোমার আবার কী নালিশ, হরিনাথ?

হরিনাথ করজোড়ে চাপা স্বরে বলল, আমার জ্যাঠতুতো দাদা — সেই অম্বিকা, সেই যে সেই—

বারি মিয়াঁ বললেন, কী করেছে অম্বিকা?

হরিনাথ ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বলল, নগদ সাত টাকা পাঁচ আনা সেলামি গুনে দিয়ে অনাবদি জমিখানার বন্দোবস্ত নিয়েছি। নায়েবমশাই সাক্ষী — জিগ্যেস করে দেখবেন হুজুর! এখন অম্বিকা বলছে, ওই জমি নাকি আমার ঠাকুর্দার বন্দোবস্ত নেওয়া ছিল। আগের বছর ইস্তফা দিয়ে এসেছিল! আমি বললাম, বেশ — সেই ইস্তফানামা কাগজপত্র দেখাও!

বারি মিয়াঁ শফিকে বললেন, উঠে পড় শফি। শফি রেকাবে পা রেখে ঘোড়ার পিঠে চাপল। তারপর একটু পিছিয়ে বারি মিয়াঁকে জায়গা করে দিল। শফি সেই মুহূর্তে আবার টের পেল, কালো ঘোড়াটির শরীর থেকে একটা জোরালো স্পন্দন তাব শরীরে সংক্রামিত হচ্ছে। বারি মিয়াঁ ঘাড় ঘুরিয়ে হরিনাথের উদ্দেশে বললেন, ইস্তফাদেওয়া জমি নতুন বন্দোবস্ত দিলে তাতে আগের মালিকের হক থাকে না।

ঘোড়াটির যখন কদমে পা ফেলেছে, তখনও হরিনাথ করজোড়ে অনুসরণ করে জোর জলায় বলছিল, বলুন — বলুন তাহলে এটা অন্যায্য কি না!...

হঠাৎ ঘোড়াটি ছুটতে শুরু করল। শফি আবার আঁকড়ে ধরল বারি চৌধুরীকে। বাদশাহি সড়ক আবার ঢালু হয়ে নেমে গেছে। আবার দুধারে দাগড়া-দাগড়া সবুজ শস্যক্ষেত্র, জটপাকানো ঝোপঝাড়, গাছপালা। আবার খানাখন্দ, জলকাদা। তারপর ঘোড়াটি থামল। সামনের প্রাচীন সাঁকোটি ভাঙা। একফালি অপ্রশস্ত কাঁদর দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার ডানদিকে ঢালের ওপর গোবুমোষের দাগ। নিচের একটা ঘাসজমি পেরিয়ে দাগগুলো জলের ধাবে শেষ হয়েছে। ওপাবে আবার সেই দাগগুলো ব্যানাকাশের জঙ্গল চিরে এগিয়ে গেছে। শিক্ষিত ঘোড়াটি সেই পথে নেমে সাবধানে জল পেরিয়ে ওপারে পৌঁছুলে বারি মিয়াঁ বিরক্তমুখে বললেন, জেলাবোর্ডের এই সাঁকোটা মেরামত করার কথা। তদ্বির করে-করে হন্যে হয়ে গেছি। বড়োগাজিকেও বলেছি। কোনো লাভ হয়নি। আর স্থানীয় লোকেরাও যেমনি কুঁড়ে তেমনি বদমাইশ। এখানে প্রায়ই রাতবিয়েতে রাহাজানি হয়। গাড়োয়ানদের খন্দের বস্তা লুঠ হয়। তবু কেউ কিছু করবে না। ডিসট্রিকট কালেকটার ম্যাকফার্সনা সায়েবকে না ধরলে কাজ হবে না দেখছি।

ঘোড়াটি আবার ভালো রাস্তা পেয়ে দুলকি চালে হাঁটতে লাগল। বারি মিয়াঁ তাকে ছোটাতে চাইছিলেন না, সেটাই কারণ। কিছুক্ষণ পরে বারি মিয়াঁ সামনে একটা

প্রকাণ্ড ঢিবির ধারে একটি বটগাছ দেখিয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে একটু বসব আমরা। কেন তোকে এভাবে হঠাৎ তুলে নিয়ে এলাম, তোকে বলা দরকার।

এই বটতলাটি জনহীন। মৌলাহাটের দীঘির মতোই একটি বিরাট দীঘি দেখা যাচ্ছিল দুটি ঢিবির মাঝখান দিয়ে। কিন্তু তেমন কোনও বাঁধানো ঘাট দেখতে পেল না শফি। তবে বটগাছের পেছনে ঢিবির পারে ভেঙেপড়া একটা মসজিদ দেখল সে। প্রকাণ্ড সব পাথরের চাঙড় গড়িয়ে এসে বটগাছের গোড়ায় আটকে আছে। ঘোড়া থামিয়ে দুজনে নামল। ঘোড়াটা আগের মতো পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

একটা চাঙড়ে বসে বারি মিয়াঁ বললেন ; ·ঙ্গে বন্দুক থাকলে আজ আমি ওই হারামজাদি মেয়েটাকে গুলি করে মেরে আসতাম।

শফি তাকাল। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না।

বারি মিয়াঁ বললেন দরিয়াবানুর সঙ্গে আজ আমার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি ওকে বোঝাতে গিয়েছিলাম, রোজির সঙ্গে নুরুজ্জামানের শাদি দেয় তো দিক। রুকুর জন্য বরং অপেক্ষা করুক। শফি লায়েক হোক। লেখাপড়া শেখা শেষ হোক। তখন না হয় রুকুর সঙ্গে তার শাদি হবে। কিন্তু দরিয়াবানুর এক কথা। একই সঙ্গে দুই বেটির শাদি হবে। তার চেয়ে সাংঘাতিক কথা, ওই ধূর্ত মেয়েছেলে আগেই টের পেয়েছিল, আমি তোর শাদিতে নারাজ। তাই কী করেছে জানিস ? বিয়ের তারিখ এগিয়ে এনেছে। সামনে শুক্কুরবার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। তুই তো জানিস, তোর আব্বা মসজিদেই থাকেন। সাংসারিক ব্যাপারে আর মাথা ঘামাচ্ছেন না। তাঁর কথা হল, যা করার তা নুরু আর তোর মা করুন। তাতে তাঁর অমত হবে না। আর ব্যস ! দরিয়াবানু কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে।

একটু চুপ করে থাকার পর শ্বাস ফেলে বারি চৌধুরী বললেন, তোর আব্বা বা তোর বড়ো ভাই আলেম লোক। তার ওপর ওহাবি না ফরাজি। ওঁরা আশরাফে-আজলাফে (উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণে) বিশ্বাস করেন না। আমি ধর্মটর্ম মানি না। কিন্তু আমিও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদে বিশ্বাস করি না। তবে আমি জানি, এড়ুকেশান-কালচার বলে একটা ব্যাপার আছে। সেদিক থেকে আশরাফ-আজলাফ না মেনে পারা যায় না। দরিয়াবানু আজলাফ ঘরের মেয়ে। তার রুচি আলাদা। সে এড়ুকেশান-কালচার বোঝে না। সে শিক্ষার মূল্য কী জানে না।

বারি চৌধুরী চুপ করলেন। একটু পরে শফি মৃদুস্বরে বলল, আপনি আব্বার সঙ্গে দেখা করেননি ?

করেছিলাম।

আব্বা কী বললেন ?

বারি মিয়াঁ একটু হাসলেন।...দরিয়াবানু আর তোর বড়ো ভাই যা বলছে, তাই বললেন। তবে তোর বড়ো ভাই আলেম হয়ে দেওবন্দ্ থেকে ফিরেছে। সে আমাকে খুব তম্বি করল। হুমকি দিল। বলল, আমি নাকি হিন্দুদের স্কুলে খ্রিস্টানি শেখাচ্ছি। শুনেছি, তোর বড়ো ভাই নাকি তোর আব্বার সঙ্গেও আজকাল কোরান-হাদিস নিয়ে তর্ক করে। সেদিন, নাকি মসজিদ-ভরা লোকের মধ্যে তোর আব্বাকে নুরু চার্জ করেছিল, কেন উনি তোকে 'কুফরি কালাম' (বিধর্মীর বিদ্যা) শিখতে দিয়েছেন ?

তোর আব্বা ওকে থাপ্পড় তুলে মারতে এসেছিলেন। লোকেরা নুরুকে টানতে-টানতে সরিয়ে নিয়ে যায়।

শফি উঠে দাঁড়াল।...আমার এসব শুনতে ইচ্ছে করছে না। ইন্দ্রাণী আর কতদূর ?

বারি মিয়াঁ আস্তে বললেন, আর ক্রোশ দুই মাত্র। চল্, রওনা হওয়া যাক।

ইন্দ্রাণীতে নবাববাহাদুরের কাছারিবাড়িটি বিশাল। গেটে দুজন সঙ্গীনধারী দারোয়ান আছে। তিনদিকে সারবন্দি অনেকগুলো ঘর। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের অংশটি দোতালা। নিচের ঘরগুলিতে খাজাঞ্চিখানা, সেরেস্তা, মহাফেজখানা এইসব। প্রজাদের ভিড়ে কাছারিবাড়িটি গিজগিজ করছে। মাঝখানে খোলামেলা বিশাল এক চত্বর। দুধারে পাম আর ঝাউগাছের সারি। টুকরো-টুকরো কিছু ফুলবাগিচা। একখানে পুরনো ফোয়ারা। কিন্তু ফোয়ারাটি শুকনো। মাঝখানের যে স্তম্ভের ছিদ্র দিয়ে জল ছড়িয়ে পড়ত, তার মাথায় একটি মার্বেলের পরি সামনে ঝুঁকে কুণ্ডে জল ভরার ভঙ্গি করছে।

গেটের দুধারে দুটি কাঠমল্লিকা ফুলের গাছ। সেই ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ শফিকে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল মৌলাহাটের খোঁড়াপিরের মাজারে রুকু-রোজির সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই আশ্চর্য সময়টির কথা। আর তখনই সে আবিষ্কার করেছিল, একটা কালো ঘোড়া তাকে রুকুর কাছ থেকে দূরে — বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের জন্য অসহায় অস্থিরতায় তার বুকের ভেতরটা কেঁপে-কেঁপে উঠেছিল।

দোতালার কয়েকটি ঘর নিয়ে সপরিবারে বাস করেন এসটেট ম্যানেজার প্রফুল্লরতন সিংহ। পাশেই হলঘরে মতো একটি ঘর দেওয়ানসাহেবের জন্য সব সময় সাজানোগোছানো থাকে। ঘরের দেয়ালে হরিণ আর বাঘের স্টাফকরা মাথা, নবাববাহাদুরবংশের লোকেদের বড়ো-বড়ো সব তৈলচিত্র, একখানে একটি টেবিলআয়না। বড়ো-সড়ো সব জানলা। মাঝখানে কয়েকটা সুদৃশ্য গদিআঁটা চেয়ার আর মধ্যিখানে মার্বেল পাথরেব ডিমালো একটি টেবিল। একধারে একটি পালঙ্কে বিছানা পাতা। বড়োগাজির ঘরটিকে একপলকেই তুচ্ছ ক'রে ফেলেছিল এই ঘর। শফি অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। প্রফুল্লবাবু কথা বলছিলেন বারি চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁরা কথা বলতে-বলতে খোলা ছাদের দিকে এগিয়ে গেলে শফি উত্তরের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল সামান্য দূরে একটা ছোট্ট নদী। নদীর এধারে নিচু বাঁধ। হিজল-জারুল-জামগাছের সারি। নদীটি কানায়-কানায় ভরা। ওপারে শাদা কাশফুলের ভেতর একটি কুঁড়েঘর। তার সামনে একটা গাবগাছের তলায় বাঁশের মাচান। মাচানে বসে এক প্রায়-ন্যাংটো লোক তকলি ঘুরিয়ে সুতো কাটছে। জনহীন কাশবনের ভেতর একলা এক কুঁড়েঘর আর এক মানুষ শফিকে অবাক করে রাখল কিছুক্ষণের জন্য।

তারপর সে দক্ষিণের জানালায় গেল। নিচের প্রাঙ্গণ, পাম আর ঝাউগাছের সারি, ফুলবাগিচা, মৃত ফোয়ারা ও পরি আর তার ওধারে সেই হাতিটিকে শিরীষগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সে সাতমার কাল্লু পাঠানকে খুঁজল। কিন্তু দেখতে পেল না কোথাও।

প্রফুল্লবাবু আর বারি মিয়াঁ ঘরে ঢুকলে সে ঘুরে দাঁড়াল। প্রফুল্লবাবু বেঁটে

গাব্দাগোব্দা মানুষ। মাথায় টাক আছে। গোঁফটি প্রকাণ্ড। ভুরু কুঁচকে এবং মিটিমিটি হেসে শফিকে বললেন, কী ? দেওয়ানসাহেবের পাল্লায় পড়ে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে গেছ দেখছি ! বসো, বসো ! একটু জিরিয়ে নাও। তারপর কথাবার্তা হবে।

এইসময় উরদি-পরা একটি লোক ট্রেতে দু-গ্লাস শরবত এনে টেবিলে রাখল। প্রফুল্লবাবু শফির হাত ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। বারি মিয়াঁও বসলেন। প্রফুল্লবাবু যখন একটা গ্লাস তুলে শফির দিকে এগিয়ে দিলেন, সে গ্লাসটি নিল। আর তখনই এই হিন্দু মানুষটিকে তার আপন মনে হল। হরিনাথ কি এঁর চেয়েও উঁচুদরের মানুষ ?

প্রফুল্লবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, বাল্যবিবাহ মন্দ না ! দেওয়ানসাহেব তা যাই বলুন ! এই দেখো না, আমার বিয়ে হয়েছিল ঠিক তোমার বয়সে। তখন আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র। এফ. এ পড়ার বছর আমি ছেলের বাপ হলাম। মন্দ কী।

বারি মিয়াঁও হাসলেন।...ঘরের শত্রু বিভীষণ একেই বলে ! সিঙ্গিমশাই, ওকে তাতাবেন না।

প্রফুল্লবাবু মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে বললেন, আলবত তাতাব। লোককে তাতানোই আমার কাজ।

বলে শফির দিকে ঝুঁকে চাপা স্বরে সকৌতুকে বললেন ফের, দেওয়ান সাহেবকে তুমি কী বল ?

শফি সলজ্জ হেসে বলল, চাচাজি !

ঠিক আছে। আমাকে তুমি কাকাজি বলবে।

বারি মিয়াঁ বললেন, দ্যাটস এ টার্কি ওয়ার্ড সিঙ্গিমশাই ! মুসলিমতুর্কিদের ভাষা।

আপনাকে নিয়ে পারা যায় না চৌধুরীসায়েব ! প্রফুল্লবাবু শফির দিকে ঘুরলেন — ওঁকেও চাচাজি বলবে, আমাকেও চাচাজি বলবে। এটা হয় না। চাচাজি আর এই কাকাজি এক বস্তু নয়। থাকো কিছুদিন — হাড়ে-হাড়ে টের পাবে।

বারি মিয়াঁ বললেন, জানো তো শফি, সিঙ্গিমশাই মুখে বলছেন বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী। এদিকে এখনও দুই মেয়ের বিয়ে দেননি। তাদের দিব্যি শহরের স্কুলে কলেজে পড়াচ্ছেন।

প্রফুল্লবাবু সে-কথায় কান না করে উঠে পড়লেন।...ওসব থাক চৌধুরীসায়েব। বারোটা বাজে প্রায়। এবেলা শুনলাম মেহমানখানায় আপনাদের খাওয়া রেডি করেছে। যাই হোক, ওবেলা এই বান্দার ঘরে দুমুঠো খেতে হবে। কী গো ? তুমি নাকি পিরসায়েবের ছেলে। খাবে তো হিন্দুবাড়ি ? তোমার এই চাচাজি ভদ্রলোকের কিন্তু বহু আগে জাত গেছে !

বারি মিয়াঁ চোখে ঝিলিক তুলে বললেন, জাত কি আপনারও যায়নি সিঙ্গিমশাই ?

ঠোঁটে আঙুল রেখে প্রফুল্লবাবু বললেন, চুপ, চুপ।...

দুপুরে শফি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেলে কার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখল উদরদিপরা সেই লোকটা চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আদাব দিয়ে বলল, আর ঘুমোবেন না খোকামিয়াঁ ! উঠে পড়ুন।

শফি উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, চাচাজি কোথায় ?

দেওয়ানসাহেবের কথা বলছেন তো ? উনি তোপপাড়া গেছেন। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।

সে সসম্ভ্রমে চায়ের পেয়ালাটি শফির হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। শফি পেয়ালাটি হাতে দিয়ে দক্ষিণের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

নদীর ওপারে কুঁড়েঘরের লোকটি এখন ভরা নদীতে জাল ফেলছে। বিকেলের রোদ টেরচা হয়ে পড়েছে নদীর বাঁকের ওপর। এপারের বাঁধে দাঁড়িয়ে আরেকটা লোক ওপারের লোকটিকে চিৎকার করে কিছু বলছে। এপারের লোকটিকে একটু পরেই চিনতে পারল শফি। এ সেই সাতমার কাল্লু পাঠান। এখন তার পরনে লুঙ্গি, গায়ে কুর্তা, রীতিমতো মিয়াঁসাহেবটি। শফি চা শেষ করে নিচে নেমে গেল।

বিকেলেও সেরেস্তা আর খাজাঞ্চিখানায় লোকজনের ভিড়। শফি ফোয়ারাটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শাদা পাথরের পরিমূর্তির দিকে তাকিয়ে আবার তীব্রভাবে বুকুর কথা তার মনে পড়ে গেল। আর তখনই একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসল, সে কি চুপিচুপি পালিয়ে যাবে ? বারিচাচাজি নেই। কেউ তাকে বাধা দেবার নেই। হঠকারিতায় সে গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেল। গেটের দুধারে দুটি কাঠমল্লিকাফুলের গন্ধ তার সেই হঠকারিতার গতি বাড়িয়ে দিল। শফি রাস্তায় পৌঁছুল।

ইন্দ্রাণী গ্রামটি কাছারিবাড়ির পেছনদিকটায় শুরু হয়েছে। বাদশাহি সড়ক গেছে তার মাঝখান দিয়ে। কয়েক পা এগিয়ে গেছে, কাল্লু পাঠানের ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল শফি। ঘুরে দেখল, কাল্লু হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে আসছে। শফির বুকে রক্ত ছলকে উঠল। এই লোকটিকে কি তাহলে বারিচাচাজি তার পাহারায় রেখে গেছেন ?

কাল্লু সেলাম ঠুকে বলল, ছোটাসাব ! আপনি এসেছেন, হামি খবর পেয়েছে। তো উধার কাঁহা ঘুমতে যাচ্ছেন ? আসেন, আসেন। হামি আপনাকে ঘুমিয়ে লিয়ে আসি।

শফি দাঁড়িয়ে আছে দেখে কাল্লু চোখ নাচিয়ে বলল, গাওঁকি অন্দর কী দেখবেন ছোটোসাব ? উধার কুছ ভি দেখনেকা নেহি আছে। আসেন, আপনাকে কোঠিবাড়ির জঙ্গল দেখিয়ে লিয়ে আসি।

সে হাত তুলে উত্তরদিকের ঘন গাছপালাঢাকা একটা জায়গা দেখাল। শফি বলল, না। আমি কোথাও যাব না।

কাল্লু খ্যা খ্যা করে অদ্ভুত হাসল।...তো ঠিক হ্যায় ! লেকিন গাঁওকি অন্দর মাত্ যাইয়ে।

শফি বলল, কেন ?

গাঁওবালেকি সাথ হামলোগোঁকা বহত ঝামেলাউমেলা চলছে। উও মাহিনা কাছারিতে হামলা কোরতে এল ; তো মেনিজারবাবু পাইক ভেজে সব ঠাণ্ডা করে দিল।

আজ তো চাচাজির সঙ্গে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে এলাম !

কাল্লু আবার হাসল।...দেওয়ানসাবের কথা আলাদা আছে। উনহিকে কৈ কিছু বলবে ইয়ে হিম্মত কার আছে বোলেন ? আরে ছোটাসাব, উনহি তো সব কাজিয়া রফা করে দিলেন।...কাল্লু চাপা স্বরে বলল, ওহি যো মেনিজারবাবু আছে না ?

উনহি খালি ঝুটঝামেলা কোরবেন — ফিকির কোরবেন। লেকিন ছোটাসাব, আপকা গোড় পাকড়ে বলছি, মেনিজারবাবুর কাছে বোলবেন না।

শফি আবার কাছারিবাড়িতে এসে ঢুকল। কাল্লু বারবার তাকে চাপা স্বরে অনুরোধ করছিল, ম্যানেজারবাবুর কানে কথাটা যেন না যায়। ফোয়ারার কাছে পৌঁছে শফি বলল, আমি কি কাছারিবাড়ির লোক যে আমাকে মারবে?

কাল্লু চলল, কুছু বিশোয়াস নাই ছোটাসাব। আপনাকে দেওয়ানসাহেবের সঙ্গে আসতে দেখেছে কী না বোলেন? তো ব্যস, আপনিভি কাছারির লোক হয়ে গেছেন।...

সে রাতে বারি চৌধুরী ফিরে আসার পর শফি জানতে পেরেছিল, কাল্লু পাঠান মিথ্যা বলেনি। বিশাল ইন্দ্রাণী পরগনা জুড়ে কিছু ছিট মহল আছে। সেগুলোর মালিক হিন্দু বা মুসলিম জমিদার। নবাবি মহলের সঙ্গে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধে। ইন্দ্রাণী গ্রামটি এক মুসলিম জমিদারের এলাকাভুক্ত। সম্পর্কে তিনি হরিণমারার বড়োগাজির আত্মীয়। মাঝে-মাঝে বড়োগাজি এসেও রফা করে দিয়ে যান। গ্রামটি মোটামুটি মুসলিমপ্রধান। এদিকে নবাবি এসটেটের ম্যানেজার প্রফুল্ল সিঙ্গি মুখে যত অমায়িক হোন, অতিশয় ধূর্ত মানুষ। তাঁর কী অভিসন্ধি ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু বারি চৌধুরী জানেন, উনিই সব সংঘর্ষের প্ররোচনা দিয়ে থাকেন। খোলা ছাদে বসে যখন চাপাস্বরে বারি চৌধুরী শফিকে এসব কথা বলছিলেন, সেই সময় প্রফুল্লবাবু এলেন লণ্ঠন হাতে। বললেন, আপনারা অন্ধকারে এখানে বসে — এদিকে হরিবন্ধু আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আসুন, আসুন। আহারাদি প্রস্তুত।

সত্যিই প্রস্তুত অবশ্য হয়নি। ঝাড়লণ্ঠনটি জ্বলছে সন্ধ্যা থেকে। শাদা টেবিলে শুধু একটি জলের পাত্র। সেটি চীনেমাটির এবং কারুকার্যকরা। ওধারের ঘর থেকে দুটি লোক প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় ভাত নিয়ে এল। ট্রেতে সাজিয়ে একগুচ্ছের তরিতরকারির বাটি আনল। এই প্রথম শফি হিন্দুবাড়ির রান্না খেতে চলেছে। প্রকাণ্ড থালার পাশে কী-সব ভাজাভুজি আর সবজির দলা দেখে সে পার্থক্যটা বুঝতে পারছিল।

একটু পরে ঘোমটা টেনে এক প্রৌঢ়া হিন্দু মহিলা এলেন। বারি চৌধুরীকে আদাব দিয়ে শফিকে দেখিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, এই বুঝি আপনাদের পিরসাহেবের ছেলে?

প্রফুল্লবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, দেখে কী মনে হচ্ছে বলো?

সিঙ্গিগিন্নি বললেন, চেহারা দেখে মনে হয় বাঙালির ছেলে। মুসলমান বলে চেনাই যায় না।

বারি চৌধুরী একটু হেসে বললেন, আপনাদের খালি ওই কথা! মনে পড়ে আমাকে প্রথমবার দেখে বলেছিলেন? আমাকে দেখেও নাকি—

সিঙ্গিগিন্নি ঝটপট কথা কেড়ে এবং বিব্রত মুখে বললেন, না-না। সেভাবে বলিনি। সত্যি তো! মানুষের চেহারায় কি কিছু তফাত আছে? তবে যাই বলুন দেওয়ানসাহেব, এই ছেলেটিকে যদি ধুতিশার্ট পরিয়ে দেন, বামুনের ছেলে মনে হবে না? কেমন টকটকে গায়ের রঙ, কেমন নাকমুখের গড়ন!

প্রফুল্লবাবু একটু তফাতে চেয়ার টেনে বসে হতাশ ভঙ্গি করে বললেন নাও

শুরু হল! আরে বাবা, পোশাকের ভেতর মানুষ তো একই? সেই দুখানা ঠ্যাং, দুখানা হাত, একটা মুণ্ডু!

বারি চৌধুরী বললেন, তবে বউদির কথায় একেবারে সত্য নেই, তা নয়। পোশাকও বটে, আবার মুখের ভাষাতেও খানিকটা পার্থক্য থেকে গেছে হিন্দু-মুসলমানে। কালচারাল ডিফারেন্স বলা যায়।

সিঙ্গিগিন্নি শফিকে দেখছিলেন। এক পা এগিয়ে এসে বললেন, বাড়িতে আর কে-কে আছে বাবা তোমার? বাবা তো শুনলাম পিরসাহেব। মা আছেন — শুনলাম। ক ভাইবোন তোমার?

শফি মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, তিন ভাই।

বোন?

বোন নেই।

বারি চৌধুরী বললেন, সমস্যা হল — মেজো ভাই প্রায় জড়বুদ্ধি। একটু বিকলাঙ্গও বলা যায়। ইদানীং নাকি কিছুটা সেরে গেছে কোন কবরেজের ওষুধ-টষুধ খেয়ে। ওদিকে ওর দাদিআম্মা — মানে ঠাকুমা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। বড়ো ভাই দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে পাস করে মৌলবী হয়ে ফিরেছে। তারপর ঘটনা বলুন, দুর্ঘটনা বলুন — হঠাৎ বড়ো ভাই — আর এই নাবালক ছেলের একই সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পরশু শুক্রবার বিয়ের দিন। কন্যা দুটি যমজ বোন। আমারই দূরসম্পর্কের এক ভাইয়ের মেয়ে। সে-ভাইটি অবশ্য বেঁচে নেই।

প্রফুল্লবাবু বললেন, আপনার বউদিকে বলেছি সব কথা।

সিঙ্গিগিন্নি শফিকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ক্লাসে পড়ছ তুমি?

জবাবটা দিলেন বারি মিয়াঁ।...ক্লাস সিক্স। অথচ এতদিনে ওর এনট্রানস পাস করা উচিত ছিল। আসলে ওর বাবা মৌলানপির মানুষ। একেবারে যাযাবর স্বভাব। আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে — এই করে সপরিবারে ঘোরেন। ফলে শফির লেখাপড়ার কনটিনিউটি থাকে না।

শফি এই প্রথম হিন্দুবাড়ির রান্না খাচ্ছিল। অন্য এক স্বাদ — যেন বড়োগাজির বাড়ির খাদ্যের চেয়েও সুন্দর একটা আস্বাদ পাচ্ছিল সে। এত ভালো ডালরান্না কখনও সে খায়নি। সামান্য শাকসবজিও যে এমন সুস্বাদু হয়, তার জানা ছিল না। ভাজা মাছের ঝোলটাও খুব তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছিল সে। খাওয়ার দিকে মন থাকায় সে ওঁদের কথাবার্তায় কান করছিল না।

ভাতের শেষে চাটনি এল। তারপর দই আর সন্দেশ। দুপুরের বিরিয়ানি আর হালুয়া আজ রাতে তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। যদিও হরিনাথ ময়রার মতো সিঙ্গিগিন্নি শফির সঙ্গে দূরত্ব রেখে কথা বলছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে স্নেহ ছিল। আর ওই স্নেহের স্বাদও তার খাওয়াটিকে মধুর করে তুলছিল।

প্রশস্ত পালঙ্কে মশারির ভেতর শুয়ে সে-রাতে শফির ঘুম আসছিল না। একটু তফাতে বারিচাচাজির নাকডাকা, বাইরে নিঝুম চরাচরে পোকামাকড়ের ডাক, তারপর হঠাৎ দেউড়িতে ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি। আর শফির মনে হল তার মা দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ কণ্ঠস্বরে কথা বলছেন। তার ইচ্ছে করছিল, চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু দেউড়িতে দারোয়ান আছে। ফটক বন্ধ। বুকুর কথা সে মন থেকে মুছে ফেললেও মাকে মুছে

ফেলতে পারছিল না। অমন করে সেদিন কেন সে হঠাৎ মায়ের ডাক পিছনে ফেলে এল, একথা ভেবে তার বুকের ভেতর থেকে একটা চাপা আবেগ ঠেলে বেরুতে চাইছিল। দেউড়ির ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে তিনবার ঘণ্টা বাজল, তখনও শফির চোখে ঘুম ছিল না।

পরদিন আব্দুল বারি চৌধুরী যখন তাকে ঘুম থেকে জাগালেন, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। বারি মিয়াঁ বললেন, ঝটপট চা-নাশতা খেয়ে নাও। আজ থেকে তোমাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাব।

শফির মনমরা ভাবটা অমনি কেটে গিয়েছিল। সেই কালো ঘোড়াটির পিঠে তাকে চাপিয়ে বারি মিয়াঁ কাছারিবাড়ির সামনের পোড়ো চটানে নিয়ে গেলেন। প্রথমে কিছুক্ষণ লাগাম নিজে ধরে পাশে-পাশে হেঁটে চললেন। তারপর লাগামটি শফির হাতে তুলে দিলেন। শিক্ষিত কালো ঘোড়াটি শফিকে মেনে নিল। ঘোড়ার চড়ার নেশা শফির পেছনের জীবনকে মুছে ফেলে আরেক জীবনে নিয়ে যেতে চাইছিল। সেই জীবন গতিময়। সে-জীবনে বুকু নেই, আর কেউ নেই। সে একা। তার মনে হচ্ছিল, এই জীবনের চেয়ে কাম্য আর কিছু থাকতে পারে না।

আর এর তিন দিন পরে বড়োগাজি হঠাৎ এসে খবর দিয়েছিলেন, দরিয়াবানুর দুই মেয়ের সঙ্গে বদুপিরের দুই ছেলের শাদি হয়ে গেছে। দিল আফরোজের সঙ্গে নুরুজ্জামানের এবং দিলরুখের সঙ্গে মনিরুজ্জামানের।

স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ

...স্পষ্ট মনে পড়ে দিনটিকে। মেঘে ঢাকা আশ্বিনের আকাশ থেকে টিপ-টিপিয়ে বৃষ্টি ঝরছিল। প্রফুল্লবাবু গম্ভীর মুখে বলছিলেন, সেবারকার মতো পাগলি খেপে না ওঠে ; এবং একটু পরেই বুঝতে পেরেছিলাম, পাগলি বলতে তিনি কাছারিবাড়ির পেছনের নদীটিকেই চিহ্নিত করছেন। তারপর প্রফুল্লবাবু যখন ক-বছর আগে কাছারিবাড়িতে বন্যার জল ঢোকার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন অবাক লেগেছিল ওই শীর্ণ বেহুলা নামের স্রোতস্বিনী যাকে এখন এই শরৎকালে বেহালার টানটান তারের মতো দেখায় — যেন ছুঁলেই টুং করে বেজে উঠবে, সে কেমন করে সব-ভাসানিয়া স্বভাব আর সাহস পায় ? আর কাল্লু আমাকে বলেছিল, চত্তির মাহিনামে তাকে

দেখলে তাজ্জব হোয়ে যাবেন ছোটাসাব ! জেরাসে — এত্তোটুকুন ভি পানি না আছে। বহত্ বালি — খালি বালি ! ঔর উও বালি চক্কর মারতে-মারতে হাওয়া কি সাথ পাগলা জিনকি মাফিক্ কাছারিমে ঘুসবে ! আঁখ অন্ধা কোরবে ! তো ছোটাসাব, বেহুলা এইসি নদীয়া আছে ! বহত খেয়ালওয়ালি আছে।

নদীর দিকে কখনও আলাদা করে তাকাতে জানতাম না তখনও। তখনও কি জানতাম আলাদা করে কিছু — ওটা গাছ, এটা মাঠ, ওটা আকাশ এটা কাশবন ? উলুশবার মাঠে সারবাঁধা গাড়ির পেছনে নিজেকে একলা করে নিয়ে হেঁটে আসতে-আসতে সেই যে একটা অবচেতনা গড়ে উঠেছিল — যার মধ্যে স্বাধীনতা আছে, যা প্রকৃতির তাই যেন কাল্লু পাঠানের সঙ্গে কয়েকটি দিনের ভ্রমণে পাগলি বেহুলার মতো টানটান বয়ে যেতে টের পেতাম। কুটিবাড়ির জঙ্গলে, ওপারে মেহবুর কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়ানো গাবগাছের ছায়ায় মাচানে বসে এক আদিম পৃথিবীর গল্প শুনতে-শুনতে একটি পরাবাস্তবতা আমাকে আবিষ্ট করত। বড়ো স্বাধীনতাময় সেই পরাবাস্তবতা যার সঙ্গে মৌলাহাটের একটি মেয়ের নিবিড় সম্পর্ক আছে। হুঁ, বুকু ছিল সেই স্বাধীনতাময় পরাবস্তাবতার দূরতম প্রান্তে দাঁড়ানো। মাঝে-মাঝে বেহুলা আর বুকু এক হয়ে যেত ! কিন্তু বারিচাচাজির সতর্ক প্রহরীর মতো সাতমার কাল্লু খাঁ যেন আমার চারদিকে কী এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ গড়ে তুলেছিল। তাই তাকে ঘৃণা করতাম। অথচ তার মধে বিস্ময়কর বহু চুম্বক ছিল — তাকে এড়ানো যেত না।

তো মেঘেঢাকা দুর্লক্ষুণে টিপটিপ বৃষ্টির দিনে ভিজে জবুথবু হয়ে যে-ঘোড়সওয়ার কাছারিবাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকছিল, প্রথমে তাকে জানালা দিয়ে আমিই দেখতে পাই। তিনিই যে হরিণমারার বড়োগাজি সইদুর রহমান, একেবারে চিনতে পারিনি। তাঁর পরনে ছিল আলিগড়ি চুস্ত পাজামা আর শাদা নকশাদার পানজাবি, মাথায় তুর্কি টুপি। ওপরের হলঘরে যখন তাঁকে সসম্মানে নিয়ে আসা হল, তখন তাঁর নেতিয়েপড়া কাদাটে মূর্তি দেখে হাসি পাচ্ছিল। কারণ কিছুদিন আগেই এই লোকটিকেই সবিক্রমে তলোয়ার সঞ্চালন করতে দেখেছি ! কিন্তু তখনও জানতাম না, তিনি কেন হঠাৎ এই দুর্যোগে এতদূর পাড়ি জমিয়েছেন ? আর ওই কাদাটে চেহারায় তাঁকে এতটুকু ক্লান্ত বা ম্রিয়মাণ দেখাল না এবং তিনি প্রথমেই সোজা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। ভিজে ঠাণ্ডা হাতে আমার একটা হাত চেপে ধরে প্রচণ্ড উল্লাসে একটি ইংরেজি বাক্য উচ্চারণ করলেন, মাই বয় ! নাও ইউ আর ফ্রি !

বারি মিয়াঁ অবাক হয়ে বলেছিলেন, ফ্রি ফ্রম হোয়াট, গাজি ?

ফ্রম ডেনজার ! বড়োগাজি এত জোরে অট্টহাসি হাসলেন যে সেই মুহূর্তের শরৎকালীন মেঘগর্জনও খানখান হয়ে গেল। বড়োগাজি বলেছিলেন ফের, ফ্রি ফ্রম ডেনজার ! মৌলানা বদিউজ্জামানের বড়ো এবং মেজো ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধু লেট তোফাজ্জেল চৌধুরীর দুই মেয়ের শাদি হয়ে গেছে গতকাল।

প্রফুল্লবাবু হেসে ফেলেছিলেন বড়োগাজির অঙ্গভঙ্গি দেখে। কিন্তু বারিচাচাজি হাসছিলেন না। সেই মেঘগর্জন ছিল বজ্রপাতঘটিত এবং আমার মনে হয়েছিল বাজটি আমার ওপর পড়েছে। বুকু ! আমার বুকু ! তাকে পাশে নিয়ে শোবে মনিভাই —

অর্ধপশু অর্ধমানব, বিকলাঙ্গ, উদ্ভট একটা প্রাণী ! অকপটে বলছি, ওকে কতদিন আবছা-আঁধার ঘরে উচ্ছ্রিত শিশ্ন নিয়ে জঘন্য খেলায় লিপ্ত দেখেছি এবং সে-কথা এই বিশাল পৃথিবীর কোনো বৃক্ষকেও জানাতে পারতাম না। এখন নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি বলেই জানিয়ে যেতে যেতে চাইছি। এ মুহূর্তে জীবনের — আমার এই দণ্ডিত জীবনের পুরোটাই আমি পটের মতো ছড়িয়ে দিতে চাই — মাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে হলে তুমিও পা বাড়াতে পার লম্বানেকো শাস্ত্রীভাই !—

একটু পরে বারি চৌধুরী আস্তে বলেছিলেন, গাজি, তুমি কী বলছ !

বড়োগাজি হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, শাদিতে আমারও জেয়াফত (নেমন্তন্ন) ছিল চৌধুরী ! মইদুর, মানে তোমাদের ছোটো গাজিরও ছিল। অবশ্য আমি মদুর মতো পিরসায়েবের মুরিদ হইনি। কারণ তাহলে আমাকে ব্র্যানডি-হুইসকি ছাড়তে হবে। সিগারেট ছাড়তে হবে। পাঁচ অক্ত নমাজ পড়তে হবে। ইসলামের জন্য এতখানি স্যাক্রিফাইস করতে আমি রাজি নই ভাই ! আমাকে জেয়াফত করেছিল আমার লেট বুজম ফ্রেনড তোফাজ্জলের বউ। চৌধুরী, শি ইজ এ জিনিয়াস ! ইলিটারেট চাষাভুষোর মেয়ে হতে পারে, কিন্তু তার অসামান্য শক্তি। শক্তি আর জেদ। আমি ওর প্রশংসা করি !

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বারি চৌধুরী একইভাবে বলেছিলেন, আমি করি না।

কেন বলো তো ?

আজও জানি না, সেদিনও বুঝতে পারিনি, কেন বড়োগাজির ওই সরল প্রশ্ন শুনে বারিচাচাজি হঠাৎ ফেটে পড়েছিলেন। আই হেট দ্যাট উওম্যান। ছোটো লোকের মেয়ে ! তরতাজা গোলাপের মতো ফুটফুটে একটা মেয়েকে—

উত্তেজনায় বাকরুদ্ধ দেওয়ানসাহেব উঠে গিয়ে জানালার রড মুঠোয় আঁকড়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। বড়োগাজি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। সামলে নিয়ে শুকনো হেসে বলেছিলেন, সিঙ্গিদা ! আপনার দেওয়ানসাহেবকে আজ অব্দি আমি বুঝতে পারলাম না ! এলাম ঝড়পানি মাথায় করে এত ক্রোশ পথ একটা সুখবর দিতে ! আর মিয়াঁসাহেব উলটে — থাক গে, মরুক গে ! আমি চলি।

বুঝতে পেরেছিলাম বড়োগাজি অপমানবোধে আহত। প্রফুল্লবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠেছিলেন, কী মুশকিল ! কাপড়-চোপড় বদলে নিন। অনুগ্রহ করে গরিবালয়ে এসে পড়েছেন যখন, তখন এভাবে চলে গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয় জানেন না ?

প্রফুল্লবাবুর কথার মধ্যে সরলতা আর কৌতুকও ছিল। কিন্তু বড়োগাজি গ্রাহ্য করেননি। আমার দিকে ঘুরে বলেছিলেন, তোমার কাছে তলব পাঠিয়েছিলেন তোমার আব্বা — কিংবা আম্মা। যাই হোক, কাজিসাহেব কিছু বলতে পারেননি তুমি কোথায় আছ। আমি অবশ্য বলেছিলাম লোকটাকে সোজা এখানে আসতে। আসেনি সে ?

খুব আস্তে বলেছিলাম, না। একটু পরেই ফের বলেছিলাম, জানি না।

আমার হাতে ঠাণ্ডাহিম হাত রেখে বড়োগাজি বলেছিলেন, যাক গে। যা হয়, ভালোর জন্যই হয়। তুমি বেঁচে গেছ। এখন মন দিয়ে পড়াশুনো করো। ওহে চৌধুরী ! তোমার আবার হলটা কী ? ঘোরো এদিকে। আহা !

বলো!

শফি হরিণমারায় ফিরছে কবে?

কেন?

অদ্ভুত প্রশ্ন! বড়োগাজি একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন। ওকে কি স্কুল ছাড়িয়ে দেবে নাকি? মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার কথাটা শোনো। পুজোর ছুটি চলছে এখন। দিনকতক এখানে থাক। তারপর আমার কাছে এসো। কাজির বাড়ি থাকলে ওর লেখাপড়া হবে না। কাজির ছেলেটা বড্ড শয়তান! শফিকে আমি রাখব। আমার বাড়ি থাকবে। আমি ওকে পড়াব। ইংরেজিতে ও বড্ড কাঁচা — জান কি?

বারি চৌধুরী চাপা শ্বাস ছেড়ে সরে এসেছিলেন জানালা থেকে।— সেসব কথা পরে হবে। তুমি যেও না। পোশাক বদলে নাও। খাওয়া-দাওয়া করো!

বড়োগাজি পা বাড়িয়ে বলেছিলেন, তোমার মাথা খারাপ? আসার পথে রফিকুল আমাকে দেখেছে। ওর বউ এতক্ষণ গোঁসা করে বসে আছে।

বলে সিঁড়িতে নেমে একবার ঘুরে ফের বলে গিয়েছিলেন, এতক্ষণ মোরগ হালাল করে ফেলেছে, খোদার কসম!

আমি উত্তরের জানালার ধারে বসে বেহুলাকে দেখছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম, আঁকাবাঁকা বৃষ্টিকে তার ভেতর গাঢ় ও বিস্তীর্ণ শ্যামলতাকে — যা স্বাধীনতাময়। সেই স্বাধীনতাকে ধূসর আলো ও আবহমণ্ডলের মধ্যে আলোড়িত একটি ব্যাপকতার মতো বোধ হচ্ছিল! যেন হাত বাড়ালেই এখন তাকে ছুঁতে পারব। ভেসে যেতে পারব সেই প্রাকৃতিক স্বাধীনতাস্রোতে। আমি এবার কী স্বাধীন! কী স্বাধীন! আমি তো এখন যা খুশি করতে পারি! আমি 'ফ্রি' — স্বাধীন মানুষ!

প্রফুল্লবাবু চলে গেলে বারিচাচাজি আমার কাছে এলেন। আমার দুকাঁধ ধরলেন। পিঠে তাঁর শরীরের উষ্ণ স্পর্শ। আস্তে বললেন, আমাকে ভুল বুঝিস নে বাবা! ঠিক এমনটি আমি চাইনি! আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে রে, শফি! এ কী ঘটল, বুঝতে পারছি না! আমারও বড়ো ইচ্ছে ছিল, রুকুর সঙ্গে তোর শাদি হোক। আমি জানি — আমি সব জানি রে!

কী জানেন? এই প্রশ্নটা আমার গলার ভেতর আটকে গেল। জিভ তাকে তুলে ধরতে পারল না। দুই ঠোঁট তাকে বের হতে দিল না। শুধু ঘুরে বারিচাচাজির দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওঁর চোখ দুটো ভিজে যাচ্ছে। কাঁপা-কাঁপা স্বরে ফের বললেন, এমন ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটাকে হাবাগোবা জড়বুদ্ধি আর বিকলাঙ্গ একটা ছেলের হাতে তুলে দিতে বাধল না হারামজাদির! ওকে করে মারতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মেরেও তো আর—

চাচাজি!

আমার ডাক শুনে বারিচাচাজি থেমে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন হঠাৎ আমি ডেকে ফেললাম কে জানে! কী বলতে চাইলাম তাঁকে, মুহূর্তেই ভুলে গেলাম। উনি আমার দুই কাঁধে চাপ দিয়ে বললেন, ছেড়ে দে। গাজি হয়তো ঠিকই বলে গেল, যা হয় ভালোর জন্যই হয়। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। মন খারাপ করিস নে বাবা। দুনিয়াটা এরকম। মানুষ যেন এক অদৃশ্য হাতের পুতুল! তার নিজের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই!

সেদিন ধূসর ভিজে আবহমণ্ডলে এইসব কথা আর ঘটনা অমনই ধূসর আর

ভিজে হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল বিশাল এক লোকসংগীত শুনছি চারদিকে। ইচ্ছে করছিল সবকিছুতে লাথি মারি। গুঁড়িয়ে ফেলি সাজানো নবাবি ঘরের আসবাবপত্তর। ছুটে বেরিয়ে যাই একটা কালোরঙের ঘোড়ার পিঠে চেপে — ছুটতেই থাকি ক্রমাগত, দিনভর রাতভর — আমৃত্যু। রুকু তো আমারই। আমার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল রুকু। সেই রুকুকে হাত থেকে কেড়ে নিল আমারই এক সহোদর ভাই, অর্ধপশু এক মানুষ — যার কাছাকাছি যেতেও আমার ঘেন্না হত! অস্তিত্বকে আমি কোনোদিনই স্বীকার করিনি! আজ সে আমার রুকুকে কেড়ে নিতেই একটা স্বীকৃত অস্তিত্বে পরিণত হল। ঘৃণা, ঘৃণা এবং ঘৃণা! আমার বুকের ভেতরটা ঘৃণায়, আর অসহায় রোষে আর ক্ষোভে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল।

প্রফুল্লবাবু উদ্বেগ প্রশমিত করে বিকেল নাগাদ বৃষ্টিটা একেবারে থেমে গেল। মেঘের ফাটল দিয়ে ঝকমকে রোদ চুঁইয়ে পড়তে থাকল। সন্ধ্যার কিছু আগে, বারিচাচাজি সম্ভবত তখন বড়োগাজির সঙ্গে কথা বলতে তাঁর আত্মীয় এবং খুদে জমিদার রফিকুল হাসানের বাড়ি গেছেন, আমি বেরিয়ে গিয়ে আস্তাবলে কালো ঘোড়াটির খোঁজ করলাম। সহিস মহিউদ্দিন জানাল, দেওয়ানসাহেব নিয়ে গেছেন ওকে। তখন ভিজে মাটিতে হাঁটতে-হাঁটতে নদীর ধারে গেলাম।

কাল্লুকে খুঁজছিলাম। ইদানীং তাকে প্রায়ই জেলেদের নৌকায় ওপারে মেহবুর কাছে গিয়ে আড্ডা দিতে দেখেছি। দুদিন আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল সে। মেহবু লোকটি দারুণ ভালো। আমি মৌলাহাটের পিরসায়েবের ছেলে শুনে সে আমাকে কোথায় রাখবে, কীভাবে খাতির করবে, ভেবেই পেত না। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ওর কাছে গিয়ে আবিষ্কার করি, মেহবুর একটি বউ আছে। আর সেই বউটি আয়মনির বয়সী — যুবতী। তালডোঙা বেয়ে সে ওপারে গিয়ে মধ্যবয়সী স্বামীকে খাদ্য দিয়ে আসে। রাত্তিরটা স্বামীর কাছেই কাটায়। কাল্লু চোখে ঝিলিক তুলে বলেছিল, মেয়েটা বহত কসবি আছে।

কসবি শব্দটা ওই বয়সেও কিছুটা রহস্যময় ছিল আমার কাছে। রবির মুখে কসবি শব্দের কোনো খোলা ব্যাখ্যা শুনিনি। বড়োগাজির দ্বিতীয় পক্ষের বউ — যার সঙ্গে রবি কোনো এক দুপুরে শুয়েছিল, আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি — তো তাকে রবি কসবি বলত মনে পড়ে।

এর ফলে মেহবুর বউ সম্পর্কে আমার একটা অসচেতন কৌতূহল জেগে থাকবে। সূর্যাস্তের আগে লালচে রোদে বিস্তীর্ণ বনভূমি, ধানখেত, সব শ্যামলতা খুবই কোমল দেখাচ্ছিল। ভরা ছোট্ট নদীটির এপারে দাঁড়িয়ে যখন কাল্লুকে খুঁজছিলাম, দেখলাম কাল্লু ওপারের মাচানে বসে মেহবুর হুঁকোটি টানছে এবং মেহবু হাত নেড়ে তাকে কিছু বলছে।

আমি কাল্লুকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম আমার বাঁ-পাশে ঝোপঝাড় ঠেলে মেহবুর বউকে বেরুতে দেখে। সে যেখানে দাঁড়াল, তার নিচেই কালো তালডোঙাটি বাঁধা আছে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়ে আমার দিকে ঘুরল মেহবুর বউ। শেষ বিকেলের লাল রোদে তার নাকছাবিটা জ্বলে উঠেছিল। হঠাৎ ওই আলোর রঙে তার মুখটি আয়মনির চেয়ে অনেক-অনেক বেশি সুন্দর মনে হল। তার গড়নে আয়মনির মতো পুষ্টতা বা বলিষ্ঠতা নেই। কিন্তু জীবনের এ যেন

এক বিস্ময়কর খেলা, কোনো এক মুহূর্তে কাউকে প্রচণ্ড চেনা মনে হয়ে যায় — যেন মাথার খুব ভেতরদিকটায় একটা হুলুস্থূল পড়ে যায়, ভাবি — আরে! একে তো কতকাল ধরে চিনি, নিবিড় করে জানি — ঠিক যেমনটি একদিন মনে হত বুকুকে দেখে!

মেহবুর বউয়ের নাম আসমা, সেটা কাল্লুর জানা। আসমা আমাকে দেখে একটু হেসে বলে উঠল, কী মিয়াঁ, যাবেন নাকি ওপারে?

ঝটপট তার কাছে চলে গেলাম। জলকাদার জন্য খালি পায়ে বেরিয়েছিলাম। আসমা তালডোঙায় চড়ে হাত বাড়াল এবং নির্দ্বিধায় তার হাতটা আঁকড়ে তালডোঙায় পৌঁছুলাম। ডোঙাটা খুব টলমল করছিল। আসমা হাসতে-হাসতে বলল, এই গো! নিজেও ডুববে! আমাকেও ডুবিয়ে ছাড়বে।

জীবনে সেই প্রথম তালডোঙায় চাপা। ডোঙাটার ভেতর একটু জল ছিল। টলোমলো, লম্বাটে তালগাছের গোড়ার দিকটা খোদাই করে তৈরি জিনিসটির ভেতর একটা আশ্চর্য বোধ আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসল। স্রোতের টানে ভেসে চলার বোধ বললে খুব কমই বলা হবে। একটি কালোরঙের ঘোড়া আমাকে যে-গতির হাত ধরিয়ে দিয়েছিল অথবা দিতে চেয়েছিল এবং আমি গতিকে চিনেছিলাম, সেই গতি নতুন চেহারায় সামনে এসে হাত বাড়িয়েছিল। যেন বলছিল, আয় ভাই, আমরা যাই! আর বেহালার টান-টান করে বাঁধা তারের মতো এই নদী আবার গতির প্রতীক হয়ে-ওঠা আরেকটি কালো জিনিস, আর ওই যুবতী নারী — টলায়মান অবস্থায় যখন তার দিকে তাকালাম, আবার একই সঙ্গে তাকালাম যুগপৎ টান-টান স্রোতস্বিনী আর কালো প্রতীকটির দিকেও, একটা প্রগলভ মত্ততা আমাকে বাচাল করে ফেলল। আশ্চর্য, আমি হেসে উঠলাম। বুকুর কথা ভুলে গেলাম। অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল বুকু এইসব কিছুর কাছে, যার ওপারে স্বাধীনতা — প্রকৃতি, বারি চৌধুরীর নেচার। আর আসমাও হাসছিল। তার গায়ে আয়মনির মতো জামা ছিল না। তার পরনে ছিল নীলচে নেতিয়েযাওয়া তাঁতেবোনা শাড়ি — সেও হাঁটুর নীচে অব্দি টানা। তার একহাতে ছোট্ট একটা বৈঠা। অন্যহাতে কীভাবে হঠাৎ খোঁপা-ভেঙেপড়া চুল ঝুঁটি বাঁধতে গিয়ে উন্মোচিত হয়ে গেল স্তন! ভরাট, নিটোল, কোমলতাময় কাঠিন্যে অসংবৃত তীক্ষ্ণাগ্র একটা মাংসপিণ্ড, যা আমার মতো ষোলো-সতেরো বছর বয়সের একটি ছেলেকে দ্রুত ফিরিয়ে দেয় তীব্র স্মৃতিতে ভরা এক হারানো পৃথিবী আর সময়কে, তার ধোঁয়াটে ধুলোয় ধূসর শৈশবকে।

এখন ভাবি, পুরুষের জীবনে ওই যেন কঠিন নির্বাসনের কষ্ট-কাল! নারীর জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসে নিরন্তর নারীর সঙ্গে স্পর্শে-সাহচর্যে বেড়ে উঠতে-উঠতে তারপর সে ধীরে দূরে সরে যেত থাকে অথবা তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় দূরে। নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট তাকে অচ্ছুত করে ফেলে। নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে প্রিয় এক জগৎ, এবং নির্বাসিতের মতো, অচ্ছুতের মতো, তারপর দূরে সরে থাকা। আবার প্রতীক্ষায় থাকা, কবে ফিরবে প্রিয়তম ঘরে? কবে ফিরে পাবে সে নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট এবং নারীর জরায়ু — শরীরের পারুষ্যের যৌবনের রক্তমূল্য দিয়ে সকল পেশীর শক্তি দিয়ে হবে তার প্রত্যাবর্তনজনিত পুনরভিষেক? কবে সে ফিরবে পুরনো কোমল ঘরে? কৈশোর সেই প্রতীক্ষা আর

নির্বাসনের কাল।

অবচেতন বিহ্বলতায় আমি আসমার উন্মোচিত বাম স্তনটিকে দেখছিলাম। ধূর্ত বন্য যুবতী তা বুঝতে পেরেছিল। সে মুখ টিপে হেসে ডোঙাটির মুখ ঘোরাল স্রোতের কোনাকুনি এবং চাপা স্বরে বলে উঠল, খুব যে! অ্যাঁ?

কী আসমা? টলোমলো ডোঙায় বসে বাচালতা করে বললাম।

আসমা ঠোঁট কামড়ে ধরে বহতা জলের ভেতর নিজের দুধারে পর্যায়ক্রমে বৈঠার আঘাত হানছিল। ওই কামড়েধরা ঠোঁটে শব্দহীন তীক্ষ্ণ হাসি ছিল। ওই হাসিতে কথা ছিল। সেই কথা আমি অনুভব করছিলাম আর আমার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বারবার দুর্দান্ত স্বাধীনতার ঘা, ওই বৈঠার প্রতিটি শব্দময় ঘা — যা তলোয়ারের কোপের মতো। নীচের নদীটির মতো আমি ভেঙে পড়েছিলাম। আঘাতের শব্দ শুনছিলাম বুকের ভেতর দিকে।

তো ডোঙাটিকে কি ইচ্ছে করেই অসমা দেরি করিয়ে দিচ্ছিল? কিংবা তীব্র স্রোতের টানে, বৃষ্টির পর নদীর জলটাও বেড়েছিল সেদিন, ডোঙাটিকে সরাসরি ওপারে নিয়ে যেতে পারছিল না সে? দেখলাম, মেহবুর কুঁড়েঘর বাঁদিকে সরে যেতে-যেতে হিজলহাম-জারুলের জটলার আড়ালে পড়ে গেছে। কোনাকুনি এগিয়ে তীরের কাছাকাছি হয়ে আসমা তার নিচের ঠোঁটকে মুক্তি দিল। ফিক করে হেসে বলল, পিরসাহেবের ছেলে জাদুমন্তর কী দোয়া-দরুদের ভেলকি জানে মোনে হয়। আজ আমাকে কী, আমার ডোঙাকেই যেন বেবশ করে দিলে গো! লাও, টানো এখন কদ্দুর উজোন!

কিন্তু সে উজানে মেহবুর কুঁড়ে অব্দি নিয়ে গেল না ডোঙাটিকে। সামনেই অর্ধবৃত্তাকার ধসছাড়া একটি স্রোতহীন অংশ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। সেখানে মাটির ভিজে চাঙড়ে একটা ভাঁড়ুল গাছের মোটা আর সরু অজস্র শেকড় বেরিয়েছিল এবং গাছটিও ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছিল নদীর দিকে। সেই শেকড় ডোঙার মাথার দিকে ছেঁদা গিঁটবাঁধা একটা দড়ি বাঁধল আসমা। বৈঠাটি একহাতে, অন্যহাতে ন্যাকড়ায় বাঁধা তার স্বামীর রাতের খাবার — হয়তো জামবাটিভরা ভাত-তরকারি। সে শেকড়ের ফাঁকে পা বাড়িয়ে দিতে প্যাচপেচে কাদায় পা ডুবে গেল। তখন সে খিলখিলিয়ে হেসে বলে উঠল,ও মিয়াঁর ব্যাটা, ইবারে তুমি আমাকে বাঁচাও। আহা, উঠে এসো না বাপু!

সে এখন আমাকে 'তুমি' সম্ভাষণ করছে! আমি শেকড়বাকড়ে পা রেখে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে শক্ত এবং ঘাসে ঢাকা পাড়ে পৌঁছুলাম। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে তার স্বামীর খাদ্যটা দিল আমাকে। একজন চাষাভুষো মানুষের খাদ্য বইতে হচ্ছে আমাকে,— এটা একদিন আগে ঘটলেও খুব অপমানজনক গণ্য করতাম। কিন্তু আজ আমি ভিন্ন এক মানুষ। আর এখানে স্বাধীনতা — বারি চৌধুরির 'নেচার'। দুর্দান্ত এক বন্যতা আমাকে পেয়ে বসেছে। আমার নতুন চুস্ত পাজামা-পানজাবিতে হলুদ পলিমাটি মেখে গেছে যথেচ্ছ। হাত বাড়িয়ে ন্যাকড়ায় বাঁধা জামবাটিটা নিলাম। তখন আসমা বলল, ওখানে রাখো। রেখে আমাকে ইবারে ওঠাও!

তার নির্দেশ পালন করলাম। কিন্তু ভেবেছিলাম, সে বৈঠাটাই বাড়িয়ে দেবে — তা দিল না। বাঁহাতে বৈঠাটা পাঁকে লাঠির মতো দেবে ডানহাতটা বাড়াল। তার

হাতে আয়মনির হাতের মতোই একগোছা নানারঙের কাচের চুড়ি ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময়। আয়মনির হাতের ছোঁওয়া একটু-আধটু পেয়েছিলাম। কিন্তু কখনও সে-ছোঁওয়া এমন প্রত্যক্ষ আর জোরালো ছিল না। মনে হল সৌন্দর্য বা চেহারার লালিত্যের তুলনায় আসমার হাতখানি ঈষৎ রুক্ষ আর শক্ত। শ্রমজীবী নারীর হাত। আয়মনির বাপের তোজ মিজিরেত আছে প্রচুর। কিন্তু আসমার মধ্যবয়সী স্বামীটি খুবই গরিব মানুষ। সামান্য একখানি ধানখত আর নদীর কাঁধে একটুখানি জমির মালিক সে। ওই ধানখেতের কোনো ভরসা নেই। কারণ হঠাৎ বৃষ্টিতে নদীর এপার ছাপিয়ে বন্যায় সব ভেসে যেতে পারে। এপারে কোন বাঁধ নেই। বাঁধ অন্যপারে কাছারিবাড়ির পেছনে সমান্তরাল।

এখন ঘন গাছপালা। বৃক্ষলতার এমন ঠাসবুনোট কারুকার্য প্রথম যেদিন দেখি, সেদিনকার অনুভূতি আর আজকের দিনশেষের এই অনুভূতি এক নয়। শেষবেলায় নদীর বাঁকের ওপারে বিধ্বস্ত কুঠিবাড়ির জঙ্গলের নিচে সূর্য নেমে গেলে নদী আর এই বনভূমি কী এক রহস্যময় ধূসরতায় ছমছম করছিল। জনহীন এই নিসর্গে প্রকৃতির ফিশফিশ ষড়যন্ত্রের মতো হালকা আর শিরশিরে হাওয়া বইছিল। জামবাটিটা তুলে নেওয়ার আগে আসমা বৈঠাটা নরম ঘাসেঢাকা মাটিতে বিঁধিয়ে দুটি মুক্ত হাত উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে লাগল। আবার উন্মোচিত হল তার স্তন, পুরোপুরি নয় — অর্ধোন্মোচিত। আর অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হাহাকার করতে-করতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।....

দেখো শাস্ত্রী! এই দেখো, আমার হাতের লোম খাড়া হয়ে গেছে। শিরশির করছে রোমাঞ্চের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা সারা শরীরে। তবে সেই প্রথম স্বাধীনতার অঙ্কুরোদগম আমার দেহ-মনে। সেই প্রথম প্রকৃতির করতলগত হওয়া! সেই প্রথম কালো ঘোড়াটির অন্ধ হয়ে যাওয়া। তার হ্রেষা আর খুরধ্বনি সেই প্রথম।

অসমা অর্ধস্ফুট স্বরে বলে উঠেছিল, আ ছি ছি! এ কী, এ কী! তুমি না পিরসায়েবের ছেলে?

ভিজে চবচবে ঘাসের ওপর বাঘের হরিণ ধরার মতো একটা ধস্তাধস্তি চলছিল। আসমার শরীরে আমার শরীর মাথা কোটার ভঙ্গিতে আছড়ে পড়েছিল। হায় শরীর! মানুষের হারামজাদা শরীর! শুয়োরের বাচ্চা শরীর!

কুছ তকলিফ, সাব?

তাকালাম।

ডিপটি জেলরবাবুকো খবর ভেজুঙ্গা ডাগদারকে লিয়ে?

না।

আপ শো যাইয়ে সাব! বারাহ্ বাজ গয়া!

আপনা কাম করো ভাই, আপনা কাম করো!

লম্বানেকো শাস্ত্রীটির পাশে বেঁটে শাস্ত্রীটি এসে দাঁড়াল। বলল, ক্যা জী?

কুছ নেহি ভেইয়া, কুছ নেহি!

বেঁটে ভারী সঙ্গীন বাগিয়ে কাঁধে রেখে আস্তে আস্তে বলল, শোচিয়ে মাত্ সাব! খুদা কিসিনে জিন্দা রাখনে চাহে তো উসকো মার ডালে কোন? আপিল পেশ কিয়া

— শুনা। শোচিয়ে মাত্। শো যাইয়ে আরামসে!

সে আরও সমবেদনায় বলে উঠল, কেত্তা আদমি বিমারসে মর যাতা! মউতকো তো সাথ-সাথ লে কর আদমি দুনিয়ামে আতা হ্যায় সাব! আপ লিখ্‌খা-পঢ়াহ্ আদমি। সবহি জানতে হেঁ আপ!

তাদের বুটের শব্দ বুকের ভেতরটা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। আমি সরে গিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকালাম! দেখলাম সামনে মেহবু দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছে, কিংবা সে কোনো একভাবে আছে। তার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য প্রতিধ্বনি এতকাল পরে ভেসে উঠল। মউতকো তো সাথ সাথ লেকর আদমি আতা হ্যায় দুনিয়ামে! আর মেহবু বলেছিল, জেবন-মরণ দুই ভাই — একই সঙ্গেতে জন্ম লয় মায়ের জঠরে। একই সঙ্গেতে বাড়ে। দু-ভাইয়ে কত ছলচাতুরি, কত লুকোচুরি খেলা। তবে কথা কি কালসাপ লিয়ে মানুষের বসবাস। তমু মানুষের ই কথাটো খ্যাল হয় না গো! তমু মানুষ কী করে সব ভুলে থাকে!

মেহবু বলত, তাদের বংশের পদবি খামবু। সে মেহেবু — মেহেবুদ্দিন খামবু। কারণ তার পূর্বপুরুষের ঢের জোতজমা ছিল। খামার ছিল! খামারবাড়িটা নাকি এত বড়ো ছিল যে লোকেরা তাদের খামবু বলে সম্ভাষণ করত। কিন্তু এই রাক্ষসী নদী আর নবাববাহাদুর আর হরিণমারার বড়োগাজির মামাতো ভাই ইন্দ্রাণীর খুদে জমিদার রফিকুলের পূর্বপুরুষ খামবুবংশকে ভিখিরি করে দিয়েছিল। এখন সে প্রফুল্ল সিঙ্গিকে সেলামি দিয়ে ওই ডুবো জমিটুকু সালগুজারি বন্দোবস্ত নিয়েছে। দু-আনা পাঁচ-গণ্ডা খাজনা আর ম্যানেজারবাবুকে শীতের সময় দশ আড়ি ধান ভেট। আড়ি বেতে তৈরি একটা পরিমাপপত্র। কিন্তু মেহেবুর সন্দেহ, আড়িটার প্রান্তিক বেড়ে দুটো বাড়তি বেতের চক্কর আছে।

এখন এবং আরও পরে মেহবুর কথা মনে এলেই বিব্রত বোধ করতাম। একজন দার্শনিককে আমি ঠকিয়েছি! এদেশের এক মেঠো সোক্রাতেসকে আমি দূর কৈশোরে শুধু মিস করিনি, তাকে অপমানও করেছি! আর কী জঘন্য কথা, লালবাগ শহরের নবাবি হাতির সাতমার কাল্লু পাঠান তাকে একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, মেহবু! তুমি কেমন মোরোদ আছ — কী তুমার বিবি এইসা ভেগে গেল? তো হামাকে দেখো, আমি পাঠানবাচ্চা আছে। হামার উমরভি তুমার সমান আছে। হামারভি ছোটি এক বিবি আছে। তো—

মেহবু, দার্শনিক মেহবু অশালীন খিস্তি করে নিজের শিশ্নটির শক্তি বোঝাতে হাতির পায়ের শেকল বাঁধা লোহার গোঁজের উপমা দিয়েছিল! কাল্লু পাঠান হা-হা করে হেসে অস্থির। আমিও খুব হেসেছিলাম। মনে হয়েছিল, সে যা বলছিল, তা কদাচ সত্য নয়।

সত্য নয়, তার কারণ আমি বুঝতে পারতাম। হায় মেঠো দার্শনিক, প্রশ্নটি শিশ্নমূলক নয়, অন্য কিছু। তা হয়তো ভালোবাসামূলক। অনাথা একলা-বেড়ে-ওঠা মেয়ে আসমা, যে দুনিয়ার — তা যত ছোটো হোক তার সেই দুনিয়া, শুধু শিশ্ন দেখেছে, দেখেনি ভালোবাসা। ভালোবাসা ভিন্ন এক জিনিস। সব মানুষ তা পায় না — বোঝে না, বা চেনে না। সে প্রকৃতির শেখানো বুলি আওড়ায়। যে-আবেগে পাখিরা খড়কুটো বেঁধে বাসা বানাতে ব্যস্ত হয়, সেই জৈব আবেগমাত্র।

ভালোবাসা আবার সবাইকে সয়ও না। সায়নি বারি চৌধুরিকে। অনেক পরে যা জানতে পেরে অবাক হয়েছিলাম। কেন তাঁর চিরকুমার থাকার বদখেয়াল, কেন অমন দৃকপাতহীন নির্বিকার ব্রহ্মচর্য, অনেক দেরিতে বুঝতে পেরেছিলাম। আর আমার বেলাতেও তাই। আমি ভালোবাসা পেয়েছিলাম। কিন্তু ভালোবাসা আমাকেও সয়নি !....

তো এক আশ্বিনের দিনের বৃষ্টিবাদলার শেষে ধূসর আলো-আঁধারে ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘাসের ওপর সেই প্রথম নারীশরীরের ভিন্ন এক স্বাদ পেয়েছিলাম ! ছটফটে, কোমলতাময়, দৃঢ়, শ্রমজীবী গ্রামীণ এক যুবতীর শরীর কেন্দ্র করে আনাড়ি, অবোধ এক বিস্ফোরণ মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। হয়তো এজন্য হরিণমারার কাজি হাসমত আলির ছেলে রবিউদ্দিনের সহবাসকে দায়ী করা যেতে পারে। হয়তো রবিই আমাকে ভেতবে-ভেতরে নষ্ট করে ফেলেছিল। কিন্তু একথাও হয়তো বা সমান সত্যি যে, আমি বুকুর ওপর প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার মাথার ঠিক ছিল না সেদিন। একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে চাইছিলাম। আর কলঙ্কিনী নামে ইন্দ্রাণীতে বদনাম কুড়ুনি যুবতী আসমা যেন ইচ্ছে করেই সেই সুযোগ করে দিয়েছিল ! নইলে কেন সে তার স্বামীর আস্তানা থেকে অতটা দূরে ভাটিতে গিয়ে ডোঙা পাড়ে ঠেকিয়েছিল, যেখানে শিয়রে প্রগাঢ়ভাবে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষলতার আড়াল আর অবাধ নির্জনতা ?

হুঁ — সবই তার সাজানো মনে হয়েছিল পরে। কিন্তু কী পেয়েছিলাম আমি ? সত্যই কি কোনও জৈব সন্তোষ কিংবা যাকে বলে 'মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘে'র তৃপ্তি এবং বেড়ে-ওঠা লোভ ? কিছু না, কিছুই না। বরং আমার গা ঘিনঘিন করছিল। ভবা স্রোতবতী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরকে, আমার নিস্পাপ শুদ্ধ শরীরের নোংরামিটাকে ধুয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল ! কিন্তু পুকুরে সাঁতার কাটার অভ্যাস থাকলেও কখনও স্রোতের জলে সাঁতার কাটিনি — সেই ভয়। আরও এক অদ্ভুত ভয় আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছিল। আব্বা বলতেন, আমাদের বংশের শরীরে পবিত্রপুরুষ পয়গম্বরের রক্তেব ধারা বয়ে চলেছে। মাথা নিচু করে নদীর দিকে তাকিয়ে ত্রাসে কেঁপে উঠেছিলাম ! আব্বার অনুচর কোনো জিন কি দেখে ফেলল আমার এই পাপক্রিয়া ? ত্রাসে অনুশোচনায় আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আর আসমা তার শাড়িটি নতুন করে পরে নির্বিকাব মুখে উঠে দাঁড়াল। তারপর জামবাটি আর বৈঠাটি কুড়িয়ে নিযে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থামল। বলল, মিয়াঁর প্যাটে-প্যাটে এত, তা জানতাম না !

. সে বাঁকা হাসছিল। আমি ভাঙা গলায় অতিকষ্টে ডাকলাম, আসমা !

বুলো।

আমি মাফ চাইছি। তুমি কাকেও—

আসমা দ্রুত এসে খুব হঠাৎ চটাস শব্দে আমার বাঁ গালে চুমু খেল। হাসি আর শ্বাসপ্রশ্বাসে জড়ানো গলায় বলল, ও কী কথা গো ছেলের ? ওপরে আসমান, নিচে মাটি — পক্ষিটিও জানবে না।

তারপব সে যে কথাটি বলল,আমি অবাক হয়ে শুনে গেলাম। সে ফিশফিশ

করে বলে উঠল ফের, এমন করে মোনের সুখ মেটে না। তুমি দুকোরবেলা ওপারে ঝোপের ভেতর থেকো। তখন মিনসে থাকে না কুঁড়েতে। দহে মাছ ধরতে যায় জাল লিয়ে। আমি লিয়ে আসব তুমাকে।

বলেই সে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল এবং একবার ঘুরে যখন দেখল, আমি আসছি না, তখন সে ইশারা করল তাকে অনুসরণ করতে। আস্তে বললাম, আমি যাব না।

আসমা চলে-যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ডাক শুনতে পেলাম কাল্লুর, ছোটোসাব! ছোটোসাব!

সাড়া দিলাম না। নদীর পাড়েই একটা প্রকাণ্ড গাছের শেকড়ে বসে একটুকরো শুকনো কাঠি কুড়িয়ে আঁক কাটছিলাম। ভীষণ ক্লান্ত শরীর, শুওরের বাচ্চা হারামজাদা নেড়ি কুত্তা শরীর! এখন এত ভারী, এত বিধ্বস্ত! আর তখন আমার ব্যক্তিগত আবহমণ্ডলে আসমার চুলের আর সারা শরীরের ঘ্রাণ। বুঝতে পারছি না এ ঘ্রাণ নিয়ে আমি কী করব? একে সরাতেও তো পারছি না! বুঝতে পারছি না এ ঘ্রাণ সুখের, না জঘন্যতার।

কাল্লুর হাসি শুনতে পেলাম পেছনে। ঘুরলাম না তবু। কাল্লু বলল, ছোটোসাব! এখানে কী কোরছেন একেলা বৈঠকার? হামি আপনাকে মেহবুর বহুর সাথে আসতে দেখল। তো ছোকড়ি হামাকে বলল, ছোটোসাব একেলা ঘুম কোরতেছে ইধার! আইয়ে, আইয়ে! ইধার সাঁপ-উপ থাকবে। জংলি জানবার ভি। আইয়ে।

সাপের কথায় এতক্ষণে চমকে উঠলাম। সাপ থাকার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম এতক্ষণ। দিনের শেষ আবছায়াভর আলোটুকু, যা কররেখা অস্পষ্ট করে তুলেছে, চকিতে ফণাতোলা অজস্র সাপের ছবি আঁকতে থাকল আমার চারপাশে। উঠে দাঁড়ালাম। কাল্লু পথ দেখিয়ে মেহবুর কুঁড়ের দিকে নিয়ে চলল।

গাবতলার মাচানে পা ঝুলিয়ে আসমা বসে আছে। কুঁড়েঘরটির ভেতর রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে। সেই ম্লান আলো কেন্দ্র করে পোকামাকড় থকথক করে চক্কর যাচ্ছে। একটু দূরে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে মেহবু জামবাটি থেকে সশব্দে ভাত খাচ্ছে। আমাদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে একবার দেখার চেষ্টা করে বলল, কাল্লুভাই?

হাঁ। ছোটাসাবকে লিয়ে আসল। মেহবু এঁটো মুখে বলল, বসেন হুজুর, বসেন! আমি খাওয়াটুকুন সেরে লিই! বলে সে বউকে ডাকল, ওরে! কাল্লুভাইকে তামুক সেজে দে দিকিনি!

আসমা অমনি মাচা থেকে নেমে বলল, সাজো তুমি তামুক। আমি চললাম। আঁধার হয়ে গেল দেখছ না? রহিমা এতক্ষণ ঘর-বার করছে আমার জন্যে।

সে তার মরদকে গ্রাহ্য করল না। গজগজ করতে করতে বৈঠাটি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল আবছা আঁধারে। দু জায়গায় ঘরকন্নার ঝকমারির কথাই সে বলতে-বলতে গেল। আর তাই শুনে খ্যা-খ্যা করে হেসে তার বোকাসোকা দার্শনিক মরদটি এঁটো ঠোঁটের নিচে জঙ্গুলে দাড়িতে এককুচি ভাতসহ বলে উঠল, শুনো কথা কাল্লুভাই! হারামজাদির কথা শুনো।

কাল্লু অবাক হয়ে সহাস্যে বলল, আজ তুমহারা বিবি থাকল না তুমার কাছে?

বাত ক্যা ভেইয়া মেহরু ?

মেহরু গুম হয়ে বলল, বাড়িতে আপ্তকুটুম্ব এসেছে। আমার ভাগ্নী কাচ্চাবাচ্চা লিয়ে এসেছে তো ! তাদের খাওয়া-দাওয়া, মেহমানি তো করাতে হবে, না কী ? তবে তামুকটা সেজে দিয়ে গেলে কী ক্ষেতি হত, বুলো কাল্লুভাই ?

কাল্লু বলল, তো ঠিক হ্যায়। হামি সেজে লিচ্ছে।

খড়ের দড়ি জড়িয়ে মেয়েদের চুলের বেণীর মতো বাঁধা একটা জিনিসের মাথায় আগুন জুগজুগ করছিল। ওটাকে 'বিড়ে' বলে, আমি জানি। কাল্লু জানে কোথায় তামাক আছে। সে ব্যস্তভাবে তামাক সাজতে বসলে আমি বললাম, কাল্লু ! আমরা ওপারে ফিরব কী করে এবারে ?

কাল্লু হাসল। রোজ য্যায়সে আনা-যানা করি, ওইসে। বৈঠিয়ে না !

খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে মেহরু নদীতে গেল জামবাটি ধুতে। ফিরে এসে সে জাঁকিয়ে মাচানে বসে কাল্লুর হাত থেকে হুঁকো টানতে টানতে খোদাতালার মেহেরবানির কথা ঘোষণা করছিল। আকাশের অবস্থা থেকে কী ডর না পেয়েছিল সে ! না — সে এই নদীর সঙ্গে নিজে লড়াই করে জান বাঁচাতে পটু, এমনি অনেক লড়াই সে সারাজীবন লড়ে আসছে। কিন্তু সেজন্য তার ডর জাগেনি। যত ডর দেড়বিঘে ধানখেতটার জন্য। বুকে থোড় গজিয়ে এখন ধানগাছ ডাগরডোগর হয়েছে। জলের তলায় চলে গেলে আর শীষ গজাত না, সেই ডর। তারপর কী করত মেহরু ? সেই মাঘ অব্দি প্রতীক্ষায় থাকতে হত এই মাচানের নিচে সামান্য দূরে 'কাঁধা' নামে ঢালু জমিটুকু জেগে ওঠার জন্য। সেই জমিতে সে কুমড়ো কাঁকুড় আর তরমুজের বীজ পুঁতবে। খরার মাসে সেগুলো নিয়ে যাবে তার বউ হাটতলায় হাটবারে বেচতে। এইসব কথা বলার সময় লোকটার প্রতি যুগপৎ ঘৃণা আর করুণা জাগছিল আমার। ঘৃণা — কারণ আসমাকে সে বউ করেছে। করুণা — কারণ তার এই বেঁচেবর্তে লড়াই। অবশেষে সে হুঁকোয় সুখটান দিয়ে কাল্লুকে দিল এবং বলল, ভাবতে গেলে এ দুনিয়াদারি এক ঝকমারি বটে হে, কাল্লুভাই ! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, লাথি মেরে ফেলে ফকিরি লিই !

তারপর সে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল। কাল্লু বলল, গলা ফাড়কে গাও ভেইয়া ! তুমি তো বহত ওস্তাদ লোক আছ ! গাহ্না করো — ছোটোসাবকে শুনাও !

মেহরু এত সুন্দর গাইতে জানে ! তখন চারদিক নিঝুম আঁধার। কুঁড়ের ভেতর রেড়ির তেলের পিদিমটি জ্বলছে এবং পোকামাকড়েরা আত্মহত্যায় লিপ্ত। নদীর দিকে আবছা ছলচ্ছল একটা শব্দ শুধু। শরৎ-ঋতুর আকাশে ঝকমক করছে নক্ষত্রের ঝালর। দূরে একটু আগে যে শেয়ালগুলো ডাকছিল, তারা হঠাৎ থেমে গেছে। মেহরু কানে একটা হাত রেখে তান দিল, আহা রে—এ—এ....তা—না—না—না....

"ভোবো না ভেবো না বিফলো ভাবনা/ভাবিলে যাবে না দূরে—'

কাল্লু পাঠান সমের মাথায় বলে উঠল, বহত আচ্ছা ! মেহরু চেরা গলায় গাইতে লাগল। নদীতীরের এই সংগীতধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে দূর-সুদূর ছাড়িয়ে যেতে থাকল। ওপারে কাছারিবাড়ির দোতলায় আলো জ্বলছিল। সেই আলোকে ছুঁয়ে মেহেরুর গান মেঠো দার্শনিকতাকে বয়ে নিয়ে চলল কোথায় — যেন বা ওই নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে, ওই লম্বাটে ছায়াপথের সীমানায় ! আর আমি দেখলাম, কী বিশাল

ওই আকাশ, কত জ্যোতির্ময়তা ! তার কাছে কতটুকু এই মানুষের ভাবনা ! মেহবুর ভাবনা ! আমার ভাবনা আর এই মেহবুর যুবতী বউয়ের শরীর থেকে প্রতিশোধের ছুতোয় আমি যে শাস্তি সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, তারই বা মূল্য কতটুকু ? ছি ছি এ আমি কী করলাম — কেন করে ফেললাম এ পাপ ? অন্ধকারে আমার দুচোখ ভিজে যাচ্ছিল — জানি তা মেহবুর গানের বিষাদজনিত সংক্রমণে নয়, পাপবোধে।—

না — ওই বয়সে ঠিক এমন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে কিছু ভাববার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু অনুভূতি ছিল। বোধ ছিল। নিজের ওপর দুঃখে করুণায় আমার কান্না পাচ্ছিল। আমার যে-শরীরে নাকি পবিত্র পুরুষে' রক্তধারা বয়ে চলেছে, আর যে-শরীর নির্দিষ্ট ছিল অন্য এক নারীর জন্য, যাকে আমি বেহেশতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও কাম্য বলে গণ্য করতাম — সেই শরীরকে আর হঠকারিতায় আমি হারিয়ে ফেলেছি ! আমি নিজের পবিত্র সত্তাটিকে হিজলজামজারুলের জঙ্গলে ভিজে ঘাসের ওপর জবাই করে ফেলেছি। আর এই নিরক্ষর মেঠো লোকটি সুর ধরে আমাকে শোনাচ্ছে, 'ভেবো না ভেবো না বিফলো ভাবনা/ভাবিলে ভাবনা যাবে না দূরে !'

বড়ো অবাক লাগে হে শান্ত্রিদ্বয় ! বেহুলা নদীর ধারে এক আশ্বিনের সন্ধ্যারাতে আমার মাথার ভেতর উলটে এক বন্য ঘুণপোকা ঢুকে পড়েছিল। সত্যিই তো ! বিশাল পৃথিবীতে বিরাট আকাশের নিচে মানুষের সব ভাবনাই কী অকিঞ্চিৎকর ! তবু মানুষ ভাবে। ভাবনা ছাড়া মানুষের চলে না। দার্শনিক মেহবু ভাবনা নামে পোকাটিকে তাড়াতে গিয়ে সেটি আমার মাথায় ঢুকে পড়েছিল। আর সেই ভাবনার কুটকুট কামড়ানিতে অস্থির হয়ে বাকি জীবন আমি ছুটে বেড়ালাম বিভ্রমণে। কী না করে বেড়ালাম ! স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত।

মধু জেলে দূরের দহে বিকেল থেকে এক প্রহর রাত অব্দি ছোট্ট নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যেত। সে যথারীতি ফিরে এল মেহবুর কাছে-তামাক খেতে। তার নৌকোয় আমরা ফিরে গেলাম ওপারে।

কাছারিবাড়ির ভেতর ঢুকে প্রতিমুহূর্তে গা শিরশির করছিল। আমাকে দেখে কি বারিচাচাজি টের পাবেন কিছু ? আমি কি ধরা পড়ে যাব ? আমার চুস্ত পাজামা-পানজাবিতে ঘাসের কুটো, পলিমাটির দাগ। কিন্তু দোতালার হলঘরে ঢুকলে বারি চৌধুরী বললেন, আয় শফি ! কাল আমরা লালবাগ যাব ঠিক করেছি। কী ? দারুণ সুখবর না ? বারিচাচাজির সঙ্গে প্রফুল্লবাবু আর বড়োগাজিও হাসতে লাগলেন।.....

জ্যোৎস্নার মৃত্যুর ঘ্রাণ

নুরুজ্জামান মৌলাহাট মসজিদে তার পিতার ভূমিকা নিয়েছে কিছুদিন। কারণ বদিউজ্জামান গেছেন তিন ক্রোশ দূরের এক শিষ্য-গ্রাম শিসগাঁয়ে। নবীন মৌলানা নুরুজ্জামান তাই নমাজ-পরিচালক হয়েছে। গত জুম্মাবারের নমাজে তার খোত্‌বা-পাঠে (শাস্ত্রীয় ভাষণ) মৌলাহাটের মুসল্লিদের মধ্যে ধুম পড়ে যায়। শোভানাল্লা! কী গলার আওয়াজ! কী উচ্চারণ! একেই বলে, 'বাপকা বেটা সিপাহিকা ঘোড়া। কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।'

ফজরের নমাজ সেরে বাড়ি ফিরে সে তার বালিকাবধূকে তখনও কোরান-পাঠে ব্যাপৃত দেখেছিল। বারান্দায় পাতা জায়নামাজ বা প্রার্থনা আসনটি একটি রঙিন গালিচা। দেওবন্দমুলুক থেকে কিনে এনেছিল নুরুজ্জামান। এ মুহূর্তে মনে হল, খোদাতালার কী মহিমা! পরিস্তানের এক পরিকে মন দিয়ে অনুভব করছিল নুরুজ্জামান। কিন্তু শালীনতাবশে উঠোন থেকে সে একটু সরে কুয়োতলায় গেল। একটু কাশল। বাড়িটা যেন জনহীন। রোজির কোরান-পাঠের মৃদু ধ্বনিপুঞ্জে সারা বাড়ি পবিত্রতার মধ্যে বুঁদ হয়ে আছে। তার কাশির শব্দটুকু কোনো পৃথক স্পন্দন তুলল না। তিনটি ঘরের একটি দলিজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেখানেই বালিকাবধূ নিয়ে রাত্রিযাপন করে নুরুজ্জামান। মাঝের ঘরটিতে থাকে মনিরুজ্জামান আর তার বালিকাবধূ। শেষ ঘরটিতে দাদি আম্মা কামরুন্নিসা আর মা সাইদা বেগম। বাড়িতেও রোদ আসেনি। ধূসর আলোর ভেতর দরজাখোলা তিনটি ঘরের ভেতর ঘন কালো ছায়া থমথম করছে। তবু নুরুজ্জামান দেখতে গেল, সাইদা তাঁর শাশুড়ির একাঙ্গ ডলে দিচ্ছেন। মাঝের ঘরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এক মুহূর্তের জন্য নুরুজ্জামানের মাথায় এল, তার ভ্রাতৃবধূ আজও সম্ভবত কোরান পাঠ করেনি। কিছুদিন থেকে থেকে এ ব্যাপারটা চোখে পড়েছে তার। রোজ দুই বোন পাশাপাশি বসে ভোরবেলায় কোরান পাঠ করত। হঠাৎ এমন ঘটছে কেন? রোজিকে জিগ্যেস করবে দুইবোনে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে নাকি।

সেই মুহূর্তে মাঝের ঘর থেকে এলোমেলো কাপড়, খোঁপাভাঙা চুল, বেরিয়ে এল রুকু। এসেই ভাসুরসায়েবকে দেখে থমকে গেল। তারপর আবার ভেতরে ঢুকে

পড়ল। ভেতর থেকে এইসময় গোঙানির মতো ভুতুড়ে হাসির শব্দ ভেসে এল। নুরুজ্জামান বিকৃতমুখে গলার ভেতর বলল, জানোয়ার!

রোজির কোরান পাঠ শেষ। কোরান বন্ধ করে সে সেই পবিত্র ঐশীগ্রন্থটিকে চুম্বন করে কপালে ঠেকাল। তারপর নকশাদার লাল রেশমি কাপড়ের আধারে ঢুকিয়ে শেষপ্রান্তের সরু চিকন দড়িটি দিয়ে জড়াল। রেহেল বা কাঠের পুস্তকাধারটিও ভাঁজ করে নিয়ে বারান্দার তাকে রাখল। গালিচাটি গুটিয়ে ঘরে নিয়ে যাবার সময় সে ঘুরে দেখতে পেল, তার স্বামী তাকে অনুসরণ করছে। একটু হাসল রোজি। তারপর নিজের ঘরে ঢুকল।

নুরুজ্জামান ঘরে ঢুকেই তক্তাপোশের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। সে হাসছিল না। রোজি গালিচাটি রেখে তার পাশে এসে বসে পড়ল এবং বুকের ওপর ঝুঁকে চাপা স্বরে বলল, আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন গো?

নুরুজ্জামান আস্তে বলল, কিছু না।

আপনি আমার উপর গোঁসা করেছেন?

এবার নুরুজ্জামান একটু হাসল। তোমার ওপর গোঁসা করার হিম্মত কার? এইসা নেক আউরত তুম্!

রোজি তার তরুণ স্বামীর দাড়িসুদ্ধু চিবুক ধরে বলল, আবার ওই খোট্টাপনা? ওসব করবেন মসজিদে গিয়ে। আমার কাছে নয়।

নুরুজ্জামান হাসল। মুসলমানের জবান, রোজি।

রোজি কপট অভিমান দেখিয়ে বলল, তো যে-মুলুকে ছিলেন সেই মুলুক থেকে কাউকে শাদি করে আনলেই পারতেন।

নুরুজ্জামান রোজিকে বুকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলে রোজি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ভ্রূ কুঞ্চিত। যেন বলতে চায়, দরজা খোলা। কেউ এসে পড়লেই কেলেংকারি হবে না বুঝি?

নুরুজ্জামান একটু চুপ করে থাকার পর বলল, একটা বাত পুছ করব রোজি!

কী?

বহিনের সাথ কি তোমার কাজিয়া হয়েছে?

মুহূর্তে রোজি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। স্বামীর শাদা কোর্তার বোতাম খুঁটতে-খুঁটতে মাথাটা শুধু নাড়ল।

নুরুজ্জামান বলল, তোমরা একসাথ কোরান তেলাওয়াত (পাঠ) করছ না! আলগ-আলগ থাকছ।

রোজি দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, বুকুকে আটকে রেখে।

নুরুজ্জামান দ্রুত উঠে এসে বসল। বলল, কে? ওই কমবখ্ত্ শয়তানটা?

চুপ। বলে রোজি উঠে দাঁড়াল। কই সরুন বিছানা গুছোই। সুজনিটা ময়লা হয়েছে। কাচতে হবে।

নুরুজ্জামানের টুপিটা বালিশে পড়ে গিয়েছিল। সে সেটি তুলে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধভাবে বলল, এইসা নাহি চলে গা। আমি এসব বরদাস্ত করব না।

রোজি ধমকের ভঙ্গিতে বলল, আপনি আসুন তো। কেলেংকারি যা হবার হচ্ছে, আর বাড়াবেন না।

নুরুজ্জামান অবাক হল।...কী হচ্ছে?

রোজি জবাব দিল না। সুজনি গোটাতে ব্যস্ত হল। বাইরে সাইদার গলা শোনা গেল, বড়ো বউবিবি! একবার আসবে, মা?

রোজি সুজনি নিয়ে বেরিয়ে গেল শাশুড়ির ডাকে। সাইদা বললেন, আমার হাতে মালিশের তেল। সাজিমাটি দিয়ে না ধুলে যাবে না। ততক্ষণ তুমি নাশতার জন্য আটা মাখো। বিবিজি আজ পরোটা-হালুয়া খেতে চেয়েছেন। বয়োমে ঘি আছে দেখো গে।

সাইদা কুয়োতলায় গেলেন। রোজি সুজনিটা বারান্দায় রেখে ডাকল, বুকু!

ভেতর থেকে আওয়াজ এল, যাই!

একটু পরে সে বেরুল। রোজি বলল, আয়, নাশতা বানাতে হবে।

দুজনে রান্নাঘরের বারান্দায় গেছে, এমন সময় নড়বড় করে চৌকাঠ ধরে বেরিয়ে এল মনিরুজ্জামান। সে এখন কোনোরকমে টলতে-টলতে হাঁটতে পারে। গত জুম্মায় বড়োভাই নুরুজ্জামান তাকে মসজিদে নিয়ে গিয়েছিল। দেওবন্দ থেকে ফিরে মনিরুজ্জমানকে মুসল্লি বানানোর জন্য লড়াই করে যাচ্ছে নুরুজ্জামান। নামাজ, দোওয়াদবুদ আবৃত্তি করা শেখাচ্ছে। জড়ানো গলায় অনেক কষ্টে দু-চারটি বাক্য উচ্চারণ করতে পারে সে, অনবরত লালা গড়ায় যার মুখে, তাকে ঐশীবাণী আবৃত্তি শেখানো সহজ নয়, নুরুজ্জামান বুঝতে পারে। তবু এইটুকু উন্নতি দেখে সে খুবই অবাক হয়ে গেছে। পিতার সঙ্গে জ্যোতির্ময় জিনেদের গোপন সম্পর্ক এখন তার বিশ্বাস্য মনে হয়।

মনিরুজ্জামানের পরনে ডোরাকাটা তহ্‌বন্দ। খালি গা। সে বারান্দায় পা বাড়ালে কুয়োতলা থেকে সাইদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, অই! অই! অ মেজোবউবিবি দ্যাখো, দ্যাখো কোথা যাচ্ছে!

মনিরুজ্জামান গোঙানো গলায় উচ্চারণ করল, মুঁ ধোঁ-ধোঁ—

মুখ ধুবি তো ওখানেই বস। সাইদা ধমক দিলেন। বস ওখানে। পানি দিচ্ছি।

মনিরুজ্জামান গ্রাহ্য করল না। বেপরোয়া ভঙ্গিতে বারান্দার বাঁশের খুঁটি ধরে সিঁড়িতে পা রাখল। তারপর টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ল। সাইদা আর্তনাদ করে দৌড়ে এলেন। নিজের ঘর থেকে নুরুজ্জামান একবার উঁকি মেরে ব্যাপারটা দেখল শুধু।

সাইদা ধরতে গেলে মনিরুজ্জামান একটা চাপা হুংকার দিল। বোঝা গেল, সে এই দুনিয়ায় পা ফেলে হাঁটার জন্য অন্যের ভরসা করতে রাজি নয়। মায়ের হাতটা সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। তারপর হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে দাঁড়াল। নড়বড় করে পা ফেলে কুয়োতলার দিকে এগোতে থাকল।

রান্নাঘরের বারান্দায় আটা মাখতে মাখতে দৃশ্যটা রোজি দেখছিল। মুখ টিপে হাসছিল। আর বুকু উঠোনের দিকে পিঠ করে বসেছে পিঁড়িতে। উনুনে ঘুঁটে সাজাচ্ছে। একবারও ঘুরল না এদিকে। তার মুখে নির্লিপ্ততার গাঢ় ছাপ। রোজি ফিসফিস করে বলে উঠল, তোর দামাঁদ (বর) খেপল কেন রে? তখন কানে আসছিল, দুজনে খুব যুদ্ধু করছিলি যেন!

বুকু বলল, বেশ করছিলাম। তাতে তোর কী ?

রোজি হাসল। তারপর ঠোঁট উলটে বলল, আমার আবার কী ? কানে এল, তাই বলছি।

বুকু শলাইকাঠি জ্বেলে একগোছা খড়ের নুড়ি ঢোকাচ্ছিল উনুনের ভেতর সাজানো ঘুঁটের স্তূপে। বলল, চিরকাল আড়িপাতা তোর স্বভাব।

রোজি চাপা হাসতে লাগল। আব্বাসায়েব ফিরে এলে বলিস, কালো জিনটা এখনও পালায়নি তোর দামাঁদের কাছ থেকে।

বুকু ঝাঁঝালো স্বরে বলল, ভালো হবে না বলছি, রোজি !

বেশ বাবা, বেশ। তোমার দায় তুমি সামলাও। আমার কী ? বলে রোজি পরোটা বেলতে থাকল। দুলতে-দুলতে কাজ করা তার স্বভাব।

সাইদা প্রতিবন্ধী পুত্রের সঙ্গ ছাড়েননি। কুয়োতলায় তাকে আগের মতো মুখ ধুইয়ে না দিলেও পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তবে তিনি মনে-মনে এখন ভারি খুশি। খোঁড়া পিরের দরগায় গোপন মানত অথবা কোবরেজমশাইয়ের ওষুধের গুণেই হোক, এতকাল পরে মনি যে হাঁটতে বা কথা বলতে পারছে, এ এক বিস্ময় তাঁর। তবে এজন্য তিনি দরিয়াবানুর কাছে ঋণীও বটে। কতবার করে বলেন, তোমার গুণ কী দিয়ে শুধব বেয়ান ? রোজ কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে খোদাতালাকে বলব, আমি যেটুকু নেকি (পুণ্য) করেছি, তার অদ্ধেক আমার বেয়ানকে দিচ্ছি ! দরিয়াবানু বলে, ওকথা বলতে নেই বেয়ান ! আমি মুরুক্ষু চাষার বেটি। বরাতজোরে মিয়াঁর ঘর করতে এসেছিলাম। তবে হ্যাঁ, এটুকুন জানি — কিসে কী হয়। যদি ছোটোবেলা থেকে ছেলেটাকে হাঁটাচলা শেখাতে, চেষ্টাচরিত্তির করতে — বাছার এমন দশা হত না !

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বিয়ের পরই যেন রাতারাতি বদলে গেছে মনিরুজ্জামান। লালা গড়ালে মুছতে পারে। হাতদুখানির নুলো দশা কিছুটা ঘুচে গেছে মালিশের গুণে। নিজের হাতেই খেতে চেষ্টা করে। যেন স্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠার জন্য তার আত্মার ভেতর কী এক উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটেছে।

কিন্তু সেই উদ্দীপনাই যেন তাকে ইদানীং কেমন হিংস্র করে ফেলেছে। মুখে হাত ঢুকিয়ে উনিশবছরের এই ন্যালা ছেলেটি আর খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হাসে না। পাখ-পাখালি দেখে আগের মতো অবাধ খুশিতে তার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। বরং হুংকার দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করে। গাইগোবুটির দুধ দুইয়ে দিত আয়মনি। তার হঠাৎ কি হয়েছে, পিরসাহেবের বাড়ির আনাচে-কানাচেও তাকে দেখা যায় না। আয়মনি দুধ দুইয়ে বিবিসাহেবাকে দুধভরা পেতলের পাত্রটি দিতে এলে বারান্দা থেকে মনি দুহাত নড়বড়িয়ে শিশুর মতো ছটফট করত। গোঙানো স্বরে দুধ খাওয়ার জন্য কিছু বলার চেষ্টা করত। আর আয়মনি তাকে সস্নেহে বলত, সবুর বাপাজান ! একটুখানি সবুর ! কাঁচা দুধ খেয়ে ছ্যারানি হবে জান না ? কী যে হাসত আয়মনি এইসব কথা বলতে-বলতে ! আর মনির মুখ থেকে লালা গড়াত। সে দুপাশে দুলত। হাতদুটো সামনে নাড়া দিত। পাছা ঘসটাতে-ঘসটাতে কখনও রান্নাঘরের দিকে এগোনোর তালে থাক। আয়মনি বলত, অই ! অই ! সাহস দেখছ ছেলের ?

এখন দুধ দুইতে আসে দুলির মা নুরি। হাঁটুর নিচু অব্দি ডোরাকাটা তাঁতের

খেরোপরা দুলির বুকে আয়মনির ভাষায় 'কুসুমফুল ফুটেছে।' তবু খালি গা ওই মেয়ের। শাড়ি পরালে নাকি ঝটপট 'কুসুমফুল' ডাগর হয়ে যাবে। নুরি দুধ দোহায়। তার মেয়ে বাছুরটার দুই কান ধরে আটকে রাখে। বাছুরটা তার পেটে ঢুঁ মারে। পরশু এক কাণ্ড ঘটেছিল।

বাছুরের ঢুঁতে দুলির খেরো খুলে এক লজ্জা-লজ্জি ব্যাপার। রোজি দৌড়ে গিয়ে মেয়েটার আব্রু রক্ষা করেছিল। কিন্তু বারান্দায় বসে অভ্যাসে হাত চুষতে গিয়েই মনির যেই চোখ পড়ে, সে প্রচণ্ড এক হুংকার ছেড়েছিল। বাড়িতে সেই সময় যারা ছিল, প্রত্যেকে টের পেয়েছিল এ কিসের হুংকার। মনিরুজ্জামান মানুষে পরিণত হচ্ছে। মেয়েদের আব্রু বুঝতে পেরেছে সে।

ফেনিল দুধের পাত্রটি সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে দেখলে এখন তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে বটে, কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে। অপেক্ষা করে কখন মা তার জন্য গেলাসে করে দুধ আনবেন। চামচে করে ফুঁ দিয়ে খাওয়াবেন।

এদিন সে আরও আশ্চর্য এক কাণ্ড করল।

শাশুড়িকেও কাছে বসে খাওয়াতে হয়। পক্ষাঘাতের রুগি কামরুন্নিসা নিজের জীবিত একটি হাত দিয়ে খেতে পারেন, তবে গিলতে কষ্ট হয়। সাইদা তদারক করেন। তারপর খাওয়াতে যান মনিকে।

আজ মনি একটা হাত নেড়ে মাকে বুঝিয়ে দিল, তাঁর হাতে খাবে না। সাইদা ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, নে! তোর আজ আবার কী হল?

মনি গোঙানো স্বরে কিছু বলল।

বুঝতে না পেরে সাইদা রেগে গেলেন। আর কত জ্বালাবি তোরা আমাকে? তোদের জন্য আমার হাড়মাস কালি হয়ে গেল। এবারে গোরে গিয়ে ঢুকি, তবে তোদের শান্তি হয় — তাই না?

রোজি তার স্বামীকে নাশতা দিতে গিয়েছিল। সাইদার চড়া গলা শুনে বেরিয়ে এল। রুকু রান্নাঘরের বারান্দার উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছে। কোনদিকে লক্ষ্য নেই, শুধু আগুন দেখছে।

সাইদা ছেলের সামনে নাশতার থালা রেখে রান্নাঘরে গেলেন। রোজি দেখল, মনি চোখ বড়ো করে তাকিয়ে আছে — হ্যাঁ, রুকুরই দিকে। রোজি ঠোঁটের কোনায় হেসে এগিয়ে এল দেওরের কাছে। চাপা স্বরে বলল, কী মিয়াঁ? আজ বুঝি বিবির হাতে খানা খাওয়ার ধান্দা?

মনি গ্রাহ্য করল না তাকে। তখন রোজি আলতো পায়ে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় গেল। শাশুড়ি গম্ভীর মুখে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছেন। রোজি পা বাড়িয়ে রুকুর পেছনটা ছুঁল। রুকু ঘুরে ওকে একবার দেখে নিয়ে বলল, কী?

সাইদা দুজনের দিকে তাকালে রোজি ঝটপট বলল, রুকুকে ডাকছেন মেজোমিয়াঁ।

সাইদা একটু চুপ করে থেকে শ্বাস ছেড়ে বললেন, সে আমি কী বলব মা? তোমাদের ইচ্ছে। কেউ যদি ওর খিদমত (সেবা) করে, আমি তো বেঁচে যাই। এখন যা ভালো বোঝ, করো।

বুকু পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। সাইদা শাশুড়ির ঘরে গিয়ে ঢুকলে রোজি ধমক দিল বোনকে।— ইশ! শরমে গলে হালুয়া! নিজের দামাঁদকে খাওয়াবে, তাতে শরম। কেন, আমি খাওয়াই না বড়োমিয়াঁকে?

বুকু কোনো জবাব দিল না। আঁচল বাড়িয়ে দুধের পাত্রটা উনুন থেকে নামাল। তারপর উঠোনে নেমে হনহন করে খিড়কির ঘাটের দিকে চলে গেল। রোজি শুধু বলল, দেখছ?

মনির নিষ্পলক চোখদুটো অনুসরণ করছিল বুকুকে। খিড়কি খুলে বুকু ঘাটে নামতেই চাপা হুংকার দিয়ে সে নাশতার থালাটায় লাথি মারল।

সাইদা দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। নিচের উঠোনে হালুয়া-পরোটা ছড়িয়ে পড়েছে। থালাটা উলটে গেছে। সাইদা জীবনে যা করেননি, করবেন বলে কল্পনাও করেননি, আজ তাই করে বসলেন। তাঁর পায়ে কালো চটিজুতো। একপাটি খুলে মেজোছেলের মাথায় মারতে শুরু করলেন।...জানোয়ার! শয়তান! আজ তোমার জান সুদ্ধ খতম করে দেব! মুখের রুজি তুমি ছুড়ে ফেলতে পারলে?

সাইদার সারা জীবনের জমানো রাগ ফেটে পড়ছিল বুঝি। কামরুন্নিসা চেঁচামেচি করে জানতে চাইছিলেন, কী হয়েছে? অ বউবিবি? হয়েছে কী? অ রোজি! অ বুকু!

মনি মায়ের চটিটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। পারছিল না। রান্নাঘরের বারান্দায় খুঁটি আঁকড়ে ধরে রোজি থ। তারপর মনি মায়ের কাপড় খামচে ধরল। গলায় বিকট গোঙানির আওয়াজ। নুরুজ্জামান এঁটো হাতে বেরিয়ে একমুহূর্ত দৃশ্যটা দেখল। সে চেঁচিয়ে উঠল, আম্মাজান! ইয়ে ক্যা হো রাহা?

সে দৌড়ে এসে মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর ভাইয়ের হিংস্র হাত থেকে মায়ের কাপড় মুক্ত করে বলল, তওবা! তওবা! এসব কী শুরু করেছেন আপনারা? ইজ্জত বরবাদ করে দিচ্ছেন। এ কি পির-মওলানা আশরাফ-মোখাদেমের বাড়ি, না চাষাবাড়ি? ছুঃ ছুঃ!

নুরি তার মেয়েকে নিয়ে একটু আগে চলে গেছে। বাড়িতে এ মুহূর্তে বাইরের লোক নেই। নুরু ভাইয়ের হাত ধরে ওঠানোর চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ আগে যাকে সে জানোয়ার বলে গাল দিয়েছে, এখন তার জন্য দরদ জেগেছে মনে। কিন্তু মনি তার হাতে কামড় দিতে গেলে সে ঝটপট হাত সরিয়ে নিল। ফের খাপ্পা হয়ে বলল, অ্যাই উজবুক আকেলমন্দ্ বেতমিজ? কী হয়েছে তোর? উল্লুকা মাফিক কাম করছিস কেন? বেশরম খবিস কাঁহেকা!

সাইদা কাঁদতে-কাঁদতে শাশুড়ির কাছে ফিরে গেলেন। রোজি এতক্ষণে উঠোনে নেমে হালুয়া-পরোটা থালায় তুলে নিল। অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। উঠোনে ধুলো জমেছে। নাশতাটা তাই সাবধানেই তুলেছিল সে। এ বাড়ির শিক্ষা, মুখের রুজি নষ্ট করতে নেই। নিজে খেতে না পার, তো ফকিরমিশকিন লোককে দান করে দাও। নেকি হবে।

রোজি সেই কথা ভেবেই থালাটা রান্নাঘরে নিয়ে গেল। নুরু ফিরে গিয়ে অবশিষ্ট নাশতায় মন দিল। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না সে। রোজির প্রতীক্ষা করতে-করতে পরোটার শেষ টুকরোটা চিবুতে থাকল সে।....

ঘাটের মাথায় খিড়কির দরজার পাশেই কলাগাছগুলো বেশ ঝাঁক বেঁধে উঠেছে।

বুকু সেখানে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া ঘটনাটা দেখছে। হঠাৎ তার ইচ্ছে করছিল, ছুটে গিয়ে ওই জন্তুমানুষটাকে বাঁচায়। কিন্তু ওকে পালটা আক্রমণ করতে দেখেই থমকে গেছে। মরুক। মেরে ফেলুক ওকে বিবিজি! বুকু মনে-মনে বলছিল।

তারপর সব শান্ত হয়ে গেছে। বাড়িটা চুপ। বুকু ব্যাপারটা দেখেছে, অন্তত রোজি যেন জানতে না পারে — এই ভেবে সে কলাগাছের আড়ালে সরে এল।

কিন্তু বাড়ি ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না তার। যদি পারত, পালিয়ে যেতে কোথাও। অন্তত একটা দিনের জন্যও যদি বাইরে কাটাতে পারত। মায়ের কাছে গেলে তো বকুনি পিটুনি দুই-ই খাবে। বাবাকে দুই বোনে শুধু দূর থেকেই জানত। মা-ই তাদের সব। এতদিন মা তাদের শিয়রে ছিল। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে দিয়েছে। সেই স্বাধীনতা হঠাৎ কেড়ে নিয়ে তাদের দরদিনী মাও কেমন হিংস্র হয়ে উঠল — কেন এমন হল, বুকু আজও বুঝতে পারে না। বারিচাচাজির সঙ্গে ঝগড়াই কি এর কারণ? আরও অবাক লাগে, বারিচাচাজি আসাই ছেড়ে দিলেন মৌলাহাটে!

আর আয়মনিখালা! তারও কী হল, এবাড়ি আর আসে না। বিবিজি কি কিছু মন্দকথা বলেছেন ওকে? বুকু খুঁজে পায় না। কলাগাছের পাশে দাঁড়িয়ে বুকুর ইচ্ছে করছিল বুক ফেটে কাঁদে। কিন্তু কান্নাতেও আজকাল কী এক ভয়, সবকিছুতেই ভয়। দুনিয়াসুদ্ধ পর হয়ে গেলে যে ভয় মানুষকে পেয়ে বসে, সেই ভয় — কিংবা অন্য কোনো ভয়। সে পুকুরের ওপারে জঙ্গলের ভেতর খোঁড়াপিরের মাজারের বটগাছটির দিকে তাকাল। মনে-মনে মাথা কুটল, পিরবাবা! আমাকে বাঁচাও। নইলে আমি হয়তো মরে যাব।

কখন রোজি নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, বুকু টের পায়নি। আস্তে একটি ডাক শুনে ভীষণ চমকে উঠল।

রোজির নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। চোখ বড়ো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ঢঙ দেখে বাঁচিনে। কেন নিজের দামাঁদকে খাওয়াতে অত শরম কিসের রে? খামোকা ওকে মার খাওয়ালি। গাঁসুদ্ধ রটতে দেরি হবে না জানিস? আর মায়ের কানে গেলেই হয়েছে। কী হবে বুঝতে পারছিস?

বুকু আর সামলাতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রোজি চাপা গলায় ধমক দিল, চুপ! চুপ মুখপুড়ি! বাইরে এসে কাঁদতে শরম হয় না? কাঁদবি তো ঘরে ঢুকে কাঁদ গে না।

নুরির গলা শোনা গেল বাড়ির ভেতর। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেছে। এবার থালা-হাঁড়িকুড়ি মাজতে আসবে ঘাটে। রোজি বোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল, চুপ! চুপ! নুরিখালা এসেছে। কেলেংকারি হয়ে যাবে।

বুকু ঝটপট ঘাটে গিয়ে নামল। হেমন্তের শুরুতে পুকুরটা এখনও জলে ভরা। ঘন দাম জমে আছে। ঘাটের সামনেটা শুধু পরিষ্কার। বুকু মুখ হাত পা রগড়ে ধুল। এ বাড়ি খালিপায়ে থাকার রীতি নেই। তার ওপর পিরমওলানা বাড়ির বউবিবি। বুকু খালি পায়ে এসেছিল। চটিজোড়া রান্নাঘরের বারান্দায়, নাকি ঘরে খুলে এসেছে, মনে পড়ল না।

সে উঠে দাঁড়ালে রোজি চাপা স্বরে বলল, মেজোমিয়াঁ খায়নি। চল্, আমি ফের নাশতা বেড়ে দিচ্ছি। তুই নিয়ে যাবি।

বুকু গলার ভেতর বলল, কচি বাচ্চা নাকি ? আর-সবে তো—

চুপ ! রোজি বোনকে ধমক দিল। যা বলছি, করবি। নইলে মাকে সব বলে পাঠাব।

সে বুকুকে যেন অদৃশ্য হাতে টানতে টানতে নিয়ে গেল। রান্নাঘরে গিয়ে একটা থালায় দুটো পরোটা আর সুজির হালুয়া তুলে দিল বুকুর হাতে। বলল, তুই যা। আমি পানির গেলাস নিয়ে যাচ্ছি।

একটু ঠেলে দিলে বুকু পা বাড়াল। কামরুন্নিসা আর সাইদা চুপিচুপি কথা বলছিলেন। নাকঝাড়ার ফোঁসফোঁস শব্দ ভেসে আসছিল। নুরিকে বাসি হাঁড়ি-বাসনকোসন এগিয়ে দিতে থাকল রোজি। একটা চোখ বুকুর দিকে। মেজোমিয়াঁ একটু আগে নিজের ঘরে ঢুকে গেছে। বুকু ঘরে ঢুকলে রোজি মাটির কলসি থেকে কাচের গেলাসে জল ঢালতে ব্যস্ত হল।

গেলাসটা নিয়ে রোজি মুখ টিপে হেসে সোজা চলে গেল মেজোমিয়াঁর ঘরে। গিয়ে দেখল, বিছানায় বসে পা দুটো স্বাভাবিক মানুষের মতো ঝুলিয়ে একটু-একটু করে দোলাচ্ছে মনিরুজ্জামান। কিন্তু মুখটা নিচু। চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। লালার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আর তার সামনে মাথায় ঘোমটা টেনে নাশতার থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে বুকু।

ন্যালা তরুণটিকে এভাবে কাঁদতে কখনও দেখেনি রোজি। মুহূর্তে তার মন নরম হয়ে গেল। আস্তে বলল, ছিঃ ! কাঁদে না ! আম্মা মেরেছেন, না অন্য কেউ ? খান দিকি, নাশতা খান। দুনিয়ায় কার আম্মা কাকে মারেন না ? এই যে আপনার শাশুড়ি — আমাদের মা — আমাদের দুবোনকে কম মারধর করেছেন ?

বুকু অবাক হচ্ছিল। রোজির কণ্ঠস্বরে বুড়ি মেয়েমানুষের হাবভাব ! তারপর রোজি তাকে ঠেলে দিল। বলল, যাঃ ! হাতে নাশতা তুলে দে না !

তাই করতে গেলে মনি হাত নাড়ল। বুঝিয়ে দিল, খাবে না। তখন রোজি তার পাশে বসে পড়ল। কাঁধে হাত রেখে বলল, লক্ষি ভাইজান ! আমি তোমার ভাবি হই। শুনবে না ভাবির কথা ? তারপর হেসে উঠল সে।....এই মেয়েটাকে তুমি এখন চিনতে পারনি ? বড্ড বদমাইশ মেয়ে। বুঝলে ?

আর মনি তাদের দুজনকেই অবাক করে গোঙানো কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, টোঁ-টোঁ-টোঁমরা খেয়েছ ?

রোজি হাসতে লাগল।....কথা শোনো মিয়াঁর ! তুমি না খেলে আমরা খাব ? গোনা হবে জান না ? কত্তো বেলা হয়ে গেল ! খিদে পায়নি বুঝি আমাদের ? নাও — নাও ! ও বুকু, পরোটা ছিঁড়ে টুকরো করে দে তোর দামাঁদমিয়াঁকে।

মনি গোঁ ধরে বলল, টুঁ-টুঁমি ডাঁও !

তার মানে বুকুর ওপর তার রাগ এখনও পড়েনি। ভাবি তাকে খাইয়ে না দিলে সে খাবে না। রোজি হাসতে-হাসতে পরোটা টুকরো করতে থাকল।

এদিন থেকেই তেরো বছরের বালিকাবধূ রোজি এ সংসারে সাঁইদা বেগমের ঠাঁইটি দখল করে ফেলল যেন। শাশুড়ি আর দাদিশাশুড়িরও সেবাযত্ন তদারক সারাক্ষণ, কোমরে আঁচল জড়িয়ে ব্যস্ত গম্ভীর হয়ে ছুটোছুটি, নুরিকে কথায়-কথায়

ধমক, কত কিছু। আর বুকু আরও উদাসীন নির্লিপ্ত। দুই যমজ বোনের মাঝখানে একটি অদৃশ্য পাঁচিল গড়ে উঠেছিল। প্রায়ই শিষ্যবাড়ি থেকে ধানচাল, বিবিধ খন্দ, গুড়ের হাঁড়ি এসে পৌঁছয়। কত দূর-দূরান্তর থেকে শিষ্যরা গোরুর গাড়ি বা টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে, নয়তো নিজেরাই বয়ে আনে হরেক গুরুপ্রণামী। সাইদার মতো আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে নেপথ্যের কণ্ঠস্বরে রোজি নির্দেশ দেয়, কোথায় জিনিসগুলো রাখতে হবে। নুরুজ্জামান বাড়িতে থাকলেও এই খবরদারি রোজির। বুকু লক্ষ্য করে, রোজির মধ্যে তার মায়ের আদল ফুটে বেরুচ্ছে। প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা তাকে খুব ভেতর থেকে তাতিয়ে দেয়। ভাবে, যদি সে 'জন্তুমানুষটা'র বউ না হত, তাহলে সংসারে কর্তৃত্বের ন্যায্য শরিকানাটি দখল করত সেও হয়তো কোমরে আঁচল জড়াত। কিন্তু কী দরকার অত ঝামেলায় নাক গলিয়ে? বেশ তো আছে।

না — সত্যিই সে ভালো নেই। যখন-তখন একটা জন্তুমানুষের কামার্ত আক্রমণ, এমন-কি রজস্বলা অবস্থাতেও রেহাই নেই। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে বুকু তার অবশ শরীর রেখে পালিয়ে যায় — পালাতেই থাকে, দূরে—বহুদূরে। কিন্তু কোথায় যাবে? কার কাছেই বা তার এই মানসিক সফর? খালি মনে হয়, খোঁড়াপিরের দরগায় ভাঙা ফটকে কাঠমল্লিকার ফুলবতী গাছের কাছে উলটো মুখে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। ভয় পেয়ে পিছু হটে ফিরে আসে নিজের। বেইজ্জত শরীরের ভেতর ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা! নিজের ওপর, সবকিছুর ওপর।....

অনেকদিন পরে আয়মনি এল খিড়কির দরজা দিয়ে। রোজি কুয়োতলার পাশে বিকেলের রোদে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। বুকু বারান্দায় সুজনি সেলাই করছিল। কদিন থেকে ওই নিয়ে লেগে আছে। কদিন থেকে কামরুন্নিসার বুকে ব্যথা-ব্যথা ভাব। তেল দিয়ে বুক ডলে দিচ্ছেন সাইদা। রোজি আয়মনিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বলল, সাপের পা দেখেছ, নাকি দিনে তারা দেখেছ আয়মনিখালা? যাও, যাও। অবেলায় আমরা মেহমান নিই নে!

আয়মনি একটু হাসল।...আসা হয় না মা! বাপজানের শরীল ভালো না। বলে সে বুকুর দিকে ঘুরল। বুকু, কেমন আছ মা?

বুকু আয়মনিকে বলল, ভালো। সে আয়মনিকে দেখছিল। কেমন যেন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে ওকে। সেই সাজগোজের ঘটা আর নেই। কপালে টিকলি নেই, কোমরে রুপোর চন্দ্রহার নেই, পায়ে নেই রুপোর মল! কানের সোনার বেলকুঁড়িটা নেই।

রোজির কাছেই দাঁড়িয়ে রইল আয়মনি। এইতেও বুকুর খারাপ লাগল। ওকে দেখেই বুকের ভেতরটা দুলে উঠছিল চাপা আবেগে। কত কথা জমে আছে মনে!

রোজি হাসতে-হাসতে ছড়া কেটে বলল, 'এসো কুটুম বসো খাটে। পা ধোওগে ডোবার ঘাটে!'

আয়মনি একটু হাসল। আমি কি কুটুম? পর বই তো লই।

রোজি কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তাহলে পরের বাড়ি এলে যে বড়ো?

এলাম একটুকুন কাজে।

আয়মনির কণ্ঠস্বরে কী একটা ছিল, রোজি আর বুকু একই সঙ্গে তার দিকে স্থির চোখে তাকাল। তারপর রোজি আস্তে বলল, কী কাজ আয়মনিখালা?

আয়মনি বলল, দরিবুবু পাঠাল। সনজেবেলা দুই বহিন একবার যেও।

দরিয়াবানু বেয়ানবাড়ি কদাচিৎ এসেছে। মেয়েদের বিয়ের পর এ অঞ্চলের প্রথা হল, বিনা আমন্ত্রণে আর অন্তত বেয়ানরা পরস্পরের বাড়ি যাবে না। সাইদা সেই একবার মৌলাহাটে প্রথম পৌঁছে গাড়ির ধুরিভাঙার দুর্ঘটনার দরুন দরিয়াবানুর বাড়ি উঠেছিলেন। ছিলেনও কয়েকটা দিন। কিন্তু তখনও তিনি ভাবতে পারেননি, এই চাষাড়ে স্বভাবের স্ত্রীলোকটি তাঁর বেয়ান হবে। ছেলেদের বিয়ের সময়ও তিনি যাননি, যদিও বরপক্ষের সঙ্গে বাড়িভে মেয়েদেরও যাওয়ার নিয়ম। আসলে ওই বিয়েটা ছিল একটা হঠকারিতা। একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র।

তবু যে দরিয়াবানু বেয়ানবাড়ি গায়ে চাদরমুড়ি দিয়ে কখনও এসেছে সেটা তার পক্ষেই সম্ভব। এসে ঈষৎ লজ্জা আর কুণ্ঠায় বলেছে, এখন আমি পিরসাহেবের বেয়ান। আগের মতো মাঠেঘাটে চাষবাসের তদারকে বেরুতে শরম হয়, বহিন! বেয়াইসাহেবের কানে উঠলে উনিও শরমেন্দা হবেন। অথচ দেখো, বড্ড ক্ষেতিও হচ্ছে। মুনিশ-মাহিন্দার লুটেপুটে খাচ্ছে। সমিস্যেয় পড়েছি।

আরও কিছু সমস্যা ছিল তার স্বামীর স্থানীয় আত্মীয়দের নিয়ে। জমিজমার শরিকানা নিয়ে ঝুটঝামেলা বাধত। মৌলানা এবং 'পির' বদিউজ্জামান কুটুম্ব হওয়ায় গ্রামের লোক এখন দরিয়াবানুর দলে। তাই সেসব ঝামেলা বাইরে-বাইরে দেখা যায় না। এবার দরিয়াবানু তদারকের জন্য নিজে মাঠে যেতে পারে না বলে চৌধুরী আর খোনকার সায়েবর যেন আড়াল থেকে মুনিশমাহিন্দারকে প্ররোচনা দিচ্ছেন। ঠিকমতো নিড়ান দেওয়া হয় না। সেচ পড়ে না। এবার ধানের ফলন নিয়ে দরিয়াবানু ভাবনায় পড়ে গেছে।....

আয়মনির কথা শুনে রোজি বলল, তুমি বিবিজিকে বলে যাও আয়মনিখালা! উনি না বললে যাব কেমন করে? আর শোনো, তুমি এসে নিয়ে যাবে — তবে যাব বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।

আয়মনি একটু হেসে সাইদাবেগমের ঘরে গেল। সাইদা তাকে দেখে বললেন, কী আয়মনি! এ বাড়ি আসা যে ছেড়েই দিয়েছ?

আয়মনি সে-কথা কানে করল না। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব জানিয়ে বলল, দরিবুবু রোজি-বুকুকে সনজেবেলা একবার ডেকেছে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব — তাই বলতে এলাম বিবিজি!

সাইদা একটু হাসলেন। বেশ তো, যাবে, বলে শাশুড়ির বুক ডলে দেওয়ার কাজটা থামিয়ে মুখ তুললেন।— নুরু বলছিল, সকালে তাকেও ডেকেছিল বেয়ান। কীসব ঝামেলা হচ্ছে ভুঁইখেত নিয়ে। তো নুরু বলল, ভুঁইখেতের আমি কী বুঝি? তবে শাশুড়ি বলছেন যখন, তখন বরঞ্চ—

আয়মনি কথার ওপর বলল, হুঁ — তাও বলল দরিবুবু। আমি বলি কী বিবিজি, আপনার বড়ো ছেলে বরঞ্চ দরিবুবুর মাথার ওপর গিয়ে দাঁড়াক। মৌলবি হয়েছে বলে দুনিয়াদারি করতে নাইকো?

স্বামীর কথাগুলো মনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সাইদার।...ইসলাম যেমন দুনিয়াদারি করতে বলছে মানুষকে, তেমনি আখেরাতের কাজও করতে বলেছে। তাই যে মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নমাজে বসে দুহাত তুলে মোনাজাত করে, সেই মোনাজাতের মানে হল : 'হে খোদা! আমাকে ইহকাল-পরকালের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলো দান করো।'

ইসলাম দুনিয়াদারিও চায়। দুনিয়ার সেরা জিনিসগুলোও ভোগ করতে চায়। বদিউজ্জামান পরক্ষণে হাসতে-হাসতে বললেন, তবে আমার যেন দুনিয়াদারি সয় না। বড়ো ঝকমারি লাগে।

সাইদা বললেন, হ্যাঁ — নুরু বলছিল, এবার থেকে শাশুড়ির বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করতে হবে। মৌলাহাটওয়ালা ফরাজি হয়েছে। মনটা তো রাতারাতি বদলায় না।

আপনার মাথা খারাপ, বিবিজি ? আয়মনি বলল। তার কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ ছিল।— মুখে সব আল্লা আমিন করছে, এদিকে ভেতর-ভেতর যা ছিল তাই। লোকদেখানো ভড়ং। এখন পিরসায়েব সফরে বেরিয়েছেন। গিয়ে দেখে আসুন গে, রাস্তায়-রাস্তায় মাঠে-ঘাটে আবার মেয়েলোকগুলো বেশরম ঘুরছে।

পেছন থেকে রোজি বলে উঠল, তুমিও বুঝি বেপরদা হয়ে ঘোর না আয়মনিখালা ?

রোজি হাসছিল। আয়মনি বিব্রতভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, সাইদা মৃদু ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বললেন, ছি বউবিবি ! আয়মনি বড়ো ভালো মেয়ে। আর বেপরদা হয়ে ঘোরে তো কী হয়েছে ? চাষিবাড়ির বউঝিরা পরদা করে বসে থাকলে সংসার চলবে ?

রোজি হাসতে-হাসতে সরে গেল। আয়মনি পিরজননীর হালহকিকতের খবর নিয়ে বুকুর কাছে গেল। উঁকি মেরে দেখেও নিল, ঘরের ভেতর বিছানায় বসে ন্যালা দামাঁদমিয়াঁটি ঠ্যাঙ দোলাচ্ছে। আয়মনি বুকুর কাছে দাঁড়ালে বুকু একবার নির্লিপ্ত মুখ তুলে তাকে দেখে নিল। তারপর লাল সুতোয় পদ্মফুল তৈরি করতে ব্যস্ত হল। আয়মনি একটা শ্বাস ছেড়ে আস্তে বলল, আসি বুকু। সনজেবেলা এসে তোমাদের নিয়ে যাব।—

হেমন্তসন্ধ্যায় এদিন আকাশে ঝলমলিয়ে চাঁদ উঠেছে। অলিগলি রাস্তা, তারপর পুকুরপাড় দিয়ে ঘুরে আয়মনি দুবোনকে চুপচাপ নিয়ে যাচ্ছিল তাদের মায়ের কাছে।

খিড়কির দরজায় লণ্ঠন রেখে দরিয়াবানু প্রতীক্ষা করছিল। পুকুরের জল ছুঁয়ে আসা একঝলক হাওয়া হঠাৎ হিম দিয়ে চলে গেল তার বাড়ির ভেতর। কেন যেন শিউরে উঠল দরয়াবানু। চাঁদের আলোয় আবছা তিনটি মূর্তি সামনে দেখেও দরিয়াবানু চুপ।

আয়মনি বলল, কী হল দরিবুবু ?

দরিয়াবানু লণ্ঠনটি তুলল। দুই মেয়েকে দেখল। তারপর বলল, আয়।

বারান্দায় লম্ফের আলোয় বসে মাহিন্দার বরকত গায়ে তেল মাখছে। শোবার আগে এই কাজটা সে করে। উঠোনে দুটো ধানের মরাই। তার ওপাশে দেয়াল ঘেঁষে হাঁসমুরগির দরমা। পেছনে গোয়ালঘর। এ বাড়ির চাল টিনের। মেঝেয় লাইমকংক্রিটের ওপর লাল পলেস্তারা। দুই বোনই লক্ষ করল, পলেস্তারা চটে গেছে অনেক জায়গায়। ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটি রেখে দরিয়াবানু হঠাৎ বুকুকেই বুকে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রোজি আর আয়মনি একটু অবাক।

একটু পরে চোখ মুছে বুকুকে, তারপর রোজিকে টেনে পাশে বসাল দরিয়াবানু। আয়মনি চৌকাঠের কাছে বসল কপাটে হেলান দিয়ে। দরিয়াবানু ধরা গলায় বললেন,

দুপুরবেলা হঠাৎ দেওয়ানসায়েব এসেছিল ঘোড়ায় চেপে।

রোজি চমকখাওয়া স্বরে বলল, বারিচাচাজি ?

দরিয়াবানু তার থান কাপড়ের আঁচল খুঁটতে-খুঁটতে মুখ নামিয়ে বলল, আবার কাজিয়া করে গেল। বললে কী, একটা ছেলের জিন্দেগি আমি নষ্ট করে দিয়েছি। এটার ছাস্তি আমাকে না দিয়ে ছাড়বে না। চাষার বেটি, মুরুক্ষু হারামজাদি বলে একশো গালমন্দ !

রোজি খাপ্পা হয়ে বলল, তুমি কিছু বললে না ?

দরিয়াবানু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কী বলব মা ? আমিই তো মেয়েটাকে— আবার হু হু করে কেঁদে ফেলল সে।

রোজি বলল, মা ! মা ! তুমি কিছু করনি। বুকু তো ভালো আছে। মেজোমিয়াঁও ভালো হয়ে গেছে কত্তো। বুকু, তুই বল্ না মাকে। চুপ করে আছিস কেন ?

বুকু চুপ। আয়মনি একটু হেসে বলল, ছাড়ো তো দরিবুবু ! দেওয়ানসাহেব লবাববাহাদুরের লোক — লবাববাহাদুর তো লয়কো যে তাকে এত ডর ? কী ক্ষেতি সে করতে পারে ? ভুঁইখেত যা-কিছু, সবই তো তোমার লিজের নামে কেনা। তুমার বিটিজামাইরাই তা ভোগ করবে।

দরিয়াবানু বুকুর দিকে ঘুরল। আবার তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তবু বুকু চুপ। রোজি আর আয়মনিও।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে আবার চোখ মুছে দরিয়াবানু উঠে দাঁড়াল। আস্তে বলল, খইয়ের লাড্ডু বানিয়ে রেখেছি। পাঠাইনি। আপন হাতে খাওয়াব বলে।

সিকেয় ঝুলন্ত হাঁড়ি নামিয়ে সেটি নিয়ে এল দরিয়াবানু। একটা নাড়ু বুকুর, আরেকটা রোজির মুখে গুঁজে দিল। আয়মনিকে বলল ; বারান্ডায় কলসিতে পানি আছে। ওই দ্যাখ কাঁসার গেলাস। পানি নিয়ে আয় তো বহিন !

আয়মনি ব্যস্তভাবে আদেশ পালন করতে গেল। দরিয়াবানু বলল, সকালে নুরুকে ডেকেছিলাম। বললাম, আমার তো আর কেউ নাইকো বাপজান তুমরা ছাড়া। পিরসাহেব দুনিয়াদারির ধার ধারেন না। কিন্তুক তুমাকে ভিনরাস্তায় হাটতে হবে — নইলে জো নাইকো। নুরু বলল, তার আপিত্য নাইকো। বললে পরে এবাড়ি এসেই থাকবে।

রোজি বলল, বিবিজির তবিয়ত ভালো না। দাদিশাশুড়িরও এখন-তখন অবস্থা। আমরা এলে চলবে ?

দরিয়াবানু বুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, বুকু তো আছে।

বলে সে বুকুর মাথায় হাত বুলোতে থাকল। বুকু লাড্ডু চিবুচ্ছিল। তেমনি নিশ্চুপ। আয়মনি দু' গেলাস জল খাটের পাশে প্রকাণ্ড সিন্দুকটার ওপর রেখে বলল, খুব ভালো কথা বুলেছ দরিবুবু। ইটা একটা কাজের কথা বটে।

দরিয়াবানু বুকুর উদ্দেশে বলল, দেল (হৃদয়) শক্ত করো, বেটি ! এই যে আমাকে দেখছ — আমি কী করে সংসার সামলেছি। তোমার আব্বাজান কী করে বেড়াত, মনে করে দ্যাখো। সেইসব কথা ভেবে বড়ো হও। বরাত বেটি ! আমারই ভুলে তোর এই কষ্ট।

রোজি বলল, কিসের কষ্ট ? ও কিছু না।

দরিয়াবানু ভাঙা গলায় বলল, সব কানে আসে ! গাঁয়ের লোক কত হাসাহাসি করে। লোকু ছড়াদার সঙের গান বেঁধেছে। কুচ্ছোর শেষ নাইকো আমার নামে ! রাগে দুঃখে ঘেন্নায় ছাতি ফেটে য্যায় রে !...

রোজির তাড়ায় বেরুনো গেল। বেশ রাত্তির হয়ে গেছে। হাঁড়ির নাড়ু বয়ে নিয়ে গেল আয়মনি। এবার তার হাতে দরিয়াবানুর লণ্ঠন। পুকুরপাড় থেকে চাঁদের আলোয় খিড়কির ধারে দাঁড়ানো মায়ের আবছা মূর্তিটা চোখে পড়ছিল দু'বোনের। রুকু বার-বার ঘুরে দেখছিল। মায়ের এই চেহারা সে কোনো দিন দ্যাখেনি। তাছাড়া মায়ের শরীর থেকে কী যেন একটা গন্ধ তীব্র হয়ে তাকে অনুসরণ করছিল। তার মা কি আতর মেখেছে ?

সে রাতে রুকু ঘুমোতে পারছিল না। মায়ের শরীরের সেই অদ্ভুত গন্ধটার কথা ভাবছিল। পাশের জন্তুমানুষটি এ রাতে তার বউকে জ্বালাতন করেনি। কোবরেজের বড়ি নিজেই চেয়ে নিয়ে খেয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাঝরাতে হিমটা আরও ঘন হল। সেই হিম রুকুকে ধীরে ঘুমের দিকে টেনে নিয়ে গেল। ঘ্রাণটাও হারিয়ে গেল।

আর সেই ঘুম ভোরবেলা ভেঙে গেল রুকুর। রোজির কোরানপাঠের সুর শুনে নয়, কী একটা প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে। নুরি কান্নাকাটি করে কী একটা বলছে শুনতে পেল। বেরিয়ে যেতেই নুরি হাহাকার করে বলে উঠল, ওরে বেটিরা ! তোদের কপাল ভেঙেছে রে ! তোদের মা ডুমুরগাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে রে !

রুকু একপলক শুধু দেখল রোজিকে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গিয়েছিল, কাল জ্যোৎস্নারাতে পুকুরপাড়ে ডুমুর গাছটার পাশ দিয়ে আসার সময় কী একটা ঘ্রাণ পেয়েছিল, বুঝতে পারেনি। এখন বুঝল, সে ছিল তাব মায়ের গায়ের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ — মৃত্যুর ঘ্রাণ।...

সব পাখি ঘরে ফেরে

বদিউজ্জামান শুধু বলেছিলেন, আমি সবই জানতাম। আর এই থেকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, মধ্যরাতে দরিয়াবান যখন ডুমুরগাছে ঝুলতে যাচ্ছে, তখন পিরসাহেবের অনুগত এক জিন ছুটে এসে খবর দিয়েছিল। জিনটি বলেছিল, আত্মহত্যাকারীদের

প্রতি খোদার লানৎ (অভিশাপ) ! পিরসাহেবের সঙ্গে জিনটির তুমুল তর্কাতর্কি হয়ে যায়। পিরসাহেবের মতে, আল্লাহ দোজখের একাংশ খালি রেখেছেন আত্মহত্যাকারীদের জন্য। কাজেই আল্লাহের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। ক্ষুব্ধ জিনটি পরে আলোর বেগে অকুস্থলে পৌঁছেও দরিয়াবানুকে আটকাতে পারেনি। সে স্তম্ভিত হয়ে দেখে, ডুমুরগাছটিকে পাহারা দিচ্ছে একদল কালো জিন। সেই জ্যোৎস্নারাতে একটা কালো দেয়ালের ভেতর নাদান এক স্ত্রীমানুষের মৃত্যু হচ্ছিল। ব্যথিত জিন ফিরে এসে পিরসাহেবকে ধ্যানস্থ দেখতে পায় এবং আসমানের দ্বিতীয় স্তরে নিজের দেশে চলে যায়। আর সে কোনোদিন ভুলেও পৃথিবীর মাটিতে পা রাখেনি।

জিনটির সঙ্গে বদিউজ্জমানের তর্কাতর্কি শুনেছিল মসজিদ-সংলগ্ন একটি বাড়ির বুড়ো-বুড়িরা। তারা জেগেই রাত কাটায়। তারাই সাক্ষ্য দিয়েছিল, পিরসাহেব বেয়ানের মরতে যাওয়ার কথা জানতে পেরেছিলেন। জিনটি চলে যাওয়ার সময় নিমগাছে আলোর ঝলকও দেখেছিল তারা। সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে ভেবে তারা ভোরের প্রতীক্ষায় রাত কাটাচ্ছিল।

সকালে মৌলাহাট থেকে খবর এলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। পিরসাহেবের বেয়ানের অত্যদ্ভুত মরণঝাঁপের একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলে। তবে বদিউজ্জামান ভারী একটা শ্বাসের সঙ্গে শুধু এই বাক্যটি উচ্চারণ করেন, আমি সবই জানতাম।

ইসলামে আত্মহত্যাকারীদের ক্ষমা নেই এবং নিশ্চিত অনন্ত দোজখ। আসলে শয়তান তাব কালো জিনের বাহিনী নিয়ে যখন কাউকে ঘিরে দাঁড়ায়, তখন কিছু-কিছু ক্ষেত্রে তার জয়লাভ ঐশী নিয়মের অধীন। নইলে আল্লাহ যে হাবিয়া থেকে জাহান্নাম পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বড়ো থেকে ছোটো সাতটি দোজখ প্রস্তুত রেখেছেন, তা পূর্ণ হবে কেমন করে?

শিসগাঁয়ের মসজিদের খতিব, যিনি জুম্মাবারে খুৎবা পাঠ কবতেন, সেই হোসেন মোল্লাব এই ব্যাখ্যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এব ফলে কোনো মুসলমানের মৃত্যুসংবাদ শুনে যে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না আলাইহে রাজেউন' দোয়াটি মৃতের আত্মার শান্তির জন্য উচ্চারিত হয়, হতভাগিনী দরিয়াবানুর জন্য তা হয়নি। আব পিবসাহেবের মুখে এক সাংঘাতিক গাম্ভীর্য। তাঁর উজ্জ্বল ফরসা রঙ নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। মৌলাহাটের লোকটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ক্ষুব্ধভাবে ফিরে যায়। সে আশা করেছিল, পিরসাহেবের সঙ্গে গোবুর গাডি চেপে বাড়ি ফিরবে। যতক্ষণ যা উনি বেয়ানের এই ভয়ঙ্কর পাপের জন্য আল্লাহেব কাছে ক্ষমা চাইছেন, স্ত্রীলোকটির যে পরিত্রাণ নেই! শুধু সে নয়, মৌলাহাটের সব মানুষই পথ চেয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। আশা করেছিল, দরিয়াবানুর লাশের সামনে জানাজা-নামাজে পিরসাহেবকে দাঁড়ানো দেখবে। কিন্তু তিনি যাননি। পরে সাব্যস্ত হয়, ফবাজি মৌলানার পক্ষে কোনো আত্মহত্যাকারিণীর লাশের জানাজায দাঁড়ানো সম্ভবত নিষিদ্ধ।

কিন্তু এসবের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বদিউজ্জামানের ক্রমাগত দূরাপসরণ। শিসগাঁ থেকে হাটুলি, হাটুলিতে দুটো দিন কাটিয়ে কাঁদরা, সেখান থেকে ভবানীপুর, তারপর মণিগ্রাম-বিনোটিয়া। উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় সরলরেখায় অপসরণটি ঘটছিল। মণিগ্রামে আবার বাদশাহি সড়কের দেখা মেলে। সড়কের ধারে ঢ্যাঙা

শিমূলের মাথায় তখন লাল ফুল। বসন্তঋতু আসন্ন। সেখান থেকে সড়ক ধরে দশ ক্রোশ দূরত্ব পেরিয়ে যাথারীতি শিষ্যরা বস্তাভরা ধান, একটিন গুড় আর একবস্তা মসুরির ডাল পৌঁছে দিতে গিয়েছিল মৌলাহাটে।

সাইদা বেগমের বাড়ির দরজায় সারা মরশুম এভাবে শিষ্যরা গাড়িবোঝাই জিনিসপত্র পৌঁছে দিত। তারা বলত, হুজুরের তবিয়ত খোদার বরকতে ভালো। তারা একটু রহস্যময় হাসিও হাসত। বলত, আপনাদের হালহকিকত হুজুরের অজানা নাই। অর্থাৎ অনুগত শাদা জিনদের অদৃশ্য গতিবিধি সমানে চলেছে। নুরুজ্জামান তখন শাশুড়ির বাড়ির মালিক। জোতজমার মালিক। রোজি মায়ের মতো কোমরে আঁচল জড়িয়ে সংসার গুছিয়ে বসেছে। এ বাড়িতে মনিরুজ্জামান নড়বড় করে হেঁটে শিষ্যদের গাড়ির কাছে যায়। গোঙানো কণ্ঠস্বরে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে। দলিজঘরে ধান বা খন্দের বস্তা শিষ্যেরা তুলে দেওয়ার পর সে হুংকার দিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়া শস্য কণাগুলির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এজন্য নুরির মা ঝাঁটা হাতে তৈরি থাকে। যত্ন করে খুঁটিয়ে সব ঝাঁট দিয়ে স্তূপাকৃতি করে! আঁচলে বা কুলোয় তুলে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় একটু হেসে নুরির মা লোকগুলোকে জিগ্যেস করে, হুজুর কবে ফিরছেন? ওরা শুধু বলে, কী জানি! হুজুরের ইচ্ছে।

ফাল্গুন মাসে ধান বেচে সাইদা বউবিবি রুকুকে সোনার নথ বানিয়ে দিলেন। রোজি তার মায়ের সব গয়না পেয়েছিল। নিজে সবই পরে থাকত। কিন্তু রুকুর কথা যেন তার মনে পড়ত না। আয়মনি এসে রুকুকে সাইদার সামনে তাতাতে চাইত। রুকু গ্রাহ্য করত না। সাইদার সোনার নথ কিনে দেওয়ার পেছনে সেই ক্ষোভ ছিল। রুকু শাশুড়ির খাতিরে একটা দিন নথ পরেছিল মাত্র। তারপর আবার সেই শাদাসিধে বেশভুষা। উদাসীন হাঁটাচলা, চাউনি দূরে — বহু দূরে, খোঁড়াপিরের পোড়ো মাজারে বটগাছের শীর্ষে নীল-ধূসর আকাশের দিকে। সেখানে কেউ উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে।

আর সেই ফাল্গুন মাসে শিষ্যদের কাঁদিয়ে বদিউজ্জামান যখন মহুলায় যাবার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, সেই সময় মৌলাহাট থেকে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে ক্লান্ত একটি লোক ভাঙা গলায় খবর দেয়, শেষ রাতে হুজুরের আম্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না আলাইহে রাজেউন।

আশ্চর্য, বদিউজ্জামান বলেছিলেন, আল্লাহের ইচ্ছা! শিষ্যরা গাড়ির মুখ ঘোরাতে গেলে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, অ্যাই নাফরমান খোদার বান্দা! তোমরা জান না মউতের জন্য শোক হারাম? প্রবাদ আছে, এরপর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে মৌলাহাটে! কামরুন্নিসার জানাজা হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, কারণ দশ ক্রোশ দূর থেকে তাঁর পুত্রের পৌঁছুনোর অপেক্ষা করা হয়েছিল। আর সেই সন্ধ্যায় আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে জমাট কালো মেঘ দেখা গিয়েছিল। আগাম একটা কালবোশেখির আশঙ্কা করছিল ওরা। ক্লান্ত লোকটি টাট্টু নিয়ে ফিরলে বিস্মিত মৌলাহাটবাসীরা গোরস্তানে লাশ নিয়ে যায় এবং সেই সময় কালবোশেখি এসে পড়ে। জানাজার সময় আরও বিস্মিত হয়ে তারা দেখে, অবিকল হুজুরের মতো লম্বা-চওড়া এবং শাদা আলখেল্লা, সবুজ পাগড়ি পরা একটি মানুষ আগের সারির সামনে লাশের

কাছে দাঁড়িয়ে জানাজার নামাজ পড়ছেন। ধুলোর পরদার ভেতর ওই দৃশ্য এমনকি মেঘের গর্জনের ভেতর চেনা গম্ভীর কণ্ঠস্বরও কেউ-কেউ শুনেছিল। ছড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়লে তারা দ্রুত লাশ কববস্থ করে এবং মাটি চাপিয়ে চলে আসে। আসার সময় পিছু ফিরে কবরের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ। কিন্তু কী খেয়ালে কেউ-কেউ তাকিয়েছিল। তাদের চোখে পড়ে লম্বচওড়া মানুষটি কবরের দিকে ঝুঁকে কাদামাটি সযত্নে সমান করে দিচ্ছেন। শিলাবৃষ্টি শুরু না হলে তারা অন্য লোকেদের তখনই কথাটা বলত। তারা হলফ করে বলেছিল, বিদ্যুতের ঝিলিকে মানুষটিকে তারা স্পষ্ট দেখেছে এবং তিনিই যে হুজুর পিরসাহেব, তাতে কোনো ভুল নেই।

তখন বদিউজ্জামান মহুলার মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন শিষ্যদের সামনে দাঁড়িয়ে। এই মসজিদটি ছিল ইটের তৈরি এবং নতুন। হুজুরকে দিয়ে মগরেবের (সন্ধ্যার প্রার্থনার) সময় এর দ্বারোদঘাটন হয়। কালবোশেখি আর শিলাবৃষ্টির দৌরাত্ম্যের দরুন মসজিদপ্রাঙ্গণে যে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল, তাতে বাধা পড়ে। তবে ব্যাপারটা হাজি নসরুল্লার প্রকাণ্ড দলিজঘর আর বারান্দায় ঢুকে যেতে অসুবিধা হয়নি। তখন আর বৃষ্টি ছিল না। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হুজুর কিছু মুখে তোলেননি। বলেছিলেন, মউতের জন্য শোক হারাম। তবে শোকে নয়, আমার তবিয়ত কাল থেকে ভালো নেই। শেষে অনেক সাধাসাধির পর শুধু একগ্লাস গুড়ের শরবত খেয়েছিলেন।

সে-রাতে মহুলার কিছু অসৎ কৌতূহলী যুবক জনহীন নতুন মসজিদে বদুপিরের সঙ্গে জিনের বাতচিত দেখার জন্য ওত পাততে যায়। তাদের একজনকে সাপে কামড়ায়। সে মারা পড়ে।

মহুলা নদীর তীরে বলে গ্রামটিরও নাম ছিল মহুলা। লোকগুলি ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। প্রায় ষাটঘরের বসতি। কিছু অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুরও বসবাস ছিল। তারা ছিল মৎস্যজীবী। মুসলমান পিরকে তারাও খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত এবং যে-বাড়িতে পিরসাহেবের খাওয়ার দাওয়াত, খোঁজ নিয়ে সেই বাড়িতে তারা সেরা মাছটি পাঠিয়ে দিত। জুম্মাবারে তারা দল বেঁধে স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে মসজিদের বাইরে একটা গাবগাছের তলায় ভক্তিভরে বসে থাকত! অসুখের জন্য পিরসাবের মন্ত্রপুত জল ঘটিতে করে নিয়ে যেত। পিরসাহেবের দর্শন আর আশীর্বাদ চাইত। বদিউজ্জামান বেরিয়ে আসতেন। তারা ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলতেন, অ্যাই বেঅকুফ! করছ কী তোমরা? আমি তোমাদের মতনই এক মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের কাছে মাথা নোয়াতে নেই। নোয়াবে শুধু ওই আল্লাহের কাছে।

তারা কুণ্ঠিতভাবে জড়োসড়ো হয়ে তাকিয়ে থাকত। আসলে তারা এই মুসলিম 'পির'কে ভাবত এক অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ। তারা তাঁর কাছে যাচ্ঞা করতে আসত নদীর সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। নদীটি ছোট্ট হলেও তার নিষ্ঠুরতা ছিল অসামান্য। বর্ষার পর থেকে তার হিংস্রতা যেত বেড়ে। এপাড়ের বাঁধ ভেঙে কতবার সর্বনাশী হয়ে ঘরসংসার ভাসিয়ে দিয়েছে লোকের। হাজি নসরুল্লাও বদুপিরকে এনেছিলেন এর একটা হিল্লে করতেই। নসরুল্লা আড়ালে মুচকি হেসে বলতেন, আর ডর নাই বাছারা। হুজুর বাঁধে হেঁটেছেন, বাঁধ পাথর হয়ে গেছে।

বদিউজ্জামান যতদিন মহুলায় ছিলেন, প্রতি বিকেলে অভ্যাসমতো বেড়াতে

বেরুতেন। নিষেধ থাকায় কেউ তাঁর সঙ্গে যেত না — যেতে চাইত না। ওঁকে একা রাখতে চাইত। আর হুজুর তাঁর ময়ূরমুখো ছড়িটি নিয়ে বাঁধ ধরে বহুদূর হেঁটে যেতেন। বিকেলে কোনো ঘাসজমিতে একা 'আসরে'র নামাজ পড়ে নিতেন। 'মগরেবের' সময় ফিরে আসতেন মসজিদে। একদিন ফেরার পথে বাঁধের ওপর ফণা-তোলা একটি সাপের মাথায় ছড়ির ঘা মারেন বদিউজ্জামান। সাপটি সঙ্গে-সঙ্গে মারা পড়ে। সেই মরা সাপ ছড়িতে ঝুলিয়ে তিনি গাঁয়ে ফেরেন। খুব ভিড় জমে যায়। সাপটিকে আগুন জ্বেলে পোড়ানো হয়। গুজব রটে যায়, এই সেই শয়তান সাপ, যে নুহু নামে এক যুবককে কামড়েছিল। তবে তার চেয়ে বড়ো ঘটনা 'বাঁধের পাথর হয়ে যাওয়া'। প্রতি বিকেলে মহুলার পুবে বা পশ্চিমে হুজুর নদীতীরে বাঁধ বরাবর হেঁটে যান, প্রতি সকালে বাঁধটি পরীক্ষিত হয়। লোকেরা বাঁধটির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মাতে থাকে, এই শাদা আর ধূসর মাটির বাঁধ অবশ্যই পাথরে পরিণত হতে চলেছে। হাজি নসরুল্লা চাপাস্বরে বলতেন, আল্লার ইচ্ছায় আর হপ্তাটাক। হপ্তাটাক ওঁয়ার জুতো খেলেই ব্যাটা শায়েস্তা হয়ে যাবে।

হয়ে যেত। বাধা পড়ে গেল। এক সন্ধ্যায় মগরেবের নমাজের পর মসজিদপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রবীণেরা চাপা স্বরে চাষবাসের গপ্প করছে, বদিউজ্জামান মসজিদের ভেতর রেড়ির তেলের আলোয় ফারসি শাস্ত্র খুলে বসেছেন, হঠাৎ একটা কালোরঙের ঘোড়া আঁধার ফুড়ে বেরিয়ে এল। লোকগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল। ঘোড়াটি উঁচু। মহুলায় এক সময় হাজি নসরুল্লার একটি ঘোড়া ছিল বটে, কিন্তু সেটি নিছক টাট্টু। তার পিঠে ছেলেপুলেরা যখন-তখন চেপে বেড়াত। ছোটানোর চেষ্টা করত। এই করতে গিয়ে বাঁধ থেকে বেচারি টাট্টু সোজা নদীতে পড়ে যায়। নদীতে স্রোত ছিল। সে ভেসে যায় এবং পরে তার মড়া পাওয়া গিয়েছিল বহু দূরের এক বাঁকের মুখে। শেয়ালেরা তাকে টেনে চড়ায় তুলেছিল। এক বেলাতেই তার মাংস ফুরিয়ে যায় এবং শকুনেরা নাকি ঠোঁট চেটে চেটে শেয়ালগুলোকে গাল দিতে-দিতে আকাশে উড়ে যায়। এই গল্পটা খুব রসিয়ে বলতে পারত নুহু, সেই সপেকাটা যুবকটি। সন্ধ্যাব অভাবিত এই উঁচু ঘোড়াটি দেখলে রসিক যুবক অন্য কোনো গল্প বানিয়ে নিতে পারত। ঘোড়ার সওয়ারকে নিয়েও তুখোড় একটি গল্প ফাঁদতে পারত সে। কাবণ এমন ঘোড়সওয়ারও এ তল্লাটে কেউ কখনও দ্যাখেনি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সেই ঘোড়সওয়ার বলেছিলেন, এটা কি মহুলা?

লোকগুলো আড়ষ্টভাবে জবাব দিল, জি হ্যাঁ। এটাই মহুলা বটে।

এখানে কি মৌলাহাটের পিরসাহেব আছেন?

তারা একসঙ্গে হল্লা করে বলল, আছেন, আছেন। হুজুর আছেন।

সেই সময় কালো ঘোড়াটি হ্রেষাধ্বনি করল। কেন যেন ভয় পেয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিল সে। সামনেকার দুই ঠ্যাং তুলে অন্য ধারে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছিল। তাকে শান্ত করার পর সওয়ার নামলেন। ঘোড়াটি তখন স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তার চোয়ালে একবার হাত বুলিয়ে সওয়ার মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্ভাষণ করলেন, আসসালামু আলাইকুম।

ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম।

বারান্দার চুনকামকরা থামের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বদিউজ্জামান। ঘোড়ার

আওযাজ শুনেই তিনি চমকে উঠেছিলেন। আগন্তুক কবমর্দনেব জন্য হাত বাড়ালে তিনি দুহাতে হাতখানি গ্রহণ কবলেন। তাঁব মনে ঝড শুবু হযেছিল। অতিকষ্টে দমন কবে আস্তে বললেন, ভেতবে আসুন দেওযানসাহেব।

দেওযান আব্দুল বাবি চৌধুবি নাগবাজুতো খুলে বাবান্দায উঠলেন। তাঁব বাঁ হাতে বন্দুক ছিল। বন্দুকটি নিযে খোদাব ঘবেব ভেতবে ঢোকা উচিত হবে কি না ভেবে একটু দ্বিধায পডেছিলেন। সেটা লক্ষ্য কবে বদিউজ্জামান একটু হেসে বললেন, নিযে আসুন। ইসলাম কালাম (ঐশী বিদ্যা) আব হাতিযাব দুই-কেই সমান ইজ্জত দেয। আমাব বসুলে কবিম (সাঃ) নিজে হাতিযাব ধবে লডাই কবেছিলেন। আসুন।

কিন্তু তাঁব মনে ঝড উঠেছিল। হঠাৎ এই অজ াাডাগাঁযে দেওযানসাহেব এভাবে এসে পডেছেন, নিশ্চয তাব কোনো মজবুত কাবণ াাছে। বদিউজ্জামান গালিচাব একাংশ দেখিযে বললেন, বসুন। বাবি চৌধুবী গালিচায বসলেন না। নগ্ন চুনকংক্রিটেব মেঝেয-বসে পডলেন। তাঁকে ভীষণ গম্ভীব দেখাচ্ছিল।

বদিউজ্জামান গালিচায বসে তাঁকে দেখতে-দেখতে বললেন, কোনো জবুবি খবব আছে দেওযানসাহেব ?

বাবি মির্যা আস্তে বললেন, ভেবেছিলাম আমাকে চিনতে পাববেন না।

বদিউজ্জামান মুখে সবল হাসিব ছটা তুলে বললেন, আল্লাহেব দুনিযায কিছু-কিছু চেহাবা মনে খোদাই কবে বাখাব মতো।

আমি গোনাহ্‌গাব মানুষ পিবসাহেব। আমাব তাবিফ কববেন না। বাবি মির্যা হাসবাব চেষ্টা কবে বললেন। হবিণমাবাব ছোটোগাজিব মুখে আমাব কুফবি (বিধর্মীসুলভ) চালচলনেব কথা শুনে থাকবেন। যাই হোক, আপনাব খোঁজে আজ প্রায সাবাটা দিন কেটে গেছে। আমাব ববাত। আপনাব দেখা পেলাম অবশেষে।

বদিউজ্জামান গম্ভীব হযে বললেন, খবব বলুন দেওযানসাহেব।

আপনি শফিব খবব বাখেন ?

বদিউজ্জামান চমকে উঠলেন। নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিযে বললেন, শফিব খবব। সে তো আপনাব বাখাব কথা। কেন দেওযানসাহেব ?

শফিব সঙ্গে আপনাব দেখা হযনি ? আপনাব কাছে আসেনি সে ?

না। কেন — কী হযেছে তাব ?

বাবি মির্যা গলাব ভেতব বললেন, প্রায সাতদিন হতে চলল, তাব পাত্তা নেই।

বদিউজ্জামান ঝুঁকে এলেন তাঁব দিকে। তাঁকে ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসজডানো গলায বললেন, কেন পাত্তা নেই ? তাকে আমি আপনাব হাতে তুলে দিযেছিলাম। আপনি তাব জিম্মাদাব। আব আজ আপনি আমাব কাছে তাব খবব নিতে এসেছেন। আজ্জব।

বাবি মির্যা মৃদুস্ববে বললেন, ওকে লালবাগে নিযে গিযেছিলাম। হবিণমাবা স্কুলে থাকলে ওব পডাশোনা হবে না ভেবে কাছে বেখেছিলাম। নবাব বাহাদুব ইন্সটিটিউশনে বাইবেব ছেলেদেব ভবতি কবে না। ওটা নবাব ফ্যামিলিব প্রাইভেট স্কুল। তো—

বদিউজ্জামান প্রায গর্জন কবে উঠলেন, কুফবি বাত ছাড়ুন। সাফ-সাফ বলুন, কেন শফি চলে এল ?

মাথা নেড়ে দুঃখিত স্বরে বারি মিয়াঁ বললেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ অমন করে চলে আসার পর আমি মৌলাহাটে গেলাম। গিয়ে শুনি, রোজি-রুকুর মা স্যুইসাইড করেছে। শফি সেখানে যায়নি। আবার ছুটে গেলাম হরিণমারায় বড়োগাজির কাছে। খোনকারসাহেবের কাছেও গেলাম। শফি যায়নি। তারপর ভাবলাম আপনার কাছে এসেছে নাকি।

বদিউজ্জামান চুপ করে থাকলেন। মুখটা নিচু। পিদিমের সামান্য আলোয় তাঁর চোখদুটি চিক চিক করছিল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভাঙা গলায় বললেন, আপনি শফির জিম্মাদার! তার ভালোমন্দের সব দায় আপনার।

জি হ্যাঁ।

শফিকে আমি আংরেজি কালাম শিখতে দিয়েছিলাম! বদিউজ্জামান আবেগপ্রবণ মানুষ। এই কথাটি বলেই অবোধ বালকের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন। শয়তান আমাকে জাদু করেছিল। হা আল্লাহ! সেই গোনাহ্‌গারির এই খেসারত!

প্রার্থনায়, ভাষণে, মজলিশে উদাত্ত কণ্ঠস্বরে পবিত্র বাক্য আবৃত্তি করতে করতে হুজুর পিরসাহেবকে তাঁর সব শিষ্যই এভাবে কাঁদতে দেখেছে। মহুলার শিষ্যরা ততক্ষণে ভিড় করে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। তারা ভেতরে ঢুকতে ভরসা পাচ্ছে না। বাইরে গ্রামের পথে গাবগাছটার তলায় ঘোড়াটা তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে নদীর ওপারের আকাশে প্রকাণ্ড জালার মতো মেটেরঙের চাঁদটা উঠছিল। সেই পাংশু ছটায় কালো ঘোড়াটিকে অলীক দেখাচ্ছি — যেন এক পক্ষিরাজ। মেয়েরা একটু দূরে পিদিম হাতে দাঁড়িয়ে ওই অলৌকিককে প্রাণ ভরে উপভোগ করছিল। তাদের কেউ-কেউ হাসাহাসি করে বলছিল, নুহু বেঁচে থাকলে বড়ো মজা হত। মজাটা কী হত, বলা কঠিন। তবে নুহু নিশ্চই ওই আশ্চর্য প্রাণীটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারত।

বাইরে চটুল এবং চাপা হাস্যপরিহাস, ভেতরে ক্রন্দন। বিব্রতমুখে বারি মিঁয়া বললেন, হুজুর পিরসাহেব! আপনি বুজুর্গ আছেন. এই সামান্য ব্যাপারে আপনার অস্থির হওয়া শোভা পায় না। আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম, শফি আপনার কাছে এসেছে কি-না।

সবুজ পাগড়ির প্রান্ত নাকে চোখে ঘষে বদিউজ্জামান সংযত হলেন এবার। ভাঙা গলায় বললেন, আপনি শফির আম্মার সঙ্গে দেখা করেছেন?

জি হ্যাঁ।

তিনি কী বলছেন?

পদ্মার ধারে ভগবানগোলার ওদিকে ওঁর ভাইয়ের বাড়ি। সেখানে গিয়ে থাকতে পারে!

যাবে না। বদিউজ্জামান গলার ভেতর বললেন। যায়নি।

কেন?

শফির মামুজি এক শয়তান। নেশাভাং করে। খুদ জাহান্নামি শয়তান সে।

তবু একবার দেখে আসব। বারি চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন!...ঠিকানা নাম সবকিছু লিখে নিয়েছি শফির মায়ের কাছে।

বলেই বন্দুকটি কাঁধে তুলে নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন। বদিউজ্জামান তাঁকে রাতের মেহমানির কথা বলার সুযোগই পেলেন না।

বাইরের ভিড় দেখল, কালো ঘোড়াটি কী ভাবে মুছে গেল — যেন পিছলে চলে গেল হলুদ জ্যোৎস্নার গা বেয়ে। তারপর বহুক্ষণ শুকনো মাটিতে খুরের শব্দ হতে থাকল খট্ খট্ খটাখট্...খটা্ খট্ খটাখট্—

মসজিদের বারান্দা থেকে কুণ্ঠিত মুখগুলি উঁকি দিচ্ছিল। বদিউজ্জামান গলা ছেড়ে ডাকলেন, হাজিসাহেব আছেন কি?

কেউ বলল, হাজিসাহেব নদীর পারে গেছেন ভুঁই দেখতে। খবর দিই হুজুর?

জি। জলদি খবর ভেজুন।

সে ছুটে বেরিয়ে গেল। নদীর ওপরে বোরো ধানের জমিতে কোথায় মুনিশেরা সেচ দিচ্ছে রাতভর এবং হাজি নসরুল্লা তার তদারক করছেন, সে জানে।...

হুজুরের তলব পেয়ে হাজি নসরুল্লা কাদা ধোওয়ার কথা ভুলে হাঁফাতে-হাঁফাতে গাঁয়ে ফিরেছিলেন। ফতুয়া লুঙ্গি আর টুপিতে প্রচুর কাদা। মসজিদের বারান্দায় উঠেই তিনি থ। ভেতরে মুসল্লি প্রবীণেরা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। হুজুর হাত তুলে তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ব্যাপারটা কী, বুঝতেই সময় লেগেছিল। তারপর যখন শুনলেন, হুজুর এখনই তাঁদের ছেড়ে চলে যাবেন এবং গাড়ি সাজাতে বলেছেন, তিনিও বিকট শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। বদিউজ্জামান বললেন, তওবা! নাউজুবিল্লাহ! আপনারা কি নাদান, না বেঅকুফ?

হাজি নসরুল্লা ভেতরে ঢুকে পায়ের কাছে আছড়ে পড়লেন। বিদায়ের সময় একটা চিরাচরিত রীতি বা দৃশ্য। কিন্তু বদিউজ্জামান বুঝতে পারছিলেন, মহুলার এই মানুষগুলো একেবারে আলাদা রকমের। কথায়-কথায় এরা যেমন খুনোখুনি করতে পারে, তেমনি কেঁদে বান ডাকিয়েও দেয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি এ ব্যাপারটা সহজভাবে নিয়েছেন। নিজেও প্রচুর কান্নাকাটি করেছেন। কিন্তু সে-মুহূর্তে তাঁর অসহ্য লাগছিল। তিনি শেষে ক্রুদ্ধভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এখনই গাড়ির ইন্তেজাম না হলে আমি পায়দল রওনা হব। বলুন আপনারা, কী চান?

হাজি নসরুল্লা চোখ মুছে বললেন, তাই হবে হুজুর! আগে দুমুঠো খানা তো খেয়ে নেন। এশার নামাজের পর গাড়ি ছাড়বে। ইনশাল্লাহ্।

মহুলার একমাস পরে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরুতে পেরেছিলেন বদিউজ্জামান। মহুলা থেকে কোনো রাস্তা নেই। মাঠের জমির আল কেটে দুফালি চাকাগড়ানো 'লিক'-রাস্তা করা হয় শুখার কয়েকটা মাস। বর্ষায় কাটা আলগুলো বুজিয়ে জমিতে জল ধরে রাখে চাষীরা। তারপর সেই শীতে ধানকাটা হয়ে গেলে আবার লিক-রাস্তাটা গড়ে ওঠে ক্রমশ। সেই লিক-রাস্তা ধরে দুক্রোশ এগিয়ে তবে বাদশাহি সড়ক। মৌলাহাট দশ ক্রোশ দূরত্ব। পৌঁছুতে পরদিন সন্ধ্যা হওয়ার কথা। কিন্তু খবর ছোটে বাতাসের আগে। সারা রাস্তায় যত গ্রাম, ততবার অলৌকিক শক্তিধর — বুজুর্গ-পুরুষ বদুপিরের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় জনতা। হানাফি ফরাজি কোনো বাছাবাছি নেই। ততদিনে বদুপির মজহাব বা সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রতি গ্রামে তাঁর গাড়ি পৌঁছয়, দেখা যায়, আগে থেকে খবর পেয়ে প্রস্তুত মুসলমান-জনতা রাস্তায় অপেক্ষা করছে। এমন-কী হিন্দুরাও তাঁকে উদ্দেশ করে কপালে হাত ঠেকায়। গাড়ি ছিল দুটি। একটিতে তিনি, পেছনেরটিতে কয়েকজন

মহুলাবাসী শিষ্য ধান-খন্দের কয়েকটা রাস্তা নিয়ে। তাদের সঙ্গে লাঠি-টাঙ্গি-বল্লম এবং একটা তলোয়ার ছিল। বাদশাহি সড়কে রাহাজানি হয় প্রায়ই। তাই এই সতর্কতা। বদিউজ্জামান গাড়োয়ানের ঠিক পেছনে বসেছিলেন, হাতে তসবিহ্ বা জপমালা। মাথায় সবুজ রেশমি পাগড়ির শীর্ষে শাদা ছুঁচলো টুপিটি দেখা যাচ্ছিল। পরনে ঢিলে শাদা আলখেল্লা। বাঁহাতের কড়ে আঙুলে চাঁদির মোটা আংটি — তবে ওটা নিছক আংটি নয়, তাঁর সিলমোহর। আরবিতে নিজের নাম খোদাই করা আছে। কাজললতার কালি মাখিয়ে কাগজে ছাপ দিলে সেটি শাস্ত্রীয় দলিল বলে গণ্য হয়। বহু বিবাদের নিষ্পত্তি, শরিকি সম্পত্তি বাঁটোয়ারা, কোনো জটিল সামাজিক ঘটনায় বা ব্যক্তিগত বিষয়ে 'ফতোয়া'র প্রামাণিকতা সিদ্ধ করে ওই চাঁদির আংটিটি। সারা রাস্তা সেবার তাঁর বড়ো বেশি দেরি করিয়ে দিচ্ছিল লোকেরা। দিনের নমাজগুলো কোনো-না-কোনো গ্রামের মসজিদে সেরে নিতে হচ্ছিল। আর নমাজ শেষ হলেও তাঁকে ওরা ছাড়তে চায় না। বহু সমস্যার ফয়সালা করে দিতে হয়। সিলমোহরে ছাপসহ 'ফতোয়া' লিখে দিতে হয় কাগজে। তবে প্রচুর সেলামি পড়ছিল। তাঁর আলখেল্লার একটি জেব টাকাকড়িতে ভরতি হয়ে গিয়েছিল।

অথচ মনে এতটুকু শান্তি ছিল না বদিউজ্জামানের। অস্থির হয়ে ভাবছিলেন, এর চেয়ে যদি দেওয়ানসাহেবের মতো তাঁর একটি তেজী ঘোড়া থাকত, তিনি পাখিওড়া পথে কখন পৌঁছে যেতেন মৌলাহাটে। এতদিনে বুঝতে পারছিলেন, তিনি যেন একটা ফাঁদে আটকে গেছেন। এই ফাঁদকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চলার জন্যই তিনি এক গ্রামে বেশিদিন বাস করতেন না। অথচ কী ভাবে খুব সহজেই ফাঁদে পড়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত! এখন তাঁর দিকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য অদৃশ্য চোখ — তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একা হতে চান, একা বেরিয়ে পড়েন। তবু ওই তীক্ষ্ণ সজাগ ঝাঁকে ঝাঁকে চোখ পেছনে অলক্ষ্যে থেকে তাঁকে দেখে। আহারে নিদ্রায় ভ্রমণে প্রার্থনায় ধ্যানে শয়নে সর্বত্র সর্বদা যেন হাজার-হাজার চোখ তাঁর প্রতি নিবদ্ধ। নাদান বেঅকুফ! ওরা তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে ও কাজে 'মোজেজা' অন্বেষণ করে। নিশীথ রাত্রির বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অনুভব করার জন্য যখন তিনি খোলা আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়ান, ওরা ভাবে একটা মোজেজা ঘটতে চলেছে। তাঁর হাতের ময়ূরমুখো ছড়িটি দেখে ওরা কি ভাবে তিনি হজরত মুসার মতো দরিয়ার পানি দুভাগ করতে পারেন? উজবুগ, বুড়বক, গোমরাহ্!

হুজুর!

গাড়োয়ান ঘুরে তাকে প্রশ্ন করছিল। বদিউজ্জামান বলেছিলেন, কিছু না।

গাড়োয়ান হলুদ দাঁতে হেসে বলেছিল, আর এসে পড়েছি বলে! ইনশাল্লা! ফজরের নামাজ মৌলাহাটের মসজিদেই পড়ব দেখবেন। আপনার মেহেরবানিতে, হুজুর, বলদ দুটো কেমন টগবগিয়ে পা ফেলছে দেখছেন?

এই বলে সে বলদ দুটোর লেজ খামচে বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিল, ইর্‌র্‌র হেট্ হেট্! লে লে লে...হুদ্দে হুদ্দে হুদ্দে...

সাইদা খবর পেয়েছিলেন আগের দিন সন্ধ্যায়। ইন্দ্রাণীর হাটে গিয়েছিল কারা, তারা খবরটা পায় — হুজুর মদনপুর থেকে রওনা দিয়েছেন। বুকু হিসেব করে

বলেছিল, পৌঁছুতে রাতদুপুর হবে। মনিরুজ্জামান কীভাবে ব্যাপারটা আঁচ করে আগের মতো মুখে হাত ভরে আপনমনে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠেছিল। সাইদা বেগম নির্বিকার মুখে রান্না করছিলেন। মুরগির গোস্ত, খেজুরথড়ি চালের পোলাও, সেদ্ধ করে রাখা বাসি গোরুর গোস্তের কোপ্তা। সারা সন্ধ্যা রুকু শিলনোড়ায় গোস্তটা থেঁতলে নরম করেছিল। বাড়িতে কয়েকটা আলো এ রাতে। আয়মনি এসেছিল এশার নামাজের পর। পা ছড়িয়ে বারান্দায় বলে চাপাস্বরে রোজির সংসারের গল্প করছিল। শফির নিপাত্তা হওয়ার খবরে সে কান করেনি। বলেছিল, আছে কোনোখানে। বাপের স্বভাব। ঠিকই মা বসে ডেকে বাড়ি ঢুকবে। সাইদা কোনো মন্তব্য করেননি। দুদিন আগে দেওয়ানসাহেবকে গোড়াল থেকে বলে দিয়েছেন, শফি আমার মরা ছেলে। ওর কথা আমার মনে পড়ে না দেওয়ানসাহেব।

এদিন শফির আব্বা আসবেন শুনে শফির কথাই বেশি করে মনে পড়ছিল সাইদার। প্রস্তুত হচ্ছিলেন মনে-মনে, সামনে এসে দাঁড়ালেই জামা খামচে ধরে আকাশচেরা গলায় বলবেন, আমার শফিকে ফিরিয়ে এনে দাও ! তোমার না জিনের পাল পোষা আছে, শুনি ! বলো তাদের, এখনই এনে দিক আমার বুকের মানিককে ! নইলে তোমার নিস্তার নেই !

রুকু দেখছিল, বিবিজি বারবার ঠোঁট কামড়ে ধরছেন। যেন কার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। চোখ নিস্পলক ! নাসারন্ধ্র স্ফুরিত !

দুখু শেখ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সাড়া দিচ্ছিল, মাজান ! বিবিজান গো !

সাইদা তাকে দেখা দেন না। আয়মনি কান করে শুনে ফিক করে হাসল। ওই গো, খবর হয়েছে !

না — এখনও খবর হয়নি। দুখু শেখ জানিয়ে গেল, বানারিপুরে হুজুর এশার নামাজ পড়েছেন। আসতে ভোর হয়ে যাবে। দুদণ্ড বেলাও হতে পারে।

সাইদা শ্বাস ছেড়ে বললেন, বউবিবি ! শোও গে যাও ! আয়মনি, বাড়ি যাবি না শুবি আমার কাছে ?

আয়মনি বললে, একটু দাঁড়ান বিবিজি ! বাপজানকে বলে আসি।

আয়মনি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে নুরুজ্জামান এল হন্তদন্ত। আম্মা ! আম্মি ! আব্বাসাব আসলেন ?

না।

নুরুজ্জামান উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, তাজ্জব।

উঠোনে চাঁদের আলো সবে পৌঁছেছে। কুয়োর কাছে রুকু কী একটা করছিল। নুরুজ্জামান দেখল, তার ভ্রাতৃবধূ হাতে বদনা নিয়ে টাট্টিঘরের দিকে চলেছে। সে মাঝখানের ঘরটার দিকে তাকাল। মনিরুজ্জামান তক্তাপোশের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে খুব দুলছে। নুরুজ্জামান চোখ সরিয়ে নিল।

সাইদা বললেন, বসবি না নুরু ?

নাঃ। যাই আম্মি ! মসজিদ থেকে সোজা আসছি। শোচ করলাম কী, আব্বাসাব আসলেন নাকি দেখে যাই !

নুরুজ্জামান চলে গেলে সাইদা ক্ষুব্ধভাবে আপন মনে বললেন, ঢং ! আব্বাসাব এলে মসজিদে খবর হবে না কি বাড়িতে খবর হবে ! দুশমন — সব্বাই দুশমন !

বুকু বেরিয়ে বলল, কিছু বলছেন বিবিজি ?

সাইদা গম্ভীর মুখে বললেন, না। শুয়ে পড়ো। রাত হয়েছে।

আয়মনিখালা আসুক।

সাইদা ধমক দিলেন, শোও তো তোমরা।

মনিরুজ্জামান গোঙানো গলায় যেন গান গাইবার চেষ্টা করছিল। ভুতুড়ে শব্দটা ভারি বিরক্তিকর। কিন্তু কেন মনি আজ এত খুশি, বুঝতে পারছিলেন না সাইদা। ওর আব্বা তো জন্ম দিয়েই খালাস। কোনোদিন ভুলেও কি তার দিকে একবার তাকিয়েছে ? তাকালে কবে ও পুরোপুরি মানুষ হয়ে যেত।

সেই মুহূর্তে সাইদা বেগম আরও শক্ত হয়ে গেলেন।...

সে রাতে সাইদা চেয়েছিলেন মজবুত এক উদাসীনতা। প্রবলভাবে ঘুমোতে চেয়েছিলেন, এমন ঘুম যেন কেউ এসে ডাকাডাকি করে ফিরে যাক। কিন্তু উদাসীনতা, ঘুম বা শক্ত ভাবটা শেষ পর্যন্ত তিনি ধরে রাখতে পারেননি। আয়মনি গাঢ় ঘুমে কাঠ। সাইদার ঘুম নেই। বাদশাহি সড়কে সারারাত গাড়ি চলার গড়গড় কোঁচ কোঁচ অদ্ভুত সব শব্দ হয়। মাঝে-মাঝে ভেসে আসে ঘুমঘুম গলায় গাড়োয়ানের গানের সুর। সে রাতে প্রতিটি শব্দের স্বাদ যাচাই করেছিলেন সাইদা। দুরের গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে শুনতে প্রতীক্ষা করছিলেন কখন শব্দটা এসে তাঁর খুব কাছে, হয়তো বা বুকের পাঁজরের কাছে এসে থেমে যাবে।

কিন্তু কোনো চাকার শব্দই থামল না। তাঁর বুক মাড়িয়ে মাথার খুলির ভেতর একটি গুরুভার গাড়ির দুটি চাকা গড়িয়ে যেতে থাকল অনন্তকাল, আজীবন।

বদিউজ্জামানের খবর এল সকালে। দুখু শেখ খবর এনেছিল। হুজুর পিরসাহেব ফজরের নামাজ পড়েছেন হরিণমারায়। ছোটোগাজি ছাড়েননি। এবেলা হরিণমারায় থাকবেন। বিকেলে রওনা দেবেন। দুখু শেখ হুজুরের আসন্ন প্রত্যাবর্তনের 'নমুদ' (সাক্ষ্য) হিসেবে একটি গোরুর গাড়িকে রাস্তা দেখিয়ে এনেছিল। গাড়িটিতে শস্যের বস্তা, জালাভরতি গুড়, কয়েকটা কুমড়ো। দুখু সদর দরজার বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ঘোষণা করছিল এইসব খবর। সাইদা তাকে দেখা দেন না। বুকু ঘোমটা টেনে দলিজঘরের দরজা খুলে দিল। তারপর সাইদা দেখলেন, মনিরুজ্জামান নড়বড় করে হেঁটে দলিজঘরের দিকে চলেছে। বুঝলেন, আব্বা কী নমুদ পাঠিয়েছেন, তা দেখার জন্যই যাচ্ছে সে। বুকু তার পাশ কাটিয়ে সরে এল। সাইদার ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি জানেন, দরিয়াবানুর এই মেয়েটি তাঁর মেজো ছেলেকে ঘৃণা করে।

তখন বদিউজ্জামান হরিণমারায় গাজিদের দলিজঘরে বসে আছেন বড়োগাজির পালঙ্কে। ছোটোগাজি হুজুরের শিষ্য। খাসি কেটে ভোজসভার আয়োজনে ব্যস্ত। আর বড়োগাজি বিনীতভাবে একটা চেয়ারে বসে শাস্ত্র-আলোচনা করছেন পিরসাহেবের সঙ্গে। বলছেন, আপনি ঠিকই বলেছেন হুজুর ! নাফরমানি-বেইমানির জন্যই মুসলমানের শাহি বরবাদ হয়েছে। আজ সে রাস্তার ফকির। আর আপনি ওই সে বললেন, ইংরেজ মুসলমানের দুশমন, সেও ঠিক ! নানা ফিকিরে সে হিন্দুদের লড়িয়ে দিচ্ছে মুসলমানের সঙ্গে। তবে আমার মতে, হিন্দুদের সঙ্গে লড়তে হলে তাদের মতো ইংরেজিবিদ্যা শেখা এখন মুসলমানের ফরজ। এ বিষয়ে হুজুরের মত

জানতে পারলে খুশি হই।

বদিউজ্জামান দেখামাত্র টের পেয়েছিলেন লোকটি ভণ্ড। তার এই ঘরভরতি বিলায়তি জিনিস, আংরেজি কেতাব ! লোকটির চোখেমুখে চালাকি ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিংবা এটা তার আংরেজি এলেমেরই পরিণাম। বদিউজ্জামান আস্তে বললেন, আমাদের একহাতে লড়াই করতে হবে হিন্দুদের সঙ্গে, অন্যহাতে আংরেজশাহির সঙ্গে।

বদিউজ্জামানের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। অথচ বড়োগাজির কথার জবাব ভদ্রতাবশে দিতে হচ্ছে। একে-একে গ্রামের মান্যগণ্যেরা এসে জুটলে বড়োগাজির হাত থেকে একটু রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু এবাও তেমনি নাছোড়বান্দা। হুজুরের মুখে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব শুনতে আগ্রহী। হুজুরকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ছোটোগাজি এসে অবশেষে বাঁচিয়ে দিলেন। তাড়া দিয়ে বললেন, জোহরের নমাজের সময় মসজিদে ওসব কথা হবে। আপনারা এবার মেহেরবানি করে হুজুরকে একলা থাকতে দিন। উনি বড্ড পেরেসান। মহুলা কি এখানে ?

লোকগুলো চলে গেলে বড়োগাজি ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, খানার কী ইন্তেজাম করলেন ?

মইদুর বললেন, খাসি জবাই হয়েছে।

বড়োগাজি সইদুর বাঁকা হাসলেন। বদিউজ্জামানের দিকে ঘুরে বললেন, আমাদের এই এক বদনসিব হুজুর। হরিণমারায় গোরু হালাল করা বারণ। হিন্দু জমিদারের মাটি। অনেক লড়াই করেছি।

বদিউজ্জামান আনমনে বললেন, মাটি আল্লাহতায়লার।

বড়োগাজি ক্ষুব্ধভাবে বললেন, আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওই যে বললাম, মুসলমান নিজেই যদি নাফরমান-বেইমান হয়, তাহলে ? হরিণমারার মুসলমান আমার হুকুমে খুন দিতে রাজি ; কিন্তু এই কাজটি বাদে। ওরা বলে, চিরকাল এরকম চলছে। বাড়তি ঝামেলা করে কী হবে ?

ছোটোগাজি মুখটিপে হেসে বললেন, তুমি দেখো না এবারে কী করি। হুজুরকে এতদিন বাদে যখন পেয়েছি, তখন আল্লাহ্ ভরসা। সামনে বকরিদের দিন হুজুর এখানেই এসে—

বদিউজ্জামান কথার ওপর বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ্। আমি নিজের হাতে হালাল করব।

বড়োগাজি নেচে উঠলেন।...মৌলাহাটের তামাম মুসলমানকে জেয়াফত করব বকরিদের নামাজে।

ছোটোগাজি বললেন, হুজুরের হুকুমে নিজের জান কোরবান করব।...

বারি চৌধুরী হরিণমারার গাজিভ্রাতৃদ্বয়কে বলতেন ডনকুইক্সোট-সাংকোপাঞ্জা। সেবার বকরিদ পড়েছিল বর্ষাকালে। হরিণমারায় গোরু কোরবানি নিয়ে এলাকায় বড়ো রকমের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশের তা থামানোর সাধ্য ছিল না। মুসলিম অধ্যুষিত মহকুমা। এস ডি ও বাহাদুর ছিলেন এক অস্ট্রেলিয়ান সায়েব। সারকেল অফিসার মুসলিম। শেষ পর্যন্ত একটা ফায়সালা হয়ে যায়। গোরু কোরবানি চলবে, তবে সদর রাস্তা থেকে অনেকটা আড়ালে।

মসজিদের পেছনে আগাছার জঙ্গলে ভরা পোড়ো জমিটাকে এজন্য চিহ্নিত করে যান এস ডি ও চার্লস প্যাটারসন। খবর পেয়ে সদর শহর থেকে খানবাহাদুর গরিবুল্লা হক পর্যন্ত এসে হাজির হরিণমারায়। শুধু আসেননি বারি চৌধুরী। কিন্তু মুসলমানদের এ একটা জয় তো বটেই এবং হুজুর পির বদিউজ্জামান এর মহানায়ক। গুজব রটে যায়, কোরবানির দিন ইদগাহের প্রাঙ্গণ ছাপিয়ে বাঁজা ডাঙা অব্দি যে নামাজিদের দেখা গিয়েছিল, তাদের একাংশ ছিল মানুষবেশী জিন। বিলপারের গ্রাম ঝিঙেখালির ডানপিটে গোয়ালার দল উলুশরার মাঠে এসে জিনের পাল্লায় পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তারা অগত্যা ফিরে যায় নাকাল হয়ে। আবার এও শোনা যায়, গোয়ালারা তাদের বাঁজা আর বুড়ো গোরুমোষের বাড়তি খদ্দের জোটায় ভেতর-ভেতর খুশিও হয়েছিল। মৌলাহাটের হামদু কশাই নাকি এই গোপন খবরটা দেয়।...

তো সে অনেক পরের কথা। বদিউজ্জামান সেদিন মৌলাহাট রওনা হন বিকেলের নামাজ পড়ার পর। ছোটোগাজি তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। মৌলাহাটে পৌঁছুতে এশার নামাজের সময় হয়ে যায়। ফলে হুজুরকে প্রথমে মসজিদেই অবতরণ করতে হয়। নামাজ শেষে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, মাথায় শাদা টুপি, পরনে কোর্তা-পাজামা, মুখে দাড়ি — একটি তরুণ নড়বড় করে ভিড় ঠেলে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তার মুখে অজস্র লালায় ভেজা হাসি ঝলমল করছে। নুরুজ্জামান পিতার পেছনের সারিতে ছিল। সে বলে উঠে, আব্বাসাব ! মনিকে পহচান করতে পারলেন কি ? আর প্রধান শিষ্যরা কোলাহল করে বলে ওঠেন, হুজুরের মোজেজা ! মারহাবা ! মারহাবা !

মোজেজাই বটে ! বদিউজ্জামান বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রথম মেজো ছেলেকে আলিঙ্গন করলেন।

শোনা যায়, সেই প্রথম আলিঙ্গনেই মনিরুজ্জামানের দেহ থেকে ততদিনে অতিশয় বুগ্ণ কালো জিনটি পড়ি-কী-মরি করে ভেগে যায়। সে রাতে জ্যোৎস্না ছিল। মৌলাহাটের ওপর দিয়ে সর্বকিছু প্রচণ্ড নাড়া দিতে-দিতে একটা আচানক তুফান বয়ে যায় এবং মসজিদের উত্তর-জানালা দিয়ে একটা কালো কিছু বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন মুসল্লিরা।

সাইদার কাছে খবর হয়েছিল, যে খবর হাওয়ার আগে ছোটে, হুজুর পিরসাহেব তাঁর মায়ের কবর জেয়ারত করে দুই ছেলের কাঁধে হাত রেখে রওনা হয়েছেন। কিন্তু ওই একটুখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে কী সময় যে লেগে গেল ! বারান্দায় রুকু ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছ ঘেঁসে দেয়ালে সেঁটে আয়মনি, নুরির মা, আর নুরি। সাইদা যেই শুনতে পেলেন সদর দরজায় বরাবর শোনা সেই পবিত্র দোয়াদরুদ উচ্চারণ, অমনি গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বরটি তাঁকে বিপন্ন করল বুঝি। শরমের মাথা খেয়ে সাইদা তাঁর ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বারান্দায় চারটি মেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেল। রুকু বন্ধ দরজার দিতে তাকিয়ে রইল। আর বদিউজ্জামান উঠোনে দাঁড়িয়ে সাইদার সংসার দেখছিলেন। চাঁদের আলোয় নুরুজ্জামান পিতাকে দেখাচ্ছিল সব্বকিছু। গোয়ালঘর, কুয়ো, রান্নাঘর, টাট্টিখানা, বড় তিন কামরা মাটির ঘরের খড়ের চাল, উঠোনপ্রান্তের গাছগাছালি। মনিরুজ্জামান তার ছড়িতে ভর করে দাঁড়িয়ে খালি দুলছিল আর দুলছিল। জ্যোৎস্নায় তার দাঁত চকচক করছিল।

নুরুজ্জামান মায়ের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করাটা লক্ষ করেনি। করেছিলেন বদিউজ্জামান। অস্বস্তি বোধ করেছিলেন।

কী-একটা আশঙ্কা করে এবং শরমে আয়মনি, নুরি, ও তার মা হালকা পায়ে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বদিউজ্জামান বারান্দায় রুকুর উদ্দেশে যখন আস্তে বললেন, কে — তখন রুকু ঝটপট নেমে এসে শ্বশুরের পদচুম্বন করল। আর মনিরুজ্জামান গোঙানো কণ্ঠস্বরে আম্মাকে ডাকতে থাকল।...

কানা ঘোড়ার সওয়ার

...পান্না পেশোয়ারিকে ইট মেরে জখম করে শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বারিচাচাজি বললেন, 'লালবাগ ইজ দা টাউন অব দা ডেডস'— মৃতদের শহর, আর সেই মৃতদের শহরে শয়তানের প্রতিনিধি ছিল পান্না পেশোয়ারি। এই লোকটাকে দেখলেই সবরকমের লোক সেলাম ঠুকে বলত, আদাব পান্নাসাব! তাগড়াই চেহারা, ফিনফিনে মলমলের কোর্তার ওপর কালো ভেলভেটের জরিদার শলুকা বা সদ্‌রি, কোমরবন্ধে গোঁজা বাঁকা খাপে চাকা ছোরা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে নকশাদার লাল নাগরা পরে পান্না পেশোয়ারি বিকেলে ছড়িহাতে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াত। নবাব বাহাদুর ইন্সটিটিউশনে আমার সহপাঠী বিড্ডু, যে ছিল নবাবি খানদানের ছেলে, আমাকে বলেছিল, পান্নাসাবকো সবকোই সালাম দেতা, লেকিন হম্ নেহি। কাহে কী, আই বিলং টু দা নবাব ফ্যামিলি। বাট ইউ মাস্ট শফি, ভুলো মাত্, হি ইজ আ ডেনজারাস ম্যান — খুদ্ শয়তান উসকো গার্ড দে রহা।

এই কথাটাও পান্না পেশোয়ারির প্রতি আমার রাগের কারণ হতে পারে। 'মৃতদের শহর'টা প্রচণ্ড ভিড়ে ভরা দিনমান। সন্ধ্যার পর থেকেই তার চেহারা কবরখানার। কেল্লাবাড়ি, যার পোশাকি নাম ছিল নিজামত কেল্লা, প্রায় এক বর্গমাইল জুড়ে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। তিনদিকে তিনটে প্রকাণ্ড দেউড়ি, একদিকে গঙ্গা। কেল্লাবাড়ির ভেতর নবাববাহাদুরের মোতিমহল, তার পিছনদিকটা জুড়ে ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। তার ভেতর জরাজীর্ণ সব একতালা খোপড়িঘর। আর উঁচু পাঁচিলটা ছিল অনেক জায়গায় টুটাফাটা। ভেতরে বাস করত নবাব-খানদানের অসংখ্য লোক। বিড্ডু তাদেরই একজনের ছেলে। গদ্দিনশিন নবাববাহাদুর-পরিবারের লোকেরা

তাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করতেন। ওঁরা থাকতেন মোতিমহলে। এদিকে নহবতখানার ফটকের পেছনে ভেঙে-পড়া কয়েকটা বাড়ি। তার ওপাশে কেল্লাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁসে সারবন্দি ঘুপচিঘর। সেই ঘরগুলোতে থাকত বাতিল চাকর-নফরদের পরিবার। সাতমার কাল্লু পাঠান কেল্লাবাড়ির ভেতর পিলখানা বা হাতিশালায় যে ঘর পেয়েছিল, সেটা ছেড়ে চলে আসার কারণ, বিড্ডুর মতে, তার দুসরি বহু সিতারা। আর এটাই আশ্চর্য সিতারা ছিল কেল্লা বাড়ির অস্বীকৃত 'নবাব'দের মেয়ে, তার বাবা আতা বেগ ছিলেন রোশন মহল্লার এক দরজি। দরজিগিরি করলেও লোকে তাঁকে বলত আতানবাব। বিড্ডু বলত, কেল্লাবাড়ির বান্দা-বাঁদিদের বংশও নিজেদের নবাব বলে চালায়, আর উজবুক শহরের লোক সেটা বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে। কিন্তু পরে বারিচাচাজি বলেছিলেন, কাল্লুর ছোটোবউ সিতারা বিড্ডুর এক চাচির (কাকিমা) মেয়ে। আর তখন থেকেই সিতারার দিকে আমার চোখ যায়।

নহবতখানার কাছে সারবন্দি একতালা ঘরের একটা জবরদখল করেছিল কাল্লু পাঠান। সেই ঘরটাতে থাকত এক বুড়ি, ইসমাইল কোচোয়ানের মা। ইসমাইল তার মাকে বাঁচাতে পারেনি, তার কারণ নাকি পান্না পেশোয়ারি। ইসমাইল থাকত রোশনিমহল্লার বস্তিতে। মাকে অগত্যা সেখানে নিয়ে যায়। আর তারপর থেকে পান্নাসাবেরও চোখ পড়ে সিতারার দিকে।

এসব কথা বিড্ডুর কাছে শোনা। বিড্ডুর আসল নাম ছিল মির্জা আরিফ বেগ। লম্বা, ছিপছিপে, ফরসা এই ছেলেটি আমাকে পাত্তা দিত। কাল্লুর ছোটো ভাই চুল্লু ছিল পিলখানার এক নোকর। চুল্লুর সঙ্গে বিড্ডুই আমার পরিচয় করিয়ে দেয় 'পিরসাহেবের ছেলে' বলে এবং দুর্ধর্ষ চুল্লুই ছিল একমাত্র লোক, যে পান্নাসাবের থোড়াই পরোয়া করে। ফলে চুল্লুকে আমার ভালো লেগে যায়। বিড্ডু তার কাছে লুকিয়ে গাঁজার ছিলিম টানতে যেত। আমিও চুল্লুরই কথায় ছিলিম টানি। সারারাত পড়ে থাকি চুল্লুর ঘরে। ভাগ্যিস তখন বারিচাচাজি কোনো মহালে গিয়েছিলেন, আর তখন শীতকাল, ফসল ওঠার মরশুম, খাজনা আদায়ের তাগিদ তখন থেকেই শুরু হয়। মৃতদের শহরটা প্রথম দিন থেকেই খুব রহস্যে ভরা মনে হয়েছিল বলে রহস্য ফর্দাফাঁই করার জন্য সেটাই ছিল আমার সুসময়। বিড্ডুর সঙ্গে টো-টো-করে ঘুরতাম দিনে রাতে। স্কুলটাতে তত কড়াকড়ি ছিল না। কারণ বেশির-ভাগ ছাত্রই নবাবি খানদানের আর বাদবাকি সব নবাববাহাদুরের কর্মচারীদের সন্তান। ইংরেজির ওপরই বেশি ঝোঁক ছিল, তাই স্কুলে যাওয়াটা আমার পক্ষে ছিল ভারি অস্বস্তিকর। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই অ্যাংলো-ইনডিয়ান। একজন মেমসায়েবও ছিলেন, আলাদা ঘরে বোরখাপরা মেয়েদের ইংরেজি পড়াতেন। সেই প্রথম গোরাসায়েব এবং মেমসায়ের দেখেছিলাম। তাঁদের মনে হত কথাবলা আজব রঙিন পুতুল। দুজন হিন্দু শিক্ষক, প্রচণ্ড বুড়োমানুষ, বাঙলা পড়াতেন। তাঁদের ক্লাসে বেশির-ভাগই বাঙালি কর্মচারীদের ছেলেরা এবং মুসলিম ছাত্র মোটে কয়েকজন, আমিও। তবে প্রতাপশালী শিক্ষক বলতে আরবি-ফারসি-উরদুর মৌলবিসাহেবেরা। কোনো এক পিরসায়েবের ছেলে বাঙলা পড়ে, এটা তাঁদের কাছে বেজায় বেশরিয়তি, তাই আমাকে দেখলে তাঁরা মুখ ঘোরাতেন। কোন সুনির্দিষ্ট কারিকুলামহীন, খেয়ালখুশিমাফিক পড়াশোনার এই প্রাইভেট স্কুলে তবু ক্লাস, পরীক্ষা এসব ব্যাপার ছিল এবং ছাত্ররা

কেউ ফেল করত না। আমিও ফেল করিনি।

বারিচাচাজি মহাল থেকে ফেরার পর নতুন বই কিনে দিয়েছিলেন। তাঁর খুশি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম নবাবি স্কুলটি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। গঙ্গার ধারে কেল্লাবাড়ির প্রধান দেউড়ির লাগোয়া দোতলা একটি ঘরে তিনি থাকতেন। ঘরটিতে প্রচুর বই আর পত্রিকা — বেশির-ভাগই ইংরেজি, এবং বই-পত্রিকার দিকে আমার একটুও ঝোঁক ছিল না। আমার ভালো লাগত গঙ্গার পাড়ে ঝকঝকে একফালি রাস্তার ধারে ফুলবাগিচা, কাঠের ছাতাবসানো চবুতরা, সানবাঁধানো ছোট আর বড়ো ঘাট, আর গঙ্গা। শীতে কালো জলের তলায় ঝিকমিক করত কী সব জিনিস, মনে হত কবে কোন্ নবাবজাদির কানের মোতির ফুল হারিয়ে গিয়েছিল, তারই গুঁড়ো। আর বিড্ডু বলত, উও সির্‌ফ্ বালু — জাস্ট্ স্যান্ডস্। তুম কভি গঙ্গা নেহি দেখা, শফি? দিস রিভার যিতনি দুইরোসে আতি, যিতনি দুইরোসে যাতি, বহ্‌তি, মেরা খানদানকা মুল্লুক থি। শালে ইংলিশ লোগোঁনে লুঠ লিয়া। আই হেট দা বাস্টার্ডস। বিড্ডুর বাবা কলকাতায় চাকরি করতেন। তাঁকে কখনও দেখিনি। বারিচাচাজি বলেছিলেন, বিড্ডুব আব্বা কলকাতায় এক মেমসাহেবের সরদার খানসামা। কিন্তু সাবধান, বিড্ডুকে বলিসনে এসব কথা। বলিনি। বিড্ডু বলত, সে বড়ো হলে ফৌজ জোটাবে। পান্নাসাব তাকে সাহায্য করবে। সেই ফৌজ নিয়ে সে ইংলিশম্যানদের সঙ্গে জেহাদ লড়বে। কথাটা আমার, কে জানে কেন, ভালো লাগত। সেই ভালোলাগার সূত্রে পান্না পেশোয়ারিকেও সবে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম! অথচ সেই বিড্ডুই যখন বলত, সে পান্নাসাবকে ঘৃণা করে এবং লোকটা বিপজ্জনক, তখন অবাক লাগত। আসলে বিড্ডু ছিল অস্থিরচিত্ত, চঞ্চল, কিছুটা ভীতু স্বভাবের ছেলে। পান্না পেশোয়ারিকে দূর থেকে দেখলে এড়িয়ে যেত। ফিসফিস করে বলত, নজর কারকে দেখো, দেয়ার ইজ এ ডারক্ হ্যালো বিহাইনড হিম, বহত্ খতরনাক! উসকা সাথ বাত মাত করো কভি। হি ইজ ডেনজারাস।

বারিচাচাজির বাবুর্চি-নোকর বলতে বুড়ো করিম বখ্‌শ্। সেও আমাকে পান্নাসায়েবকে এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দিত। পরে একদিন করিম বখ্‌শ্ মুখ বিকৃত করে বলেছিল, পান্না পেশোয়ারির কাছে লড়কালড়কির কোনো ফারাক নেই। আপনার মতো সুন্দর ছেলের ওপর ওর নজর পড়লে মুসিবত হবে। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। পান্না পেশোয়ারির ওপর আমার রাগের তৃতীয় কারণ এই।

একদিন কোনো মহালে প্রজাদের সঙ্গে হাঙ্গামা বেধেছে, বারিচাচাজি হাতি চেপে সেখানে গেছেন, সঙ্গে সাতমার কাল্লু এবং একদঙ্গল ভাড়াটে বরকনদাজ, যারা তলব পেলেই আশেপাশের এলাকা থেকে এসে হাজির হত হাজারদুয়ারি প্রাসাদের সামনে। তখন স্কুলে ছিলাম বলে সেই জঙ্গি সমাবেশ দেখতে পাইনি। করিম বখ্‌শ্ এবং পরে বিড্ডু এসে খুব রঙ চড়িয়ে বলল, ফৌজ রওয়ানা দিয়েছে। এতে বিড্ডুর খুশি আর উত্তেজনার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না! গদ্দিনশিন নবাববাহাদুর-পরিবারের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড শত্রুতা। অথচ বিড্ডুর নবাবি রক্ত তোলপাড় হচ্ছে নাকি, বিড্ডু বলল, দা সেইম ব্লাড শফি, খানদানকা খুন! সেই উত্তেজনায় সে আমাকে একখানে নিয়ে গিয়ে মজা লুঠবে বলে টানছিল। দক্ষিণের বড়ো দেউড়ির কাছে পৌঁছে পড়ে

গেলাম পান্নাসাবের পাল্লায়। এড়ানো গেল না তাকে।

পান্নাসাবকে দুধারের টুলে বসে থাকা লিকলিকে চেহারার দুই প্রহরী, যাদের হাতে খুব লম্বা দুটো গাদা-বন্দুক এবং ডগায় সঙ্গিন আটকানো, সেলাম দিচ্ছিল। পান্নাসাবের চোখ পড়ল আমাদের দিকে। হেসে বলল, আবে বিড্ডু! আ—আ যা মেরা পাশ! তারপর আমাকে দেখল সুরমাটানা চোখে। ইয়ে কৌন বে?

বিড্ডু আস্তে বলল, বাঙ্গালি। ছোটা দেওয়ানসাবকা ভাতিজা।

পান্না পেশোয়ারি এসে আমার চিবুক ধরে বলল, ওয়াহ্! ওয়াহ্! (বাঃ বাঃ)

ঝটপট সরে এলাম। প্রহরীদের একজন মুচকি হেসে বলল, কৈ পিরসাহাবকা আওলাদ (পুত্র) হুজুর! বঙ্গাল মুল্লুককা বড়া পির, শুনা!

পান্না পেশোয়ারি সুরমাটানা কুতকুতে চোখে আমাকে দেখতে-দেখতে বলল, তো তুমি পিরসাহাবকা আওলাদ ঔর ছোটা দেওয়ানসাহাবকা ভাতিজা। ঠিক হ্যায়! চলো, মেরা সাথ ঘুমনো চলো! এ বিড্ডু তু ভি আ যা।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, বিড্ডু ইশারায় আমাকে দৌড়ে পালাতে বলছে, পান্না পেশোয়ারি ফের আমার চিবুক ধরতে এল!...কী? হামার কোথা সমঝাতে পারছ না? হাম থোড়া-থোড়া বাঙলা বোলে। বোলো, কী বোলবে, বোলো! মেঠাই খাবে? তো এসো, হামার সোঙ্গে এসো।

আবার পিছিয়ে গেলাম। বিড্ডু হনহন করে চলে গেল রাস্তার দিকে। সেই সময় কোত্থেকে এসে পড়ল চুল্লু পাঠান। বলল, কা হুয়া পান্নাসাব? ঝামেলা মাত করো! মুশকিল হো যায়ে গা।

পান্না পেশোয়ারি বাঁকা হাসল।...হাঁ বে চুল্লু! মুশকিল তো হরঘড়ি হোতা। তেরা ছোটিভাবিভি বলিস্ কী, চুল্লু বাহাদুর মর্দ্ হো গেয়া — মুশকিল হো যায় গা। তো ঠিক হ্যায়।

সে টলতে-টলতে দেউড়ির ভেতর দিয়ে কেল্লাবাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। চুল্লু একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, শফিসাব, চলিয়ে মেরা সাথ।

বললাম, কোথায়?

চুল্লু হাসল।... জানিবাবার মাজারে উরসশরিফের মেলায় যাচ্ছি হামি। ওইখান থেকে দেখলাম কী, শয়তান পান্নাসাব আপনাদের সঙ্গে কোথা বলছে। খবরদার! উও জাহান্নামি যোখন সামনে আসবে, দেখ্‌কে দূরে চলে যাবেন। ওই দেখুন, বিড্ডুসাব কোথাতে চলে গেসে!

সে দেখিয়ে দিল রাস্তাব ধারে একটা সন্দেশের দোকানের কাছে ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিড্ডু। তার কাছে চলে গেলাম। আমাকে দেখেই বিড্ডু, বলল, কাম্ অন্ শফি। জলদি আও।

বললাম, চুল্লু আমাদের ডাকছে।

চুল্লু-উল্লু ছোড়ো! বলে সে আমাকে টানতে-টানতে নহবতখানার দিকে হন্তদন্ত এগিয়ে গেল। চুল্লু নিশ্চয় অবাক হয়েছিল। একবার ঘুরে দেখে নিলাম, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। আমরা ডাইনে মোড় নিয়ে উত্তরের রাস্তায় হাঁটছিলাম। নহবতখানার তলা দিয়ে রাস্তাটা গেছে। পেরিয়ে গিয়ে বললাম, চুল্লু কোন্

উরসশরিফের মেলায় যেতে ডাকছিল। গেলে ভালো হত, বিড্ডু।

বিড্ডু বলল, তার চাইতে বঢ়েয়া জায়গায় আমি তোমাকে লিয়ে যাচ্ছি! সে মুখ টিপে হাসল। তার কোর্তায় আতরের গন্ধ ভুরভুর করছিল। রাস্তাটা ঘিনজি, কালো পাথরের ইট এলোমেলো বসানো, খানাখন্দ এবং দুধারে জঙ্গলের ভেতর ধ্বংস্তুপ, কোথাও একলা-দোকলা জরাজীর্ণ একতালা ইটের বাড়ি—পলেস্তারা-খসে-যাওয়া, শ্যাওলায় সবুজ, দাঁতবেরকরা কঙ্কালের মতো বাড়ি। গাছপালার ভেতর মসজিদের গম্বুজে একঝাঁক পায়রা বসে আছে। রাস্তাটা একেবারে জনহীন। বাঁয়ে ঘিনজি গলির ভেতর ঢুকে বিড্ডু জানাল, বিবিমহল্লা এটা। শুধু ছিটেবেড়ার ঘর, খড়ের চাল, কোথাও ইটের বাড়ি — একইরকম হতশ্রী। গোরু ছাগল মুরগি আর আনমনা লোকে ঠাসা। খাটিয়ায় বসে বুড়ো-বুড়িরা চাপা স্বরে কথা বলছে এবং হুঁকো টানছে। কেশে অস্থির হচ্ছে। দরজায়, অথবা ফোকর বলাই উচিত, একদঙ্গল করে মেয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে। তারা বিড্ডু আর আমাকে দেখে নড়েচড়ে বসছিল। এমন সব ঠাট্টা করছিল যে আমি লজ্জায় আর অস্বস্তিতে আড়ষ্ট। আরপর আমার মাথায় এল, এরাই তাহলে বেশ্যা। আমি আরও অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। মহল্লা ছাড়িয়ে গিয়ে সোজা বিকেলের গঙ্গার মুখোমুখি হলাম। পাড়ে একটা খাড়া পাঁচিল দাঁড়িয়ে, তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বিড্ডু চাপা হেসে বলল কানিজা-নানির হাভেলিতে তোমাকে লিয়ে যাচ্ছি। তুমি ভি নানি বোলবে। বুঢ়িয়া খুশি হোবে।

ধ্বংসস্তূপ, গম্বুজওয়ালা পোড়ো মসজিদ, তার ভেতর একটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একতালা একটা বাড়ি। বাড়িটার একটা উঁচু দেউড়ি আছে। কাঠমল্লিকার প্রকাণ্ড গাছ দেউড়ির পাশে। বন্ধ বিশাল কপাট জুড়ে কাঠের ফুলকারি, কপাট দুটো কোনো এক সময় ভীষণ লাল ছিল আর দেউড়িটাও ছিল শক্ত। এখন টুটাফাটা। কপাটের ফোকরে একটা মোটা দড়ি ঝুলছিল। দড়ির শেষে একটা লোহার ছোট্ট ডাণ্ডা। সেটা ধরে বিড্ডু বার কতক টানল। ভেতরে ঢঙ ঢঙ করে ঘণ্টা বেজে উঠল। কপাটের অন্য পাশটায় আরও একটা ঘুলঘুলি এবং সেখানে দুটো চোখ দেখে চমকে উঠলাম। কপাট ফাঁক হলে দেখলাম যার চোখ, সে একজন মোটাসোটা মধ্যবয়সী মেয়ে, সালোয়ার-কামিজ-উড়নি পরা। বিড্ডুকে সে আদাব দিল। বিড্ডু বলল, মুন্নিখালা, ইয়ে মেরা দোস্ত্ শফি। বহত উঁচা খানদান। উঠোনে একটা ডালিমগাছের পাশে খাটিয়ায় একঝাঁক মেয়ে শুয়ে, বসে এবং পরস্পর হেলান দিয়ে কথা বলছিল। আমাদের দেখতে লাগল। বারান্দার ওপর ছোটো তক্তাপোশের বিছানায় বসে এক বৃদ্ধ ফরসিতে তামাক টানছিল। মোটাসোটা মেয়েটি গিয়ে তাকে বলল, বিড্ডুসাব আয়া আম্মি!

বৃদ্ধা ভুরু কুঁচকে বলল, কৌন রি?

বিড্ডু গিয়ে বলল, নানি! ম্যয় বিড্ডু হুঁ! ক্যায়সি হো তুম নানিজান? খবর আচ্ছি তো? বলে সে আমার নামটাই শুধু বলল। বৃদ্ধা ঘোলাটে চোখে আমাকে দেখতে দেখতে নলে টান দিতে থাকল!

মুন্নি, সেই মেয়েটা, আমার দিকে ঘুরে বলল, তুমি বাঙ্গাল আ্ছ বাবু?

ততদিন আমার জানা হয়ে গেছে, এ শহরের উরদুভাষীদের 'বাবু' হিন্দু 'বাবু' নয়। বাবা আদরে বাবু হয়। বিড্ডু আমার পাঁজরে আঙুল ঠেকাল। বললাম, হ্যাঁ।

বৃদ্ধা, বিড্ডুর কানিজা-নানি নির্বিকার স্বরে বলল, বিড্ডুয়া, তু বহৎ ঝুটবাজ।

কাহে রি নানি ? বিড্ডু তার পাশে বসে পড়ল। আমাকেও অন্য পাশে বসতে ইশারা করল। কিন্তু আমি বসলাম না।

বৃদ্ধা ধোঁয়ার মধ্যে বলল, কোতোয়ালসাবকো তু কুছ নেহি বলিস ! কাল হারামিবাচ্চা দারোগাবাবুকো সাথ লেকে আয়া। লোঠিশ লটক দিয়া দেউড়িমে। বোলা কী, আদালতকা পেয়াদাভি আবে ! তো ম্যয় হাবেলি ছোড় কার কালকাত্তা জাউঙ্গি ? কা ?

বিড্ডু বলল, তেরা কিরিয়া নানি, খোদাকা কসম, কোতোয়ালসাবকো হাম—

ছোড় বে শালে পাঁঠ্‌ঠে ! বৃদ্ধা তার পিঠে থাপ্পড় মারল বাঁ হাতে। ম্যয় পান্নাসাবকো খবর ভেজুঙ্গি।

মুন্নি এবার আমাকে একটা তেঠেঙ্গে কুরসি এনে দিল ঘর থেকে। কুরসিটার গদি আছে। মুন্নি আমার কাঁধ ধরে বসিয়ে দিল। অমনি বৃদ্ধা একটা হাত বাড়িয়ে বলল, এ বাঙ্গাল ছোকড়া ! কিতনা রূপেয়া হ্যায় তোরা পাস ? নানিকো তো কুছ ইনাম দেনা পড়ে গা ! দে !

নানি ! বিড্ডু বলল। উও বাঙ্গালকা সবসে বড়া পিরসাবকা আওলাদ। উসকো পাস কৈ ফিকির মাত করুগি তু। উও সির্‌ফ্ তেরি সাথ মুলাকাতকে লিয়ে আয়া।

বৃদ্ধা ভুরু কুঁচকে বলল, আবে ছোড় শালে পাঁঠ্‌ঠে ! তেরা মতলব ম্যয় সমঝি। উত্ত ভি রাণ্ডিবাজ লড়কা !

নানি, এক শরিফ লড়কাকো তু—

বৃদ্ধা থাপ্পড় তুললে বিড্ডু উঠে দাঁড়াল। ইশারায় আমাকেও উঠতে বলল। ডালিমতলায় খাটিয়ায় মেয়েগুলো ভীষণ ফরসা — পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে। বিড্ডু বারান্দার ধাপ বেয়ে নেমে তাদের কাছে গেল। আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বিড্ডু চাপাস্বরে মেয়েগুলোকে কিছু বলল। ওরা হাসতে লাগল আমাকে দেখিয়ে। রাগ করে বললাম, বিড্ডু আমি চলে যাচ্ছি।

একটি মেয়ে ভেংচি কেটে বলল, চোলে যাচ্ছি ! বিড্ডু দেখ্ বাঙ্গাল ছোকরা চোলে যাচ্ছে। এসো, এসো। যাবে কেনো ? জেরা দুধ খেয়ে যাও, কোলে তো বোসো !

সে তার কোর্তা নামিয়ে স্তন দেখানোর ভঙ্গি করল। বিড্ডু খি-খি করে হেসে উঠল। আমি রাগে, দুঃখে লজ্জায় দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড কপাটের হুড়কো তুলে বাইরে গেলাম। মুন্নি হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে এসে কপাট বন্ধ করল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিড্ডুর অপেক্ষা করলাম। কিন্তু বিড্ডু এল না।

বিবিমহল্লার ভেতর দিয়ে ফিরতে ইচ্ছে করল না। ডাইনে ধ্বংসস্তূপ, একটা কবরখানা আর ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে দূরে নহবতখানা চোখে পড়ল। কিছুটা হাঁটার পর একফালি পায়েচলা রাস্তা, রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে গঙ্গার দিকে, সেখানেই দেখা হয়ে গেল কাল্লু পাঠানের বউ সিতারার সঙ্গে।

সিতারা মাটির কলসি নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বলল, শফিসাব ! তুমি এখানে একেলা কী করছ ? কী হয়েছে তোমার ? অমন দেখাচ্ছে কেনো তোমাকে ?

ওকে বলা যায় না আমি কোথায় গিয়েছিলাম, কী ঘটেছে এবং বিড্ডুই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সিতারার যতই বদনাম থাক খারাপ মেয়ে বলে, সেই মুহূর্তে সে কানিজাবেগমের হাভেলির বেশ্যাদের মতো কেউ নয়, একটি চেনাজানা মেয়ে এবং তার চেহারার নবাবি খানদানের ছাপ, তার চলা-ফেরায় বা কথাবলার ভঙ্গিতে একটা চাপা আভিজাত্য — তা হোক না সে সাতমার কাল্লু পাঠানের বউ। আর বারিচাচাজি বলতেন, আতানবাব জাত মানেন না, কেল্লাবাড়িতে একঘরে সেজন্য। বেচারার দুর্ভাগ্য, সাত আটটা মেয়ে, একটাও ছেলে নেই। তো কী করবেন ? যাকে পছন্দ হয় এবং টাকা দিতে পারে, তাকেই একটা করে গছিয়ে দেন। তিন মেয়ের অবশ্য ভালো বর জুটেছে। তারা কলকাতায় আছে। বাকিগুলো বিলিয়ে দিয়েছেন যেখানে-সেখানে। তবে সিতারা কাল্লুর ঘরে গিয়ে ভালোই আছে শুনেছি।...

সিতারার কথার জবাবে বললাম, এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিড্ডুকে সাথে নাওনি আজ ? সিতারা হাসল। কাজিয়া হয়েছে নাকি ?

নাঃ !

তো এসো আমার সাথে। আমি গোসল (স্নান) করব। তুমি আমাকে পাহারা দেবে।

ঘাট অব্দি আর একটা কথাও বলল না সে। আমিও চুপ করে থাকলাম। গঙ্গার পাড়ে একসময় দালানকোঠা ছিল। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। ঘাটের দুধারে প্রকাণ্ড সব চাঙড়। ঘাটেব স্বচ্ছ জলেও প্রচুর চাঙড় মাথা উঁচু কবে আছে। কলসিটা বুকে নিয়ে জনহীন ঘাটে সাঁতার কাটতে থাকল সিতারা। ওর পরনে বাঙালি মেয়েদের মতো শাড়ি। লম্বাহাতা কোর্তা। বাড়িতে সে লাল চটি পরে ঘোরে। এখানে তাকে দেখতে দেখতে আসমার কথা মনে পড়ে গেল।

নদীর সঙ্গে মেয়েদের কী যেন সম্পর্ক আছে — আমি ভাবছিলাম একটা চাঙড়ে বসে। যত ভাবছিলাম, তত আমাকে টানছিল নদী। তবে এ নদী সেই ছোট্ট নদীটি নয়। এর জলের রঙ স্বচ্ছ কালো। এ নদী বড়ো, এর বিস্তার আছে, কিন্তু স্রোত বইছে কি না বোঝা যায় না। দূরে জেগে আছে বালির চড়া। বাঁদিকে ঘুরে গেছে বলে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, যদিও জানি ওদিকটায় কেল্লাবাড়ি, ইমামবাড়া, হাজারদুয়ারি প্যালেস, মোতিমহল। হঠাৎ আমার কোর্তায় জল ছিটিয়ে দিল সিতারা। জলের শব্দের সঙ্গে বলল, আও শফিসাব—এসো ! খেলা করব।

যদি এ নদী হত ইন্দ্রাণী কাছারির পেছনে সেই খরস্রোতা বেহুলা, আর সিতারা হত আসমা, তক্ষুনি ঝাঁপ দিতাম। কালো জলের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় করছিল। ভয় করছিল সিতারাকেও। দূরে ওপারে বাঁশবনের পেছনে সূর্য ডুবে গেছে। আবছায়া ঘনিয়ে এসেছে চারদিকে। কালো জল আরও কালো হয়ে উঠেছে। সিতারা আবার জল ছুড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এখনই ঠিক করে ফেলা উচিত, এই কালো নদীটিকে ভয় করব, না করব না। সে আমাকে টানছে, পাল্টা টান দেব কি না। কিন্তু টাগ অব ওয়ারে হেরে গেলাম।

হেরে গেলাম অথবা জিতে গেলাম। পায়ে চলা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে বড়ো রাস্তায় পৌঁছে একবার মনে হল, সিতারা কী ভাবল আমাকে। যাই ভাবুক, ওর নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছি, এই আমার সুখ। আমি যদি জলে

ঝাঁপ দিতাম, ও নষ্ট হয়ে যেত। কেউ ওকে বাঁচাতে পারত না, আমিও না।

সে রাতে খেতে বসে করিম বখশকে বললাম, হাবেলি কী করিম ?

করিম বলল, কোনো ? কোঠি। তো আপনি কোন হাবেলির কথা বলছেন ছোটোসাব ? এ টৌনমে তো একহি হাবেলি আছে। বহুত খারাব জায়গা। কানিজা বেগমকি হাবেলি। বাইজিলোক থাকে।

কথায় কথায় সে একটা ইতিহাস শুনিয়ে দিল। রিসালাদার মির মুর্গিন খাঁয়ের বউ ছিল কানিজা বেগম। বিশ বছর আগে মুর্গিন খাঁকে ডাকাত বদনাম দিয়ে সদর কালেকটার সিপাহি-পলটন পাঠায়। তোপখানার জঙ্গলে একটু লড়াই হয়েছিল। মুর্গিন ধরা পড়ে। সদর আদালতে তার ফাঁসির হুকুম হয়। কানিজা বেগম নাকি তার মৃত্যুতে খুশির খানা দিয়েছিল। কেল্লাবাড়ির কোতোয়াল বাকিউদ্দিনের সঙ্গে তার প্রেম ছিল। সেই সময় কেল্লাবাড়ির গরিব মেয়েদের কিনে নেয় কানিজা এবং বাকিউদ্দিন তাকে সাহায্য করে। আসলে কানিজা নিজে ছিল বাইজির মেয়ে। লখনউ থেকে তাকে ভাগিয়ে এনেছিল মুর্গিন। ইতিহাসটি দীর্ঘ। খাওয়ার পরও করিম শোনাতে থাকল। বাকিউদ্দিন লোকটা নিজেই চোর, সে কেল্লাবাড়ির দামী জিনিস লুকিয়ে বেচে দেয়। তারপর কানিজার যৌবন ফুরিয়ে গেলে কীভাবে কোতোয়ালসাব ত্যাগ করে, করিম ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রচুর রস মিশিয়ে সেই বৃত্তান্ত বলল। কোতোয়ালসাব বহত হারামি লোক। থানার দারোগাবাবু তার দোস্ত। সদরে কালেকটারবাহাদুরকে দরখাস্ত্ ভেজেছে, হাবেলিতে খানকি লিয়ে বেওসা হচ্ছে! তো আফশোস কি বাত, গদ্দিনসিন নবাববাহাদুর ভি সহি দিয়েছেন দরখাস্তে। নোটিশ জারি হয়েছে, হাবেলি ছেড়ে দিতে হবে। এখন বলুন ছোটাসাব, বেউশ্যা বলুন কী কসবি বলুন কী খানকি বলুন, বিবিমহল্লার কথা উঠল না কেনো ? না — পান্নাসাব বিবিমহল্লার জিম্মাদার! করিম বখশ হাসল। দাড়ি চুলকে বলল, কুছু হোবে না। কুছু হোবে না, কেনো — কী, কানিজা বেগম বড়ি ধড়িবাজ আওরত আছে। পান্নাসাবকে ধরবে। ব্যস!...

পরদিন স্কুলে বিড্ডুর সঙ্গে দেখা হলে সে স্কুলের পেছনে গঙ্গার পাড়ে নিয়ে গেল আমাকে। হাসতে হাসতে বলল, ইউ আর কাওয়ার্ড, শফি। ভেগে এলে কেনো ? হোয়েন ইউ গো দেয়ার, ইউ মাস্ট্ নিড এ বিট পেশেন্স। আজ যাবে তো, বোলো ?

বললাম, না।

বিড্ডু আমাকে তার বরাতে শেষ অব্দি কী ঘটেছিল, না শুনিয়ে ছাড়ল না। সেই অশ্লীল গল্প শুনে এত খারাপ লাগল যে ঠিক করলাম, আর ওর সঙ্গে মিশব না। নিজেকে আর নষ্ট হতে দেব না। ছুটির পর সেদিন সে আমাকে ডাকতে আসবে ভেবে কেল্লাবাড়ির ভেতর মোতিমহলের সামনে দিয়ে হেঁটে হাজারদুয়ারি প্যালেসের কাছে একটা চবুতরায় বসলাম। নিচে ধাপবাঁধানো ঘাট। চবুতরায় কেন্দ্রে কাঠের ছাতার তলায় বসে গঙ্গা দেখছিলাম। সূর্য ডুবছিল ওপারের গ্রামের আড়ালে। তারপর হঠাৎ নির্জনতা অসহ্য লাগল। ইমামবাড়ার পাশ দিয়ে উত্তরের ফটক পেরিয়ে ডাইনে ঘুরেছি, আবার পড়ে গেলাম সিতারাব সামনে।

সে স্নান কবে বাড়ি ফিবছিল। কাঁখে মাটিব কলসি। থমকে দাঁড়িযে ভাবছিলাম, সেও বিড্ডুব মতো একটা কিছু বলবে। ঠাট্টা কববে। কিন্তু তেমন কিছু কবল না সে। একটু হেসে বলল, বোজ এমন কোবে তোমাব সাথে দেখা হলে মুশকিল শফিসাব!

বুঝতে না পেবে বললাম, কী মুশকিল তোমাব?

আছে। তোমাকে বলব না।

চুপ কবে আছি দেখে সে ফেব বলল, তুমি এত্তো কম কথা বোলো কেনো শফিসাব? জওযান লডকা — তুমি মেযেলোকেব মতো চুপ থাকো হবঘডি। কুছু তো বলবে? তো বোলো। আমি শুনব।

আস্তে বললাম, কী বলব তোমাকে?

বলবে। আমি দেখতে পাই, তোমাব মুখে বহত কথা লিখা আছে। তাই বলবে।

কিছু লেখা নেই আমাব মুখে।

পিছু ফিবলে সিতাবা ডাকল, শফিসাব, শুনো! একটা কথা শুনো।

কী?

আমি কাল্লু-পাঠানেব বহু বলে তুমি আমাকে কামিনা নীচ লডকি ভেবো না। মুখসুদাবাদ নিজামতেব সবচাইতে উঁচা খানদানেব খুন আছে আমাব গাযে!

অবাক হযে বললাম, ওসব কী বলছ, সিতাবা?

আমি কসবি না।

সিতাবা! তুমি কেন এসব বলছ?

সিতাবা মুখ উঁচু কবে বলল, আমবা শিযা আছি। তোমবা সুন্নি আছ। তোমাব আব্বাজান শুনেছি বুজুর্গ পিব। তা না হলে লালবাগেব কোনো শিযা মেযেলোক তোমাব সাথে কথা বলত না!

বলে সে ভিজে কাপডেব শব্দ তুলতে-তুলতে চলে গেল। তাবপব মনে পডল, প্রথম যেদিন কাল্লু পাঠান আমাকে খাতিব কবে তাব বাডি নিযে যায, সিতাবাকে জানিযে দিযেছিল, শফিসাব সৈযদ। সিতাবা বাঁকা হেসে বলেছিল, সৈযদ? তো সুন্নি কাহে? আব্বাজান বোলা, সব সৈযদ শিযা হোনে লাগে। শফিসাব, তুমি কেমন সৈযদ আছ দেখি। সে খপ কবে আমাব হাত ধবে ফেলেছিল। কাল্লু হেসে অস্থিব! সিতাবা বলেছিল, সৈযদ হলে আমাব হাত পুডে যেত। গেল না। তুমি ঝুটা সৈযদ আছ! অবশ্য সে হাসছিল। তুমি বাগ কবেছ আমাব কথায? দেখ, মোতিমহলেব নবাববা বলে তাবা সাচ্চা সৈযদ। তাবা আমাদেব বলে, বান্দা-চাকব-নোকবেব খানদান। লেকিন তুমি দেখো, যখন আমি তোমাব হাত পাকডালাম, সাচ বোলো, আমাব হাত আগুন মনে হযনি? কাল্লু হেসে গডিযে পডেছিল! জবাব দিজিযে ছোটাসাব! হামি কুছু বলবে না। আপনাব জবাব আপনি দেবেন। ঔব যে সিতাবা! তমিজসে বাত কব উনহি কা সাথ। তুম তুম কবতি কিঁউ বি? সিতাবা তাকে ধমক দিযে বলেছিল, চুপ্‌সে বৈঠো! ছিলিম পিও। ম্যয মেহমানকা সাথ আপনা খেযালসে বাত কবুঙ্গি।...

একটা কামানেব ওপর বসে থাকতে-থাকতে চাঁদ জ্যোৎস্না ছডাতে শুবু কবল। তখন নহবতখানাব দিকে হাঁটতে থাকলাম ফটক পেবিযে। ভাঙাচোবা বাডিগুলোব

পর সারবন্দি একতালা ঘরের এদিকে শেষপ্রান্তে কাল্লুর বাড়ি। সামনে বেড়াঘেরা। একটুকরো উঠোনে পেয়ারাগাছ। বারান্দায় লানটিন জ্বলছে।

আস্তে ডাকলাম, সিতারা!

সিতারা 'কৌন' বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভাবলাম পালিয়ে যাই চুপিচুপি। কিন্তু সিতারা আমার স্বর চিনতে পেরেছিল এবং জ্যোৎস্নাও তখন স্পষ্ট। সে বারান্দা থেকে নেমে বেড়ার আগড় খুলে বলল, এসো। অমন দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। ভেতরে এসো।

বারান্দার খাটিয়ায় সে একটা সুজনি এনে বিছিয়ে দিল। এতক্ষণে দেখতে পেলাম, ঘরের ভেতরে কেউ শুয়ে আছে কাঁথামুড়ি দিয়ে। সেদিকে তাকাচ্ছি দেখে সিতারা একটু হেসে বলল, মেরি শাস — শাশুড়ি আছে। বিমার হয়েছে।

কাল্লুর মা কাঁথা থেকে মুখ বের করে বলল, কৌন রি বহু?

ছোটা দেওয়ানসাবকা ভাতিজা। পিরসাবকা আওলাদ। উওদিন আয়া থা না?

হাঁ। বলে বৃদ্ধা আবার কাঁথামুড়ি দিল।

সিতারা আস্তে বলল, বোলো!

কী বলব? হঠাৎ মনে হল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ হয়তো। তাই চলে এলাম।

সিতারা একটু চুপ করে থাকার পর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চায়পাত্তা আছে। চায় খাও! আমিও খাব।

এমন করে চলে এসে অস্বস্তি হচ্ছিল। বললাম, না, থাক।

কেন থাকবে? বলে সিতারা বারান্দার কোনায় উনুন জ্বালতে বসল। পাশের ঘরগুলোতে লোকেরা চাপাগালায় কথাবার্তা বলছিল। একটা কুকুর ক্রমাগত ডাকছিল। সে থামলে কাছেই কোথাও শেয়াল ডেকে উঠল। অমনি কুকুরটার চেঁচামেচি বেড়ে গেল। আশেপাশের জঙ্গলে বাঘ আছে বলেছিল করিম বখশ। শীতের সময় তোপখানার ঝিলের দিকে সে নাকি বাঘের ডাক শুনেছে। এদিকটা একেবারে নিশুতি, শহরের শেষপ্রান্ত এবং ধ্বংসস্তূপ, কবরখানা, পোড়ো মসজিদ, জঙ্গল আর মাইলের পর মাইল আমবাগান। ভাবছিলাম নহবতখানার ওদিক দিয়ে ফিরব না। যে পথে এসেছি, সেই পথই নিরাপদ। তবে উত্তরের ফটক খোলা পাব না! স্কুলবাড়িটার পেছনে ভাঙা পাঁচিলের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। গঙ্গার ধারে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই। চেনা জায়গা। কেউ জানতেও চাইবে না আমি কে।

সিতারা চায়ের পাতা মাটির হাঁড়িতে সেদ্ধ করে তাতে দুধ আর একগুচ্ছের বাতাসা ফেলে দিল। ওর চায়ের স্বাদ অন্যরকম। শাদা ন্যাকড়ায় ছেঁকে দারুণ সুন্দর দুটো চিনেমাটির পেয়ালায় ঢালল। মেঝেয় বসে বলল, পিও — খাও! সে হাসল। বাঙলা কথা আমি শিখতেই পারলাম না। কী করে শিখব? বিয়ের পর কেল্লাবাড়ি থেকে বাইরে আসলাম। তখন একটু শিখলাম। আগে তো কুছু জানতাম না — একটা কথা বলতে পারতাম না। বোলো, এখন কত পারছি। পারছি না?

পারছ।

তুমি বেশি কথা বললে অনেক শিখা হয় যেন! বোলো কথা বোলো।

তুমি আগে বলো, কেন রাগ করেছ আমার ওপর?

আমার খুশি। তুমিও রাগ করতে পার। পার না?

না।

কিছুক্ষণ ফু দিয়ে শব্দ করে-করে চা খাওয়ার পর সিতারা একটু হাসল।... তুমি আরও বড়ো হও। জওয়ান হও পুরা। তখন সব সমঝাবে। সব কথা বুঝতে পারবে। এখন তুমি ছোটা লড়কার মাফিক আছ, শফিসাব। জান? তুমি তাই আমাকে খারাব মেয়ে ভেবেছ।

পেয়ালা রেখে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আমি খারাপ মতলব নিয়ে আসিনি তোমার কাছে।

আমার গলার স্বর একটু চড়া হয়ে গিয়েছিল। কাল্লুর মা কাঁথা থেকে মুখ বের করে বলল, কা রি বহু? কিসকা সাথ তকরার করতি তু? কাল্লুবেটাকো আনে দো—

চুপ! চুপ্ সে নিদ যাও। গলা দাবা দুঙ্গি!

সিতারার চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। উঠোনে নেমে সে আমার সঙ্গ নিল। তুমি তাহলে রাগ করতে পার দেখলাম। বাহাদুর তুমি! সে হাসতে লাগল।

পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে আগড়টা খুঁজছিলাম। হঠাৎ সিতারা এসে আমার একটা হাত নিল। শিউরে উঠলাম। তারপরই মনে হল, ও আমাকে হয়তো পরীক্ষা করছে। হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলাম। সিতারা শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল, নাদান! বুদ্ধু! আমার হাতকে কী ভাবলে তুমি? গরম লাগল? আগুন জ্বলে গেল?

সে এগিয়ে গিয়ে আগড়টা খুলে দিয়ে একটু তফাতে দাঁড়াল। আমি বেরিয়ে গেলে সেটা জোরে বন্ধ করে দিল। যখন হেঁটে চলেছি, মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। কোথায় যাব জানা নেই।....

সেই বসন্তকালে মৃতদের শহরে সিতারা আর আমি যেন একটা অদ্ভুত লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠেছিলাম। মাঝে-মাঝে মনে হত, খুব শিগগির আমার বড়ো হওয়া দরকার — সিতারার ভাষায় 'পুরা জওয়ান'। তবে মানুষের জীবনে একেকটা সময় আসে, যখন মনের বয়স শরীরের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। সেই দ্রুতগামিতায় একটা অন্ধ ঘোড়ার গতিবেগ থাকে যেন। আমি ছুটছিলাম, ছুটছিলাম, ছুটছিলাম এক বিব্রত সওয়ার — হাতে চাবুক নেই আর ঘোড়াটাও লাগামছাড়া। এই ছুটে চলার মধ্যেই কদিন পরে এক সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় গঙ্গার ধারে নির্জন চবুতরায় সিতারাকে আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিলাম। সে বলল, তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে শফিসাব। করিম বুঢ়া হারামি লোক। তোমার চাচাজি কুছু বললে তোমার বদনাম হবে। সেজন্য এখানে বসে আছি।

বুঝলাম সে ফটক থেকে আমার এখানে এসে বসে থাকা লক্ষ্য করেছে রোজ। কাঠের লম্বা বেনচের এক কোণে বসে ছিল সিতারা। তার ওপর কাঠের ছাতার গাঢ় ছায়া পড়েছিল। একটু তফাতে বসে বললাম, বলো।

সিতারা বলল, তুমি আমার কাছে আসবে? এসো — এখানে এসো। কেউ দেখতে পাবে না।

একটু সরে গেলে সে আমার হাত ধরে আরও কাছে টানল। আমার শরীর,

হারামজাদা কুত্তা শরীর, ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল — আর্তনাদের মতো। কিন্তু সিতারা হাত ছেড়ে দিল তখনই। ফিসফিস করে বলল, ভেবেছিলাম বিড্ডুকে দিয়ে তোমাকে ডাকব। লেকিন বিড্ডু আমকে খারাব ভাববে। ছোটাদেওয়ানসাব ফিরে এলে তুমি তাকে একটা কথা বলতে পারবে — আমার জন্য ?

বললাম, কেন ? কাল্লুভাইকে বললেই পার।

চুপ্। সব সেই হারামির কারসাজি। সিতারা তেমনি চাপা স্বরে বলল। পান্নাসাব বহত্ জুলুম করছে পরশুরোজ থেকে। আজ দুপুরে আমার ওপর জুলুম করতে এল। চাক্কু দেখাল। আমি তলোয়ার দেখলাম — আমার ঘরে তলোয়ার আছে। তখন হারামজাদ খবিস বলে গেল, আমাকে লুঠ করে কলকাত্তায় বেচে আসবে।

তুমি চুল্লুকে বললে না কেন ? পান্নাসাব চুল্লুকে ভয় করে।

চুল্লু একা। পান্নাসাবের পিছে টৌনের অনেক গুণ্ডা আছে। খানদান লোকেরা আছে। পান্নাসাব শুধু ছোটাদেওয়ানসাবকে ভয় করে। কেনো কী — নবাববাহাদুরের কাছে বললে কালেকটার বাহাদুরকে উনি খবর ভেজবেন। তখন শয়তানকে কয়েদখানায় লিয়ে যাবে সিপাহিলোক।

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, তুমি নিজে চাচাজিকে বলবে না কেন ?

সিতারা মুখ নিচু করে বলল, আমার শরম বাজে।

পরে বুঝেছিলাম এও তার খেলা। শরম একটা মিথ্যে ওজর। আসলে সে আমাকেই তাতাতে এসেছিল। আমি কী বলি, কেমন হয়ে উঠি, কী করি, এইসব আঁচ করতে চেয়েছিল সে। আর বোকার মতো আমি সেই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। সিতারার মুখ নিচু করে আধো-আধো স্বরে ভিজে গলায় 'শরম' শব্দটা উচ্চারণ আমাকে এমন ঝাঁকুনি দিল, একটা চরম বোঝা পড়ার ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলি।

চবুতরা থেকে লাফ দিয়ে নামলে সিতাবা বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? একটু বসো।

সেও নেমে এল। আমার কাঁধে হাত রাখল। বললাম, তুমি আর এখানে থেকো না ! টহলদার বেরোনোর সময় হয়েছে।

দেউড়ির দিকে ঘণ্টাঘড়ি বাজছিল। গুনে দেখিনি কবার বাজল। কিন্তু ঘণ্টার শব্দ শুনেই সিতারা হনহন করে চলে গেল। মোতিমহলের পাশ দিয়ে পেছনের কেল্লাবাড়ির মুখ থুবড়ে পড়ে-থাকা ফটকের ভেতর তার অদৃশ্য হওয়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, জ্যোৎস্না এত উজ্জ্বল। বুঝতে পারলাম সে রাত কাটাতে যাচ্ছে বাপের বাড়িতে।

পান্না পেশোয়ারির আস্তানা ছিল রোশনিমহল্লার ভেতর একটা ঘিনজি গলির মুখে। বিড্ডু একদিন বাড়িটা চিনিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির লাগোয়া বুকসমান উঁচু একটা খোলামেলা চবুতরা-ধাঁচের চত্বর। সেখানে খাটিয়ায় বসে পান্নাসাব দুটি কমবয়সী ছেলের সেবা নিচ্ছিল। ঘরের দরজা দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছিল তার ওপর। খালি গায়ে বসে আরামে চোখ বুজেছিল পান্না পেশোয়ারি, তার চুল ছুঁয়ে জ্যোৎস্না আর লানটিনের আলো।

মৃতদের শহরে সবখানেই ধ্বংসস্তূপ এবং যথেচ্ছ ইট পায়ের কাছে। একটা টুকরো-ইট কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। সেই নড়াচড়াটা চোখে পড়ায় হাত-পা টিপে দিচ্ছিল যে ছেলে দুটি, একগলায় বলে উঠল, কুত্তা নেহি, আদমি ! পান্না

পেশোয়ারি চোখ না খুলে বলল, আবে শালে ! আপনা কাম কর্ ! ছেলে দুটি দেখছিল আমাকে, কী করছি। ইটটা মাত্র কয়েক হাত দূর থেকে জোরে পান্না পেশোয়ারির মুখ লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলাম। পান্না পেশোয়ারি আই বাপ বলে দু'হাতে মুখ ঢাকল। ছেলে দুটি চেঁচিয়ে উঠল, মার ডালা ! মার ডালা পান্নাসাবকো ! ঘরের ভেতর থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে দৌড়ে চললাম। পেছনে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। ঘিনজি গলিটায় কোনো আলো ছিল না, শুধু জ্যোৎস্না আর খাপচা-খাপচা অন্ধকার। এবার গলির ভেতর সাড়া পড়ে গেল। চোর-চোর চিৎকার উঠল। আমি দৌড়চ্ছি দেখে লোকেরা চোর-চোর বলে আমাকে তাড়া করল। গলির পর ঝোপ-ঝাড়। নিচে একটা নালা। জলকাদা ভেঙে ওপারে ঘন গাছপালার ভেতর ঢুকে পড়লাম। বুঝলাম, এটা একটা আমবাগান। আমবাগানটা কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না। যখন শেষ হল, তখন একটা কাঁচা রাস্তা। রাস্তায় পৌঁছে গাছের তলায় ধপাস করে বসে পড়লাম। দম আটকে আসছিল। মনে হল, আমি বুক ফেটে মরে যাব।...
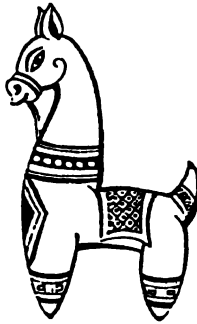
'হুঁশিয়ার রাত যখন কালো বোরখায় ঢাকে
দিনকে / আর হুঁশিয়ার যখন স্পষ্টতা
আবছায়া হয়ে যায় / আর হুঁশিয়ার
রাতে যা কিছু ভাবতে থাকো / শয়তান
সে তো অশরীরী / তাই
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার.....

শনশন শব্দ করতে-করতে বাইরে একটা হঠাৎ-আসা বাতাস চলে গেল। তারপর গাছপালায় শব্দ, পানিতে শব্দ, কতক্ষণ ধরে ফিশফিশ, চাপা হাসি বা কান্না — কিংবা এরকম কিছু গোপনীয় মানবিক আর্তি, আর চক্রান্তের আভাস চারিদিকে, তখনও পেছনদিকের সবচেয়ে উঁচু তালগাছে বাগড়ায় খড়খড় ঝাঁকুনি, বাদশাহি সড়কের ধারে অশত্থগাছটায় ক্রমাগত পত-পত করে পাতাগুলোর ধারাবাহিক অস্থিরতা, কিছু কি ঘটতে চলেছে, কিছু কি সত্যিই ঘটবে, কান পেতে থাকি। অপেক্ষা করি। আবার শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো চারদিকে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার... ! প্রতিটা

রাত আসে আর এই হুঁশিয়ারি শুনি। ফারসি 'হুঁশিয়ার-নামা' কেতাব বুজিয়ে লানটিনের দম কমিয়ে দিলাম। এবার জানালার বাইরেটা কিছু স্পষ্ট হল। জ্যোৎস্না ঝলমল করছে দীঘির জলে! ইচ্ছে হল শানবাঁধানো নতুন ঘাটে গিয়ে বসি। কিন্তু উঠতে গিয়ে এতক্ষণে কানে এল কারা চাপা গলায় কথা বলছে। হুঁ, কথা নয়, তকরার। নুরুজ্জামান খুব তর্ক করে বটে। আর বড়োগাজিও তাই। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেওবন্দির সঙ্গে আলিগড়ির বাহাস (তর্ক) চলেছে। সড়কের ধারে ঘোড়াটার একটা রেকাবে পা রেখেও বড়োগাজি বলছেন, যাই বলুন মৌলবিসাহেব, আপনার ওই ঢাকার নবাব মস্ত ভুল করছেন। হ্যাঁ....আশরাফ আতরাফ আমি মানি। তাই বলে বাঙ্গলার আশরাফের জবান হবে উরদু, এটা আমি মানি না। নুরুজ্জামান বল্ল, আপভি ভুল করছেন গাজিসাহেব। আতরাফ নেহি, আজলাফ বলিয়ে। বড়োগাজি ঘোড়ার পিঠে বসে বললেন, ঠিক আছে। আজলাফ বলুন কী আতরাফ বলুন, এরা এদেশের লোক। আশরাফরা আরব-পারস্য থেকে এসেছে ঠিকই। কিন্তু এখন তারা এদেশের লোক কি না ? মুসলমান যে দেশে গেছে, সে-দেশের জাবানেই কথা বলেছে। এলেম শিখেছে। বড়োগাজি হাসতে লাগলেন।....আর আপনি মওলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেবের কথা বললেন। ওঁরা তো ওহাবিদের মতো এদেশকে 'দারুল হর্‌ব' (শত্রুর দেশ) বলেছেন, এমন-কি এদেশের জুম্মার নামাজ 'নাজায়েজ' (অসিদ্ধ) বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্ত মওলানা কেরামত আলি সে-ফতোয়া নিয়ে বাহাস করে বলেছেন, এ ফতোয়া দেওয়াই নাজায়েজ ! নুরুজ্জামান টিট হয়ে গেল। বলল, ফির বাত করেঙ্গে। বহত রাত হয়ে গেল। হোশিয়ারিসে যাইয়ে গাজিসাহাব। বড়োগাজি হঠাৎ তাঁর তালোয়ার বের করে ফেললেন। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে উঠল তলোয়ার। চমকে উঠলাম। বড়োগাজি তলোয়ার দেখিয়ে বললে, জুলফিকার মৌলবিসাহেব ! হজরত আলির তলোয়ার জানবেন ! নুরুজ্জামান রাগ করে চলে গেল যেন। হজরত আলির তলোয়ারের নাম ছিল জুলফিকার ! বড়োগাজি তাঁর তলোয়ারকে জুলফিকার বলায় নুরুজ্জামানের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তবে শিয়ারা শুনলে বড়োগাজির মাথা যেত। বড়োগাজির ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। আমি হেসে ফেলেছিলাম। এই দুই নাদান বুড়বকের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে মনে হাসি। কিন্তু আবার সব চুপচাপ। তারপর আবার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার — চারদিক থেকে। মনে মনে বললাম, হে কুলমখলুকাতের মালিক ! হে আল্লাহ্ ! এ বান্দা সবসময় হুঁশিয়ার। দুমাস হল, মসজিদের উলটোদিকে সড়কের এধারে এই 'এবাদতখানা' তৈরি করে দিয়েছে লোকেরা। মসজিদে থাকায় আমার খুব অসুবিধে হচ্ছিল। কিছুতেই একা থাকা যায় না মসজিদে। দিনভর এত লোক আসে ! সে এক জুলুম বটে ! শেষে কাতারে-কাতারে লোক হাত লাগিয়ে এবাদতখানা (ভজনালয়) বানিয়ে দিল। এখনও চুনের গন্ধ ঝাঁঝালো। অস্বস্তিকর এই গন্ধটা। আর আশ্চর্য, এই গন্ধটা কেন যেন আমাকে শফিউজ্জমানের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কেন ? পুকুরের ঘাটের মাথায় গিয়ে বসে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে হল, হ্যাঁ — খয়রাডাঙার স্কুলবাড়িতে নিজে তাকে ভর্তি করিয়ে দিতে গিয়েছিলাম, তখন স্কুলবাড়িটা সদ্য চুনকাম করা হয়েছিল। ঠিক, ঠিক ! শফির জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। দেওয়ানসাহেব নাকি এখনও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বাস করি না।

খালি মনে হয়, শয়তানের হাতে আমার ছেলেকে তুলে দিয়েছিলাম। আফসোস! লোকেরা আমার এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেন আমার মেজাজ এমন বদলে গেল, আস্তে শান্তভাবে কথা বলি, কাউকে তম্বি করি না আগের মতো, ঠোঁটে সবসময় হাসি ফুটিয়ে রাখি, এসব কেউ লক্ষ্য রাখে না! উঁচুতে উঠে গেলে যেন মানুষের সবটুকু চোখে পড়ে না নিচে থেকে। ওরা ভাবে, আমার ঘরগেরস্থালি নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই, আমি অন্য এক মানুষ। অথচ আমার মধ্যে এইসব জিনিস আছে। টিকে থেকে গেছে সবকিছুই। সাইদার আহাম্মুকির শোধ নিতে আমি যদি নিকাহ্ করি, লোকের চোখে ছোটো হয়ে পড়ব, এই ভয়। ওরা ভাববে, তাহলে বুজুর্গেরও খাহেস (কামনা-বাসনা) আছে? আরে নাদান বেঅকুফ! পবিত্র কেতাবে বলা হয়েছে, 'চাষী যেমন তার শস্যক্ষেত্রের দিকে যায়, পুরুষ যাবে তার আউরতের দিকে।' পবিত্র কেতাবে আরও আছে: 'আউরত তার পুরুষের খাহেস পূর্ণ করতে সবসময় তৈরি থাকবে, যদি সে রজস্বলা না হয়।' তাঁর ওই মুসলমান প্রতিদিন পাঁচবার নমাজের সময় হাত তুলে বলে, 'হে দয়াময়! আমাকে ইহলোক ও পরলোকের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলো দাও' সে কথাও ভেবে দেখতে হবে। 'পুরুষ ও নারী পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' — এও পবিত্র কেতাবের কথা। স্রষ্টা আদমকে গড়েছিলেন। সে পুরুষ। তার বাঁ পাজরের হাড় থেকে বিবি 'হবা'কে তৈরি করেছিলেন। কেন? বিবি হবাকে গন্দমগাছের ফল খাওয়ার জন্য শয়তান কুমতলব দিল। সাইদাকে শয়তান হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। তাকে বাঁচানো উচিত। কিন্তু কী করব? কদিন আগেও একবার ইচ্ছে হল, বাড়ি যাই। তারপর হঠাৎ মাথায় এল, জুম্মাবারে আমি খোত্‌বা (শাস্ত্রীয় ভাষণ) পাঠের সময় দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। 'প্রেরিত পুরষ একবার পুরো একটি চান্দ্রমাস স্ত্রীদের কাছ থেকে সরে গিয়ে একা মসজিদবাসী ছিলেন। সেই মাসটিতে উনত্রিশটি দিন ছিল। প্রেরিত পুরুষের খানদানে আমার জন্ম। কিন্তু আমি আল্লাহ এবং তার প্রেরিত পুরুষের একজন দীন সেবক মাত্র। কাজেই আমার এই সরে থাকার কাল আরও বেশি হওয়া দরকার।'....এই কৈফিয়ত দেওয়া জরুরি ছিল। ভেবেছিলাম প্রেরিত পুরুষের স্ত্রীদের নিয়েও যেমন মুসলমান-নামধারী মোনাফেকেরা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি রটাত, তেমন মোনাফেকের তো অভাব নেই। তারা গোপনে কেলেঙ্কারি রটাতে পারে, এই ভেবেই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলাম। তবে যা দেখছি, অনেক উঁচুতে উঠে গেলে নিচের লোকেদের তত নজর চলে না। অথচ আমার কষ্ট। আমার মনে খাহেস। তসবিহ জপে ভুল হয়। তখন মনে পড়েছিল 'হুশিয়ারনামা' কেতাবটির কথা। আমার চারদিকে তারপর থেকে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার...অথচ রাত নিশুতি হলে সেই হুঁশিয়ারির মধ্যও চাপা হাসি-কান্নার মনবিক আর্তি ভেসে আসে। কেই বা হাসে, কেই বা কাঁদে চুপিচুপি ভেবে পাই না। বুঝতে পারি না আমার কী করা উচিত। সারারাত ঘুম আসে না দুচোখে। খালি চিন্তা, উটকো সব কথা, গাছ থেকে পাতা পড়ার মতো কিছু খসে পড়ে, দমকা হাওয়া এসে পাতাগুলো ওড়ে, ছত্রভঙ্গ পায়রার ঝাঁকের মতো, আবছা, ফালতু কী সব কথা খালি কথা আর কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার....পুকুরের পানিতে ঝিলমিল করে জ্যোৎস্না কাঁপছে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার! ওপারের কালো গাছপালার ভেতর গাঢ় ছায়ায় বসে শয়তান নজর রেখেছে

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার। আমার গা ছমছম করছিল। আমি এত একা! 'আল্লাহ আমাকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচাও!' বারকতক এই কথাগুলো আবৃত্তি করাম। মাঠের দিকে শেয়াল ডেকে উঠল। গ্রামের দিকে কুকুর। তারপর রোঁদে বেরনো চৌকিদারের হাঁক ভেসে এল হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার...অসহ্য।

ভেড়ার পিঠে টুপিপরা জিন

আমার খিদমতগার (সেবক) আলি বখ্‌শ্‌ সকালের খানা তৈরি করতে করতে বলল, হুজুরে আলা! একটা কথা শুধোব, তবে ডর লাগে। লোকটি বেজায় কালো, একটু কুঁজো, নিচের একটা দাঁত নেই। তবে না থাকলেও বোঝা যায় না। সারা জীবন দাঁতে মিশি ঘষে সব দাঁতই কালো। মিশি নাপাক (অপবিত্র) বলায় সে ওটা ছেড়েছে। তার বদলে জামালগোটার ডাল ভেঙে আমার মতো দাঁত মাজে। কিন্তু ওই নাপাক কালো রঙ আর ঘুচবে না। আমি ওর দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছি। তখন সে একটু বিব্রত হয়ে বলল, তাহলে থাক হুজুর, বলব না। একটু হেসে বললাম, না — তুমি বলো আলি বখ্‌শ্‌। সে বলল, হজরত! (হজরত সম্বোধন আজকাল সবাই নুরুজ্জামানের দেখাদেখি করে থাকে, তবে আলি বখ্‌শের মুখে শুনে হাসতে লাগলাম। সে আরও ঘাবড়ে গেল।) বলল, খাতাহ্‌ (ত্রুটি) মাফ করবেন হুজুরে আলা! আমি নাদান আদমি। একটু আগে সে বাদশাহি সড়কের দিকে উৎসুক দৃষ্টে তাকাচ্ছিল আর পরোটা সেঁকছিল। সড়কে একপাল ভেড়া যাচ্ছিল। এখান থেকে এখনও দেখা যাচ্ছে পালটাকে। খুব ধুলো উড়ছে সড়কে। আমার বুঝতে দেরি হল না যে ভেড়া সম্পর্কে তার কী জিজ্ঞাস্য। বললাম, আলি বখ্‌শ! তুমি কি জানতে চাইছ, ভেড়াগুলোর পিঠে আমি জিনদের দেখতে পাচ্ছি কি না? দারুণ চমকে আমি বখ্‌শ্‌ হাঁ করল। ওর জিভটা দেখা যাচ্ছিল। ফের বললাম, আলি বখ্‌শ্‌ আমি জিনগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। ওদের মাথায় টুপি আছে। শাদা গোল আর আঁটো টুপি। আলি বখ্‌শ্‌ খুব খুশি হল একথা শুনে। বলল, হজরত! আমার দাদো (পিতামহ) ছিল সামান্য লোক। সে ছিল জিনের রোজা! তার মুখে শোনা কথা। জিন ভেড়ার পিঠে চাপতে ভালবাসে। বললাম, হ্যাঁ — জিনেরা এটা করে। কেন — বলি শোনো। ওই জিনেরা কমবয়সি। এটা ওদের খেলা। ওই দেখো আলি ব্‌খ্‌শ্‌, ঘূর্ণি আসছে। ঘূর্ণিটা ওদের বাবা। এবার দেখো, কী হুলুস্থুলু শুরু হল। বাচ্চা জিনেরা পালিয়ে যাচ্ছে ভেড়ার পিঠ থেকে। কয়েকজনের টুপি খসে পড়েছে। কুড়োচ্ছে!....পরোটার তাওয়া নামিয়ে আলি বখ্‌শ্‌ উঠে দাঁড়াল। আমি হাসতে লাগলাম। সে ব্যাপারটা দেখতে থাকল। তারপর কাঁচুমাচুমুখে ঘুরে বলল, হজরত! সত্যিই একটা মোজেজা দেখালেন দীন বান্দাকে। আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম হঠাৎ। অন্যমনস্কভাবে ঘাটের দরজায় চলে গেলাম। আমি কি সত্যিই ভেড়ার পিঠে টুপিপরা জিন দেখি, যেন দেখি। সত্যিই এ একটা ধাঁধা। মনে পড়ে গেল, বহুবছর আগে একটা ভীষণ রুক্ষ এলাকার গ্রামে থাকার সময় এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। সে একটা নদী সম্পর্কে।....

নদী, সিঁদুর, নারী

নদী। বদিউজ্জামানের ধারণায় নদীটি ছিল প্রাচীন। কিন্তু ঠিক কতখানি প্রাচীনতা তার উপযুক্ত, সে সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিতেন। বিস্তীর্ণ রুক্ষ মাঠে (সেই গ্রামের লোকেরা ছিল অলস, অকর্মণ্য, আড্ডাবাজ) অসংখ্য আব-সদৃশ নিচু ঢিবির বন্ধুরতাগুলোকে পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে অতি সুকৌশলী এক লুপ্ত নদীর গতিপথ তাঁর চোখে আশাব্যঞ্জক অস্পষ্টতায় প্রতিবিম্বিত হত এবং তিনি শুধু এটুকুই বুঝতেন, এ হয়তো মরীচিকা নয় — যা তিনি দেখছেন বা দেখতে চান। কেন একটি প্রাচীন নদীর আকাঙ্ক্ষার ভূত তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তিনি জানতেন না। এমন নয় যে মৌলানা বদিউজ্জামান কোনো নদীতীরবর্তী দেশ থেকে উষর, বৃক্ষবিরল ওই গ্রামে নির্বাসিত হয়েছিলেন। নদী সম্পর্কে এ ধরনের মাথাকোটা আদিখ্যেতার অর্থ এও নয় যে, তিনি ইতিহাসবেত্তা ছিলেন, কিংবা জানতেন নদীর সঙ্গে সভ্যতার যোগ আছে। ইসলামি তহজিব-তমদ্দুনের (সভ্যতা-সংস্কৃতি) বাইরে সব সভ্যতাই তো তাঁর কাছে ছিল বর্বরতা এবং ইসলামের অভ্যুদয় মরুমাটিতে! তিনি অপ্রকৃতিস্থ মানুষও ছিলেন। অথচ এই বন্ধুর মাঠের শাদামাঠা লৌকিক বাস্তবতার কোনো সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে ওই অলৌকিক অশ্বডিম্ববৎ পরাবাস্তবতা ছত্রাকের মতো তাঁর সুরমা টানা চোখে গজিয়ে উঠেছিল, এও এক রহস্য। প্রথম দর্শনে, প্রতি বিকেলে দাঁড়িয়ে তাঁর খালি মনে হত, ওইখানে একটি নদী থাকলে ভালো হত অথবা ওইখানে সত্যিই একটা নদী ছিল। ক্রমশ নদীটি সম্পর্কে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যায়। ক্রমে-ক্রমে মগরেবের (সান্ধ্য) নামাজের পর ওই পরাবাস্তবতাটিকে মাঠের সান্ধ্য কুয়াশার ভেতর গর্ত থেকে লেজ টেনে সাপ বের করার মতো টেনে আনতেন, তাকিয়ে থাকতেন আঁকাবাঁকা ছায়া-নদীটির দিকে। প্রায় পৌত্তলিক পটুতায় তাকে উদ্ধারের তাগিদ অনুভব করতেন। তারপর ধূসর গোধূলির পটভূমিতে প্রাতিভাসিক বক্ররেখাটি তাঁকে শিহরিত করত, হঠাৎ আবিষ্কার করতেন সিঁদুরে আভা, আর সেই রেখার কোমলতা যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবেন এবং তৎক্ষণাৎ উদ্ধারযোগ্য স্রোতস্বিনীকে শয়তানের ইন্দ্রজাল ভেবে চোখ বুজে ফেলতেন। অথচ শয়তানের শিল্পকলায় সিঁদুরের উজ্জ্বলতা, কোমলতার কোলাহল, আর স্নিগ্ধতার অনুপুঙ্খময় চাপে যেন বা একটি স্ত্রীলোক — তওবা! নাউজুবিল্লাহ্!

পিরের সাঁকো, আবদুল কুঠোর বউ

সে অবশ্য একটা ব্যর্থতা। পরে — অনেক পরে এক নিশুতি রাতে মনে পড়েছিল, কী ঘটেছে। মরহুম আব্বার (স্বর্গীয় পিতা) সঙ্গে ছেলেবেলায় যেতে-যেতে একটি নদীর ধারে একটি বীভৎস ঘটনা দেখি। একজন হিন্দু স্ত্রীলোককে তার স্বামীর চিতায় বসিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে....হা আল্লাহ্! আব্বা আমার চোখে তাঁর পাক (পবিত্র) হাত ঢাকা দিয়ে বলেন, উধার মাত্ তাকাও। তার আগেই আমি দেখে নিয়েছি। যুবতীটির সিঁথিতে দগদগে সিঁদুর ছিল। সাইদাকে গল্পটা যখন বলি, সে আমাকে

জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ঠেছিল। সেই সাইদা আজ....

আলি বখ্‌শ্ এসে বলল, হজরত ! আমি খানা তৈরি করলাম। এদিকে এক কাণ্ড দেখুন। মাঝ্‌লা (মেজো) বউবিবি হুজুরের জন্য নাশতা পাঠিয়েছেন। বললাম, তুমি খেয়ে নাও। আলি বখ্‌শ্ তবু দাঁড়িয়ে রইল। রাগ করে বললাম, যা বলছি, তাই করো আলি বখ্‌শ্। সে গলার ভেতর বলল, মাঝলা মিয়াসায়েব দাঁড়িয়ে আছেন হজরত ! ঘুরে দেখি লাঠিতে ভর দিয়ে মনিরুজ্জামান এবাদতখানার দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে একটা নেংটির মতো গামছাপরা আদুড়-গা ছেলে। সেই রাখাল ছেলেটা ! সে আমাকে দেখে হি-হি করে হাসতে-হাসতে পালিয়ে গেল। ওই ছেলেটা সাইদার গাইগোরুটি চরাতে নিয়ে যায় দেখেছি। আমাকে দূর থেকে দেখেই বেআদবি করে — হাসে। একদিন আলি বখ্‌শ্ তাড়া করেছিল ওকে। মনিরুজ্জামান তাকাল। তাকে ধমক দিয়ে বললাম, কেন এসব এনেছ ? বাড়ি নিয়ে যাও, বলছি ! মনিরুজ্জামান গোমড়ামুখে নড়বড় করতে-করতে চলে গেল। তার উদ্দেশে ফের বললাম, বলেছি — তোমরা কেউ আমার এবাদতখানায় খানা পাঠাবে না। তবু কেন এসব কর ? এবাদতখানার সীমানায় আমার হুকুম আগে না নিয়ে কারুর আসা বারণ। আলি বখ্‌শ্‌কে খুব বকাবকি করলাম। সে কাঁচুমাচু মুখে তিনদিকঘেরা পাকশালার দিকে চলে গেল। আমার খানা রেশমি কাপড়ে ঢেকে রেখেছে এবাদতখানার বারান্দায়। খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কেনই বা খাব না ? আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য রোজ রুজি মেপে দেন। এ আমার প্রাপ্য ! খেতে-খেতে দেখলাম, আলি বখ্‌শ্ এদিকে পিঠ রেখে বসে খাচ্ছে। সাইদা কিংবা সত্যিই মেজবউবিবি কী নাশতা পাঠিয়েছে, জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আলি বখ্‌শের খাওয়ার ভঙ্গিতে যেন লুকিয়ে খাওয়া চোরাগোপ্তা জানোয়ারের আদল, একটি বেড়াল অথবা একটি কুকুর চুপিচুপি ঝোপের আড়ালে কিছু নিয়ে গিয়ে যেভাবে খায়। নাউজুবিল্লাহ্ ! এসব আমি কী ভাবছি ? খাওয়া শেষ করেও কতক্ষণ আলি বখ্‌শের খাওয়ার ভঙ্গিটি বিরক্তিকর স্মৃতির মতো আমাকে মাঝে-মাঝে খোঁচা দিচ্ছিল। ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ধ্যানে বসলাম। কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত। হরিণমারার ছোটোগাজির দেওয়া দিওয়ান-ই-হাফিজের পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এলাম তাক থেকে। খুলতেই চোখ গেল ঃ

'জে পাদ্‌শাহ ব জুদা ফারিগম ব হম্‌দ্ ইল্লাহ্
জুদা এ খাকে দরে দোস্ত্ পাদশাহে মন্ অস্ত্...'

'উপাস্যকে প্রশংসা ! বাদশাহ থেকে আমাকে ফারাক করেছেন / দোস্তের দরজার ধুলোই এখন আমার বাদশাহ্।' মারহাবা ! শাবাশ ! কিন্তু কোথায় আমার দোস্ত আর দরজা ? উপাস্য আল্লাহ কি এ বান্দার দোস্ত হতে পারেন, তাঁর দোস্ত শুধু প্রেরিত পুরুষ। আমি বেঅকুফ ফরিদুজ্জামানের মতো সুফি নই, আমার সহোদর ভাই ছিল ফরিদুজ্জামান। সে নিজেকে বলত 'মাশুক' (প্রেমিক)। তার মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল ছিল। সে গান গাইত। নাউজুবিল্লাহ্। তার চুল কেটে জুতো মেরে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম তার জঙ্গলের আস্তানা থেকে। আমার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ল। আমার সহোদর ছোটো ভাই ! কোথায় আছে সে এখন ? বেঁচে আছে না মরে গেছে ? তাকে সামনে পেলে জেনে নিতাম আল্লাহের মাশুক হওয়ার যোগ্যতা কি প্রেরিত পুরুষ ছাড়া অন্য মানুষের সত্যিই আছে ? বারান্দায় কাশির শব্দ। তারপর আলি

বখ্‌শ্‌ মৃদুস্বরে বলল, আনিসুর রহমান এসেছেন হুজুরের কাছে। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেলাম। এবাদতখানা ঘরের ভেতর কাউকে ঢুকতে দিই না। আনিসুর নিচে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রথমে 'আস্‌-সালামু আলায়কুম' সম্ভাষণ করল। সম্ভাষণের জবাব দিলে সে বলল, হজরত। কুঠো আবদুলের বিবিকে নিয়ে ঝামেলা বেধেছে। আবদুল মরার পর সে ডাহিন (ডাইনি) হয়েছে। নদীতে পিরের সাঁকোর কাছে রাতে নাঙ্গা (উলঙ্গ) হয়ে চেরাগ জ্বেলে হিঁদুদের মতো পুজো করে। অনেক লোক দেখেছে। এবারে একটা ব্যবস্থা না করলে আমাদের মান থাকে না। হানাফি-গাঁয়ের লোকে তামাশা করে বলে, তোমাদের পিরসাহেবের কুদরতি (লীলামাহাত্ম্য) এবার দেখাও ! হুজুর হজরতে আলা ! আপনিই মৌলাহাট ফরাজি-জমাতের সর্দার করেছেন আমাকে। তাই আপনার হুকুম ছাড়া কিছু করব না। আনিসুরের কথা শুনতে-শুনতে পুকুরের ওপর দিয়ে নজর পাঠিয়ে দিলাম উত্তর-পশ্চিম দিকে দূরে নদীর পুরনো সাঁকোটির দিকে। একটা ঘূর্ণি বয়ে যাচ্ছে সেদিকে। ধুলো, খড়কুটো, ছেঁড়া শুকনো পাতার ঝাঁক — জিনেরা পাগড়ির মতো। কোনো কালাজিনই হবে.! আনিসুর বলল কী ? ওর প্রশ্নবোধক সম্ভাষণে আস্তে আস্তে বললাম, আউরতটির নাম কী যেন ? আনিসুর বলল, ইকরা — ইকরাতন। হুঁ, 'ইকরাতন' মানে আবৃত্তিকারিণী। দূরের ভাঙা পোড়ো সাঁকোর কাছে 'আবৃত্তিকারিণী'কে আবার সেদিন দেখেছিলাম। বললাম, আপনাদের কিছু করতে হবে না আনিসুর রহমান ! আমি দেখছি। বলেই ঘরে ঢুকে গেলাম। বাইরে আনিসুর আর আলি বখ্‌শ্‌ চাপাস্বরে কীসব বলাবলি করতে থাকল। আমি উত্তরের জানালার ধারে গিয়ে আবার কালো সাঁকোর থামগুলো দেখছিলাম। তারপর চমক খেলে গেল। ঝড়বৃষ্টির রাতে সাইদার কাছে গেলে সে আমাকে বলেছিল, ইকরাতনের দিকে আমার নজর পড়েছে। দ্রুত আবৃত্তি করলাম ঃ

'হাসবানুল্লাহ্‌ নি'মাল আকিলু !
আলাল্লাহি তাওয়াকাল্‌না—'

বালা-মুসিবতে (অস্বাস্থ্যে ও বিপদে) এই পবিত্র বাক্যটি পাঠ করার নিয়ম ! সেই ঘূর্ণি হাওয়াটি এখন কালো পুরনো থামগুলিকে ঘিরে ফেলেছে। আমার নজর খুলে যাচ্ছে। একটি কালো থামের গায়ে দগদগে লাল সিঁদুরের ছোপ এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি — নাকি দেখতে চাইছি বলেই দেখছি ? আল্লাহ জানেন আমার চোখের কী ক্ষমতা তিনি দিয়েছেন। কালো থামের মধ্যে চেহারা নিচ্ছে একটি স্ত্রীলোক, নাঙ্গা আউরত সিঁথিতে সিঁদুর, আর ওই নদী, চিতার মতো দাউদাউ রোদ, আব্বার পবিত্র হাত আমার চোখ ঢেকে দিক। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি বিগড়ে গেল কি ? অথবা প্রকৃতই একটি মোজেজা দর্শন করলাম ! বিবি ইকরাতন কি হিন্দু স্ত্রীলোক ? তাকে কি আবদুল কুঠো ভাগিয়ে এনেছিল তার স্বামীর চিতা থেকে ? আবদুল শুনেছি দুর্ধর্ষ ডাকু ছিল। আমি বেরিয়ে গিয়ে দেখি, আনিসুর তখনও দাঁড়িয়ে। বললাম, ইকরাবিবি কি হিন্দু আউরত ছিল, জানেন ? আনিসুরের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। গাঢ় স্বরে বলল, হজরতে আলা ! আপনার অজানা কিছু নেই। আপনি যা বলছেন, তা এবার সত্যি হল। কেননা, আমরা শুনেছি, আবদুল তাকে কোত্থেকে ভাগিয়ে'এনেছিল। এও শুনেছি, সে নাকি হিঁদু আউরত। বাম্ভন (ব্রাহ্মণ) ঘরের বেটি। শুনে শুধু বললাম, দেখছি।....

পবিত্র কেতাব সুরা (অধ্যায়) 'লাহাবের' শেষ বাক্যটি আজকাল যখন-তখন মনে ভেসে আসে ঃ 'হাম্মালাতাল্ হাতাব্।' যে-স্ত্রীলোকের কাঁধে খেজুরপাতার আঁশ দিয়ে তৈরি দড়ি ঝুলছে। প্রেরিত পুরুষের এক আত্মীয় আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল কাঠকুড়োনি মেয়ে। আবুলাহাব হাত দিয়ে আঘাত করেছিল প্রেরিত পুরুষকে। সে অভিশপ্ত। আর তার কাঠকুড়োনি স্ত্রীও অভিশপ্ত। কারণ সে ছিল কুৎসাকারিণী। জানালা দিয়ে পুকুরের ওপারে কাঁধে দড়িঝোলা এবং হাতে-কাটারি ইকরাকে দেখে বাক্যটি ভেসে এল। বাক্যটি স্থির হয়ে ভাসছিল চোখের সামনে। কাঁপতে-কাঁপতে ছত্রখান হয়ে মিলিয়ে গেল। আজকাল আমাকে বাইরে বেরুনোর নেশা এসে জুলুম করে। কিন্তু বেরুলেই ভিড়। জীবনের এতটা সময় আমি যেখানেই থেকেছি, ইচ্ছেমতো বাইরে ঘুরেছি, কেউ নজর রাখত না বিশেষ। এমন অবস্থা দুর্বিষহ। প্রতিদিনই সড়কে কাতারে-কাতারে লোক এসে জড়ো হয় দোয়া মাঙতে, দোয়াপড়া জল নিতে, কবচ-মাদুলির আশায়। জুম্মাবারে সে এক অদ্ভুত অবস্থা। হাজার-হাজার মানুষ! গোরুমোষঘোড়ার গাড়ি, পালকি, চারদোলা, দুদোলা — কতরকম বাহন। সেই অসহ্য ভিড় থেকে বাঁচতে এই এবাদতখানা! আজ হঠাৎ পুকুরের ওপারে ওই 'হাম্মালাতুল হাতাব্‌কে' দেখে মনে হল, জীবনের কোনো একটা সময়ে প্রয়োজন আসে, জরুরি হয়ে ওঠে, প্রতিটি জায়গায় তন্নতন্ন তল্লাস। তল্লাস করো কোন্ জায়গাটিতে তোমার বাসভূমি হওয়া উচিত। কিন্তু কী তাজ্জব, কথাটা এখন কেন ভাবতে বসলাম? এতকাল কি এই কাজটাই করে বেড়াইনি? অথচ দেখো, বদিউজ্জামানের তল্লাসি জিন্দেগানিতে আবার নতুন তল্লাসি পরোয়ানা হাজির। এই এবাদতখানাও তোমার যেন প্রকৃত বাসস্থান নয়। আমার চিন্তা আমাকে ঘুরিয়ে মারছে এবাদতখানার চারদিকে অনেক দূর।

'ম্যায় হুঁ বাদশাহ্ যিত্না দূরোঁতক জরিপ ক্যরে/
মুঝ্‌কা দখলদারি কৈ না বরবাদ কার শ্যাকে/—'

জানালা বন্ধ করে দিতে গিয়ে পারলাম না। বেরিয়ে গিয়ে পুকুরের ঘাটে দাঁড়ালাম। 'হাম্মালাতুল হাতাব্' জঙ্গলের ভেতর থেকে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আমাকে দেখছে। নীল জ্বলজ্বলে চোখ! ওকে কি তাড়া করব এখন? ময়ূরমুখো আবলুস কাঠের ছড়িটি ছুড়ে মারব? পুকুরের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে পারবে কি এই 'আসা' (ছড়ি)? হজরত মুসা — তিনিও এক প্রেরিত পুরুষ, তাঁর আসা দিয়ে নীলদরিয়ার বুকে বাড়ি মেরেছিলেন আর দরিয়া দুভাগ হয়েছিল। আমি কি দেখব চেষ্টা করে? নাউজুবিল্লাহ্! ওহাবিরা এসব মোজেজায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা বলেন, আসা কথাটির আরেক মানে 'গোষ্ঠী'। মুসা নীলদরিয়ায় ভাটা পড়ার সময় গোষ্ঠীসহ পালিয়ে গিয়েছিলেন মিশর থেকে কেনান মুলুকে। অথচ ওহাবি হয়েও আমি যেন মোজেজা দেখি। অলৌকিক ঘটনা অনুভব করি। আমাকে আল্লাহ কোন্ রাস্তায় নিয়ে চলেছেন? আমি যে সত্যিই পির বুজুর্গ হয়ে পড়লাম! বুকের ভেতর আর্তনাদ উঠল, আমি মানুষ! আমি মানুষ! নিতান্ত এক মানুষ!

আলি বখ্শ্ এসে খবর দিল, সড়কে একজন বিদেশী এসে আমার দর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ভুরু কুঁচকে বললাম, বিদেশী? কে সে? আলি বখ্শ্ বলল,

জানি না হুজুর। মাথা ভাঙছে সে। বললাম, নিয়ে এসো। প্রাঙ্গণের কুলগাছটাকে কাটতে দিইনি। তলায় যেন কাঁটা না পড়ে, আলি বখ্‌শ্‌ সাফ করে রেখেছে। সেখানে গিয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম দুরু দুরু বুকে! শফির খবর নিয়ে এসেছে কি? তারপর দেখি, বিদেশী বলতে আলি বখ্‌শ্‌ একজন হিন্দুকে বুঝিয়েছে। একটু ইতস্তত করে বললাম, ভেতরে আসুন। গায়ে মেরজাই, মাথায় পাগড়ি, পরনে মালকোচ-করা ধুতি, এবং জুতো বাইরে খুলে রেখে তিনি ফটকে ঢুকছিলেন। এসে দুহাত জোড় করে একটু ঝুঁকতেই বললাম, আমাকে গোনাহ্‌গার করবেন না বাবু! আমি মানুষ। মানুষ মাথা নোয়াবে শুধু পরমস্রষ্টার কাছে। বাবুটি একটু বিব্রত হেসে বললেন, আপনি সাধক পুরুষ পিরসাহেব! গোস্তাকি মাফ করবেন। অধীনের নাম গোবিন্দরাম সিংহ। আমি আসছি কৃষ্ণপুর থেকে। বাবু জমিদার অনন্তনারায়ণ ত্রিবেদী আমাকে পাঠিয়েছেন। খত আছে। আস্তে বললাম, পড়ুন, শুনি। মেরজাইয়ের ভেতর থেকে ফারসিতে লেখা খত (পত্র) বাবুটি সুন্দর উচ্চারণে পাঠ করলেন ঃ মাহাত্ম্যপ্রদর্শনকারী অলৌকিক কীর্তিধর পুরুষ, সাধু মুসলমান পিরের প্রতি তাঁর সবিনয় নিবেদন, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা জিনের (ভূত) পাল্লায় পড়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস। কারণ সে সম্ভবত আরবি ভাষায় অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। অনন্তনারায়ণ ফারসি জানেন। আরবি শেখা হয়নি সুযোগের অভাবে। তা ছাড়া অধুনা আরবি-ফারসির বদলে বাঙলা-ইংরেজি ভাষার চর্চা দেশে প্রচলিত হয়েছে। মহানুভব মহাত্মা যদি এই 'বান্দা'র প্রতি হুকুম জারি করেন, সে তার জিনগ্রস্ত কন্যাকে নিয়ে সাধুমহাত্মার সমীপে হাজির হবে।...

আজকাল হিন্দুরাও আমার কাছে আরজি নিয়ে আসেন। আমি একটু ভেবে বললাম, আলি বখ্‌শ্‌! খতখানি নাও। আর বাবু, আপনি গিয়ে জমিদারবাবুকে বলুন, তিনি যখন খুশি হাজির হতে পারেন। আমি চেষ্টা করে দেখব। গোবিন্দরাম সিংহ আবার করজোড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেলেন। তারপর মনে হল, কেন আমি একথা বললাম বাবুটিকে? আলি বখ্‌শ্‌ খুশিমুখে খতটি হাতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল! নিঃশব্দে হাত বাড়ালে সে খতটি সসম্ভ্রমে দুহাতে তুলে আমাকে দিল! খুলে হাতের লেখা দেখে ভালো লাগল। আমার দাদাজির (পিতামহ) আমলে আংরেজশাহি ফারসি তুলে দিয়েছে। ফারসি ছিল দরবারি ভাষা হিন্দুস্তানে! জুলুমবাজ 'নাসারা' (ন্যাজারেথবাসী প্রেরিত পুরুষ ইসার অনুগামী, কিন্তু ইসলামি মতে পথভ্রষ্ট) হুকুমত। হুঁ, আসলে ফারসি খতখানি আমাকে অনন্তনারায়ণ সম্পর্কে আগ্রহী করেছে। খতখানি হাতে নিয়ে আবার পুকুরের ঘাটে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মনে কেন এত অহংকার আজ? আংরেজশাহির আমলে এখনও একজন হিন্দু ফারসি খত লিখেছেন বলেই কি? মুখ তুলে দেখতে পেলাম সড়কের ধারে অশ্বত্থগাছের তলায় একটি পালকি, কিছু লোক এবং বাবু গোবিন্দরাম বিশ্রাম নিচ্ছেন! আমি জানি, মেহমানির দাওয়াত দিলে বাবু বিব্রত বোধ করবেন। কিন্তু আল্লাহর কুদরত (লীলা)! হিন্দু জমিদারবাবুর কন্যা আরবি জবানে কথা বলে — আমার দেখা দরকার, জানা দরকার। জলের দিকে ঘুরে শিউরে উঠলাম। জলের তলায় নীল আসমান ভাঙচুর করে ঢেউ কী খেলা দেখাতে চাইছে আমাকে? হাফিজ আবৃত্তি করলাম।

'অ্যায় শাহান্‌শাঁহে বুলন্দ্‌ আখতার খুদায়া হিম্মতে
ত-ব-বোসম্‌ হামেচো গর্দুন খাকে অ্যায়বানে শুমা..

হে উচ্চতম রাজাধিরাজ ! করুণা ভিক্ষা চাই যেন ওই আসমানের মতো তোমার উচ্চস্থিত আসনের ধুলো চুম্বন করতে পারি। তারপরই মনে পড়ে গেল, বাচ্চা শফিউজ্জামান তার মাকে হরবখত প্রশ্ন করত, মা পানির তলায় দুনিয়া আছে ? বলো না মা, পানির তলায় সব উলটো কেন ? তার মা বলত, উলটো মানুষদের দুনিয়া আছে — তোর আব্বাকে পুছ করিস ! শফি আমাকে প্রশ্ন করতে সাহস পেত না। কিন্তু সত্যি বুঝি পানির তলায় উলটো মানুষদের দুনিয়া আছে! খুব মন নিয়ে লক্ষ্য করতে করতে ঢেউ থেমে গেল। পুকুরের পানির ভেতর খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে চারদিকে মাটি আর বৃক্ষলতার ভেতর একখানে আবিষ্কার করলাম — নাউজুবিল্লাহ ! সেই হাম্মালাতুল হাতাব দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কাটারি, কাঁধে রজ্জু। মুখ তুলতেই আবার চোখাচোখি হল। নীল রোশনি ঠিকরে পড়েছে রাতের জানোয়ারের মতো ! ডাকলাম, আলি বখ্‌শ্ ! সে এলে বললাম, ওই বেশরম আওঁরত কে ? বেপরদা হয়ে জঙ্গলে ঘুরছে, কে ওই খান্নাস (শয়তানের অনুচরী) ? আলি বখ্‌শ্ বলল, হজরত ! ওই সেই আবদুল কুঠোর বিবি। বললাম, ওকে ডেকে নিয়ে এসো। আলি বখ্‌শ্ কুণ্ঠিতভাবে বলল, হুজুরে আলা ! ওর লব্‌জ্ (কথাবার্তা) খুব খারাপ। গালমন্দ করবে। খুনখারাপি করতেও ওর ডর নেই। ছড়িটা হাতে নিয়ে পুকুরের দক্ষিণ পাড় হয়ে পুবপাড়ে, তারপর পেছনে পায়ের শব্দে ঘুরে দেখি, আলি বখ্‌শ্ আসছে। তাকে ধমক দিয়ে বললাম, এবাদতখানায় যাও বেঅকুফ। কুত্তা ঢুকবে ! সে মুখ গোমড়া করে ফিরে গেল। উত্তরপাড়ে গিয়ে গিয়ে দেখি, 'হাম্মালাতুল হাতাব' মাঠের দিকে চলেছে। বারবার পিছু ফিরে দেখে নিচ্ছে আমাকে। এইসময় আচানক একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গিয়ে সে প্রায় নাঙ্গা হবার উপক্রম। আমি চোখ বুজে ফেললাম। নাউজুবিল্লাহ্ !....

মাটি, হায় মাটি !

এবাদতখানার দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরে ডাঙা জমিগুলোর মালিক হরিণমারার হিন্দু জমিদার। নবাবি মহলের ভেতর ছিটমহল। যেন চারদিক থেকে হিন্দুরা হাত বাড়িয়ে মুসলমানের মাটি কবজা করছে, আংরেজ-শাহি মদত দিচ্ছে। ছোটোগাজি বলছিলেন, কতকটা তাই। তবে নবাববাহাদুরও দুব্‌লা হয়ে পড়েছেন। খাজনার দায়ে ছোট-খাটো মহল নিলাম হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু পয়সাওয়ালারা কিনে নিচ্ছে। যখন বললাম, এবাদতখানার চারদিকের মাটি আমার দরকার, কারণ এতিমখানা (অনাথ-আশ্রম) আর মেহমানখানা (অতিথিনিবাস) খুলতে চাই, তখন ছোটোগাজি খুশি হয়ে বললেন, আজই জমিদারবাবুকে গিয়ে বলব। তিনি আপনাকে খাতির-ভক্তি করেন বলে জানি। আমাকে একটা খোয়াব (স্বপ্ন) আচ্ছন্ন করেছে ইদানীং। দূর-দূরান্তর থেকে লোকজন আসে। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা উচিত আর এতিমখানায় এতিম — বাপমাহারা অনাথ ছেলেমেয়েরা থাকবে, এলেম শিখবে, ইসলামের ক্ষয়ে যাওয়া বুনিয়াদ হিন্দুস্তানে আবার মজবুত হবে। বিকেলে বড়োগাজিও এলেন ভাইয়ের কাছে কথাটা শুনে। এই লোকটিকে বোঝা যায় না। ওঁর নাকি খুব আংরেজি এলেম আছে।

সবতাতেই লড়াই করতে তৈয়ার। বলল, হজরত ! জমিদার নবেন্দুনারায়ণকে মদু (ছোটোগাজি) চেনে না। খুব মতলববাজ লোক সে। মদু কথা বলতে গিয়ে বেইজ্জত হয়েছে। জমিদারবাবু বলেছে, পিরসাহেবের তো এত ভক্ত। আমি পঞ্চান্নহাজারে কিনেছি। চাঁদা করে দিক ওরা। বিক্রিকবালা করে দেব। তবে পিরসাহেবের খাতির, পাঁচবিঘের মতো মাটি ওঁর নামে দানপত্র করে দিতে রাজি। চালাকি হজরত ! বিলকুল ঝুট। যে-পাঁচবিঘে দানপত্র করবে বলেছে, আমি জানি, সে-মাটি ওর এক জ্ঞাতির। সেই নিয়ে কলকাতার আদালতে মামলা চলছে। বললাম, তাহলে তো মুশকিল ! বড়োগাজি বললেন, কিসের মুশকিল হুজুর ? আপনার হুকুমে এলাকার তামাম মুসলমান জান কোরবানে তৈয়ার। আমরা লড়াই করে মাটি দখল করব। বললাম, গাজিসাহেব ! লড়াই পরে। আগে আমার খত নিয়ে যান জমিদারবাবুর কাছে। আমি ওঁকে সব বুঝিয়ে লিখে দেব। বড়োগাজি একটু অবাক হলেন নিশ্চয়। আমার চালচলনে ইদানীং জঙ্গিভাব নেই আগের মতো, সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি। বড়োগাজি আস্তে বললেন, হজরতের যা ইচ্ছা। ফারসিতে খত লিখে শিলমোহর দেগে দিলাম। বড়োগাজি একটু হেসে বললেন, আমি ফারসি ভালো পড়তে পারি না। মদু পারে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব ! নবেন্দুনারায়ণ আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত ! এমনিতে তত দুষ্ট লোক নয়। কিন্তু মাটি ওর জান। কালেকটার বাহাদুর প্যাটারসনসাহেব ওকে খুব খাতির করে। বড়োগাজি চলে গেলেন ঘোড়া ছুটিয়ে। আমি এবাদতখানা থেকে বেরিয়ে পুকুরপাড় হয়ে জঙ্গলটার ভেতর ঢুকলাম। কী আশ্চর্য স্তব্ধতা সেখানে ! গুমোট গরম পড়েছে। ঝিঁঝিপোকা, পাখপাখালির ডাক সেই স্তব্ধতার ভেতর মিশে যাচ্ছে। আল্লাহর কুদরত ! নীচু হয়ে ঝুঁকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছড়ির ডগায় খুঁচিয়ে একটু গুঁড়ো মাটি তুলে নিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই তো সেই মাটি ! এ মাটি কোনদিন এমন করে খুঁটিয়ে দেখিনি — যে মাটি থেকে আল্লাহ প্রথম পুরুষ আদমকে বানিয়েছিলেন। আমার অজুদে (দেহে) এই মাটি আছে। এই মাটি দিয়ে দুনিয়াও গড়া হয়েছে। আমার মউত হলে আমার অজুদ এই মাটিতে মিশে যাবে। আর ফেরেশতা ইস্রাফিল যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, এই মাটির দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যাবে। হায় এই মাটি ! পবিত্র কেতাবে সেদিন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

আলকারিয়াহ্ ত মালকারিয়াহ্....

মহাপ্রলয় ! মহাবিপদ ! কিসের বিপদ ? মহাপ্রলয়ের। শিউরে উঠলাম। বান্দা বদিউজ্জামান। এই দুনিয়ার জন্য তোর এত মায়া, এত স্বপ্ন ! প্রচণ্ড হতাশা, তারপর অর্থহীনতা আমাকে পেয়ে বসল। কিন্তু আমি তো কোনোদিন মাটির প্রত্যাশী ছিলাম না ! আজ কেন মাটির জন্য এ খাহেস ? এতিমখানা, মেহমানখানা, এবাদতখানা। কী অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে কয়েদি হয়ে গেছি বা হতে চলেছি ক্রমে ক্রমে। অনিত্য মাটির কথা ভেবেই কি এতদিন মুসাফিরের মতো ঠাঁই বদলে-বদলে ঘুরে বেড়াইনি ? অথচ আজ আমি এইসব গাছের মতো শেকড় বিঁধিয়ে দাঁড়াতে চাইছি। মাটির গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। একটা কাঠবেড়ালি শুকনো পাতার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে কুর-কুর করে কী চিবুচ্ছিল। ওইটুকু আওয়াজে বেচারা দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর শিরশিরে একটা হাওয়া এল মাঠের দিক থেকে। যেন চারপাশে ফিসফিসিয়ে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার !....

চোখ বুজে তসবিহ্ নিয়ে আল্লাহর নাম জপ করছিলাম। তারপর মনে হল আশ্চর্য একটা দৃশ্য আবছা নজর হচ্ছে। একদল ঘোড়সওয়ার, পরনে শাদা পোশাক তাদের, আর ঘোড়াগুলোর গায়ের রঙ নীল, বড় বড় টানা চোখে পুরু সুরমা টানা, আর সওয়ারদের হাতে খোলা তলোয়ার, তারা আমার হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ খুললাম। এ কিসের নমুদ (নিদর্শন) দেখাচ্ছেন আল্লাহ্, ওরা কি আসমান থেকে নেমে আসা জিন, আমার মদতের জন্য দাঁড়িয়ে আছে? এ অবস্থায় তসবিহ নিষ্ফল। লানটিনের দম একটু বাড়িয়ে 'হুঁশিয়ার নামাহ্' কেতাবটি রেহেলে রেখে পাতা ওলটাতেই দেখি :

'হুঁশিয়ার পিঙ্গলচক্ষু নারী সম্পর্কে। আর
'হুঁশিয়ার ঠোঁটে তার যদি থাকে
তিলচিহ্ন। হুঁশিয়ার যদি সে বারবার
স্থানপরিবর্তন করে! যদি হয় সে
চঞ্চলা মৃদুভাষিণী / উদ্দেশ্যহীন
তার গমনাগমন—'

এই সময়ে বাইরে দূরে আবছা কোলাহল। মুখ তুলে কান পাতলাম। এ রাতে খুব হাওয়া দিচ্ছিল। দুনিয়া জুড়ে একটা অস্থিরতা। গোলমালের আওয়াজ কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট। তারপর আলি বখশের সাড়া পেলাম বারান্দা থেকে। সে খুকখুক করে কাশছিল। কোনো কথা বলার দরকার হলে তার এই অভ্যাস। বন্ধ দরজার বাইরে তার কাশি শুনে ভেতর থেকে ডাকলাম, আলি বখ্শ! সে বলল, হজরত! গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে মনে হচ্ছে। বললাম, ডর নেই তোমার। চুপচাপ শুয়ে থাকো। সে উত্তেজিতভাবে বলল, হুজুর! আওয়াজ এদিকেই আসছে। হুকুম পেলে আমি একটু দেখে আসি। হুকুম দিলাম। গোলমালটা বাদশাহি সড়কের দিকে এগিয়ে আসছে বটে। আমার ঘরের দেওয়ালে আঁটা গোপন সিন্দুকে টাকাকড়ি সোনাদানা আছে। মুরিদদের (শিষ্য) নজরানা। ওই দিয়ে এতিমখানা মেহমানখানার খরচ চালাব। হুঁশিয়ার থাকা দরকার। প্রেরিত পুরুষ স্বয়ং তলোয়ার ধরে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ওহোদের লড়াইয়ে তাঁর পবিত্র দাঁতে আঘাত লেগেছিল। মুসলমান সব সময় তো লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার। কুতুবগঞ্জের গোমস্তা আবদুল কাদির বহুবছর আগে আমাকে তাঁর মরহুম (প্রয়াত) পিতার একটি ঢাল ও তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন। এবাদতখানার দেওয়ালে তা টাঙিয়ে রেখেছি। একটু ইতস্তত করে দোয়া পাঠ করলাম :

'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসায়ালুকা ফি নুহুরিহিম অ
নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম...

দুশমনদের ধ্বংসের দোয়া এটি। ঢাল আর তলোয়ার হাতে নিয়ে দরজা খুলে পা বাড়িয়েছি, কী বা কেউ আমার পাশ দিয়ে ঢুকেই লানটিন বুতিয়ে (নিবিয়ে) দিল। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। হুঁশ এলে ঘুরে গর্জন করতে গিয়ে গলায় কিছু আটকে গেল। না, আল্লাহর কসম, ডর নয়। অন্ধকার ঘর। বাইরে এতক্ষণে একফালি

চাঁদের আবছা হলুদ আলো। গোলমালটা এবার উত্তরে পুকুরের ওপাড়ে জঙ্গলের দিকে শোনা যাচ্ছে। আলি বখ্‌শ্‌ ফিরে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ডাহিন হজরত! ডাহিন! নাঙ্গা হয়ে খোঁড়াপিরের মাজারে মাথায় পিদিম জ্বেলে — বাধা দিয়ে বললাম, ইকরাতন? আলি বখ্‌শ্‌ বলল, জি হুজুর! আমার শরীরে বিজলির চমক। বললাম, আলি বখ্‌শ! পাক কেতাবে লেখা আছে, আল্লাহর ঘর — মসজিদ এবাদতখানা, সবই 'মসজিদুল হারাম!' তার মধ্যে বা চারদিকে শও হাত জমিনে মানুষ হোক কী জানোয়ার, তাকে আঘাত নাজায়েজ (অসিদ্ধ)। আলি বখ্‌শ্‌ কিছু বুঝতে পারল না। শুধু বলল, জি হজরত! তখন বললাম, আলি বখ্‌শ্‌! গিয়ে ওদের বলো, আমার হুকুম — সবাই বাড়ি ফিরে নিদ যাক। আর শোনো, তুমি নিজের বাড়ি গিয়ে তোমার বহিনের (আলি বখ্‌শের বিবি মারা গেছে। আর নিকাহ করেনি।) একটা শাড়ি নিয়ে এসো। আলি বখ্‌শ্‌! কেউ বা তোমার বহিন কিছু শুধোলে বোলো, আমার বারণ আছে জবাব দেওয়া। আর শোনো আলি বখ্‌শ্‌। অমি দুজন জ্বেন (জিন) পাঠিয়ে তোমাদের ডাহিনকে পাকড়ে আনছি। তাকে তওবা পাঠ করিয়ে খাঁটি মুসলমান করব। আলি বখ্‌শের চোখ চাঁদের আলোয় বিস্ময়ে ঝলমল করছিল। সে আবার দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তখন আমি ঘুরে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়া 'খান্নাস'টিকে আস্তে বললাম, অ্যাই বেশরম লেড়কি! তোর এত সাহস হল কী করে যে তুই আমার ঘরে ঢুকে পড়লি? চাপা ফোঁপানির মধ্যে সে বলল, ওরা আমাকে মেরে ফেলত। একটু হেসে বললাম, তুই ডাহিন আওরত? নাঙ্গা হয়ে মাথায় চেরাগ রেখে নাচ করিছিলি? শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জবাব এল, আমি থানে ওষুধ তুলতে গিয়েছিলাম।...নাঙ্গা হয়ে কেন?....নৈলে ওষুধে ফল হয় না।...বুড়বক খবিস! কিসের ওষুধ তুলে গিয়েছিলি....রুপমারির একটা মেয়ের অসুখ। দুকাঠা চাল দেবে বলেছিল।....হাসতে-হাসতে বললাম, লোককে ঠকিয়ে ধোঁকা দিয়ে রোজগার কবিস! ফুঁপিয়ে উঠে বলল, পোড়া পেটের দায়, পিরসাহেব!...তুই হিন্দু আউরত ছিলিস? এবার না-জবাব হয়ে কাঁদতে শুরু করল। ধমক দিয়ে বললাম, চুপ! নাদান বেশরম কাঁহেকা। তবু সে কাঁদতে থাকল। একটু ভেবে বললাম, আলি বখ্‌শ্‌ কাপড় আনতে গেছে। তোকে ওর সঙ্গে হরিণমারায় ছোটোগাজির বাড়ি পাঠিয়ে দেব। সেখানে থাকবি। রাজি?...জি হ্যাঁ।...তোকে তওবা করতে হবে আগে। তুই কলমা জানিস? আবদুল তোকে মুসলমান করেছিল তো? জি হ্যাঁ।...বাইরের গোলমাল থেমে গেছে। আলি বখ্‌শ্‌ আসতে একটু দেরি হবে। বললাম, আমি যা বলছি, বল্‌। না বললে মুশকিলে পড়বি। বল্‌—কল্‌মা শাহাদত ঃ

'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ মহম্মদর্‌ রসুলাল্লাহ্‌'

আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই, মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ। আশ্চর্য, আশ্চর্য এবং আশ্চর্য! সে চমৎকার আবৃত্তি করল কান্নাজড়ানো গলায়। বললাম, মারহাবা! শাবাশ! এত সুন্দর তোর লব্‌জ্‌! সে আস্তে বলল, বুকু আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। আমার মেজবউবিবি? জি হ্যাঁ। মারহাবা! মারহাবা! অ্যাই লেড়কি! তোর নামের মানে কী জানিস? যে আউরত মুখস্ত বলতে পারে। কী মুখস্ত বলতে পারে — না আল্লাহর কথা, রসুলের কথা। আর ইকুরাতনন্নেসা! তোর কি মনে পড়ে, আমার

সঙ্গে নদীর ধারে তকরার করেছিলি ?...জি হ্যাঁ।...এইসময় আলি বখ্‌শ্‌ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়ল। তাকে চাপাস্বরে বললাম, আমার জ্বেন (জিন) মেয়েটাকে ধরে এনে বেঁধে রেখেছে, আলি বখ্‌শ্‌ ! তার হাত থেকে কাপড়টা নিয়ে অন্ধকারে ঘরের ভেতর ছুড়ে ফেললাম। দরজা বন্ধ করে জ্বেনদের উদ্দেশে বললাম, ওকে তোমরা কাপড় পরিয়ে দাও। আলি বখ্‌শ্‌ জড়োসড়ো হয়ে বারান্দায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে আপনমনে বলল, সবই হুজুরের কেরামতি !

আরও একটি ব্যর্থতা

'হুশিয়ারনামাহ্' কেতাবে যেমতো লিপিবদ্ধ ছিল ! ইকরার চোখ দুটি সত্যিই ছিল পিঙ্গলবর্ণ, গ্রামে যাদের 'কয়রাচোখি' মেয়ে বলা হত, বেড়ালের মতো চোখ। চঞ্চলও ছিল সে। আর তার ঠোঁটে সত্যিই তিল ছিল। কথা কম বলত। দ্রুত স্থান পরিবর্তন করত। সেরাত্রে হরিণমারা যাবার পথে বেচারা কমজোর আলি বখ্‌শ্‌কে ধাক্কা মেরে কাঁদরের জলে ফেলে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। আলি বখ্‌শ্‌ হুজুরের ভয়ে একটা গল্প বানিয়েছিল। কাঁদরের কাছে যেতেই একদল কালা জিন তাকে ঘিরে ধরে। তাকে প্রহার করে। প্রমাণ হিসেবে সে গায়ের ছেঁড়া ফতুয়া এবং কপালে, হাতে ও পায়ে ছড়ে-যাওয়া ক্ষতচিহ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু আগাগোড়া একটি নাটকীয় ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'বদুপিরের' এই ছোট্ট পরাজয়ের চেয়ে জিনদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুসাব্যস্ত হয়। তবে বদিউজ্জামানেব জীবনে এও আরেকটি ব্যর্থতা — তাঁর নিজের কাছে। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি ব্রাহ্মণী নদীর সেই প্রাচীন সাঁকোব কাছে দাঁড়িয়ে দুঃখে ব্যর্থতায় ক্রোধে অভিমানে ক্ষিপ্ত হতেন। তারপর সাঁকোর পাথরের থামগুলো গুঁড়িয়ে ফেলাব ফতোয়া জারি করেন। পুরনো সাঁকোটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অথচ এবাদতখানায় বসে, অথবা পুকুরপাড়ে নিশুতি রাতে দাঁড়িয়ে বদিউজ্জামান অবিকল সিঁদুরের ছোপমাখা থাম দেখতে-দেখতে এক নাঙ্গা আউরতকে দেখে চোখ বুজে ফেলতেন। বিড়বিড় করে পাঠ করতেন ঃ আল্লাহ্ ! শয়তানের জাদু থেকে আমাকে বাঁচাও। আসলে জীবনের অনিবার্য স্পষ্টতাগুলো নিজেকে উঁচুতে তুলে রাখার দরুন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।

একটি কথোপকথন

কচি, ঘুমোলি ?

না একটা কথা ভাবছিলাম ! আচ্ছা, দাদিমা ?

কীরে ?

ছোটোদাদাজি যে বাঘদুটো দেখেছিলেন, তারাই যে তোমার শ্বশুরসাহেবের মাজারে সেলাম করতে আসত, কী করে জানলে ?

শুনেছি।

সবই খালি শুনেছ। কিছু দেখনি ?

কী করে দেখব বল্ ? হিজরি ১৩১৩ সনে শ্বশুরসাহেব মৌলাহাটে এলেন। সেই থেকে খাঁচায় ঢুকলাম ! হিজরি ১৩১৪ সনে আশ্বিন মাসে আমাদের দু বহিনের শাদি হল। খাঁচার দরজায় কুলুপ পড়ল।

দাঁড়াও, পঞ্জিকা দেখে হিসেব করি।

আঃ, আলো জ্বালে না। চোখে লাগে।

হুঁ, এটা হিজরি ১৩৩৩ সন। ইংরিজি ১৯১৩। দাদিমা, বিয়ের সময় তোমার বয়স কত ছিল ?

বারো-তেরো বছর হতে পারে। পরের বছর তোর আব্বার জন্ম হল।

ওম্মা ! ওই বয়সে বিয়ে, বাচ্চার মা — দাদিমা, তুমি কী বলছ !

সে-আমলে তাই তো হত। তবে জানিস কচি, তোর আব্বার জন্মের খবর গেল শ্বশুরসাহেবের কাছে। খুব জাড় পড়েছিল সেবার আঘুন মাসে। দুখু ফিরে এসে বলল, উনি এবাদতখানায় — মানে এখন যেখানে ওঁর মাজারশরিফ, জিনের মজলিশে আছেন।

ভ্যাট ! বাজে গপ্প।

দুখু বলল, জানালার ফাঁক দিয়ে শাদা রোশনি ঠিকরে বেরুচ্ছে। তখন শাশুড়িসাহেবা বললেন, নুরুকে খবর দে। এসে বাচ্চার কানে আজান দিক।

নুরু — মানে বড়োদাদাজি ?

হুঁ। তো ভাসুরসাহেবও পাশকরা মওলানা। দেওবন্দে পাশ ! এসে তোর

আব্বার কানে আজান দিলেন। তখন শেষ রাত। আয়মনিখালা কুলকাঠের আগুন জ্বেলে আমার গা সেঁকছে। ধাইবুড়ি লুকিয়ে বিড়ি ফুঁকছে।

দাদিমা, আমার দাদাজি তো ছিলেন! উনি আজান দিলেন না কেন?

ল্যাংড়া বোকাহাবা মানুষ। কষ্টে চলাফেরা করতেন! গলায় আওয়াজ বেরুত না!

আমার দাদাজি তো মেজো?

হুঁ। শ্বশুরসাহেব ইন্তেকাল করার সময় বলে গিয়েছিলেন, সে এই এবাদতখানার মালিক হবে! তারপর যখন মুরিদরা পিরসাহেবের মাজার বানিয়ে দিল, তোর দাদাজি সেখানেই থাকতেন। নজরানাটা সেলামিটা যা পড়ত, আদায় করতেন। বিঘে দশেক ভুঁই ছিল। তারও ফসল পেতাম আমরা। মায়ের সম্পত্তি এক ছটাক আমি নিইনি।

কেন নাওনি,....ও দাদিমা! বলো না। কেন নাওনি?

সেসব কথা চাপা আছে, চাপা থাক। রাত হয়েছে, নিঁদ যা।

দাদিমা, মাজারে নাকি ডাকাতরা খুন করেছিল দাদাজিকে?

আঃ, চুপ কর্ তো! খুন কেন করবে? কালা জিন গলা টিপে মেরেছিল।

আচ্ছা, দাদিমা, ছোটোদাদাজি নাকি ডাকাত ছিল?

কচি! ঘুমো।

বলো না দাদিমা, ছোটোদাদাজির কথা। জঙ্গলের ভেতর ভাঙা মসজিদ, চাঁদনি রাত, দুটো বাঘ — তারপর কী হল?

রাত জাগলে সকালে স্কুল যেতে পারবি নে। ঘুমো।

আলো জ্বালব বলে দিচ্ছি।

না, না!

অন্ধকারের প্রাণী তুমি, দাদিমা।

হুঁ, আঁধার আমার ভালো লাগে। সারাটা দিন আমার কষ্ট হয় রে! দিন কাটে না।

ঠিক আছে! নাও, শুরু করো। জঙ্গলে ভাঙা মসজিদ। চাঁদনি রাত। দুটো বাঘ খেলা করছে।

আমি তো দেখিনি। শুনেছি। এক বর্ষার রাতে দেওরসাহেব এলেন। আম্মাকে দেখা করতে। তখন উনি স্বদেশী করেন। সে আমার শাদির দশবছর পরের কথা! শেষ রাতে চলে গেলেন। পরনে হিন্দুর পোশাক।

ও দাদিমা! তাহলে বলো, ছোটোদাদাজি টেররিস্ট্ ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বইতে ওঁর নাম থাকা উচিত ছিল! আশ্চর্য! কেন নেই?

খুব নামী লোক হয়েছিলেন দেওরসাহেব। জেলা জুড়ে নাম। ম্যাজিসটের লাট রায়বাহাদুর খান-বাহাদুর ওঁর ডরে গর্তে সেঁধিয়ে থাকত।

তবু হিস্ট্রিতে নাম নেই!

কথাটা তোর আব্বাও বলত। বলত, হিঁদুরা মোসলমানদের পাত্তা দেয় না। সেইজন্যই তো হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হল। তবে দেওরসাহেব শেষে স্বদেশী ছেড়ে খুনখারাপি করে বেড়াতেন। ওঁর মাথার দাম—

ছাড়ো! গপ্পটা বলো! জঙ্গল,ভাঙা মসজিদ, জোড়া বাঘ, চাঁদনি রাত।

বলি।....

জঙ্গল চিরে ধবধবে শাদা মাটির রাস্তা। ঝলমলে জ্যোৎস্না। রাস্তার ধারে ভাঙা মসজিদ। একদল হাটুরে নিকিরি গিয়েছিল শহরে খন্দ বেচতে। কাঁধে বাঁশের বাতার ভার, দুধারে ঝোলানো ঝুড়ি। সেই দলের কাছে জানা হয়েছে এই রাস্তা গেছে পদ্মার ধারে সুপারিগোলার হাট। সামনে ভগবানগোলা। তখনও গঙ্গা বইত ভগবানগোলার কাছাকাছি। ভগবানগোলায় মামুজি আবু মিরের বাড়ি। পুরো নাম মির মোহাম্মদ আবুতৈয়ব। হাটুরে নিকিরির দল আমাকে খুব খাতির করেছিল আমি আবু মিরের ভাগনে বলে। ওরা বলেছিল, ওরে বাবা! উনি এ তল্লাটের ডাকসাইটে পুরুষ। বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় ওঁর নামে। ওরা যাবে অনেক দূর। রাস্তায় ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে। তাই ভাঙা মসজিদের উঁচু চত্বরে রাত কাটাতে গেল। বলল, পিরসাহেবের ছেলে আপনি। তার ওপর আবু মিরের ভাগনে। থাকুন আমাদের সঙ্গে। ভোরবেলা মিরসাহেবের ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাব। একা যাবেন না। লোকগুলোকে ভালো লেগেছিল। ওরা ভাঙা মসজিদচত্বরে বসে আমাকে গুড়মুড়ি খেতে দিল। পাশে একটা পুকুর ছিল। পানি এনে খেল। পানিটা বিস্বাদ। ওরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুল। আমাকে একটা চট দিল শুতে। দেখলাম ওদের কাছে লাঠি বল্লম কাটারি আছে। সেগুলো পাশে রেখে শুয়েছে। বরাবর দেখেছি, এইসব মানুষের ঘুমটা খুব গাঢ়। আমার পক্ষে ঘুমানো অসম্ভব! চট, তা ছাড়া বালিশ নেই। জ্যোৎস্নার আলোছায়া। হু-হু বাতাস। শনশন অদ্ভুত সব শব্দ। মামুজির কথা ভাবছিলাম। উনি কি আমাকে চিনতে পারবেন? সেই ছ বছর বয়সে একবার আম্মার সঙ্গে গিয়েছিলাম। গিয়ে তো ঝামেলা। পরদিনই ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে আম্মা চলে এলেন। সারা পথ কাঁদছিলেন আম্মা। কেন তা জানি না। মামুজি নাকি নেশাখোর মানুষ, এলাকার ডাকাত-সর্দাররা ওঁর গোলাম। কত অদ্ভুত গল্প শুনেছি দাদি-আম্মার কাছে। মামুজিকে বাচ্চা বয়সে নাকি গোরা পলটন ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওঁর আব্বা হাসু মিরকে না পেয়ে। কেন? দাদি-আম্মা বলেছিলেন, হাসু মির ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। ব্যাপারটা সিপাহি বিদ্রোহ হওয়া সম্ভব। মরহুম দাদাজিও নাকি সিপাহি বিদ্রোহের সময় লুকিয়ে বেড়াতেন। বারিচাচাজির কাছে সিপাহি বিদ্রোহের গল্প শুনেছি। মাত্র বছর আটত্রিশ আগের ঘটনা। হরিণমারার বড়োগাজি বলতেন, বাঙালি হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে হিন্দুস্তান থেকে তামাম ইংরেজকে ভাগিয়ে দেওয়া যেত। ব্যাপারটা কিছু বোঝা যায় না। জানতে ইচ্ছে করে। গত মাসে লালবাগ শহরে মদ খেয়ে এক গোরাপলটন গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের বেইজ্জতি করত। আশ্চর্য ব্যাপার, ওই পান্না পেশোয়ারি তাকে শায়েস্তা করেছিল। পান্না শয়তান কিছু ভাল কাজ করে। তাই তাকে শহরের লোকে হয়তো ভালোবাসে। সবাই পান্নার পেছনে না দাঁড়ালে ওর বিপদ হত। মাতাল গোরাটাকে বহরমপুর ব্যারাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।...কাত হয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে চোখ খুলে দেখি, একটু তফাতে নীচের ফাঁকা জায়গায় দুটো বাঘ। ওখানে চাঁদের আলো। বাঘদুটোর লেজ নড়ছে। কেমন একটা কেঁউ-কেঁউ মিহি আওয়াজ ওদের গলায়। পরস্পরকে আঁচড়াচ্ছে। কামড়াচ্ছে। তারপর একটা বাঘ শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। অন্যটা তার

পাশে পেছনের দু-পা ভাঁজ করে বসল এবং মাঝে-মাঝে সামনের একটা পা তুলে চাঁটি মারতে থাকল অন্যটার গালে, পেটে, থাবায়। আমি কাঠ হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। লোকগুলো নিঃসাড়। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনে হল, বাঘদুটো বাঘ আর বাঘিনী এবং তারা যে আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, তার একটাই কারণ — আব্বা একদল জিন পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে বাঘ আর বাঘিনী খেলতে-খেলতে ওদিকে কালো জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। তখন ভাবলাম, আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম ? লোকগুলোর একজনকে খিমচি কেটে জাগিয়ে ফিশফিশ করে বললাম, বাঘ ! সে ঘুমজড়ানো গলায় শুধু বলল, হুঁ ! বাতাসের শনশন শব্দের ভেতর দূরে যেন একবার বাঘ ডাকল। বাকি রাত আর ঘুমানো অসম্ভব। ভোর রাতে ওদের সঙ্গে যাবার সময় গল্পটা বললে ওরা গ্রাহ্য করল না। একজন বলল, বাঘ মসজিদ সালাম করতে আসে। মানুষের খেতি করে না। অবশ্য সে-আমলে পাড়াগাঁয়ে সবখানে জঙ্গল। সবখানে বাঘ। এরপর যখন দেবনারায়ণ রায় নামে একজন চমৎকার মানুষের সঙ্গে শাঁখালার জঙ্গলে আবাদের কাজ দেখতে যাই, তখন প্রায়ই সেখানে একটা করে বাঘ মারা পড়ত। বাঘ, বুনোশুওর, সাপ। মানুষও মারা পড়ত। তবে এই জোড়া বাঘের গপ্প আমি একশ, দুশো বা তিনশো জনকে বলে থাকব। গপ্পটা বাজে, অথবা গপ্পটা আমার জীবনে খুব মূল্যবান। পরে যতবার মনে পড়েছে, শিউরে উঠেছি। তাহলে আমি আদতে কাদের দেখেছিলাম ? মিথুনমত্ত বাঘ আর বাঘিনী এক জ্যোৎস্নারাতের জঙ্গলে — তারা কারা ? দেবনারায়ণদা বলেছিলেন, এপ্রিল বাঘেদের মেটিং সিজন। হুঁ, ইংরেজি ১৯১৬ সাল। তিরিশে এপ্রিল। তারিখটা মনে আছে। পান্না পেশোয়ারিকে ইট মেরে পালিয়ে যাচ্ছিলাম। হাটুরে নিকিরির দলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। ভাঙা নবাবি মসজিদ জঙ্গলের ধারে। আসঙ্গলিপ্সু দুটি বাঘ। বুকের ভেতর ক্রমশ তাদের গজরানি শুনতে পেতাম। তারা খেলতে-খেলতে অবচেতনার অন্ধকারে ঢুকে যেত। এই গপ্পটা কাউকে বলা ঠিক হয়নি।.....

ব্রহ্ম ও আনন্দ

আবু মির প্রথমে চিনতে পারেননি শফিকে। তাঁর দুটি স্ত্রী ছিলেন। বড়োর বয়সের তুলনায় ছোটোটি নাবালিকা বলা যায়। আবু মিরকে দুজনেই প্রচণ্ড ভয় করতেন। আজিফা বেগম বড়োর নাম, তাঁর সতীনের নাম জরি বেগম। স্বামী বাড়ি না থাকলে দুজনে ঝগড়াঝাঁটি বেধে যেত। শফি যেদিন ওখানে পৌঁছয়, তার আগের দিন অজিফা বেগমকে তালাক দিয়েছেন আবু মির। হতভাগিনী একটি বাচ্চাও গর্ভে ধরতে পারেননি। আর জরি বেগম স্বামিগৃহে এসেই গর্ভিণী হয়েছেন। আবু মির ফরসি হুঁকোয় তামাক টানছিলেন। উঠোনে একদঙ্গল লোক বসে ছিল। তারা গেঁজানো তালরস খাচ্ছিল। তাদের পাশে লাঠি বল্লম, টাঙ্গি, তলোয়ার, ঢাল স্তূপীকৃত। কয়েকটি রণপা। এ নিয়ে শফি ছেলেদের খেলতে দেখেছে। ঝাঁকড়া চুল, গোঁফ, গালপাট্টা লাল চোখ — এইসব লোক যে ডাকাত তার বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল।

শফিকে অনেকক্ষণ জেরা করার পর আবু মির চিনেছিলেন, ছেলেটি তাঁর বোন সাইদারই সন্তান বটে। কিন্তু তিনি তত পাত্তা দেননি শফিকে। শুধু জরিবেগম শফিকে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। দুপুরে যত্ন করে খাইয়েছিলেন। মুরগির গোশত, মাসকলাইয়ের বড়া আর কুমড়োর তরকারি। ভাতটা মোটা লালচে রঙের। আবু মির তখন বেরিয়ে ছিলেন। শফি খাওয়ার পর বলেছিল, মামিজি আমি যাই। জরি বেগম বলছিলেন, কেন গো ? ছোটোমামিকে ভাল লাগছে না বুঝি ? বড়োমামি থাকলে ভালো লাগত ? তা কী করব বলো, কাল তোমার মামুজি তাকে লোক ডেকে তালাক দিয়েছেন। শফি যদিও বা থাকত, আর থাকার ইচ্ছে করছিল না। সে মৌলাহাটে ফিরে যাবেই। জরি বেগমের চেহারায় একটা নিষ্ঠুরতাও এর কারণ হতে পারে। সে বেরিয়ে পড়েছিল বাড়িটা থেকে। শুকনো গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে একটা লোকের সঙ্গে দেখা। সে তরমুজখেতে বসে হুঁকো টানছিল। লোকটি তাকে মৌলাহাটের রাস্তা বাতলে দেয়। সেখানে থেকে নাকি চোদ্দ ক্রোশ দূরত্ব। হাঁটতে-হাঁটতে একটা চটির কাছে সূর্য ডুবেছিল। চটির পেছনে হাটতলার চালাঘর। সেখানে একদল লোক বিশ্রাম নিচ্ছিল। একটি পালকি ছিল। বেহারারা পা ছড়িয়ে বসে চিঁড়ে খাচ্ছিল। মাথায় লাল ফেট্টিবাঁধা পাইক হাতে লাঠি নিয়ে তম্বি করছিল লোকগুলোকে। শফি চটির সামনে বাঁশের মাচানে বসে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল। এমন সময় হাটতলার পেছন থেকে এক লম্বা চেহারার ভদ্রলোক গাড়ু হাতে পালকির কাছে এলেন। তাঁর পরনে ধুতি, পায়ে নাগরাজুতো, খালি গা। শফির দিকে চোখ পড়লে তিনি গাড়ু রেখে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, তোমার নিবাস ?

এভাবেই কপালীতলার জমিদারদের ছোটো তরফবাবু দেবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় শফির। দেবনারায়ণ ছিলেন খেয়ালি মানুষ। দাদা আর জ্ঞাতিদের সঙ্গে বনিবনা ছিল না তাঁর। কপালীতলায় প্রায় একঘরে হয়ে বাস করতেন। মামলামোকর্দমা করে শাঁখালা নামে একটা অনাবাদি জঙ্গলমহল ভাগে পান। কয়েকটি ছোটো নদী বা সোঁতার অববাহিকায় কয়েক বর্গমাইল নাবাল মাটি। সেখানে বসত বসাতে চলেছেন। একটা দল জমির লোভে কিছুদিন আগে সেখানে চলে গেছেন। এবার দ্বিতীয় দলটাকে নিয়ে চলেছেন। ওরা বা এরা এখনও ঘরকন্না বউকাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে যেতে নারাজ। অবস্থা বুঝলে তারপর নিয়ে যাবে। দেবনারায়ণ মানুষকে খুব সহজে আপন করে নিতে জানতেন। জাত-বেজাত মানতেন না। বলতেন, একো ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি। আমরা মানুষেরা সবাই পরম ব্রহ্মের একেকটি প্রকাশ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চেতনাময়। কান করে শোনো, প্রকৃতি জুড়ে ব্রহ্মের তান। বায়ুর মর্মরে, বিহঙ্গের কাকলীতে, নদীর স্রোতধ্বনিতে, পুষ্পের প্রস্ফুটনে, সর্বত্র আনন্দরূপ ব্রহ্মতান। তাঁরই আনন্দে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। বলে তিনি গম্ভীর গলায় গান গেয়ে উঠতেন।

অর্থাৎ দেবনারায়ণ ব্রাহ্ম ছিলেন।...

দেবনারায়ণদা ছিলেন পাগল মানুষ। তবে তাঁর পাল্লায় পড়ে আমার জীবন অনেকখানি বদলে গিয়েছিল তো বটেই। শাঁখালা নামটা বদলে তিনি শঙ্খিনী রাখেন, যদিও লোকে সেটা নেয়নি। তবে উঁচু মাটির ওপর যে মূল বসতি করে ব্রহ্মপুর নাম দেন, সেটা চালু হয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় উপাসনাবেদি। নাম দিয়েছিলেন ব্রহ্মমন্দির। সেখানে চাষাভুষো লোকগুলোকে জড়ো করে আব্বার মতোই গম্ভীর স্বরে ভাষণ দিতেন। বেদমন্ত্র আবৃত্তি করতেন। এসব ব্যাপারে আব্বার সঙ্গে তাঁর খানিকটা মিল তো ছিলই। শুধু আব্বার মতো তর্জন-গর্জনটা ছিল না। শান্ত এবং গম্ভীর, অথচ প্রসন্নতা ঝলমল করত মুখে। মাঝেমাঝে বলতেন, জানিস্ শফি, ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরান আমার মুখস্থ ? বলে কোনো একটি সুরা আংশিক আবৃত্তি করতেন। আমি উচ্চারণের ভুল শুধরে দিতাম। আমার সঙ্গে ইসলাম আর উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করতে চাইতেন। এইসব সময় আমার ভারি বিরক্তিকর মনে হত ওঁকে। আমার কাছ থেকে ততদিনে ধর্মাধর্ম অনেক দূরে সরে গেছে। অবশ্য আমার ভালো লাগত সন্ধ্যাবেলার আসরটা। ব্রহ্মমন্দিবের বেদিতে বসে থাকতেন দেবনারায়ণদা। ব্রহ্মকীর্তন শুরু হত। খোল বাজিয়ে গান। দেবনারায়ণদা ওদের বলতেন বৈতালিক। সেই প্রথম খুব কাছে থেকে সংগীতের স্বাদ আমি পাই। আব্বা বলতেন, একবার গানবাজনা শুনলে চল্লিশ বছরের বন্দেগি (উপাসনা) বরবাদ। অথচ এভাবে যদি আল্লার নামে গান গাওয়া হয়, কেন আল্লা চটে যাবেন জানি না। দেবনারায়ণদা আমাকও গলা মেলাতে বলতেন। গান আমার আসে না। আর একটা বিরক্তিকর ব্যাপার ঘটত, কোনও ভদ্রলোক এলেই দেবনারায়ণদা আমাকে দেখিয়ে বলতেন এই আমাদের সমাজের মুসলমান সদস্য। তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তখন আমার পরনে ধুতি আর কামিজ। তাঁরা বলতেন সত্যি নাকি ? তাঁদের মুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠত। আমি রাগ করে সরে যেতাম। একদিন এক ভদ্রলোক এলেন, তাঁর নাম যামিনী মজুমদার। রোগা এবং বেঁটে মানুষ। আমাকে নিয়ে বিকেল বেড়াতে বেরুলেন নতুন বাঁধের পথে। কিছুদূর সত্যিই চুপচাপ পর হঠাৎ বললেন, তুমি কি মুসলমান ? বললাম, হ্যাঁ — আমার নাম সৈয়দ শফিউজ্জামান। আমার বাবা একজন পির। যামিনীবাবু আমার একটা হাত নিয়ে আস্তে বললেন, তুমি দেবুদার কাছে জুটলে কীভাবে ? তাঁকে শুধু খানিকটা বললাম। বললাম না পান্না পেশোয়ারিকে মেরে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যামিনীবাবু বললেন, তুমি এখানে থেকো না। দেবুদাকে এলাকার ভদ্রলোকেরা পছন্দ করেন না। উনি ব্রাহ্ম। জমির লোভে কিছু কিছু ভদ্রলোক এখানে এসে দীক্ষা নিয়েছেন ওঁর কাছে। এতে অনেকেই চটে আছে। এই বাঁধ গড়া হচ্ছে, শয়ে-শয়ে চাষাভুষো কোদাল কোপাচ্ছে — সামনের বছর ফসলও ফলাবে, কিন্তু আমার ভয় হয় কী জান ? বর্ষায় বাঁধ কেটে দেবে কেউ। তা ছাড়া তুমি মুসলমান — ব্রাহ্ম হয়েছ। এলাকার মুসলমানরাও এটা সহ্য করবে না। আমি বললাম, আমি ব্রাহ্ম হইনি। যামিনীবাবু হাসলেন। তাহলে এখানে পড়ে আছো কেন ? বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছ না কেন ? বললাম, আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে। যামিনীবাবু বললেন, কেন ভালো লাগছে ? একটু ভেবে নিয়ে

বললাম, নতুন মাটি আবাদ হচ্ছে। আমাকে দেখাশোনা করতে হয়। যামিনীবাবু বললেন, শুধু এজন্য ? বললাম, জঙ্গলে জানোয়ার আছে। মাঝে-মাঝে মারা পড়ে। সাঁওতাল বসতির লোকেরা শিকারের পরবে বেরোয়। তাদের সঙ্গে আমিও যাই। আমার এসব ভালো লাগে। যামিনীবাবু বললেন, এসো। এখানে একটু বসি। বাঁধের কিনারায় ঘাসের চাবড়া বসানো হয়েছে। সেখানে দুজনে বসলাম! একটু পরে যামিনীবাবু গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন। গানটা কোথায় শুনেছি মনে হল। মিঠে সুর।

বন্দেমাতরম্/
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্/....

উনিগান থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। কেমন লাগছে ? বললাম, ভালো। উনি আবার গাইতে থাকলেন,

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্...

যামিনীবাবু বললেন, কিছু বুঝলে ? ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। যামিনীবাবু হাসতে লাগলেন। দেবুদা তোমার মাথাটি খেয়ে ফেলেছেন। শোনো, গানটার মানে বুঝিয়ে দিই। এবার বললাম, গানটা আমি জানি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ আমি পড়েছি। তা ছাড়া স্কুলে সংস্কৃত পড়েছি। যামিনীবাবু নড়ে বসে আমার পিঠে হাত রাখলেন, চমৎকার! বললাম, কিন্তু আনন্দমঠে মুসলমানদের ঘেন্না করা হয়েছে। বারিচাচাজি বলছিলেন — যামিনীবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, কে তিনি ? বললাম, নবাববাহাদুরের ছোটো দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরি। যামিনীবাবু ভীষণ চমকে গেলেন। বললেন, চৌধুরিসায়েব তোমার আত্মীয় হন ? কী আশ্চর্য! এতক্ষণ বলবে তো! একথা শুনে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। বারিচাচাজিকে যদি ইনি খবর দেন কোথায় আছি, আমার এখানে আর থাকা হবে না! তাই বললাম, ঠিক আত্মীয় নন, একটু-আধটু চেনা। যামিনীবাবু আমাকে বোঝাতে থাকলেন, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু এই গানটা সত্য। দেশকে মা বলতে তোমার আপত্তি আছে ? দেবুর থাকতেও পারে। সে সর্বত্র ব্রহ্মের অস্তিত্বই মানে। ওরা পুরুষরূপী ঈশ্বরের উপাসনা করে। কিন্তু আমরা উপাসনা করি আসলে দেশের। দেশে আমাদের মা। শফি, দেশকে তুমি ভালোবাস না ? স্বীকার কর না দেশের সঙ্গে মায়ের মিল আছে ?....এই প্রথম আমি একজন 'স্বদেশীবাবু' দেখছিলাম। 'স্বদেশী'বাবুদের সম্পর্কে আমার তত কিছু ধারণা ছিল না। তাই ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জেনে নেওয়া উচিত মনে হল। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত যামিনীবাবু যা সব বললেন, মনে হল, অবিকল এইসব কথাই আব্বার মুখে কিংবা হরিণমারার বড়োগাজির মুখে একটু অন্যভাবে শুনেছি। ইংরেজ আমাদের দুশমন। ফেরার পথে যামিনীবাবুকে বললাম, আপনি এখানে কদিন থাকবেন ? যামিনীবাবু একটু হেসে বললেন, কেন ? আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে নাকি ? বললাম, না। আপনার সঙ্গে আমার যেতে ইচ্ছে করছে।

যামিনীবাবু আমার হাত ধরে বললেন, বেশ তো ! কিন্তু আর কিছুদিন তুমি এখানে থাকো ! এখনই তোমাকে নিয়ে যেতে আমারও কিছু অসুবিধা আছে। তাছাড়া তুমি মনস্থির করো। জিজ্ঞেস করলুম, কেন ? আমি আসলে বলতে চাইছিলাম, আমি স্বাধীন। মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পারি। যা খুশি করতে পারি। যামিনীবাবু আমার কথার জবাবে বললেন, আমরা এখনও সংঘবদ্ধ নই। দেশব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি। কিছু লোকের মধ্যে — যেমন আমাকে দেখছ, আমার মধ্যেও একটা সংকল্প দানা বেঁধেছে। আমরা চেষ্টা করছি, পরস্পর যোগাযোগ করে একটা সমতি গড়া যায় নাকি। এই এলাকায় আমার আসার উদ্দেশ্যও তাই। এবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিবাস কোথায় ? যামিনীবাবু একটু হেসে বললেন, বহরমপুরে ছিল। ওকালতি করতাম। তাই দেওয়ান বারি চৌধুরিকে চিনি। বললাম, ব্রাহ্মদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ? যামিনীবাবু একটু চুপ থাকার পর বললেন, ওদের নিজেদের মধ্যে মতান্তর আছে। সর্বত্র দলাদলি চলছে। একদল পইতে পরার বিরোধী — যেমন দেবুদা। দেবুদারা জাতিভেদ মানে না। ব্রাহ্মণ-শূদ্র-মুসলমান-খ্রীস্টান সবাইকে দীক্ষা দিচ্ছেন। অন্যদল চান ব্রাহ্মণের আধিপত্য। আচার্য হবেন শুধু ব্রাহ্মণ। পইতে ত্যাগ করবেন না ব্রাহ্মণেরা। যাই হোক, দেবুদার কাছে যেসব ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ভদ্রলোক এসে জুটেছেন, তাঁরা কিন্তু জমির লোভেই এসেছেন। বললাম, মুসলমানদের সঙ্গে দেবনারায়ণদার খুব মিল। যামিনীবাবু খুব হাসলেন।...কাঁদের সঙ্গে ওঁর মিল নেই ? ক্রোশ পাঁচেক দূরে এক ইংরেজ সায়েব একটা রেশমকুঠি গড়েছে। তার নাম স্ট্যানলি ! তার সঙ্গেও খুব মিল দেবুদার। কবে দেখবে সেও এসে পড়বে এখানে। অথচ আমার ইচ্ছা, ওই গোরাটাকে হত্যা করি। চমকে উঠে বললাম, সে কী ! কেন ? যামিনীবাবু গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে বললেন, নুরপুর বানুক (রেশমকুঠি) এলাকার তাঁতিদের সর্বনাশ করেছে। আর স্ট্যানলি খুব অত্যাচারী। এইসব কথা বলতে বলতে দেবনারায়ণদার ডেরায় পৌঁছলাম। তখন সন্ধ্যার উপাসনার আসর শুরু হয়েছে। বাঁশের খুঁটিতে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলছে রোজকার মতো। বেদিতে বসে দেবনারায়ণদা আব্বার মতো গম্ভীর স্বরে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করছেন। যামিনীবাবু আস্তে বললেন, দেবুদার এটাই স্বর্গরাজ্য। ঘুরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, হলুদ একটু আলোয় বাঁকা হাসি। হাসিটা খারাপ লাগল। মজলিশে অন্যদিনের মতো বসতে যাচ্ছিলাম, যামিনীবাবু আমার হাত ধরে টেনে অন্ধকার অংশ ঘুরে ছিটেবেড়ার ঘরগুলোর দিকে নিয়ে গেলেন। 'অতিথিভবন' নামে সবচেয়ে লম্বা ঘরের বারান্দায় উঠে বললেন, ব্রহ্মসংগীত দূরে বসে শোনাই ভালো। একটু দূরত্বে না গেলে সত্যকে চেনা যায় না। এখান থেকে লোকগুলোকে লক্ষ করো। সত্য ধরা পড়বে।....যামিনীবাবুর এই হেঁয়ালি বুঝতে পারছিলাম না। একটু পরে দেবনারায়ণদার উদাত্ত গলায় আবৃত্তি ভেসে এল আলোর দিক থেকে,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে...

যামিনীবাবু চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, আনন্দ ! কোথায় আনন্দ ? সর্বত্র নিরানন্দ। সর্বত্র দুঃখ। অপমান অত্যাচার।....

দ্বিতীয় কথোপকথন

দাদিমা। দাদিমা!

আমি এখানে।

আশ্চর্য মানুষ তুমি! বাইরে কী করছ?

খোকা এল না!

না আসুক। তুমি এসে শুয়ে পড়ো! এত রাতে বাইরে থেকো না!

আমার ডর লাগে, খোকা কোথায় থাকে এত রাত অব্দি?

কোথাও আড্ডা দিচ্ছে। তুমি এসো। দরজ' এঁটে দাও।

জানিস কচি, খোকার স্বভাব অবিকল তোর ছোটোদাদাজির মতো।

তাই বুঝি? -

আমার ডর হয়, কবে না পুলিশ ওকে—

আঃ! চুপ করো! ঘুমোও।

তুই আমাকে অনেকদিন পরে দাদিমা বলে ডাকলি, কচি!

কে জানে বাবা! তোমাকে বাহাত্তুরে ধরেছে। কবে তোমাকে আবার দাদিজি বলতাম!

খোকা দাদিজি বলে। হুঁ, তুই দাদিমাই বলিস বটে। কিন্তু খোকা কেন দাদিজি বলে?

ভূতের মুখে রামনাম! ওর কথা ছাড়ো তো!

কচি, তুই একেবারে হিঁদু হয়ে গেছিস।

বেশ করেছি। হিন্দুদের দেশ। হিন্দু হতেই পারি।

যতই কর কচি, হিঁদুরা তোকে আপন করবে না।

তুমি অন্ধকারের প্রাণী। কী জান, কতটুকু জান? সব বদলে গেছে এখন।

তোর ছোটোদাদাজি বলতেন, মোসলমানদের একটা খোদা। হিঁদুর তেত্তিরিশ কোটি। মোসলমান একটা খোদা বরবাদ কবতে পারে। হিঁদুদের তেত্তিরিশ কোটি খোদা বরবাদ করা কঠিন।

ছোটোদাদাজি তোমার হিরো!

কী বললি?

ছোটোদাদাজি আমারও হিরো!

হিরো — সে আবার কী রে?

দিনে বুঝিয়ে বলব! আমার ঘুম পাচ্ছে।

চুপ! ওই বুঝি খোকা এল! খোকা, এলি?

আশ্চর্য! বাতাসের শব্দ। তোমার কানেও কি বাহাত্তুরে ধরেছে?

আমার শাশুড়িসাহেবা ঠিক এরকম বলতেন, জানিস? একটু আওয়াজ হলেই সাড়া দিয়ে বলতেন, শফি এলি? সারারাত এরকম। খালি ঘর-বা'র, খালি ছটফটানি। তারপর এক বর্ষার রাতে টিপটিপ করে পানি পড়ছে। হাওয়া বইছে উথালপাথাল। আয়মনিখালা শাশুড়িসাহেবার কাছে শুয়ে আছে। হঠাৎ জানলার বাইরে—

ঘুম পাচ্ছে। কাল রাতে শুনব।

হঠাৎ জানলার বাইরে ডাক, মা! আয়মনিখালা বলল, শফি! শাশুড়িসাহেবা বললেন, অন্য বাড়িতে কেউ ডাকছে। শফি হলে আম্মা বলে ডাকত। আয়মনিখালা বলল, না — স্পষ্ট শুনলাম শফির গলা।

বকো তুমি আপন মনে। আমি শুনছি না কিন্তু!

আয়মনিখালা জানালা খুলে বলল, শফি? দেওরসাহেব রাগ করে বললে, ভিজে গেছি। আর একবার ডেকে চলে যেতাম। আয়মনিখালা দরজা খুলে ভিজতে-ভিজতে বেরিয়ে গেল। শাশুড়িসাহেবা লানটিন জ্বালবেন কী, বোবায় ধরেছে। কাঠ হয়ে বিছানায় বসে আছেন। শোরগোল শুনে লম্প জ্বেলে বেরিয়ে দেখি, — কে এক জোয়ান পরপুরুষ। পরনে হিঁদুর পোশাক। মুখের পানে তাকিয়েই ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, দেওরসাহেব বললেন, আর তো তুমি বলা যাবে না। বুকু বলেও ডাকা যাবে না। মেজভাবি, কেমন আছেন? আমার বুক ফেটে কান্না এল। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ঘরে ঢুকে গেলাম।....

একটি পিস্তল, একটি কান্না

দেবনারায়ণদার ব্রহ্মপুরে জমজমাট অবস্থা। পাকা বাড়ি উঠেছে। ব্রহ্মোপাসনার বেদি ঘিরে দালান গড়া হয়েছে। অনেকগুলো থামের মাথায় ছাদ। মাটির বেদি শাদা পাথরে বাঁধানো হয়েছে। বাইরে মাথার ওপর লেখা আছে "ব্রহ্মপুর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। নরনারী-জাতিধর্মনির্বিশেষে অবাধ প্রবেশ অধিকার।" তারও ওপরে লেখাঃ "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্!" বেদির সামনে লেখা ঃ "ওঁ তৎসৎ।" আরও কিছু বৈদিক মন্ত্রও লেখা ছিল চারদিকে। এটা ছিল আশ্রমের অংশ। আশ্রমের বাইরে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়। ব্রাহ্ম দাতব্য চিকিৎসালয়। একটা বয়স্ক শিক্ষামন্দির গড়ে তোলা হচ্ছিল আবাদের বয়স্ক চাষাভুষো মানুষদের জন্য। দেবনারায়ণদার পরিচয় তখন 'আচার্যদেব'। 'দেব' কেন জিগ্যেস করলে একটু হেসে বলতেন, সম্মানিত অর্থে। বলতাম, আমিও আচার্যদেব বলে ডাকব, দাদা! আমার দ্বিগুণ বয়সের মানুষটি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, সেই সে তারাপুর চটিতে তোর সঙ্গে পরিচয় হল আর তোকে বললাম 'আমাকে দেবনারায়ণদা বলে ডাকবে', দ্যাট ইজ ফাইনাল। যামিনীবাবু সেই যে চলে গেলেন, আর একবছর পাত্তা পাইনি। পরের বছর শীতের সময় যখন নতুন আবাদে ফসল উঠেছিল, খবর পাওয়া যায়, নুরপুর কুঠির মালিক স্ট্যানলিকে পিস্তল ছুড়ে গুলি করতে যান। পিস্তলে গুলি বেরোয়নি। উলটে স্ট্যানলির পিস্তলের গুলিতে ওঁর বুক ছ্যাঁদা হয়ে যায়। সারা এলাকা ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। চাপা সন্ত্রাস চারদিকে কয়েকটা মাস। গ্রীষ্মকালে এক ভদ্রমহিলা আর তাঁর মেয়েকে দেবনারায়ণদা বহরমপুর থেকে পালকি করে নিয়ে আসেন। আশ্রমের একটি ঘরে থাকতে দেন। আমার জানতে অনেক দেরি হয়েছিল, ওঁরা যামিনীবাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে। কাউকে জানতে দেননি দেবনারায়ণদা। আমাকেও না। একদিন লাইব্রেরি ঘরে বসে "বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের" (দেবনারায়ণদা বাবু কথাটি জুড়ে দিতেন) 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'

কবিতাটি খুব মন দিয়ে পড়ছি, জানালার ওধারে ফুলগাছের কাছে, আনমনে চোখ তুলে একটি মেয়েকে দেখলাম। তখন যে-কোনো মেয়ে দেখলেই রুকুর সঙ্গে তুলনা করার অভ্যাস ছিল। হয়তো আমার মনে ওই প্রচণ্ড কবিতাটির আবেগ ছিল, আমার দৃষ্টিতে তার প্রকাশ ঘটে থাকবে, মেয়েটি মুখ নামিয়ে নিল। দেখলাম, সে সাজিতে করে ফুল তুলছে। ওদেরই দেবনারায়ণদা বহরমপুর থেকে নিয়ে এসেছেন জানি। নিজের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছেন। মেয়েটির নাম আমি জানতাম, ভারি অদ্ভুত নাম ঃ স্বাধীনবালা ! তার মায়ের নাম সুনয়নী। সুনয়নী আমাকে অবাক চোখে দেখতে দেখতে বলতেন, তোমাকে বাবা মোছলমান বলে মনেই হয় না ! রাগ হলেও মুখে হাসতাম। বরাবর একটা কথা শুনতে-শুনতে অবশ্য খানিকটা সয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনবালাকে ফুল তুলতে দেখার পর, তাছাড়া ওইরকম সুন্দর চোখনামানো ভঙ্গি, আমার মনে হল, হয়তো যামিনীবাবু ঠিক বলেননি, সেই যে বলেছিলেন, 'কোথায় আনন্দ' ? এই তো আনন্দ। ওই ফুল, ওই মেয়ে। আর ততদিনে দেবনারায়ণদা যেন আমার মাথায় আনন্দ ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আবাদের চাষিদের কোদাল কোপানোতে আনন্দ অনুভব করি। লাঙলের ফালে কর্ষিত উর্বর মাটির চিরে যাওয়াতে আনন্দ দেখি — ওইখানে একদিন অঙ্কুরিত হবে শুকনো বীজ থেকে সবুজ শস্য। বীজও নিজেকে চিরে নিয়ে আসে শ্যামলিমার লাবণ্য। জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে বৃক্ষলতার দিয়ে তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলে ওঠেন, 'ওই আভূমিপ্রণত শ্যামলতা দুলিতেছে।' আমি বদলে যাচ্ছিলাম অথবা বদলে গিয়েছিলাম। পান্না পেশোয়ারির কথা, সিতারার কথা, লালবাগ শহরের সমস্ত কথা পায়ের তলায় মাড়িয়ে ততদিনে আমার চলার গতি কমেছে। লাগামছাড়া ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছি, চলে গেছে পেছনে, আমি পায়ে হাঁটছি। নিজের পায়ে হাঁটার মধ্যে আবিষ্কার করছি, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ ! যা ধ্বংস, যা মৃত্যু, যা দুঃখ, সবই একটি আনন্দের মৃত্যুর পর অপর একটি আনন্দের জন্ম। কদিন পরে সেই লাইব্রেরি ঘরে বসে "বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের" আরেকটি চটি বই পড়ছি, আমাকে চমকে দিয়ে স্বাধীনবালা ঢুকল। মুখ তুললাম না। সে বইয়ের আলমারিতে কোনো বই খুঁজতে থাকল। তারপর আস্তে বলল, আচ্ছা, লাইব্রেরিতে কোনো উপন্যাস নেই ? বললাম, জানি না। স্বাধীনবালা একটু হাসল ! কেন ? আপনিই নাকি লাইব্রেরিয়ান ? বললাম, না তো ! স্বাধীনবালা বলল, দেবুজ্যাঠা বলেছেন। আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করব, রাগ করবেন না তো ? মাথা নাড়লাম। স্বাধীনবালা বলল, আপনি কি সত্যিই মুসলমান ? ইচ্ছে হল রেগে একটা কড়া জবাব দিই, ওকে বলি — মুসলমান কি সৃষ্টিছাড়া প্রাণী যে তাকে আলাদা করে চিনে নিতে হবে ? স্বাধীনবালা বলল, আমরা ব্রাহ্ম হয়ছি। ব্রাহ্মধর্মে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ভেদাভেদ নেই। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ফের বলল, আপনার নামটা কী যেন — বললাম, সৈয়দ শফিউজ্জামান। স্বাধীনবালা বলল, উচ্চারণ করতে পারব না। ডাকনাম নেই আপনার ? আস্তে বললাম, শফি। স্বাধীনবালা বলল, আপনাকে শফিদা বলব। আচ্ছা শফিদা, আপনার বাড়ি কোথায় ? বললাম, মৌলাহাট। স্বাধীনবালা জেরা করে ঠিক ওর বাবার মতোই জেনে নিতে চাইছিল, কেন এবং কীভাবে আমি এখানে এসে জুটেছি। আমি একইভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। শেষে বললাম, আপনার বাবার সঙ্গে আমার

খুব আলাপ ছিল। অমনি স্বাধীনবালা চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল, বাবা সম্পর্কে ও খুব কম জানে। আমি যামিনীবাবুর সঙ্গে আমার যা-সব কথা হয়েছিল, বললাম। শোনার পর স্বাধীনবালা আনমনা ভঙ্গিতে আঙুলে আঁচল জড়াতে-জড়াতে (আঃ! রুকুর এই ভঙ্গিটি মনে পড়ছিল) বলল, আমার একটা পিস্তল থাকলে আমি স্ট্যানলিকে গুলি করে মারতাম। এই কথাটা আমার বুকের ভেতর ধাক্কা দিল। ওকে কিছু বলতাম, কিন্তু দেবনারায়ণদা এসে গেলেন। মাঠ থেকে এসেছেন। খালিপায়ে ধুলোকাদা। মুখে ঘাম। কোনার দিকে তক্তাপোশে বসে বললেন, একটা কথা মাথায় এসেছে। দুজনেই শোন্। শফি তো সেকেন্ড ক্লাস অব্দি পড়েছে। স্বাধীন পড়েছিস মাইনর অব্দি। ঠিক আছে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের দুজন টিচার পাওয়া গেল। শফি পড়াবি পুরুষদের, স্বাধীন মেয়েদের। কী? রাজি? স্বাধীনবালা খুশি হয়ে বলল, হুঁউ। আমি বললাম, কিন্তু — দেবনারাণদা রাগের ভঙ্গি করে বললেন, তোর মাথার ভেতর একটা কিন্তুর গোঁজ বসানো আছে ওটা ওপড়ানো দরকার। স্বাধীনবালা হেসে উঠল। দেবনারায়ণদা বললেন, হ্যাঁ। ওই কিন্তুটা তোর সর্বনাশ করবে, শফি! সামনে তোর বিশাল জীবন পড়ে আছে। তাকে ফুলেফলে ভরিয়ে তুলতে হবে — যেভাবে আমি আবাদের কাজে নেমেছি। বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু তাঁর ওই প্রশ্নটা আমার দারুণ ভালো লাগে ঃ 'জীবন লইয়া কী করিব?' তোকে একটা কথা বলি, শোন। মুসলমান আর ব্রাহ্মদের মধ্যে একটা সাধারণ বেসিক ইউনিফর্মিটি আছে। মুসলমানধর্মে যার জন্ম, তার তিনটে মূল কালচার। ইসলামি কালচার, পারিপার্শ্বিকগত হিন্দু কালচার আর শিক্ষাসূত্রে লব্ধ পাশ্চাত্য আধুনিক কালচার। ব্রাহ্মদেরও তাই। ইসলাম-খ্রীস্টান-হিন্দু। হিন্দু মানে অরিজিন্যাল বৈদিক কালচারের কথাই বলছি। সুতরাং...দেবনারায়ণদা মুখ খুললে থামতে চাইতেন না। আমি আড়চোখে দেখছিলাম, স্বাধীনবালা খুব মন দিয়ে বক্তৃতাটা শুনছে।

এর মাসখানেক পরে এক বিকেলে বাঁধে গিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, স্বাধীনবালা আসছে। চোখমুখে পাগলাটে ভাব। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, সেই স্ট্যানলি এসেছে দেবুজ্যাঠার কাছে। শফিদা, আমাকে তুমি একটা পিস্তল জোগাড় করে দিতে পার? পার না শফিদা? কতজনের সঙ্গে তোমার জানাশোনা। সে কেঁদে ফেলল। তোমার পায়ে পড়ি শফিদা! আমাকে একটা পিস্তল জোগাড় করে দাও। আমি বিকেলের গোলাপি রোদে ওর কান্নাটা হয়তো উপভোগ করছিলাম।...

In Heaven a spirit doth dwell
"Whose heart-strings are a lute"
None sing so wildly well
As the angel Israfel...

'চান্দ্রমাস জেলহজ্জের দশম দিবসে কেয়ামতের (মহাপ্রলয়) নিদর্শন প্রকাশ পাইবে। সেই দিবস সূর্য উঠিবে না। দুনিয়া অন্ধকার থাকিবে। মানুষসকল ভাবিবে, ইহা কী হইল? তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। অতঃপর তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিবে, পশ্চিমদিকে সূর্য উঠিতেছে। তখন তাহারা জানিবে, কেয়ামত নিকটবর্তী কিন্তু হায়! তখন তওবার (ক্ষমাপ্রার্থনা) দুয়ার আল্লাহ বন্ধ করিয়াছেন। তাহারা পবিত্র কেতাব খুলিয়া দেখিতে পাইবে, হরফসকল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আর এই সময় আরবদেশের সাফাপর্বত বিদীর্ণ করিয়া দাব্বাতুল আরদ বাহির হইবে। ইহার মুখের চেহারা মানুষের মতন। কিন্তু গর্দান ঘোড়ার মতন। পা উটের মতন। লেজ গোরুর মতন। পশ্চাদ্দেশ হরিণসদৃশ। শিং দুইটি বলদের তুল্য। আর হস্ত দুইটি বাঁদরের। ইহার এক হস্তে থাকিবে পয়গম্বর সোলেমানের আংটি, অপর হস্তে থাকিবে পয়গম্বর মুসার লাঠি। দাব্বাতুল আরদ অবিশ্বাসীদের ললাটে ওই আংটি দ্বারা কালো চিহ্ন এবং বিশ্বাসীদের ললাটে ওই লাঠি দ্বারা শাদা চিহ্ন দাগিয়া দিবে। তাহার পর জুম্মাবার প্রত্যূষকালে আল্লাহ ফেরেশ্‌তা ইস্রাফিলকে শিঙায় ফুঁ দিতে বলিবেন। প্রথমে অতিক্ষীণ ধ্বনি বাড়িতে থাকিবে! মানুষসকল ভাবিবে, ইহা কিসের শব্দ? ক্রমে ক্রমে ইস্রাফিলের শিঙার ধ্বনি কানে তালা ধরাইবে দিবে। দুনিয়া কাঁপিতে থাকিবে! পর্বতসকলও মাটি পেঁজা তুলার মতন উৎক্ষিপ্ত হইবে। প্রাণিসকল মৃত ও নিশ্চিহ্ন হইবে। সমস্ত নিরাকার শূন্যে পরিণত হইবে। শুধু থাকিবেন আল্লাহ এবং তাঁহার বান্দা ফেরেশতাবৃন্দ। আর আল্লাহ তখন ইস্রাফিলকে দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁ দিতে বলিবেন। এক্ষণে মৃত সকল প্রাণী, সকল মানুষ ও জিন পুনরায় জীবিত হইবে।'

খোকা ॥ দাদিজি, এই গুলতাপ্পি কে ঝেড়েছে বলো তো?

দিলরুখ বেগম ॥ তওবা! আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌! খোকা, জবান সামলে কথা বল্‌!

তুই বুজুর্গ পিরের খানদান !

কচি ॥ খোকা, তুই হাফ্-এজুকেটেড। গুলতাপ্পি বলছিস ? পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হবে না ? বিজ্ঞানের বইতে কী লেখা আছে জানিস ? আর চারশো কোটি বছর পরে সৌরজগৎ ধ্বংস হবে।

খোকা ॥ কচি, আমাকে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করবি নে বলে দিচ্ছি। থাপ্পড় খাবি।

দি বেগম ॥ কাজিয়া করে না ভাই-বোনে। ওই কেতাব আমার শ্বশুরসাহেবের লেখা। হরিণমারার বড়োগাজিসাহেব কলিকাতা থেকে ছেপে এনেছিলেন। দে, সিন্দুকে তুলে রাখি। আর একটা কথা বলি, কক্ষনো নাপাক হাতে সিন্দুক খুলবি নে ! দে কেতাবখানা !

কচি ॥ দাদিমা, আমি পড়ব। আমার কাছে থাক। প্লিজ দাদিমা !

খোকা ॥ এই মেয়েপণ্ডিত ! তুই জানিস ইস্রাফিল কে ? বল্ তো কে সে ?

কচি ॥ খোকা, বিদ্যে ফলাবি নে আমার কাছে। ক্লাস নাইনে ফেল করা ছেলের মুখে 'ইস্রাফিল কে' এ প্রশ্ন মানায় না।

খোকা ॥ তুই জানিসই না, ইস্রাফিলকে মুসলমানরা বাইবেল থেকে চুরি করেছে। প্যাটপ্যাট করে তাকাস নে। আমার কাছে জেনে নে। ইস্রাফিল স্বর্গের মিউজিশিয়ান।

কচি ॥ বাজে বকিস নে।

খোকা ॥ বাজে ? দাঁড়া, তোকে ছোটোদাদাজির একটা বই দেখাচ্ছি।

দি বেগম ॥ খোকা ! সিন্দুক খুলিস নে আর। ও কচি, ওকে বারণ কর্ !

কচি ॥ দাদিমা, একটু চুপ করো না ! ওর বিদ্যের দৌড়টা দেখি।

খোকা ॥ এই দ্যাখ। ছোটদাদাজি আনডারলাইন করে রেখেছেন।

কচি ॥ এ তো ইংরিজি পদ্যের বই ! এডগার অ্যালেন পো। কী অবাক ! নামকরা কবি বুঝি ?

খোকা ॥ ছোটোদাদাজি পণ্ডিত লোক ছিলেন। একগাদা ইংরেজি বই ভরা আছে সিন্দুকে।

দি বেগম ॥ ওই কেতাবগুলো জেহেলখানা (জেল) থেকে ওঁর ফাঁসির পর পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি সিন্দুকে তুলে রেখেছিলাম। যেদিন খবর এল — হা খোদা !

খোকা ॥ আঃ দাদিজি ! কান্নাকাটি থামাও। ইংরেজরা অসংখ্য লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। তাদের জন্য কাঁদবার লোক নেই।

কচি ॥ আছে রে ! শহিদ বলে স্টাচু গড়েছে। মালা দিচ্ছে বার্থডেতে। শুধু ছোটোদাদাজির জন্য কিছু হয় না। হয়তো মুসলমান বলেই হয় না।

খোকা ॥ ভ্যাট ! ছোটেদাদাজি — আমার ধারণা, ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন না, বুঝলি কচি ? উনি ছিলেন অ্যানারকিস্ট্। বুঝিস কাদের অ্যানারকিস্ট্ বলে ? যারা রাষ্ট্র বলে সরকার বলে কিছু মানে না। যারা বলে মানুষ বর্ন্-ফ্রি।

কচি ॥ বুঝেছি। তুই পাঁচুবাবুর পাল্লায় পড়েছিস ! খোকা, সাবধান কিন্তু। কামাল স্যার বলছিলেন, লোকটা এখানে এসে জুটেছে কোনো মতলবে। ওকে শিগগির পুলিশে ধরবে।

খোকা ॥ তোদের কামালস্যারকে বলবি, প্রি-পার্টিশন পিরিয়ডে তো লিগের

লিডার ছিল। এখন ভোল বদলে কংগ্রেস কেন ? গিরগিটির বাচ্চা ! বহুরূপীর দল গাছেরও খাবে, তলারও কুড়ুবে।

কচি ॥ খোকা, যা-তা বলবি নে বলে দিচ্ছি। কামালস্যার না থাকলে আমার পড়াশুনো হত না।

দি বেগম ॥ খোকা ? আবার কোথায় বেরুচ্ছিস এই রোদ্দুরে ?

খোকা ॥ আসছি।

কচি ॥ দাদিমা !

দি বেগম ॥ উঁ ?

কচি ॥ তুমি আমাক বলনি সিন্দুকে এত কি্ছু আছে ! গুপ্তধনের মতো আগলে রেখেছ ! ভাগ্যিস খোকা সিন্দুক খুলল, তাই জা্নতে পারলাম। দাদাজির আব্বা বই লিখতেন, ছোটোদাদাজি ইংরেজি পদ্য পড়তেন ! ভাবা যায় না !

দি বেগম ॥ তোরা বুজুর্গ আলেমের খানদান, ভাই ! কেতাবই তোদের সম্পত্তি। শ্বশুরসাহেব বলতেন, তুচ্ছ মাটির ওপর কেন লোভ মানুষের ? বলতেন, মাটি আমার সয় না। তাই যা পেতেন, দুহাত ভরে বিলিয়ে দিতেন। ইচ্ছে করলে কত জমিজমার মালিক হতে পারতেন। হননি। ওঁর কাছেই শিখেছিলাম মাটির কোনো দাম নেই।

কচি ॥ কিন্তু বড়োদাদাজি ? উনি তো সাত পুরুষের সম্পত্তি করে গেছেন— সেটা বলো !

দি বেগম ॥ ভাসুরসাহেব বাপের এলেম কিছু পাননি। অন্য ধাতের মানুষ।

কচি ॥ হুঁ, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পথে বসিয়ে — আর তোমার নিজের মায়ের পেটের বোনটিও বাবা আচ্ছা !

দি বেগম ॥ ছিঃ কচি ! মু বন্ধ্ কর্। বলতে নেই।

Whose heart-strings are a lute

স্বাধীনবালা তার বাবা খুনীকে খুন করতে চায় এবং আমার কাছে একটা পিস্তল চাইতে এসেছিল ! এই কথাটা যখনই ভেবেছি, বুকের ভেতর কী একটা নড়ে উঠেছে। মেয়েরা কেন আমার কাছে নালিশ জানাতে আসে ভেবে পাইনি। কাল্লু সাতমারের বউ সিতারা বেগমও এক জ্যোৎস্না রাতে অন্য ভাষায় এমন একটা নালিশ তুলেছিল। কী আছে আমার মধ্যে, বুঝি না। যেন তারা ভাবে, এই অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন পৃথিবীকে অর্থপূর্ণ আর উদ্দেশ্যময় করার জন্য দু-একটা মানুষ দরকার। তাই হয়তো পিরবুজুর্গ-পয়গম্বর-সাধুসন্ত-মহাত্মা-নেতাদের দরকার হয়। কথাটা পরে খুঁটিয়ে ভেবে দেখেছি। দেবনারায়ণদার এই নয়া আবাদের প্রায় শুরু থেকে আমি আছি। প্রথম-প্রথম স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, এখানে যত-সব মানুষ এসে জুটেছে, বা জুটছে, তারা নিছক মাটির লোভে লোভী। ক্রমশ একটা আমূল রদবদল ঘটতে থাকল ওদের মধ্যে। মাটি পাওয়ার পর ওরা যেন এই বেঁচে থাকার — এই জীবনের এবং তার পারিপার্শ্বস্বরূপ এই পৃথিবীর ওপর কোনো একটা অর্থ আরোপ করতে চাইল। বাঁধ আর উঁচু ঢিবির ওপর দু বছরের মধ্যে যেসব বসতি গড়ে উঠল, দেবনারায়ণদা

সেগুলোর নাম রাখলেন কেশবপল্লী, শিবনাথপল্লী, দেবেন্দ্রপল্লী, বিজয়পল্লী, আনন্দপল্লী। এসব নাম কেন ? জিজ্ঞেস করলে দেবনারায়ণদা আমাকে দু ঘণ্টা অথবা তিন ঘণ্টা কিংবা চার ঘণ্টা ধরে নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের পন্থা, তারপর এই পথে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের পিদিম হাতে (যেহেতু পৃথিবী 'অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন') হেঁটে চলেছেন, তাঁদের নামগুলো জেনে রাখতে বললেন। শুধু বললেন না, কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেও দিলেও দিলেনঃ "কেশবচন্দ্র সেনের নামে কেশবপল্লী, শিবনাথ শাস্ত্রীর নামে শিবনাথপল্লী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে দেবেন্দ্রপল্লী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামে বিজয়পল্লী এবং আনন্দমোহন বসুর নামে আনন্দপল্লী। তারপর মিটিমিট হেসে বললেন, কিন্তু তুমি লক্ষ করছ নিশ্চয়, আমাদের আদি পথপ্রদর্শক ও পরম গুরু রাজা রামমোহন রায়ের নামে কোনো পল্লী স্থাপন করি নাই। বিস্মিত হয়ো না। নুপুর রেশমকুঠির নিকট অনাবাদি ত্রিশ বিঘা ডাঙ্গা জমি স্ট্যানলি সায়েবের কাছেই শীঘ্র বন্দোবস্ত নিচ্ছি। ওই স্থানে রামমোহনপল্লীর অঙ্কুরোদগম হবে। পাশেই বাদশাহি সড়ক। কাজেই একটা হাটও স্থাপন করব। এই ব্রহ্মপুরের কিছু সমস্যা আছে। স্থানটি নিম্নভূমি হওয়ায় বন্যার আশঙ্কা প্রবল। পশ্চিমে তিন ক্রোশ দূরে বাদশাহি সড়ক। তুমি জান, সড়ক জাতীয় সম্পদের তুল্য, যেহেতু অধিকসংখ্যক লোকালয় ও মনুষ্যগণের মধ্যে সড়ক যোগসূত্র স্থাপন করে। শফি, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। দেবনারায়ণদা কথায়-কথায় সংস্কৃত শ্লোক বা ফারসি বয়েৎ আওড়ান। কথার শেষে এই ফার্সি বয়েৎ মৃদুস্বরে আবৃত্তি করলেন ঃ

কিশ্‌তি শিকস্ত্‌ গাঁয়েম অ্যায় বাদ্‌-এ শুর্তা বর্‌খেজ
বাশদ্‌কে ওয়জ্‌ বিন্‌য়েম দিদার-এ আশনারা...

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহে পিরজাদা ! কিছু বুঝলে ? আস্তে বললাম, আমি ফারসি জানি না। দেবনারায়ণদা উদাত্তস্বরে বললেন, কবি হাফিজ বলছেন ঃ 'নৌকায় উঠে বসেছি। হে অনুকূল বায়ু ! প্রবাহিত হও। সেই প্রিয় বন্ধু দর্শন পেতে পারি যাতে।'

বাদশাহি সড়ক ! কথাটা যতবার শুনেছি, বারিচাচাজির সেই কালো ঘোড়াটার হ্রেষা আর খুরের শব্দে আক্রান্ত হয়েছি। ইচ্ছে করেছে, এখনই ছুটে যাই, ফিরে যাই মৌলাহাটে। মায়ের জন্য ছটফট করেছি। আয়মনি খালার জন্য মন কেমন করেছে। অথচ তারপর অনিবার্যভাবে বুকুর কথা মনে পড়েছে। অর্ধমানব অর্ধপশু এক উদ্ভট প্রাণীর কবলে হরিণের মতো কিশোরী। হোক না আমার সহোদর ভাই, ঘৃণা আমাকে তেতো কবে ফেলেছে। পালিয়ে যেতে পারেনি বুকু ? পারেনি তার মায়ের মতো ঝুলে পড়তে ?...এইসব চিন্তার মধ্যে একদিন স্বাধীনবালা এসে বলল, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন, শফিদা ?

একটু হেসে বললাম, কিছু না। তুমি—

থামলে যে ? কী ?

তুমি ইদানীং উপাসনাসভায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ কেন, স্বাধীন ?

দেবুজ্যাঠা বলেছিলেন কিছু ?

না। আমার চোখে পড়েছে।

তুমি আমার দিকে অত লক্ষ্য রাখ কেন ?

একটু চমকে ওর চোখের দিকে তাকালাম। বললাম, হয়তো আমার ভয় হয়, তুমি তোমার বাবার মতো একটা কিছু করে বসবে।

করতে তো ইচ্ছে করে। স্বাধীনবালা শক্ত মুখে বলল। তারপর চাপা শ্বাস ফেলল। দৃষ্টি দূরে রেখে ফের বলল, মায়ের এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। মা ঠাকুরদেবতা-ছেড়ে নিরাকার ভজনা করতে চায় না। পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই।

স্ট্যানলিকে খুন করার জন্য ?

স্ট্যানলিকে খুন করার জন্য।

হেসে ফেললাম ওর কথা শুনে। স্বাধীনবালা রাগ করে বলল, তুমি আমাকে কী ভাব ? আমি খুব সামান্য মেয়ে নই। বাবা বলতেন, আমার মধ্যে ছেলেদের স্বভাব আছে।

লক্ষ্য করেছি বটে !

এদিন আকাশ ছিল মেঘলা। ভাদ্র মাস। গুমোট গরম। ব্রহ্মোপাসনা-মন্দিরের পাশে খালের ধারে একটা বটতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম ! খালের ওপারে নতুন আবাদের মাঠে টুকরো-টুকরো সবুজ ধানখেতে একঝাঁক শাদা বক দাঁড়িয়ে ছিল। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হলে বটের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়ালাম। স্বাধীনবালা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজছিল। বলল, তুমি দেবুজ্যাঠাকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেছ কি ?

বললে নিশ্চয় টের পেতে। কিন্তু তুমি ভিজছ কেন ?

ইচ্ছে করছে।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমি মুসলমান বলে তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর স্বাধীন ?

স্বাধীনবালা চমকে উঠল। আস্তে বলল, হঠাৎ একথা তুমি ভাবলে কেন ? আশ্চর্য তো !

লক্ষ্য করেছি, তুমি সব সময় একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বল ! তা ছাড়া তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছ, তবু এখানে আসছ না।

স্বাধীনবালা এবার হাসল। ওর দুচোখে যেন কৌতুক ঝিলিক দিল। নির্লজ্জ ভঙ্গিতে বলে উঠল, মুসলমান বলে নয়। তোমাকে আমার কেন যেন ভয় করে।

বলেই সে হনহন করে চলে গেল। অবশ্য বৃষ্টিটা বাড়ছিল। সে মন্দিরের পেছন ঘুরে চাতালে উঠলে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। চোখ ঝলসে দিল বিদ্যুৎ। আবার মেঘ গর্জে উঠল। আমি গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। রাগে দুঃখে অভিমানে অস্থির। এই মেয়েটির মধ্যে সিতারার অনেকখানি আছে। কিন্তু সিতারাকে আমার ভালোবাসতে ইচ্ছে করত। স্বাধীনবালাকে ভালোবাসার কথা ভাবাও যায় না। ও হিন্দু আমি মুসলমান বলে নয়, কী একটা কঠিন আর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে বলে চিন্তা হয়। সেটা কি ওর পুরুষালি হাবভাবের জন্য ? সত্যি বলতে কী, ইন্দ্রাণীতে বেহুলা নদীর পারে জঙ্গলের ভেতর এক আদিম মেয়ে আসমা খাতুনের শরীর আমার পবিত্র রক্তে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, তার জ্বালা এখনও ঘোচেনি। অসংখ্যাসংখ্য মেয়ের পায়ের তলায় মাথা কুটতে ইচ্ছে করত, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা

করো, ক্ষমা করো ! আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে আব্বার মতো তাকিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বলতাম, মহান ফেরেশতাবৃন্দ ! আমাকে ক্ষমা করুন ! এই ব্রাহ্ম উপাসনামন্দিরে ভিড়ের মধ্যে বসে মনে মনে বলতাম, পরমেশ্বর ! আমাকে ক্ষমা করুন !

বৃষ্টি থেমে গেলে দেবনারায়ণদার ঘরে গেলাম। উনি বিছানায় রাশীকৃত ছড়ানো বই আর পত্রপত্রিকার মধ্যে বসে ছিলেন। মুখটা গম্ভীর। আমাকে দেখে বললেন, বসো শফি ! একটা আনন্দসংবাদ, গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাখানি আশা করি তুমি নিয়মিত পাঠ কর ?

বললাম, করি, ইন্ডিয়ান মিরর, বামাবোধিনীও পড়ি।

আমাব কথার ওপর দেবনারায়ণদা বললেন, তোমাকে সংস্কৃত সাহিত্যও পড়তে হবে।

পড়ছি। ইদানীং আমি লাইব্রেরিতেই দিন কাটাই।

ইংরাজি সাহিত্যও পড়ছ তো ? বিশেষ করে ইউরোপীয় দর্শন তোমার সম্যকভাবে পাঠ করা প্রয়োজন।

পডছি। মানে চেষ্টা করছি বুঝতে। শাস্ত্রীজী, ভূপতিদা এঁরা আমার শিক্ষক।

দেবনারায়ণদার গম্ভীর মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল হল। বললেন, এইবার পরবর্তী প্রকল্পনার কথা বলি। আগামী মাঘোৎসবে মহাপণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় ব্রহ্মপুরে পদধূলি দেবেন। তাঁর সঙ্গে আসবেন মৌলুবি আফতাবউদ্দিন আহমদ।

তিনি কে ?

তোমারই মতো আমাদিগেব এক মুসলমান ব্রাহ্ম ভ্রাতা। দেবনারায়ণদা আরও উজ্জ্বল মুখে বললেন, ওই সময় ব্রহ্মপুরের এই আশ্রমের পুনর্বিন্যাস ঘটাব খুলে বলি। ইংরাজি পুস্তকে সেমেটিক ধর্মসমূহের ইতিহাস পাঠ করে একটি তথ্য অবগত হলাম। ইহুদিগণের কৃষিজনপদকে বলা হয় কিবুৎস্। ইংরাজিতে বলে কমউন। কিছুকাল আগে কলিকাতাস্থ কলুটোলা স্ট্রীটে অনুরূপ একটি কমিউন ব্রাহ্মভ্রাতৃবৃন্দ স্থাপন করেছেন। কিন্তু নগর অপেক্ষা কৃষিজনপদেই এই ব্যবস্থা শিকড় পুঁততে সক্ষম হবে বেশি। কলুটোলার কমিউনটির নাম দেওয়া হয়েছে আশ্রম। আমরাও ব্রহ্মপুর আশ্রম — না, বরং 'ব্রহ্মপুর সমবায় আশ্রম' নাম দেব। কী বল ?

ভালোই তো !

উত্তেজনায় দেবনারায়ণদা আমার হাত ধরলেন। বসিয়ে দিয়ে বললেন, ব্রহ্মপুরে আমার ব্যবস্থাপনায় যে সকল ভূ-সম্পত্তি আছে, ব্রাহ্ম ভ্রাতাভগ্নীদের তাতে সমানাধিকার থাকবে। তাঁতবস্ত্র এবং অন্যান্য কুটির শিল্প গড়া হবে। সমস্ত কিছুর আয় সমবায় তহবিলে ন্যস্ত হবে। কারুর নিজস্ব কিছু থাকবে না। সকলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আশ্রম যোগাবে। একত্র রন্ধনশালা, একত্র খাদ্যপরিবেশন, বস্ত্রবণ্টন ঔষধাদিদান — বুঝেছ ?

হৃদয়নাথ শাস্ত্রী, ভূপতিরঞ্জন মিত্র, ব্রহ্মানন্দ মণ্ডল, গিয়াসুদ্দিন আহমদ প্রমুখ একটা দল কেউ ইংলিশ ছাতা, কেউ দেশী তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে এসে পড়লেন। নিস্কৃতি পাওয়া গেল। লম্বা বারান্দা দিয়ে আমার ঘরে গেলাম ভিজে কাপড় বদলাতে। লাইব্রেরির পাশে একটা স্বল্পপরিসর ঘর। একটি তক্তাপোশে

বিছানা। দেবনারায়ণদার দেখাদেখি বিছানায় বইপত্র ছড়িয়ে রাখি। দরজার তালা দেওয়ার দরকার হয় না। শেকল তোলা থাকে মাত্র। ঘরের দরজা খোলা। মেঘবৃষ্টির দরুন ভেতরটা আবছা। একটু অবাক হলেও ব্যস্ত হইনি। চুরি করার মতো কিছু নেই আমার ঘরে।

কিন্তু চমকে উঠতে হল। জানালার পাশে বসে স্বাধীনবালা বৃষ্টি দেখছে!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে ঘুরে বলল, নিজের ভয় ভেঙে দিতে ট্রেসপাস করলাম! ইংরিজি বইয়ে পড়েছি 'ট্রেসপাসার্‌স উইল বি প্রসিকিউটেড।' দেখা যাক।

গম্ভীর হয়ে বললাম, তুমি আমাকে যেমন, তেমনি নিজেকেও বিপদে ফেলতে চাও, স্বাধীন! এটা খুব বাড়াবাড়ি।

স্বাধীনবালা পালটা চটে গিয়ে বলল, আমি তোমার প্রেমে পড়িনি। আমার সব সময় মনে থাকে, তুমি ব্রাহ্ম হও, কী যাই হও, তুমি মুসলমান। আর আমিও হিন্দু।

বেশ তো! তাহলে এভাবে মুসলমানের ঘরে কেন ঢুকেছে?

ওই যে বললাম, নিজের ভয় ভাঙাতে।

এটা খুব বিপজ্জনক খেলা, স্বাধীন!

বলে আমি লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ালাম। স্বাধীনবালা আস্তে ডাকল, শফিদা! শোনো, কথা আছে।

বলো!

তুমি হাজারিলালকে চেন?

হ্যাঁ।

তুমি নিশ্চয় জান না ওর নাম হাজারিলাল নয়?

বলো কী!

কাউকে বলবে না কিন্তু। ওর আসল নাম হবিনারায়ণ ত্রিবেদী। ও ব্রাহ্মণ। এখানে হাজারিলাল নামে হিন্দুস্থানী সেজে আছে। স্বাধীনবালা আরও চাপা স্বরে বলল, হরিদা জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। ওর কাছে পিস্তল আছে। কাউকে বোলো না। আর শোনো, হরিদা বলেছে, ওর পায়ে চোট লেগেছে। খুঁড়িয়ে হাটে, দেখনি?

আবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। বললাম, হঠাৎ এসব কথা আমাকে বলতে এলে কেন?

হরিদা স্ট্যানলিকে মারবে। কিন্তু সঙ্গে একজন সাহসী লোক চায়।

একটু হেসে বললাম, তুমি তো আছ।

না। একজন পুরুষমানুষ চাই ওর। আমি ওকে তোমাব কথা বলেছি। সন্ধ্যায় যখন সবাই মন্দিরে যাবে, তুমি ঘরে থেকো। ওকে ডেকে আনব। থাকবে কিন্তু।

স্বাধীনবালা চলে গেল। ভাগ্যিস বারান্দা এবং অন্য কোথাও এসময় কেউ ছিল না। চোখে পড়লে কী ভাবত, জানি। কিছুক্ষণের জন্য একটা দুর্ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। সত্যি বলতে কী, এখানে আমাবও থাকা হাজাবিলালের মতো থাকা। একজন ফেরারির অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন। আসলে আমি একটা

উদ্দেশ্যহীন জীবন থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। দেবনারায়ণ রায়ের আশ্রয় আর সাহচর্যে দিনেদিনে আমার ভেতর একটা রূপান্তার ঘটতে শুরু করেছিল। মনে হচ্ছিল, জীবনের কোনো একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে — যা বুঝে ওঠার জন্য একটা বয়স দরকার। দরকার একটা অনুকূল পরিবেশ। সেই বয়স আর পরিবেশ এতদিনে পেয়ে গেছি। আবছা টের পাচ্ছি দেবনারায়ণদা যাকে 'কর্মযজ্ঞ' বলে অভিহিত করেন, তার মধ্যে 'আনন্দের' স্বরূপ এবং 'অব্যক্তের ব্যক্ত' হওয়ার ব্যাপার আছে। আর কী আশ্চর্য মিল ঈশোপনিষদ গ্রন্থের এই শ্লোকের সঙ্গে মুসলমানদের নামাজের সঙ্গে উচ্চারিত দোয়াটিতে, আব্বা যার একই ব্যাখ্যা করতেন ঃ

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং...

না ! আমি ধার্মিক নই। ব্রাহ্ম মুসলমান নাই। মুসলমানও নই আর। বারিচাচাজি আমার মাথায় সেই যে কবে 'নেচার' ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তাই আমাকে গিলে খেয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় নাকি ছেলেবেলাতেই 'পরম সত্য' টের পান। আমিও কি পেয়েছিলাম ? সেই যেদিন উলুশরার মাঠে গাড়ির সারির পেছনে আসতে-আসতে একলা হয়ে গেলাম, আর তৃণভূমিতে প্রকৃতির রহস্যময় সংগীত শুনতে পেলাম ঃ

Whose heart-strings are a lute...

কেউ ফিসিয়ে উঠল, শফিদা ! হরিদা আসছে ! আবছা আলো-আঁধারে মিলিয়ে গেল একটি মেয়ে। মন্দিরের দিক থেকে দেবনারায়ণদার গম্ভীর গলায় বেদমন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে। বিলিতি বাতি জ্বলছে। দরজার সামনে আবছা একটা মূর্তি এসে পরিচিত গলায় বলল, সেলাম শফিসাব !

হাজারিলালকে একটু সন্দেহের চোখে যে না দেখতাম, এমন নয়। সে থাকে কেশবপল্লীতে। তার ভাঙা হিন্দুস্থানী কথাবার্তায় দু-একটা ভদ্রলোকসুলভ শব্দও শুনেছি। কিংবা রহস্যময় তার একলা থাকার স্বভাব। দেখা হলেই ধান বা গমের খেত থেকে সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছে, সেলাম শফিসাব !

সে কিনা এক হরিনারায়ণ ত্রিবেদী ! শুনেছি ত্রিবেদীরা নাকি আসলে পশ্চিমে বামুন ! বাঙলামুলুকে তারা চলে এসেছে। হ্যাঁ, হাজারিলালের হিন্দুস্থানীতে কথাবার্তা বলার হক আছে, সে হরিনারায়ণ ত্রিবেদী যখন। বললাম, আসুন, দাদা !

হরিনারায়ণ ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে বসলেন। বয়সে আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়োই হবেন। একটু চুপচাপ থাকার পর বললেন, আপনি আমার পরিচয় জেনেছেন। আমিও কিন্তু আপনার পরিচয় জেনেছি। তবে আমার এভাবে লুকিয়ে থাকার একটা উদ্দেশ্য আছে। আপনার কী উদ্দেশ্য ভাই ?

চমকে উঠেছিলাম। বললাম, আমার পরিচয় তো সবাই জানে। আমি এক পিরসাহেবের ছেলে, সে তো সবাই জানে।

হরিবাবু একটু হাসলেন। বললেন, এখন যদি তুমি বলি, রাগ করবেন ? আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ।

খুশি হয়ে বললাম, নিঃসংকোচে তুমি বলতে পারেন। আমিও আপনাকে হরিদা বলব।

তুমি কৃষ্ণপুরে নাম শুনেছ ?

না। কেন ?

কৃষ্ণপুরের জমিদার অনন্তনারায়ণ ত্রিবেদী আমার বাবা। আমার বোন রত্নময়ীকে নাকি ভূতে বা জিনে পেয়েছে। নায়েব গোবিন্দরাম সিংহের সঙ্গে দুমাস আগে দৈবাৎ আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ। কাজেই আমার কথা গোপন রাখবেন বলে বিশ্বাস করি।

হরিবাবু চাপা শ্বাস ছেড়ে ফের বললেন, আমি পিতৃদ্রোহী — নানা কারণে। আমার পিতৃদেব ইংরেজের পা-চাটা কুকুর। যাই হোক, গোবিন্দদার কাছে খবর পেলাম, রত্নময়ীকে নিয়ে উনি মৌলাহাটে এক পিরসাহেবের কাছে গিয়েছিলেন। সেই পিরসাহেব কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দদাকে বলেছেন, তাঁর ছোটো ছেলে শফি লালবাগ টাউনে লেখাপড়া করত। তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি তাঁর অনুগত জিনদের খুঁজতে পাঠিয়েছেন—

হাসতে-হাসতে বললাম, তারপর ?

হরিবাবুও হাসছিলেন। বললেন, তবু গোবিন্দদাকে তিনি অনুরোধ করেছেন, যদি দৈবাৎ শফির খোঁজ কোথাও পান, তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

হাসি থেমে গেল আমার। আস্তে বললাম, আপনি গোবিন্দবাবুকে কিছু বলেছেন ?

নাঃ। হরিবাবু জোর দিয়ে বললেন। আমি একজন বিপ্লবী। কিছু নীতি মেনে চলি। স্বাধীনের বাবা যামিনী মজুমদার ছিলেন আমার দীক্ষাগুরু।...এক কাজ করা যাক। এখানে কথা বলা ঠিক নয়। চলো, আমরা মাঠের দিকে যাই।

দুজনে ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে বাঁশপাতার গেট খুলে একটা পোড়ো জমিতে পৌঁছুলাম। তারপর বাঁধে গিয়ে দেখলাম, সারাদিনের বৃষ্টিতে কাদা জমেছে। হরিবাবু বললেন, আমার ডেরায় যাওয়া যাক বরং।

বাঁধের পথে কিছুদূর চলার পর কেশবপল্লী। বাঁধের একদিকে টুকরো-টুকরো ঢিবির ওপর মাটি বা ছিটেবেড়ার ঘর। কোনো-কোনো ঘরের দাওয়ায় আলো জুগজুগ করছিল। চাপা গলায় লোকেরা কথা বলছিল। কুকুর ডাকতে থাকল। আকাশে সামান্য মেঘ। মাঝে-মাঝে চাঁদ বেরিয়ে পড়ছে। লক্ষকোটি পোকামাকড় ডাকছে। এক আশ্চর্য অনুভূতি জেগে উঠল। সত্যিই 'এত প্রাণ এত গান আছে ভুবনে' ! দেবনারায়ণদার 'পরমা প্রকৃতি'র অস্তিত্ব শুধু বীজের অঙ্কুরোদগমে, শস্যের বেড়ে ওঠায়, ফুলের প্রস্ফুটনে, দিন-রাত্রি-মাস-ঋতুচক্র-আবর্তনে সীমাবদ্ধ নয়, প্রাণের চিৎকারেও তার স্পন্দন। কেন ওই চিৎকার ? কিসের ডাকাডাকি ? হরিবাবু বললেন, এই আমার ডেরা। একটু দাঁড়াও। লণ্ঠন জ্বালি। পা ধুতে হবে।

ছিটেবেড়ার ঘরের ভেতর একটি খাটিয়ায় জীর্ণ খেজুরতালাই বিছানো আছে। একখানা তুলোর কম্বল ভাঁজ করা আছে নোংরা বালিশের ওপর। কোনার দিকে মাটির হাঁড়ি, সরা, একটি লোহার ছোট্ট কড়াই — এসব জিনিস। একটি কোদালের ওপর আলো পড়ে ঝকমক করছিল। কৃষ্ণপুরের জমিদারপুত্রের এই জীবন আমার ভেতর দিকে নাড়া দিচ্ছিল।

তুমি কিছু খাও, ভাই! তুমি আমার অতিথি।

হরিবাবু কথা শুনে দ্রুত বললাম, না। এখন আমার খিদে নেই।

হরিবাবু ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবছিলেন। একটু পরে বললেন, তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হবে না। কাজের কথাটা সেরে নিই।

আব্বার সংবাদ জানতে আগ্রহ ছিল। তাই একটু হেসে বললাম, আপনার বোনের জিনটার কী অবস্থা ?

হরিবাবুও হেসে ফেললেন। তুমি কি বিশ্বাস কর এসবে ?

কী জানি ! তবে বাবার অনেক ব্যাপার দেখেছি। রহস্যময় মনে হয়েছে।

রত্ন নাকি তোমার বাবার সঙ্গে আরবি ভাষায় তর্কাতর্কি করেছে — গোবিন্দদা বলছিলেন। প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল ওখানে। তিনদিন চেষ্টার পর নাকি জিনটা পালিয়ে গেছে। হরিবাবু হঠাৎ থেমে লণ্ঠনের দম কমিয়ে দিলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে কাউকে বললেন, কৌন বা ?

কেউ নিচের জমি থেকে সাড়া দিল, আমি সুধন্য, হাজারিদা।

হরিবাবু বললেন, সুধন্য ? ক্যা বে ? কৌন কাম করছিস তু ?

মাছলি — মাছ ধরছি হাজারিদা ! 'বিত্তি' পেতেছিলাম, দেখি মাছ পড়ল নাকি।

ঠিক হ্যায় !

হরিবাবু ভেতরে ঢুকে বললেন, এখানে আসার পর আমার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রখর হয়েছে। উপরন্তু ষষ্ঠেন্দ্রিয় লাভ করেছি। অন্ধকারের প্রাণীদের মতো সবকিছু দেখতে পাই। শুনতে পাই। জানতে পারি কে শত্রু কে মিত্র।

সুধন্যকে আমি চিনি।

চিনবে। কে না চেনে ওকে ? হরিবাবু বসে বললেন। ছেলেটা প্রাণীদের মতোই প্রকৃতিচর। ওর একটা গুণের কথা জান কি ? ও অসাধারণ গান গায়। যে গ্রামে ওর বাড়ি ছিল, সেখানে নাকি বেহুলা-লক্ষিন্দরের পালায় বেহুলা সাজত। দেবনারায়ণবাবুর কানে গেলে ওর একটা সদগতি হবে নিশ্চয়। কিন্তু তাহলে ওকে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে-গাইতে মারা পড়তে হবে। অর্থাৎ ওর মাঠেঘাটে ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। আচার্যদেবের হাতে বন্দী হতে হবে। হরিবাবু খিকখিক করে হাসতে লাগলেন।...

রক্ততিলক

'বাং ১২৯৯ সনের শুভ ১০ই বৈশাখ সন্ধ্যারাত্রে আমার প্রথম নরহত্যা। বহু বৎসর পরে জানিতে পারি, নরাধম পশু পান্না পেশোয়ারির পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। একখণ্ড ইষ্টক বস্তুপিণ্ড মাত্র। উহা স্থাবর এবং অনড়। তুমি মনুষ্য। অস্থাবর ও গতিশীল। তুমি বস্তুপিণ্ডকে তোমার গতি দান করিতে সমর্থ। তুমি জান না, তোমার মধ্যে প্রকৃতি অসীম গতিশক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে। তুমি জীবনে ইহার তিলার্ধ কাজে লাগাইতে পার কি না, দেখ। অবশ্যই পারিবে।...

'আর দেখ, প্রকৃতিতে সকল ঘটনাই উদ্দেশ্যপূর্ণ। তাই রক্ত ও অশ্রুর পৃথক-পৃথক মূল্য নাই। মূল্যবিচারের তৌলদণ্ড নাই। উহা মনুষ্যহৃদয়ে স্থাপিত। যে-কোনও

ঘটনার দুইটি দিক আছে। একটি বিষয়গত, অপরটি বিষয়ীগত। দ্বিতীয় দিক হইতে দেখিলেই দুঃখ ত্রাস অনুতাপ প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিক্রিয়া জাগিবে। প্রথম দিক হইতে হইলে বোধ হইবে, নিশ্চয় ইহা উদ্দেশ্যমূলক। তোমার আগোচর কোনও হিতের নিমিত্ত ঘটিয়াছে।...

'আমার দ্বিতীয় নরহত্যা বাং ১৩০২ সনের শুভ দোসরা আশ্বিন বৈকালে। নুরপুর বানুককুঠিয়াল রিচার্ড স্ট্যানলি ওই দিবস ঘোড়া ছুটাইয়া দেবনারায়ণ রায়ের সন্নিধানে উপস্থিত হয়। স্বাধীনবালা হরিনারায়ণ এবং আমাকে সম্বাদ দেয়। হরিনারায়ণ এবং আমি যখন জঙ্গলের ভিতর দিয়া রওয়ানা হইতেছি, পশ্চাতে পদধ্বনি শুনি। ঘুরিয়া দেখি, স্বাধীনবালা দৌড়াইয়া আসিতেছে। তাহাকে রণরঙ্গিনী অথবা উন্মাদিনী বোধ হইতেছিল। সে বলিল, দাড়াও। তোমাদের জয়তিলক পরাইয়া দিই। তাহার হাতে একটি ছুরিকা ছিল। সে তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী চিরিয়া আমাদের দুইজনের ললাটে রক্তচিহ্ন আঁকিয়া কহিল, বন্দেমাতরম্! আমরা কহিলাম, বন্দেমাতরম্। সে দাঁড়াইয়া রহিল। যতদূর যাই, মাঝে মাঝে ঘুরিয়া দেখি, সে দাঁড়াইয়া আছে। হরিনারায়ণ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, ওই নির্বোধ যুবতী সর্ব্বনাশ বাধাইয়া ছাড়িবে।...

'নুরপুর বানুকের উদ্ধর্ত সমুচ্চ ইষ্টকস্তম্ভটি বহুদূর হইতে দেখা যায়। শুনিয়াছি, উহা ষাট-সত্তর ফুট উচ্চ। কিছুদূরে নিম্নভূমিতে আমরা কাশবনের মধ্যে আত্মগোপন করিলাম। পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড আলিপথ। উহা স্থানীয় লোকের মতে, 'কেদাররাজার আইল।' উহা নাকি একরাত্রে ওই রাজার উপাস্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডী কর্তৃক নির্ম্মিত। স্ট্যানলি এই আলিপথে ফিরিবে। এতদঞ্চলে সে টাংলিসাহেব নামে পরিচিত ছিল। শুনা যায়, ইংরাজি ১৭৪৪ সনে যে মেজর মনরো আড়াইশত বিদ্রোহী সিপাহীকে কামানের নলের মুখে বাঁধিয়া তোপের আগুনে উড়াইয়া দেয় (সেইটি ভারতবর্ষের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ), এই শয়তান স্ট্যানলি তাহারই বংশধর। ওই সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী লোক ছিলেন। ইংরাজি ১৮৫৭ সনে মহাবিদ্রোহের সময় স্ট্যানলির পিতা এতদঞ্চল হইতে একশত দুর্বৃত্ত দস্যু সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিতে বহরমপুরের ব্যারাকে উপস্থিত হয়। ওই মহাবিদ্রোহে আমার পিতামহ সিপাহীদের সহযোগিতা করায় তাঁকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইসব কথা আমি পিতামহী মরহুমা কামবুন্নিসা বেগমের কাছে যখন শ্রবণ করি, তখন নিতান্তই বালক। সম্যক কিছু বুঝি নাই। এক্ষণে সেই কাহিনী মনে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। হরিনারায়ণ আমাকে একটি তলোয়ার দিয়াছিলেন। হরিণমারার বড়োগাজির তলোয়ারখানির ন্যায় সুদৃশ্য নহে। কিন্তু শান দিয়া অত্যন্ত ক্ষুরধার করা হইয়াছে।...

'হঠাৎ হরিনারায়ণ কহিলেন, এক কাজ করা যাউক। আলিপথে যতখানি সম্ভব গভীর করিয়া গর্ত্ত খনন কবি। শীঘ্র আইস। শালার আসিবার সময় হইয়াছে। তলোয়ার দ্বারা আমি লম্বালম্বি গর্ত্ত খনন করিলাম। হরিনারায়ণ মাটি তুলিয়া সাহায্য করিলেন। কার্য্য প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক সম্পন্ন হইয়াছে, এমন সময় দিগন্তে অশ্বারোহী মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা বিদ্যুৎগতিতে নিম্নস্থ কাশবনে আত্মগোপন করিলাম। সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছিল

হরিনারায়ণ পিস্তলহাতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া আমি তলোয়ার বাগাইয়া ধরিলাম। স্ট্যানলির ঘোড়া গর্তের কয়েকহস্ত দূরে থমকিয়া দুই পা উর্ধ্বে তুলিল। সাহেব লাগাম টানিয়া ধরিয়াছিল। পরমুহূর্তে সে একটা কিছু অনুমান করিয়া দ্রুত পিস্তল বাহির করিল। অমনি হরিনারায়ণ 'বন্দেমাতরম্' গর্জ্জন করিয়া তাঁহার পিস্তলের ঘোড়া টানিলেন। প্রথম গুলি সাহেবের কাঁধে, দ্বিতীয় গুলি ফসকাইয়া গেল। কিন্তু প্রথম গুলিতেই সায়েব ধরাশায়ী হইল। ঘোড়াটি সভয়ে চিত্রার্পিত দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব কাত হইয়া গর্ত্তে পড়িয়াছিল। পিস্তল ব্যবহারের পূর্বেই আমি দুইহাতে তলোয়ার ধরিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিলাম। উপর্যুপরি আঘাতে সে নিশ্চল হইল। তথাপি আমার রক্তের নেশা ঘুচিল না। তাহার সর্বাঙ্গে তলোয়ারের কোপ মারিতে থাকিলাম। হরিনারায়ণ পিছন হইতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, শফি! শফি! লোক আসিতেছে। আমি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। হরিনারায়ণ স্ট্যানলির পিস্তলটি কুড়াইয়া লইলেন। কহিলেন, আইস! কাশবনের ভিতর দিয়া পলায়ন করি। আমার জামা-কাপড়ে স্ট্যানলির রক্ত। কিয়দ্দুরে গিয়া বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তখন আমার দেহ মৃতমনুষ্যবৎ, অনুভূতিহীন। শুধু ললাটে রক্ততিলক চড়চড় করিতেছে।...

'আর সেই মুহূর্তে একটি কথা ভাবিয়া শিহরিত হইলাম। সিতারার জন্য পান্না পোশোয়ারিকে আঘাত করিয়াছিলাম। এইবার স্বাধীনবালার জন্য স্ট্যানলিকে আঘাত করিলাম! নিয়তি বলিয়া সত্যই কি কিছু আছে?...'

যার হৃদয়তন্ত্রী একটি বীণা

কচি ॥ দাদিমা, ঘুমোলে?

দিলরুখ বেগম ॥ না ভাই। পোড়াচোখে নিঁদ নেই। কবরে গিয়ে আরামে নিঁদ যাব।

কচি ॥ ফের আজেবাজে কথা? শোনো, আজ কামাল-স্যারের কাছে ইংরিজি পদ্যটা বুঝে নিয়েছি। 'Whose heart-strings are a lute'! যার হৃদয়তন্ত্রী একটি বীণা। বুঝলে কিছু?

দি বেগম ॥ আমি কী বুঝব? আমি কি তোর মতো লেখাপড়া জানি?

কচি ॥ ছোটোদাদাজি একটা মেয়েকে ভালোবাসতেন। হিন্দু মেয়েকে। তা জান তো?

দি বেগম ॥ কচি, চুপ কর। ওসব কথা থাক।

কচি ॥ সত্যি! ছোটোদাদাজির একটা খাতা পেয়েছি সিন্দুকে।

দি বেগম ॥ ওঁর মতন বেদিল বেরহম (হৃদয়হীন নির্দয়) মানুষ কেউ ছিল না রে!

কচি ॥ কী বল, বুঝি না। যারা মানুষ খুন করে, তারা বুঝি কাউকে ভালোবাসতে পারে না?

দি বেগম ॥ ওঁর জানে মুহব্বত বলে কিছু ছিল না। তুই চুপ কর।

কচি ॥ তুমি চটে যাচ্ছ কেন? আশ্চর্য তো!

দি বেগম ॥ রাত হয়েছে, ঘুমো।
কচি ॥ দাদিমা! সেই রাখালছেলের গপ্পটা বলনি কিন্তু। এখন বলো না!
দি বেগম ॥ আমার শ্বশুরসাহেবও — বলতে নেই, খুব বেরহম ছিলেন।
কচি ॥ সে কী! কেন? ও দাদিমা, কেন ওকথা বলছ?
দি বেগম ॥ ছেলেটার একটা দোষ, বাঁশি বাজাত। বাঁশি শুনলে গোনাহ্। তাই—
কচি ॥ Whose heart-strings are a lute! গপ্পটা বলো।

বেদা'য়াতে সাইয়্যেয়া

মেজবউবিবি দিলরুখ ওরফে বুকু বেগমের গর্ভজাত শিশুটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন সাইদা বেগম। তাঁর বুজুর্গ স্বামী এই শিশুর জন্মের সময় ইসলামি কানুন অনুসারে তার দুই কানে আজান দিতে আসেননি, অথচ সাতদিন পরে খৎনা (circumcision) এবং আকিকা (নামকরণ) অনুষ্ঠানে তাঁর খিদমতগার আলি বখ্‌শ্ মারফত একটুকরো কাগজ পাঠান। ওতে বাঙলায় বড়ো-বড়ো হরফে 'কামরুজ্জামান' শব্দটি লেখা ছিল। সাইদা কাগজটি পড়েই ছিঁড়ে ফেলেন। দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বলেন, আয়মনি, আলি বখ্‌শ্‌কে বলে দাও, বাচ্চার নাম রাখা হয়েছে রফিকুজ্জামান। আলি বখ্‌শ্ বিবিসাহেবার উদ্দেশে সালাম জানিয়ে এবাদতখানায় ফিরে যায়। আর আয়মনি পা ছড়িয়ে বসে শিশুটিকে তেল-হলুদ মাখাতে-মাখাতে সুর ধরে বলতে থাকে, 'সোনামানিক রফি রে। বড়ো কবে হবি রে। চাচা ঢুঁড়তে যাবি রে। রফির চাচা শফি রে...' গ্রাম্য মেয়েদের এই রীতি প্রথাসিদ্ধ। তারা অনর্গল অনুরূপ বাক্যনির্মাণে পটু। এভাবেই গ্রাম্য ছড়াগুলি অসম্বদ্ধতা থেকে বিমূর্ত সম্বদ্ধতায় উত্তীর্ণ হয়। আয়মনি শিশুটিকে কেন্দ্র করে ছড়া গেয়ে-গেয়ে একটি শিল্পবৃত্ত গড়ে তুলত, যার মধ্যে এক বন্ধ্যা স্বামী-ত্যাগিনী ও সাহসিকার জোরালো স্নেহ ছিল, হৃদয়-নিঃসৃত কোমলতা ছিল। আয়মনি শিশুটিকে পেয়ে আত্মভোলা। কিন্তু সাইদা বেগম সবসময় পরীক্ষা করে দেখতেন, শিশুটির মধ্যে তার প্রতিবন্ধী জনকের কোনো বৈলক্ষণ্য আছে কি-না। মনিরুজ্জামানের শৈশবকে মিলিয়ে দেখতেন সাইদা। অবশেষে নিঃসংশয় হন, শিশুটির মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক স্বাভাবিকতা আছে। এরপর থেকে আত্মঘাতিনী বেহান দরিয়াবানুর

স্মৃতিকথায় তিনি তাঁর সংসার জুড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকেন। বুকু বিব্রত বোধ করত। মায়ের স্মৃতি তার অসহ্য ছিল। সাইদা কান্নাজড়ানো স্বরে বলতেন, বেহানসাহেবার জন্য হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে খোদাকে বলব, আমার আদ্ধেক নেকির (পুণ্য) বদলে ওকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! সাইদা একথা বলতেন এবং আন্তরিক এই প্রতিশ্রুতির কারণ, আত্মঘাতীদের জন্য সুনিশ্চিত দোজখ। বুকুও নামাজ ও কোরানপাঠের পর মনে-মনে তার আত্মঘাতিনী মায়ের জন্য নিজের পুণ্যের অর্ধাংশ দান করতে চাইত। শিশুটিব প্রতি তার যেন কিছু উদাসীনতা ছিল। শাশুড়ি বা আয়মনি তাড়া না দিলে ক্রন্দনরত রফিকে সে বুকের দুধ খাওয়াতে চাইত না। সাইদা ভাবতেন, মেজবউবিবির বালিকাদশাই এর কারণ। তাঁর জীবনেও এমন ঘটেছিল। শাশুড়ি কামরুন্নিসা বেগমই তাঁর তিনপুত্রকে লালনপালন করেছিলেন। আয়মনি বলত, ত্রিমে-ত্রিমে সব জানবে গো! এই সেদিন ন্যাংটো মেয়ে দেখেছি দুই বহিনকে। এখন দেখছি বেটার মা। শিশুটির বয়স ছ মাস হলে সাইদা আর আয়মনি একটি গোপনীয় কাজ করেন। গভীর রাত্রে শিশুর মঙ্গলকামনায় পরিত্যক্ত খোঁড়া পিরের মাজারে সিন্নি দিতে যান। শিশুটিকে নিয়েই যান। তার শরীরে ঘুমন্ত অবস্থায় মাজারের ধুলো মাখিয়ে দেন। গোপনীয়তার কারণ, টের পেলে ফরাজি-মৌলাহাটে ছিছিক্কার পড়ে যাবে! ওঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বুকু খিড়কির দরজায় উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু গ্রামজীবনে কোনোকিছু গোপন থাকে না, এটাই আশ্চর্য! গ্রাম প্রকৃতির করায়ত্ত এবং প্রকৃতি সহস্রলোচন সত্তা — এ ছাড়া পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে না। কীভাবে রটে যায়, ফরাজি ধর্মগুরুর বিবিসাহেবা প্রাচীন যুগের এক সুফি পিরের দরগায় সিন্নি দিয়েছেন। প্রত্যূষে নতুন মাটির মালসায় রাখা কিছু বাতাসা, খই এবং মাটির ঘোড়া (আয়মনির ঘরে প্রাক-ফরাজি আমলের এই খুদে ঘোড়াগুলি ছিল) অনেকের চোখে পড়ে। হই-চই শুরু হয়ে যায়। হুজুরের কাছে খবর যায়। পরবর্তী জুম্মাবারে হুজুর বহুদিন পরে মসজিদে গমন করেন। এদেশের মসজিদ পূর্বমুখী। পশ্চিমদেয়ালের মাঝখানে একটি ত্রিকোণ কোটরসদৃশ খিলান থাকে, যার ঊর্ধ্বাংশ ফুলের পাপড়ির মতো। কোটরে কাঠের একটি মিম্বার (বেদি) থাকে, যার তিনটি ছোট্ট ধাপ আছে। ফরজ (আবশ্যিক) নমাজের পর নমাজ-পরিচালক ইমাম (যিনি খতিব নামেও অভিহিত হন এবং এই কাজটি যে-কোনো ইমানদার মুসলিমই করার অধিকারী) ওই মিমবারে বসে ধাপে পা রেখে 'খোৎবা' (শাস্ত্রীয় ভাষণ) পাঠ এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। তো সেই জুম্মাবারে হুজুর বদিউজ্জামান স্বয়ং খোৎবা-পাঠের সময় কেতাবটি হঠাৎ বন্ধ রেখে আগেকার বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বরে বলে ওঠেন, মোনাফেক (ভ্রান্ত মুসলিম — যোগরূঢ়ার্থে) কলঙ্ক-রটনাকারীদের প্রতি আল্লাহের লানৎ (অভিশাপ)! যারা যা দেখেছে, তারা শয়তানেরই কারবার দেখেছে। শয়তান আউরতের চেহারা ধরতে পারে। শয়তানের সাগরেদ কালা জিনেদের ডেরা ওই খোঁড়া পিরের মাজার। নাউজুবিল্লাহ্! ওই পিরেরা নিজেদের সুফি নামে জাহির করত। ওরা ছিল ভণ্ড। ওদের একজন মনসুর হাল্লাজ বলত, 'আনাল্ হক! আমিই খোদা।' তওবা নাউজুবিল্লাহ্! হুজুরের এই বাণী উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে সারা মসজিদ, মসজিদ থেকে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণ থেকে সড়ক পর্যন্ত প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি ওঠে, তওবা নাউজুবিল্লাহ! আর সেই জুম্মাবারে নামাজের পর ফরাজি মুসলিমরা কোদাল আর

গাঁইতি হাতে ছুটে যায়। খোঁড়া পিরের মাজারটি ব্রাহ্মণী নদীর পিরের সাঁকোর মতোই ধ্বংস করা হয়। এমন-কি কাঠ-মল্লিকার পুষ্পবতী গাছটিও টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। শুধু বটগাছটি তার বিশালতাহেতু অক্ষত থাকে। কথিত আছে, ওই জুম্মাবারে মানুষের চেহারায় বিস্তর শাদা জিনও উপস্থিত ছিল। অদূরে অবস্থিত হানাফিগ্রাম অছিপুরের লোকেরা যদি বাধা দিতে আসত, শাদা জিনেরা তাদের আসমানে ছুড়ে মারত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ঘটনার পর আরেকটি ঘটনা ঘটে, যা আরও বিধ্বংসী শুধু নয়, অকল্পনীয়ও বটে! তবে প্রাসঙ্গিক একটি ক্ষুদ্র তথ্য আছে। খোঁড়া পিরের মাজার ধ্বংসের দিন সন্ধ্যার পরে হুজুরের পবিত্র হাতে লেখা এক টুকরো পবিত্র কাগজ আলি বখ্‌শ্ দিয়ে যায় সাইদাকে আয়মনি সেটি সাইদাকে দিলে তিনি ছুড়ে ফেলেন। বউবিবি বুকু বেগম সেটি কুড়িয়ে নেয়। ওতে লেখা ছিলঃ "বেদা'যাতে সাইয়্যেয়া অতিশয় গোনাহের কাজ। সেই কাজগুলি হইল ঃ কবরে সিন্নি মানত, কবরে নামাজ পাঠ, মাজার অথবা দরগাহ্ নির্মাণ। আমার ইন্তেকাল হইলে যেন এইগুলি না ঘটে।"...

হাফিজ ইন খির্কা কি দারি তু বিবিনি ফরদা
কি চি জুন্নার জে জের-অশ্ ব জফা বিকুশায়েদ

পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে ছোটোগাজির কেতাবখানি পড়ছিলাম। 'দিওয়ানে হাফিজ' আমাকে চিন্তারূপী শয়তানের হাত থেকে মাঝে-মাঝে রক্ষা করে। আজ দিনভর উপদ্রব গেছে। উপদ্রবই বলা উচিত। বড়োগাজির সঙ্গে একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক এসেছিলেন। বড়োগাজি তাঁর পরিচয় দিলেন মৌলবি আফতাবুদ্দিন আহমদ বলে। মৌলবি লোকটি নাকি এতখানি জানেন, যা তামাম হিন্দুস্তানে কোনো ব্রাহ্মণপণ্ডিতও জানেন না। আমি বললাম, মারহাবা! আংরেজি শিখে নাসারা আংরেজকে বরবাদ করতে হবে। তেমনি বুত্-পরস্ত্ (পৌত্তলিক) এলেম শিখে হিঁদুদের ভুল ঘোচাতে হবে। আফতাবুদ্দিনকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বললেন, জনাবে হজরত! খ্রীস্টানদের মতোই হিন্দুরা পথভ্রষ্ট। বুত্-পরস্তি অনার্যদের ধর্ম। প্রকৃত হিন্দুধর্ম আর্যধর্ম। সেই ধর্মের কেতাবের নাম বেদ। বেদে বলা হয়েছে, পরম স্রষ্টা নিরাকার। তিনি একজন মাত্র, ইসলামের মূলতত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক মূলতত্ত্বের এতটুকু ফারাক নেই। উপনিষদ নামে কেতাব আছে। তা বেদের ব্যাখ্যা। তাই এগুলানকে বেদাঙ্গ বলা হয়। আপনি কি রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুনেছেন? তিনি ইসলামি এলেমে সু-পণ্ডিত ছিলেন। বড়োগাজি তাঁর কথার মধ্যে বলে উঠলেন, রাজা ব্রাহ্মধর্ম নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে গেছেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মুসলমানদের বহু বিষয়ে মিল আছে। এই সময় আমি বললাম, দেখুন মৌলবিসাহেব! আল্লাহ পাক মনুষ্যগণের পথ-প্রদর্শনের জন্য এক লক্ষ সত্তর হাজার পয়গম্বর পাঠিয়েছেন দুনিয়ায়। শেষ পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ (সাঃ)। আর দেখুন, ঐশী কেতাবের সংখ্যা মাত্র চার। তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল এবং ফুরকান (কোরান)। এগুলানকে আহ্‌লে কেতাব বলা হয়। আপনার বেদ কখনও আহ্‌লে কেতাব নয়। আফতাবুদ্দিন বললেন, হুজুরে আলা! আপনি সুবিজ্ঞ আলেম। আপনি কি মনে করেন, হিন্দুস্তানের কোটি-কোটি লোকের জন্য আল্লাহ, কোনো পয়গম্বর পাঠাননি এবং কোনো ঐশী কেতাব অবতীর্ণ হয়নি? ধূর্ত ও আমুদে বড়োগাজি মুখ টিপে

হেসে বললেন, ভাববার কথা। এরপর আফতাবুদ্দিন হিন্দুদের মতো বিস্তর সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। আমি বললাম, মৌলবিসাহেব, আপনি মুসলমান না ব্রাহ্ম? আফতাবুদ্দিন ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বললেন, দুনিয়ায় আল্লাহের ধর্ম একটাই। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বিভিন্ন নাম। হিন্দুস্তানে তাঁর নাম ব্রহ্ম। আরবে তাঁর নাম আল্লাহ। তাই আমি নামাজ পড়ি, আবার ব্রহ্মোপাসনাতেও যোগ দিই। বড়োগাজি বললেন, নুরপুরে তল্লাটে এক জমিদার নয়া আবাদ পত্তন করেছেন। তিনি ব্রাহ্ম। সেই আবাদে ব্রাহ্মদের বড়োঘাঁটি। আফতাব সাহেবের বাড়ি নুরপুরে। আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে রূঢ় স্বরে বললাম, আপনি ব্রাহ্ম না মুসলমান? আফতাবুদ্দিন একই ভাবে জবাব দিলেন, যিনি আল্লাহ তিনিই ব্রহ্ম। আরও রূঢ় স্বরে বললাম, আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন? আফাতাবুদ্দিন বিব্রতভাবে বললেন, হিন্দুস্তানের বর্তমান অবস্থায় ব্রাহ্ম ও মুসলমানদের ঐক্য প্রয়োজন। ব্রাহ্ম হিন্দুরা মুসলমানদের বেরাদর (ভাই) বলে জানেন। আপনাকে জানানো উচিত, ব্রাহ্ম পণ্ডিতদের কেউ-কেউ পাক হাদিস কেতাবগুলান বাঙলায় অনুবাদ করছেন। পাক কোরানও অনুবাদ করার প্রস্তাব আছে। মাঝে-মাঝে কলিকাতা গিয়ে সেই কাজে আমি তাঁদের সাহায্য করি। আমার ইচ্ছা, হিন্দুরাও জানুক ইসলাম কী। আমি বড়োগাজির দিকে চোখ রেখে বললাম, এই কাজের জন্য মুসলমানের হিন্দু হওয়ার দরকার নেই। গাজিসাহেব! আপনার এই দোস্ত (বন্ধু) শয়তানের পাল্লায় পড়েছেন। এঁকে এখনই আমার এবাদতখানা থেকে নিয়ে যান। বড়োগাজি তৎক্ষণাৎ 'মৌলবি'-খেতাবধারী লোকটিকে ইশারায় উঠতে বললেন। দুজনে বেরিয়ে গেলে আমি প্রাঙ্গণে নেমে পায়চারি করতে থাকলাম। বহু বছর আগে ঠিক এভাবে একজন আংরেজ পাদ্রি আমার কাছে এসেছিলেন। তিনিও বোঝাতে চেয়েছিলনে, খ্রীস্টান আর মুসলমান বেরাদর! দুনিয়ায শয়তান কত চেহারায় ঘুরে বেড়োচ্ছে! বিকেল পর্যন্ত আমার অস্থিরতা ঘুচল না। আশঙ্কা হচ্ছিল, বড়োগাজি শয়তানের পাল্লায় পড়লেন কি না! পুকুরঘাটে বসে 'দিওয়ানে হাফিজ' কেতাবের পাতা ওলটাচ্ছি, সেই সময় চোখে পড়ল এই বয়েতটি ঃ 'হাফিজ ইন খির্কা কি দারি তু বিবিনি ফরদা/কি চি জুন্নার জে জের-অশ্ ব জফা বিকুশায়েদ...' তওবা, তওবা! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

হাফিজের এই পোশাক যদি টেনে খুলে ফেল/
দেখবে তার তলায় আছে যজ্ঞোপবীত...

ভাবলাম, দিনশেষে শয়তান এই সুন্দর কেতাবের হরফ বদলে দিয়ে জঙ্গলের কালো ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে। দুটি পাতা উলটে শেষদিকের একটি বয়েতে চোখ রাখলাম।

হর হল্কা এমঘান্ আম্ আন্ পিসর্ চে খোস্ গুফ্ত্
ব কাফিরান্ চে কার্ অত্ গর্ বুত্ না মি পরস্তি...

তওবা, তওবা! এতদিন এ কোন্ কেতাব পড়ে তারিফ করে আসছি? কামিজের তলায় কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন বেরিয়ে পড়ল এবার। এই হাফিজ লোকটি নিশ্চয় সুফি ছিল। সুফিরা মুসলমান-ভেকধারী মোনাফেক!

অগ্নিপূজক মঘদের মজলিশে ওই বালক/
কী চমৎকার কথা বলে উঠল/
'যদি না শিখতে পারলে মূর্তিপূজা/
কাফেরদের সংস্পর্শে এসে কী লাভ হল বলো'...

কেতাবখানি পুকুরের পানিতে ছুড়ে ফেললাম। ইচ্ছে করল, এ মুহূর্তে ছোটোগাজি সামনে থাকলে ওই নাদানকে চল্লিশ পয়জার মারতাম। আলি বখ্‌শ্ সবসময় আমার দিকে নজর রাখে। সে দৌড়ে এসে পাংশু মুখে শুধু বলল, হজরত! বললাম, কিছু নয়। সে অবাক, ভীত চোখে পানির দিকে তাকিয়ে ছিল। ছড়িটি তুলে বললাম, অ্যাই কমবখ্‌ত্! এখানে কিছু দেখার নেই। ভাগো! সে মুখ নীচু করে চলে গেল। একটু পরে ওকে বলব, কালা জিনের মুখে কেতাব ছুড়ে মেরেছি। তাহলে ও খুবই খুশি হবে। আসলে মানুষের এই স্বভাব, চারপাশের সবকিছুতে অলৌকিককে ঢুঁড়তে চায়। মোজেজা অন্বেষণ করে। ওরা ভাবে, এই মাটির দুনিয়াই কি সব? ঠিকই তো। মাটির দুনিয়া নিশ্চয় সব নয়। পানির তলার ওই প্রতিবিম্বের মতো অনেক কিছু আছে। তা জানার জন্য ইল্‌ম্ (প্রজ্ঞা) অর্জন করা চাই। কিছুক্ষণ পরে আলি বখ্‌শ্ ফের এসে বলল, আনিসুর সর্দার, আরও জনাকতক হুজুরে আলার সঙ্গে করতে এসেছেন। ভাবলাম, এই অস্থিরতা ঘোচানোর জন্য কিছু হালকা গল্পগুজব করা দরকার। ওদের কাজ যত জরুরি হোক, আমি পাত্তা দেব না। বললাম, ওঁদের এখানে নিয়ে এসো। মৌলাহাট জামাতের মুরুব্বি লোকগুলি সম্ভাষণ করতে-করতে ঘাটে এলেন। ওঁদের বসতে বললাম। বিপরীত দিকের চত্বরে ওঁরা বসলেন। তারপর আনিসুর কিছু বলতে মুখ খুলেছেন, আচানক সড়কের দিক থেকে বাঁশির সুর ভেসে এল। সঙ্গে-সঙ্গে দুই কানে আঙুল গুঁজে বললাম, কে ওই শয়তান আমার চল্লিশ দিনের বন্দেগি (তপজপ) বরবাদ করল? ওকে জলদি পাকড়াও।...

নুসাইবা নামে এক নারী

দিলরুখ বেগম ॥ কচি, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রে?

কচি ॥ না, না, না! বলো না, শুনছি। রোজ বলি, অত হুঁ দিতে পারব না!

দি বেগম ॥ শাশুড়িসাহেবার কাছে শুনেছি, পয়গম্বরের জমানায় আববে এক তেজী আউরত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল নুসাইবা খাতুন। খোদা জিব্রাইল ফেরেশতার মারফত পাক কোরানের সুরা (অধ্যায়) পাঠিয়ে দিতেন। পয়গম্বর সেইগুলান মুখস্থ করতেন। পরে মজলিশে তা মোমিনদের শোনাতেন। তো একদিন নুসাইবা খাতুন রাগ করে পরগম্বর হুজুরকে বললেন, হজরত! খোদা কেন শুধু পুরুষ-মানুষদের লক্ষ করে কথা বলেন? মেয়েরা কি মানুষ নয়? আদমের বাঁ পাজর থেকে আমাদের তিনি তৈয়ার করেছেন। তাহলে কেন খোদা আমাদের লক্ষ্য করে পয়গাম (বার্তা) পাঠাচ্ছেন না?

কচি ॥ মার্ভেলাস! তারপর দাদিমা, তারপর?

দি বেগম ॥ শাশুড়িসাহেবা বললেন, তারপর থেকে খোদার পয়গামে 'মুসলিমান

ওয়া মুসলিমাত্' কথা দুটো আসতে লাগল।

কচি ॥ তার মানেটা কী বলবে ?

দি বেগম ॥ বুঝলি নে ? পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষ দু' তরফকে লক্ষ করে খোদার পয়গাম এল। পাক কোরান পড়ে দেখিস। মর্দানা-আউরত খোদার কাছে সমান। কেউ ছোটো, কেউ বড়ো নয়।

কচি ॥ হঠাৎ নুসাইবার কথা কেন, দাদিমা ? রাখালছেলেটার কী হল ?

দি বেগম ॥ ছেলেটার নাম ছিল ফজু। বাপ-মা কেউ ছিল না। আমাদের সংসারে কাজকাম দেখাশুনা করত দুখু। তারই ভাগ্নে। তখন বয়স বোধ করি নয়-দশ বছর হবে। আমাদের একটা বাঁজা গাইগোরু ছিল। তার নাম মুন্নি। ভাসুরসাহেব কতবার এসে সাধাসাধি করতেন, কোরবানিতে মুন্নিকে হালাল করি। শাশুড়িসাহেবা চোখমুখ লাল করে ভাগিয়ে দিতেন। তো মুরিদরা (শিষ্যরা) একটা দুধেল গাই দিয়েছিল। তার নাম আমি 'কাজলি' রেখেছিলাম। তার গায়ের রঙ ছিল কাজলা।

কচি ॥ আহা, রাখালছেলেটা—

দি বেগম ॥ বলছি তো! আমাদের একটা ছাগলও ছিল। তার নাম ছিল কুলসুম। ফজু সেই মুন্নি, কাজলি আর কুলসুমকে চরাতে নিয়ে যেত। ছেলেটা ছিল ভারি রগুড়ে। শালিকপাখি পুষেছিল। তার জন্য বাঁশের খোলে করে নদীর ওপার থেকে ঘাসফড়িং ধরে নিয়ে আসত। আর ওই এক শখ বাঁশি বাজানো।

কচি ॥ এক মিনিট দাদিমা! রাখালছেলেরা বাঁশি বাজাবেই। কেন বলো তো ?

দি বেগম ॥ মাঠেঘাটে ঘোরে দিনমান। সময় কাটাতেই বোধ করি বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়।

কচি ॥ দারুণ বলেছ! তবে আমার মনে হচ্ছে কী জান ? প্রকৃতির মধ্যে গেলে মানুষ একা ফিল করে — লোনলি ফিলিংস! অথবা — প্রকৃতিতে সারাক্ষণ সুর বেজে চলেছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পদ্যে পড়েছি। সেই সুরকে মানুষ, মানে রাখালছেলেটা, মানে তোমাদের ফজু বাঁশিতে নিতে চাইত। প্রতিধ্বনির মতো! Whose heart-strings are a lute!

দি বেগম ॥ নিজেই বকবক করবি, নাকি গল্পটা শুনবি ?

কচি ॥ সরি! বলো, তারপর কী হল ? তোমার বিক্রমশালী শ্বশুর রাখাল বেচারাকে কুলগাছে বেঁধে জুতো মারছিলেন। শ্রদ্ধাভক্তি আর রইল না বাবা! ভ্যাট্!

দি বেগম ॥ উনি ফরাজি আলেম ছিলেন। মৌলাহাটে সে-জমানাও ছিল আলাদা। তো ফজুকে উনি এবাদতখানার উঠোনে কুলগাছে বেঁধে রেখেছেন। বাঁশিটা ভেঙে পুকুরের পানিতে ফেলেছেন। সেই খবর এল যখন, তখন শাশুড়িসাহেবা মগরেবের জন্য বদনায় পানি নিয়ে অজু (প্রক্ষালন) করতে যাচ্ছেন। আমি তোর আব্বাকে তোর দাদাজির কোলে দিয়ে বদনা হাতে নিয়েছি। হেন সময়ে দুখু কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ঢুকল। শাশুড়িসাহেবার হাত থেকে বদনা পড়ে গেল। শুধু পলকের জন্য দেখলাম, বেপরদা হয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কচি ॥ তারপর দাদিমা, তারপর ?

দি বেগম ॥ তখনও দিনের আলো আছে। বাদশাহি সড়ক ধরে ছুটতে-ছুটতে—

কচি ॥ ছুটতে-ছুটতে ?

দি বেগম ॥ যারা দেখেছিল, তারা বলেছিল। তবে মরদলোকেরা ওঁকে তো কেউ চিনত না। উনি এবাদতখানায় ঢুকে কুলগাছ থেকে ফজুর বাঁধন খুলে দিলেন। ছেলেটা তখন আধমরা। মুখে খুন ঝরছে। কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'কত বড়ো বুজুর্গ হয়েছে, কত জিন পোষা আছে, দেখি। সাধ্যি থাকে তার জিনেরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিক।' এই বলে এবাদতখানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

কচি ॥ অসাধারণ! বড়ো আম্মা, তোমার প্রতি হাজার-হাজার সালাম! তুমি নুসাইবার বাড়া!

দি বেগম ॥ পরে এই নিয়ে হাজার কথা রটেছিল। তবে গাঁয়ের লোকেরা মনে-মনে শাশুড়িসাহেবার ওপর খুশিই হয়েছিল' শ্বশুরসাহেব এরপর সাতদিন এবাদতখানার ভেতর 'এত্তেকাফ্' নিয়েছিলেন। সাতদিন পরে শুনলাম, উনি সফরে রওনা দিয়েছেন। আলি বখশ্ এবাদতখানার জিম্মাদার রইল। তাকে কালা জিনেরা এসে খুব জ্বালাত।-

কচি ॥ কোথায় গেলেন উনি?

দি বেগম ॥ মাসতিনেক পরে খবব হয়েছিল, নুরপুরে আছেন।

কচি ॥ ছোটোদাদাজি তখন ওই এরিয়ায় ছিলেন। দেখা হয়নি?

দি বেগম ॥ শুনেছি তিনক্রোশের ফারাক। তাই দেখা হয়নি। আর দেওরসাহেব আব্বাকে দেখা দেবেনই বা কেন? উনি তখন নাকি হিঁদু হয়েছেন। সত্যিমিথ্যে জানি নে, শুনেছি।...

হাম্মালাতুল হাতাব!

নুরপুর মৌলাহাট থেকে পনের ক্রোশ দূরে। কাজি গোলাম হোসেন ক-বছর আগে ফরাজি মজহাবভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই মৌলাহাট এসে নুরপুর সফরের অনুরোধ করতেন। 'মৌলবি' খেতাবধারী আধামুসলমান আফতাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই মনে নুরপুর যাওয়ার খাহেস ছিল। পাঁচক্রোশ দূরে সাহাগঞ্জ থেকে কাজিসাহেবের কাছে আগাম খবর পাঠিয়েছিলেন। পরদিন মগরেবেব সময় দেখি, তেজী দুইটি ঘোড়ার টাঙ্গাগাড়ি হাজির। কাজি সাহেবও স্বয়ং হাজিব। মাঘমাস। রাস্তায় ঘন ধুলো। সকালে রোদ একটু চাঙ্গা হলে রওনা দিয়েছিলাম। সাহাগঞ্জের সড়কের দুধারে কাতারে-কাতারে মানুষ। তারা বাচ্চাদের মতো কান্নাকাটি করে বিদায় জানাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে বহু হিন্দুও ছিলেন। কৃষ্ণপুরের জমিদারকন্যার জিন-ভাগানোর খবর জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। নুরপুর পৌঁছুতে বিকেল হল। দূর থেকে উঁচু স্তম্ভটি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, ওটি একটি রেশমকুঠি। কাজিসাহেবের কাছে শুনলাম, কমাস আগে ওই কুঠির আংরেজ মালিক খুন হয়েছে। বললাম, মাশাল্লাহ্! শাবাশ! এই কাজ যে করেছে, তার জন্য বেহেশত্ বরাদ্দ। কাজিসাহেব বললেন, স্ট্যানলিসাহেব খুব জুলুমবাজ ছিল। এলাকার সকলেই ওর দুশমন। তাই পুলিশ খুনীদের পাত্তা পায়নি। তবে স্ট্যানলির গায়ে গুলির জখম থাকায় গবরমেন্টের সন্দেহ, একাজ 'বন্দেমাতরমওয়ালাদের'। জিগ্যেস করলাম, তারা কারা? কাজিসাহেব যা

বললেন, শুনে মনে হল, হিন্দুরা হিন্দুস্তানে বাদশাহি কায়েম করতে চায়। এটা ভালো লক্ষণ নয়। কথাপ্রসঙ্গে সেই মৌলবিটির খবর জিগ্যেস করলাম। কাজিসাহেব তাচ্ছিল্য করে বললেন, আফতাব আবার একটা মানুষ ? শুনেছি সে এখন কলিকাতায় আছে। খবরের কাগজ ছাপবে। নুরপুরে টাঙ্গা পৌঁছুলে খুশি হয়ে দেখি, এখানেও কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছে। কাজিসাহেব বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ ! নুরপুরেও একটি ফরাজি জামাত কায়েম হবে। এই নুরপুরে থাকার সময় একজন আংরেজিজানা যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার নাম দিদারুল আলম। সেই আমাকে ফরাজি মজহাবের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করত। একদিন সে আমার কাছে একখানি প্রকাণ্ড কেতাব হাতে হাজির হয়। বলে, হজরত ! আপনি হাজি শরিয়তুল্লার কথা বলেছিলেন। এই বহিখানি পুরাতন একটি সম্বাদপত্রের সংকলন। আমার আব্বা সদর শহরে ওকালতি করতেন। সম্বাদপত্র এবং বহি সংগ্রহ তাঁর বাতিক ছিল। হঠাৎ এই বহিখানির একটি পৃষ্ঠা পড়ে আমার খুন টগবগ করছে। আপনি এই পৃষ্ঠাটি পড়ে বলুন, এ সম্বাদ সত্য না মিথ্যা। বিরাট কেতাবখানি খুলে দেখি বাঙলা হরফে ছাপা। পৃষ্ঠাটিতে চোখ রাখলাম। তারপর আমারও খুন টগবগ করে ফুটতে থাকল।

> "শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশকমহাশয় বরাবরেষু। --সংপ্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির নামে এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবরডাঙ্গানিবাসি বাবু কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধনপ্রাণবিষয় এবং আর ২ হিন্দুরদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত্ত হইলে তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া ফৌজদারী নাজির মোহম্মদ পুলিসকে কএকজন চাপড়াশ সমেত নারিকেলবাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঔ অভাগা পুলিস নাজিরকে বধ কবিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্টমতে কলিকাতা হইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমির জবন একাকালীন নিপাত হইল।"

মুখ তুলে বললাম, দিদারুল। তিতুমিরের কথা আমি জানি। মরহুম আব্বাসাহেবের কাছে তাঁর পাহ্‌লোয়ানির বিবরণ শুনেছি। তিনি শহিদ এবং বেহেশতে তাঁর স্থান সুনিশ্চিত। দিদারুল বলল, হজরত ! পরের কথাগুলান পড়ুন। ওই পৃষ্ঠায় আবার নজর দিলাম। চমকে উঠলাম। আমার চোখ নিস্পলক হয়ে রইল।

> ...ইদানিং জিলা ফরিদপুরের অন্তপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিয়তুল্লা নামে এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটিদেশে চর্ম্মের রজ্জু ভৈল করিয়া তৎচতুর্দ্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেবদেবীপূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মালকতগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোঁড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটিতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্মরাশি করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দাওয়ায় অর্পিত হইয়াছে।...আর শ্রুত হওয়া গেল

দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবীপূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদারবাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কয়েক জবনকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং এবিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন।...আমি বোধ করি সরিতুল্লা জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর ২ প্রবল হইতেছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শ'ত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না।...ইতি ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র। জিলা ঢাকানিবাসি দুঃখি তাপিগণস্য।

আমি চোখ তুলে দেখি দিদারুল আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, সমাচারদর্পণ পত্রিকার ইংরাজি ১৮৩৭ সালের ২২ এপ্রিল এই চিঠি ছাপা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আপনার কী মত? আত্মসংবরণ করে বললাম, মরহুম আব্বার কাছে শুনেছি, হাজি শরিয়তুল্লা একজন জবরদস্ত আলেম ছিলেন। হিজরি ১২১৮ কী, ১২১৯ সনে দিল্লিতে ওহাবি আলেম আবদুল আজিজ ফতোয়া জারি করেন, নাসারাদের বিরুদ্ধে মুসলমানের জেহাদে নামতে হবে। সইদ আহমদ বেরিলভি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। হিজরি ১২৭৪ সনে হিন্দুস্তানের তামাম হিন্দু-মুসলমান সিপাহী আংরেজশাহির সঙ্গে জেহাদ লড়েছিল। সেই জেহাদে ওহাবিরাও যোগ দিয়েছিলেন। হাজি শরিয়তুল্লা সেই রাহের (রাস্তার) রাহি। হিন্দুস্তানের মুসলমানকে বুত্-পরস্তি (পৌত্তলিকতা), শের্ক্ (ঈশ্বরের অংশীদারি), বেদা'য়েত (উন্মার্গগামিতা) থেকে বাঁচাতে এই আলেম জানকবুল করেছিলেন। এই খতের (চিঠির) বয়ান বিলকুল ঝুট! দিদারুল উত্তেজিতভাবে বলল, চিঠির বয়ানে স্পষ্ট, শরিয়তুল্লা শুধু হিন্দু বড়োলোক-জমিদারদের জুলুম থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সুবে বাঙলায় মুসলমানের অবস্থা চিন্তা করুন হজরত! তারা গরিব হয়ে পড়েছে দিনে-দিনে। হিন্দুরা ইংরেজি শিখে ইংরেজের ধূর্ত বুদ্ধি অর্জন করেছে। তারা মুসলমানদের পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিচ্ছে। আরও দেখুন হজরত, পলাশীর যুদ্ধে শুধু মিরজাফর বেইমানি করেনি একা। জগৎশেঠ, আমিরচাঁদ, রাজবল্লভ রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, নন্দকুমাররাও বেইমানি করেছিল। ১৮৫৭ সনের সিপাহি বিদ্রোহে যখন সারা হিন্দুস্তানে হিন্দু-মুসলমান এককাট্টা হয়ে লড়েছে, তখন বাঙলার ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু ইংরেজের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমার কলেজজীবনের হিন্দু-বন্ধুদের কেউ-কেউ তামাসা করে বলে, তোমরা সাতশো বছর আমাদের জুলুম করেছ। আমরা তা ভুলতে পারব না। আমি ওদের বলি, ওটা ইংরেজের শেখানো কথা। রাজাবাদশাহরা প্রজার ওপর জুলুম করতেই পারে। এর কোনো হিন্দু-মুসলমান নেই। কিন্তু সত্যিই যদি তাই হত, যদি তোমাদের ধর্ম ধ্বংস করত মুসলমানরা, তোমাদের মন্দির চুরমার করত, তাহলে হিন্দুস্তানে এত প্রাচীন মন্দির থাকত না। এত হিন্দু থাকত না। ইংরেজের ইতিহাস পড়ে তোমরা বল, এই জেলায় মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দু মন্দির ভেঙেছিলেন। চলো, তোমাদের দেখিয়ে দিই, তাঁর আমলের কত মন্দির কাটরা-

মসজিদ তাঁর কবরের আশে-পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা ঔরংজেবের নিন্দা কর। কিন্তু চিন্তা করে দেখ না, খেয়ালি বাদশাহ শাহজাহান রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছিলেন বিলাসিতায়। তাজমহল! ভাবুন হজরত, ওই একটা তাজমহল গড়তে কত কোটি-কোটি টাকার ধনরত্ন খরচ করা হয়েছিল! এমন উচ্ছৃঙ্খল কাণ্ডজ্ঞানহীন বাদশাকে বন্দী করা কি উচিত হয়নি? ঔরংজের যদি হিন্দুদ্বেষী, কেন তাঁর প্রধান সেনাপতি হিন্দু যশোবন্ত সিং? কেন উদিপুরী নামে হিন্দু বেগমকে তিনি মুসলমান করেননি? তখন ঔরংজেবের বদলে যদি হিন্দু বাদশাহ থাকতেন, তিনিও একই কাজ করতেন। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে জিজিয়া করের মতো কর আদায় করতেন। ...এই মুসলমান যুবকটির মুখে দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। সে জোরে শ্বাস ফেললে মনে হল গরম সাইমুম বয়ে বয়ে গেল আগুনের হলকা ছড়িয়ে। কাজিসাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, দিদারুল তার আব্বার ওকালতির ধারাটি পেয়েছে। বাপজান! এবার হুজুরকে একটু আরাম করতে দাও। দিদারুল জিভ কেটে শরমেন্দা ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। বলল, আর একটা কথা আপনাকে জানাবার ছিল হজরত! হিন্দু রাজা জমিদাররা কংগ্রেস দল গঠন করেছে। কিছু মুসলমান ধান্দাবাজও ওই দলে ঢুকেছে। এদিকে বঙ্কিম চাটুজ্জের নবেল পড়ে কিছু হিন্দু বন্দেমাতরম করে বেড়াচ্ছে। তারা দেশকে দুর্গাদেবী বলে পুজো করছে। এ অবস্থায় আমার মনে হয় মুসলমানদেরও একটি দল গড়া উচিত। আমি শিগগির কলকাতা যাচ্ছি। সেখান থেকে আমরা কয়েকজন আলিগড়ে রওয়ানা হব। দোয়া করুন, যেন সফল হই। বলে সে আমার পদচুম্বন করল। আমি তার কপালে চুম্বন করে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। হা আল্লাহ! এই যুবকের মধ্যে আমি কি শফিউজ্জামানেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম? শফি তো এত কথাবলিয়ে ছিল না। অথচ ওই মুখ দেখে টের পেতাম, ওর মধ্যে কথার পাহাড় আছে, যে পাহাড়ের তলায় আল্লাহ আগুন মজুত রেখেছেন। শফি ছিল শান্ত, চুপচাপ, গম্ভীর। অথচ কী আশ্চর্য, দিদারুল যেন শফিরই একটি রূপ বলে ভ্রম হয়। এদিন যতবার দিদারুলের কথা মনে পড়ল, ততবার শফি সামনে দাঁড়াল। বিকেলে আসরের নামাজের পর অভ্যাসমতো একা বেড়াতে বের হলাম। কাজি সাহেবকে নিষেধ করলাম, কেউ যেন আমার অনুসরণ না করে। তাহলে তার বিপদ হবে। আমার জীবনে আসলে সূর্যাস্তের সময়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে বরাবর। বস্তুত এই একটা সময়, যখন আসন্ন রাত্রির জন্য দুনিয়া জুড়ে বিচিত্র প্রস্তুতি ও হুঁশিয়ারি লক্ষ করা যায়। চরাচর-স্থাবর জঙ্গমে কী এক চাপা ব্যস্ততা শুরু হয়। 'হুশিয়ার-নামা' কেতাবটি যিনি লিখেছেন, তিনি ইল্‌ম্ (প্রজ্ঞা) লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই। আমি আরবি ভাষায় আফলাতুন (প্লেটো) এবং তাঁর তালেবুলইল্‌ম্ (ছাত্র) আরিস্তোনের (অ্যারিস্টোট্‌ল্) কেতাব পড়েছি। মাদ্রাসাগুলিতে ওঁদের কেতাব এখনও পাঠ্য। কিন্তু আমার বিবেচনায় হুশিয়ার-নামার লেখক অধিক বিজ্ঞ। নুরপুর গ্রামটি উচ্চভূমিতে অবস্থিত। দক্ষিণে ধাপবন্দী মাঠ। কোথাও শস্যশূন্য খেত, কোথাও জঙ্গল। জঙ্গলের কিনারায় একটি নীচু ঝোপে পাখির বাসা দেখলাম। পাখিটি সম্ভবত ডিমে তা দিচ্ছিল। আমাকে দেখেও উড়ে গেল না। আল্লাহের কুদরত বোঝা কঠিন। পাখিদের তিনি কেন সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয় তাঁর বন্দেগির জন্য। দিনশেষের মিঠে আলোয় পাখিদের বন্দেগি শুনতে পেলাম। একটুখানি অন্যমনস্ক

হয়ে পড়েছিলাম। আচানক সামনেকার জঙ্গল থেকে একটি আউরত মাথায় লকড়ির পাঁজা নিয়ে বেরুল এবং আমার চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সবিস্ময়ে দেখলাম, এতো সেই আবদুল কুঠোর বিবি — 'হাম্মালাতুল হাতাব'। আমি হো হো করে হেসে ফেললাম! অমনি ইকরাতন লকড়ি নামিয়ে রেখে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। বিব্রত হয়ে বললাম, ছাড়্ ছাড়্! এ কী করছিস তুই — নাদান বেশরম লড়কি! ইকরাতন কান্নাজড়ানো গলায় গলায় বলল, হুজুর! আমাকে মাফ করুন। আমি আপনার কথা মানিনি। আপনি আমার জান বাঁচিয়েছিলেন! বললাম, তুই তো ছোটোগাজির বাড়ি ভালোই থাকতিস! আলি বখ্শ্‌কে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছিলি কেন? ইকরাতন উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে মুখ নামিয়ে বলল, বড়োগাজির ভয়ে। সে লোক ভালো নয়। আর হুজুর, আলি বখ্শ্ আমার হাত ধরেছিল। খাপ্পা হয়ে বললাম, ঝুট বলিস না! আলি বখ্শ্ পরহেজগার (ধার্মিক) লোক। ইকরাতন আবার কেঁদে উঠল, আল্লার কসম, হুজুর! বললাম, তুই এখানে কোথায় আছিস? নিকাহ্ করেছিস কি? সে মাথা নেড়ে আস্তে বলল, আমার সোয়ামির বহিনের বাড়িতে আছি! তারও সোয়ামি নেই। ধান ভেনে খায়! আমিও ধান ভানি তার সঙ্গে। খুব ভালো মেয়ে! মায়ের পেটের বহিনের মতন জানে আমাকে। হাসতে-হাসতে বললাম, ডাহিনগিরি ছেড়েছিস্, নাকি এখনও চালিয়ে যাচ্ছিস? সে এবার মুখ নামিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, জি না। আর বদ্যির কাজ করি না। খুশি হয়ে বললাম, ভালো করেছিস। তো এই যে বেপরদা হয়ে একা জঙ্গলে আসিস, তোর ডর হয় না? বলল, ডর হয়। তবে কী করব? বললাম, তুই নিকাহ্ করছিস না কেন? বলল, সে-ইচ্ছা আমার নেই হুজুর। পুরুষলোকেরা নেমকহারাম। আমার ঘেন্না হয়। সে লকড়ির পাঁজা তুলে করুণ সুরে ফের বলল, দোহাই হুজুর, এখানে কাউকে যেন বলবেন না আমি ডাহিন (ডাইনি) ছিলাম। সে পা বাড়ালে ডাকলাম, ইকরাতন! একটা কথার জবাব দিয়ে যা। সে ঘুরে দাঁড়ালে বললাম, তুই কি সত্যই হিন্দু ছিলিস? বলল, জি হ্যাঁ। বললাম, বাম্ভন ছিলিস কি? ইকরাতন গলার ভেতর বলল, যা চাপা আছে, তা চাপা থাক হুজুর। আপনি পির। আপনার না জানা কিছু নেই। সে দ্রুত চলে গেল। আমি তাকিয়ে থাকলাম, যতদূর গেল! চেহারায় বদল হয়েছে মেয়েটার। খাওয়াদাওয়া ভালোই জুটছে বোধ করি! দিনশেষে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সামনে একটা পুকুর দেখলাম। ভাবলাম, ওই পানিতে অজু করে নমাজ পড়ব। কিন্তু সঙ্গে বদনা আনিনি। আর পানির ধারে পাঁক। তাই জঙ্গল থেকে দূরে একটি বাঁজা ডাঙায় গেলাম। ডাঙাটিতে অসংখ্য তালগাছ। সূর্য ডুবলে একখানে পরিস্কার নাঙ্গা মাটিতে হাত দুখানি ঘষে 'তৈয়ম্মুম' (জলের অভাবে এভাবে অজুর বিধি আছে) করলাম! হা আল্লাহ! নামাজের সময় সামনেকার তালগাছটি বারাম্বার একটি নাঙ্গা আউরতের মতো বোধ হচ্ছিল। 'হাম্মালাতুল হাতাব' — ওই কাঠকুড়োনি মেয়েটি কি কালা জিনের কোনো জাদু? ও কে? কে ও?...

Her feet are tender, for she sets her steps,
Not on the ground but on the heads of men....

–Homer

হিজরি ১৩১৬ সনের কথা। জ্যৈষ্ঠ মাস ওই মাসে মহরমের দিন অছিপুরের হানাফিরা তাজিয়া নিয়ে মৌলাহাটের মাঠঅব্দি এসেছিল। খোদার কুদরত! আচানক খুব ঝড়পানি এসে গেল। মৌলাহাটের ফরাজিরা লাঠিবল্লম তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। শ্বশুরসাহেব নুরপুরে আছেন। অছিপুরওয়ালারা ভেবেছিল, মৌলাহাটওয়ালারা আগের জমানার মতন তাদের তাজিয়া আর জঙ্গ দেখবে। মুখোমুখি দুইদল দাঁড়িয়ে গেছে। হরিণমারা থানায় ঘোড়া ছুটিয়ে খবর দিতে গেছেন ভাসুরসাহেব। হেন সময়ে মেঘ ডাকল। আসমান কালো হয়ে গেল। দড়বড় করে শিল পড়তে থাকল। আমার শিলকুড়নো অভ্যাস ছিল। শাশুড়িসাহেবা বকাবকি করছিলেন। তারপর ঝড়পানি এল। দুখু ভিজতে-ভিজতে বেরিয়ে গেল ফজুকে খুঁজতে! ভয় করছিল, বাজ পড়ে ও মারা না যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে হাসতে-হাসতে বলল, মাঠে যাব কী, অছিপুরের তাজিয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে হারামজাদারা ভেগে গেছে। শাশুড়িসাহেবা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, ফজুর কী হল কে জানে? দুখু বলল, ফজু খুব চালাক ছেলে, বিবিসাহেবা! ভাববেন না। ঠিক তাই। সন্ধ্যার মুখে ঝড়পানি থামলে ফজু দিব্যি ফিরে এল। কোনো গাছতলায় গোরুছাগল নিয়ে বসে ছিল। কিন্তু তখনও জানতাম না কী খবর আসছে। লম্ফ জ্বেলে রফিকে দুধ খাইয়ে ওর আব্বার কোলে দিয়ে দলিজঘরে গেছি, মেঘ ভেঙে মহরমের চাঁদ বেরিয়ে পড়েছে। দরজা খুলে দুনিয়ার অবস্থা দেখছি। সেই সময় প্যাচপেচে কাদায় এক ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখে চমকে উঠলাম। ঘোড়াটা দলিজের বারান্দাব কাছে দাঁড়ালে যিনি নামলেন, তিনি বারিচাচাজি! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, চাচাজি! চাচাজি! বারিচাচাজি আস্তে বললেন, বুকু? তোরা কেমন আছিস, মা? আমি বুক ফেটে কেঁদে ফেললাম। বারিচাচাজি আমাকে টেনে দলিজঘরে ঢুকলেন। শাশুড়িসাহেবা ডাকছিলেন, বউবিবি! কী হল? ও বউবিবি? বারান্দায় গিয়ে বললাম, বারিচাচাজি এসেছেন, আম্মা! শাশুড়িসাহেবা ব্যস্তভাবে লণ্ঠন নিয়ে এলেন। লণ্ঠনটা দলিজঘরে রেখে বললাম, এতদিন কোথায় ছিলেন চাচাজি? শাশুড়িসাহেবা দরজাব ওপাশ থেকে মৃদুস্বরে বললেন, ভাইঝিরা কেমন আছে, কী হালে আছে ভাইসাহেবের জানার গরজ কিসের? বারিচাচাজি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কোন্ মুখে আপনাদের সামনে দাঁড়াব, আপা? শফিকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাকে হারিয়ে ফেললাম! দেখলাম, শাশুড়িসাহেবর দরজা থেকে সরে গেলেন। বললাম, চাচাজি! আপনার এ কী চেহারা হয়েছে? বারিচাচাজি বললেন, তোর অবস্থাও ভালো দেখছি না! যাই হোক, শোন্ আমি দেওয়ানি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বহরমপুরে আছি। সেদিন তোর ভাসুরসাহেবের সঙ্গে দেখা হল। মামলা-মোকর্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন বললেন। কথায়-কথায় জিগ্যেস করলাম, ওঁর শাশুড়ির সম্পত্তির ফারাজ (শরিয়তি বণ্টন) হয়েছে কি না। বললেন, হবে'খন। বুকুকে তো ধান-খন্দের ভাগ পাঠিয়ে দিই। একথা শুনে আস্তে বললাম, পাঁচ বস্তা ধান, আধবস্তা ছোলা দিয়েছে এ বছর। রোজির আমার সঙ্গে দেখা নেই অনেকদিন থেকে। বারিচাচাজি বললেন, সেকথা ভেবেই এলাম! কালই মজলিশ ডেকে তোর মায়ের সম্পত্তির 'ফারাজ' বের করব। বললাম, ওকথা থাক। হাত-মুখ ধোন! পানি এনে দিই। বারিচাচাজি বললেন, দাঁড়া। বড়ো খবর আছে একটা! তোর শাশুড়িকে ডাক! উনি শফির জন্য আমাকে মাফ করতে পারেননি। তবে শফিকে আমি ঢুঁড়ে

বের করবই। ডাক্ ওঁকে। খুব জরুরি খবর আছে। শাশুড়িসাহেবা বারান্দার একটু তফাতে খুঁটি আঁকড়ে বোধ করি কাঁদছিলেন। ডাকলে চোখ মুছে কয়েক পা এগিয়ে এলেন! বারিচাচাজি বললেন, পিরসাহেবের খবর রাখেন, আপা? শাশুড়িসাহেবা বললেন, না। তাঁর খবরে আমার কাম কী? বারিচাচাজি একটু ইতস্তত করছিলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কোনো খারাপ খবর নয় তো চাচাজি? বারিচাচাজি হঠাৎ কেমন হাসলেন। বললেন, নুরপুরের কাজি গোলাম হোসেন কাল বহরমপুরে গিয়েছিলেন। আমার চেনা লোক। উনি একটা আশ্চর্য খবর দিলেন। পিরসাহেব একটি মেয়েকে নিকাহ্ করেছেন। বললাম, সে কী! বারিচাচাজি বললেন, পয়গম্বরের তরিকা (পন্থা) মেনে চলতেই পারেন। তাছাড়া মুসলমান চার'বিবি রাখতে পারে। এটা কোনো কথা নয়। আমার অবাক লাগল, মেয়েটি এই মৌলাহাটেই নাকি কোনো চাষাভুষো একজনের বউ ছিল। কী যেন নামটা — শাশুড়িসাহেবা শক্ত গলায় বললেন, ইকরাতন! বারিচাচাজি বললেন, হ্যাঁ — ইকরাতন। আমার কী হল, ছুটে গিয়ে শাশুড়িসাহেবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলাম। শাশুড়িসাহেবা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বললেন, খামোশ! বেয়াদপ লড়কি! তারপর বারিচাচাজির উদ্দেশে শান্ত স্বরে বললেন, এ কোনো নতুন খবর নয়, চৌধুরীসাহেব। এ আমি জানতাম। বারিচাচাজি বললেন, আপনি জানতেন? শাশুড়িসাহেবা আস্তে বললেন, বউবিবি, চাচাজিকে হা-মু ধুতে পানি দাও। আমি খানার ইন্তেজাম করি। রফির আব্বা রফিকে শুইয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। দেয়াল ধরে এগিয়ে দলিজে গেলেন। গোঙানো স্বরে আসসালামু আলাইকুম বললেন। আমি ওঁকে বললাম, আপনার আব্বার কাণ্ড শুনেছেন? সেই আবদুল কুঠোর বিবিকে নিকাহ্ করেছেন। রফির আব্বা বিকটগলায় হাসতে থাকলেন। রাগেদুঃখে বেরিয়ে এলাম। বালতি ভরে পানি আর বদনা নিয়ে যাবার সময় রান্নাঘরের উনুনের সামনে শাশুড়িসাহেবাকে দেখলাম। হতভাগিনী চুপিচুপি কাঁদছেন।...

"I go and come with a strange liberty in Nature,
a part of herself..."

নুরপুর বানুকের কুঠিয়াল রিচার্ড স্ট্যানলিকে হত্যা করে যখন আশ্রমে পৌঁছাই, তখনও মন্দিরে খোল বাজিয়ে ব্রহ্মকীর্তন চলেছে। হরিবাবুর কুটির হয়ে এসেছিলেম।

তিনি এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বারণ করি। মন্দিরের পেছন ঘুরে ঘরে দ্রুত ভিজে কাপড় বদলে নিই। মন্দির থেকে যেটুকু আলো আসছিল, তাতেই চোখে পড়ে, কাপড়ে-চোপড়ের সব রক্ত ধুয়ে যায়নি। সেগুলি নিয়ে কী করব ভাবছি, সেই সময় স্বাধীনবালা এসে গেল। বললাম, কাজ শেষ। বখশিস দাও। অমনি স্বাধীন আমার পাদুটো ছুঁয়ে প্রণাম করল আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার দেহে-মনে তীব্র আনন্দস্রোত বয়ে গেল। সম্ভবত ইতিহাসে এই প্রথম এক হিন্দু যুবতী একজন মুসলমান যুবককে প্রণাম করল! এ স্বপ্ন না সত্য ? বিচলিত বোধ করছিলাম। প্রণামের পর সে সোজা হলে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ল আমার মুখে। আবিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বলে উঠল, হরিদা কোথায় ? তাকেও প্রণাম করতে চাই। এবার আমার ভাবাবেগটুকু নিমেষে ঘুচে গেল। আঃ! কী ভেবেছিলাম আমি ? বললাম, হরিবাবু তাঁর কুটিরে আছেন। কিন্তু আমার একটু প্রব্লেম হয়েছে। এই জামাকাপড়ে স্ট্যানলির রক্তের ছোপ আছে। এখনই এর একটা বিহিত করা দরকার। স্বাধীন কাপড়ের পিণ্ডটি আমার হাত থেকে নিয়ে বলল, আমি পুঁতে ফেলব। তুমি ভেবো না। সে চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকলাম, স্বাধীনের এই প্রণাম কৃতজ্ঞতামাত্র। সে আমাকে প্রণাম করেনি, করেছে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধগ্রহণকারীকে। আমি মানবেতর প্রাণী হলেও এক্ষেত্রে আমাকে সে প্রণাম করত। এইসব কথা যত ভাবলাম, তত ক্ষোভদুঃখ অনুশোচনা আমাকে জর্জরিত করতে থাকল। সে রাতে ভোজনশালায় গেলাম না। কেউ আমার খোঁজ করতেও এল না। দেবনারায়ণদার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত কিসের আলোচনা হচ্ছিল। বাইরে সে এক ভয়ঙ্কর শরৎকালীন জ্যোৎস্না। আমি বিনিদ্র। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল। স্ট্যানলিকে কেন আমি হত্যা করলাম ? এই বিশ্বজগতে স্ট্যানলি-নামক এক গোরার সঙ্গে আমার কিসেব সম্পর্ক ছিল ? পান্না পেশোয়ারিকে আঘাতের অবশ্য একটা কারণ ছিল। সিতারা নিশ্চয় নিমিত্তমাত্র। পান্না পেশোয়ারির জঘন্য সমকামী স্বভাবতই আমার ওই আচরণের কারণ। কিন্তু স্ট্যানলির সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। তাহলে কেন তাকে হত্যা করলাম ? কেন, কেন এবং কেন ?

ক্রমাগত এই প্রশ্নের ফলে অবশেষে কয়েকদিনের মধ্যে ধর্ম জিনিসটাকে ঘৃণা করার অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্ত আমাকে গ্রাস করে। জিনগ্রস্তের মতো একলা, জনহীন কোনো স্থানে থুথু ফেলে মনে-মনে বলি, ঘৃণা ধর্মকে — যা মানুষের মধ্যে অসংখ্য অতল খাদ খুঁড়ছে। ঘৃণা, ঘৃণা এবং ঘৃণা! ধর্ম নিপাত যাক্। ধর্মই মানুষের জীবনে যাবতীয় কষ্ট আর গ্লানির মূলে। ধর্ম মানুষকে হিন্দু অথবা মুসলমান করে। ধর্ম মানুষের স্বাভাবিক চেতনা আর বুদ্ধিকে ঘোলাটে করে। তার চোখে পরিয়ে দেয় ঘানির বলদের মতো ঠুলি। স্ট্যানলিহত্যার পর সারা এলাকায় হইচই পড়ে গিয়েছিল। নূরপুরে গোরাপলটন এসে ছাউনি করেছিল। পুলিশবাহিনী গ্রামে-গ্রামে হানা দিয়ে যাকে খুশি ধরে নির্মম জুলুম করছিল। তারা ব্রহ্মপুর নয়া আবাদেও যখন-তখন এসে হাজির হত। কিন্তু দেবনারায়ণদার সঙ্গে জমিদারিসূত্রে জেলার ইংরেজ কর্তাদের পরিচয় ছিল। তা ছাড়া অর্ধশতাব্দীকাল ব্রাহ্ম আন্দোলনের নির্দোষ ধর্মকর্মের ঐতিহ্যটি ইংরেজের চোখে তত সন্দেহযোগ্য সাব্যস্ত হয়নি। বরং, আমার মতে, কলিকাতার ব্রাহ্ম নেতারা ইংরাজশাসনের পৃষ্ঠপোষকতাই করে এসেছেন, সমালোচক

ভূমিকাটিকে আমি 'শত্রুরূপে ভজনা'ই বলতে চাই। এসব কারণেই ব্রহ্মপুর আশ্রমে পুলিশকর্তারা এসেই স্মিতহাস্যে বলতেন, জাস্ট্ এ রুটিন ওয়ার্ক, দেবনারায়ণবাবু! ভাগ্যিস যামিনী মজুমদার ব্রাহ্ম কিংবা আশ্রমেব লোক ছিলেন না! পুলিশদল ব্রহ্মপুরে আসবে ভেবে আমি সারাদিন আবাদের জঙ্গল এলাকায় কাটাতাম। আবাদিদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতাম। হরিবাবুকে দেখতাম তাঁর কয়েক টুকরো ধানখেতে হাঁটু মুড়ে বসে আগাছা ওপড়াচ্ছেন। নয় তো সুধন্যর সঙ্গে জাল নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন। কিছুকাল আমরা পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করতাম না। এভাবে প্রতিদিন প্রকৃতিতে থাকার ফলে আমাব যেন একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শঙ্খিনী নদীর ধারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা ঘাসজমি ছিল। তার কেন্দ্রে একটি কাত-হয়ে-থাকা বয়স্ক হিজলগাছ। মাটির সমান্তরালে ছড়ানো একটা মোটা ডালে অনেকক্ষণ বসে থাকা অভ্যাস ছিল। একদিন বিকেলে হঠাৎ একটি বিস্ময়কর চেতনা আমাকে নাড়া দেয়। আরে, কী অবাক! এখানে খাজনা-আদায়কাবী গোমস্তা নেই, পাইক-বরকন্দাজ নেই, আদালতের পেযাদা নেই, পুলিশ নেই, বাজাজমিদাব নেই, বুজুর্গ পির বা ব্রাহ্মণেরা নেই, ধর্মসমাজ-সম্প্রদায় নেই, সরকাব বাহাদুব নেই, রাষ্ট্র নেই! মানুষের কোনো নির্মাণই নেই। এখানে যা আছে, তা প্রকৃতিসৃষ্ট এবং স্বাভাবিক। এইসব উদ্ভিদ, পাখি, প্রজাপতি, শিশির, পোকামাকড়, চতুষ্পদ যাবতীয় প্রাণী কী অবাধ, স্বাধীনতাময়।

এর কিছুদিন পরে দেবনারায়ণদা আমার চালচলনে অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করার পর জেরা করে জেনে নিতে চাইতেন, কী ঘটেছে? তাঁকে প্রকৃতি সম্পর্কে আমার ওই ধারণার কথা বলায় তিনি হেসে ওঠেন। বলেন, শফি! মনে হচ্ছে, তুমি এতদিনে পরমা প্রকৃতির ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করছ। তুমি সৃষ্টির অন্তর্বর্তী আনন্দধারার নিকটবর্তী হয়েছ। তবে সাবধান! তুমি আমেরিকান মনীষী হেনরি ডেভিড থরো-তে পরিণত হয়ো না। আমার আবাদে থরোর অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারক হলে বিপত্তির কারণ ঘটবে। বছরে আমাকে সতের হাজার তিন শত ছিয়ানব্বুই টাকা নয় আনা তিন পাই খাজনা কালেকটরিকে আদায় দিতে হয়। জিগ্যেস করলাম, কেন থরোর কথা বলছেন? তখন দেবনারায়ণদা আমাকে একখানি বই এনে দিলেন। বইটি দিয়ে বললেন, ওয়াল্ডেন এবং ব্রহ্মপুর এক নয়। মানুষজনও পৃথক। তবু তুমি প্রকৃতির কথা বললে, সেইহেতু বইটি পড়ে দেখতে পার। আশা করি, ইংরাজি এতদিনে মোটামুটি রপ্ত করেছ। বইটির পাতা উলটেই একটি বাক্য চোখে পড়ল! চমকে উঠলাম। 'স্ট্রেনজ লিবার্টি!' সত্যই তাই। আমিও প্রকৃতিতে যাই এবং ফিরে আসি 'অদ্ভুত স্বাধীনতা' নিয়ে, সেই স্বাধীনতা প্রকৃতিরই অংশ! খুব মন দিয়ে বইখানি পড়তে শুরু করলাম। যেসব শব্দের মানে জানা নেই, অভিধান খুলে দেখে নিই।....

রূপান্তর ও জন্মান্তরবৃত্তান্ত

সে বছর ভালো বর্ষা হয়নি। 'আবাদ' অঞ্চল নিচু এবং কয়েকটি ছোট্ট নদীর অববাহিকা হওয়ায় মোটামুটি ফসলের আশা ছিল। এই নদীগুলির মধ্যে একমাত্র শঙ্খিনীকেই

নদী বলা চলে। বাকিগুলি নিতান্ত সোঁতা। এ অঞ্চলে এগুলিকে 'খাগড়ি' বলা হয়। উলুশরার অনাবাদি তৃণভূমিতে এমন একটি খাগড়ি দেখেছিলাম এবং একজন আশ্চর্য শাদা মানুষ (আরও আশ্চর্য, তাকে এখনও জিন বলে বিশ্বাস হয়, কিংবা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মতম সীমান্তে অভিজ্ঞতাটি ঘড়ির দোলকের মতো দোলে।) আমাদের পথ দেখিয়েছিল। কতকাল আগের কাহিনী বলে মনে হয়! সোঁতাগুলির কাছে গেলে স্বপ্নের মতো ফিরে আসে চৈত্রের একটি মেঘলা দুপুরবেলা। আরও আশ্চর্য কথা, 'আবাদে'র আরণ্য নিসর্গে যেন প্রত্যাশা করি শাদা কোনো জিনের! একদিন বিকেলে শঙ্খিনীর তীরে হিজলগাছের সেই ডালটিতে বসে একটি হ্রস্বাকার ইংরাজি বই পড়ার চেষ্টা করছি, সামান্য দূরে গাছপালার ভেতর দুটি লোককে দেখতে পেলাম। তারা ঘন ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল! কৌতূহলী হয়ে ডাল থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম হরিবাবু ওরফে হাজারিলাল কাঁধে কুড়ুল নিয়ে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে চাপা স্বরে কথা বলছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে হরিবাবু ইশারায় কাছে ডাকলেন। এই সময় বাঁদিকে গাছপালার ফাঁকে নদীতে একটা নৌকা দেখতে পেলাম। নৌকায় কয়েকজন দাঁড়িমাঝিশ্রেণীর লোক এবং তাদের দুতিনজনেব মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা। বুঝলাম ওরা পাইক এবং সশস্ত্র। কাছে গেলে হরিবাবু বললেন, শফি! ইনিই আমার বাবার নায়েবমশাই গোবিন্দরাম সিংহ। গোবিন্দবাবু চমকে উঠে বললেন, কী আশ্চর্য কী আশ্চর্য! নমস্কার! নমস্কার! আপনি মৌলাহাটের পিরবাবার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র? আপনার পিতাসাহেব আপনার জন্য—

দ্রুত বললাম, সেকথা নিষ্প্রয়োজন।

গোবিন্দবাবু একটু হেসে বললেন, এইমাত্র আপনার বৃত্তান্ত ছোটবাবুর নিকট অবগত হলেম। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য আগ্রহ হচ্ছিল! পরমেশ্বরের কৃপায় এই সৌভাগ্য লাভ হল। আপনি মহাপুরুষের সন্তান।

অয় ফরোগে মাহে হুস্ন্ অজ্ বুএ রুখশানে শুমা
অব্রু এ খুবি অজ্ চাহে জনখ্দানে শুমা...

এই ফারসি বয়েৎ আবৃত্তি করলেন গোবিন্দবাবু। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে হরিবাবু বললেন, আমার পিতাবাহাদুরের সংসর্গে গোবিন্দদা ফারসিনবিশ হয়েছেন। অবশ্য পিতাবাহাদুরের ফারসি শিক্ষা আর মুসলমানি কালচারের পশ্চাতে বিষয়স্বার্থ আছে। মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর নামক রঙিন পুতুলটিকে নিয়ে ইংরাজের সঙ্গে তিনি সমকুশলতায় খেলা করেন। গোবিন্দদা, সুজাপুর মহল আশা করি আপনার মনিবমহাশয়ের এতদিনে কুক্ষিগত হয়েছে?

গোবিন্দ ওঁর কথায় কান দিলেন না। আমার দিকে উজ্জ্বল, ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, পিরজাদা! আপনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে কবিবর হাফিজের এই বয়েৎটি আবৃত্তি করলাম। এই বয়েতে মুখশ্রীর প্রশংসা আছে।

আস্তে বললাম, আমি আরবি-ফারসি হরফ চিনি। অর্থ বুঝি না। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যেটুকু পড়েছিলাম, স্মরণ নেই! পরে আমি সংস্কৃত আর ইংরাজি পড়েছি।

হরিবাবু আমার কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন, শফির মুসলমানি আর নেই। সে রীতিমতো হিন্দু — তবে 'বেহ্মজ্ঞানী'!

গোবিন্দবাবু জিগ্যেস করলেন, আপনি কি সত্যই ব্রাহ্ম হয়েছেন?

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, আমি ধর্ম মানি না।

হরিবাবু অট্টহাসি হাসলেন। নিঝুম বনভূমি কেঁপে উঠল। গোবিন্দবাবুর মুখ দেখে মনে হল, সে কথা বিশ্বাস করেননি। বললেন, আপনি এভাবে পরিবারের সংশ্রব ত্যাগ করেছেন কেন, জানি না। হরিনারায়ণের এই অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন আছে, জানি। পিরবাবা এবং মৌলাহাটের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, আপনার সেরূপ প্রয়োজন ছিল না। তাঁদের ধারণা, পিরবাবার বৈরী কালোজিনেরা আপনাকে হত্যা করেছে। শফিসাহেব, আপনি যদি কারুর প্রতি অভিমানবশে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকেন, তাও আপনার চিন্তার ত্রুটি। গোস্তাফি মাফ করবেন একথার জন্য। বেশ তো! আপনি যদি পরিবারের সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে চান, থাকুন! কিন্তু জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী পিতা-মাতাকে অন্তত একখানি পোস্টকার্ডে ডাকমারফত জানিয়ে দিন যে, আপনি জীবিত এবং নিরাপদ। ঠিকানা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি এ বান্দাকে আজ্ঞা করেন, আমিও খুশহালে পোস্টকার্ড লিখে পাঠাব।

দৃঢ় স্বরে বললাম না।

হরিবাবু বললেন, গোবিন্দদা, দোহাই আপনার, শফির ব্যাপারে নাক নাই বা গলালেন? আর-একটা কথা, আপনি এভাবে আমার কাছে আর আসবেন না। আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবেন না আর! এখনও আমার জীবনের ব্রতপালন সম্পূর্ণ হয়নি।

গোবিন্দবাবুর মুখে দুঃখভাব ফুটে উঠল। আস্তে বললেন, হরিনারায়ণ! মায়াবশে আসি। তবে এবারকার আসার উদ্দেশ্য তোমার বোনের তাগিদে। সে তোমার জন্য এতই উদ্বিগ্ন যে আশঙ্কা হয়, দুর্বৃত্ত কালো জিনটি আবার তাকে না আক্রমণ করে। হরিনারায়ণ! মনুষ্যাত্মা দুর্বল হলে প্রেতশক্তি তাকে করায়ত্ত করে। মুসলমান মতে যা কালো জিন, খ্রিস্ট্রানিমতে তা স্যাটান, বৌদ্ধমতে তা মার, জরুথুস্ট্র মতে তা্ আহিরমান এবং হিন্দুমতে তা অশুভ প্রেতশক্তি।

বুঝলাম, এই গোবিন্দরাম সিংহ মহাশয় সুপণ্ডিত ব্যক্তি। কথাগুলি বিমর্ষভাবে বলেই তিনি নৌকার দিকে অগ্রসর হলেন। তখন হরিনারায়ণ তাঁকে অনুসরণ করে বললেন, ঠিক আছে। আপনি মাঘমাসে ব্রহ্মপুর আশ্রমে ব্রাহ্মদিগের মাঘোৎসব উপলক্ষে রত্নময়ীকে নিয়ে আসুন। স্বাধীনবালা নামে আশ্রমে একটি মেয়ে আছে। সে কৌশলে রত্নময়ীকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবে।

গোবিন্দবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, মাঘোৎসব কোন্ তারিখে?

আগামী ১১ই মাঘ।

গোবিন্দবাবু চলে গেলেন। নৌকাটি বাঁকের মুখে অদৃশ্য হলে হরিবাবু সশব্দে শ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমি বিপ্লবব্রত গ্রহণ করেছি। 'আনন্দমঠ' আমার জীবনের আদর্শ। কিন্তু দেখো শফি, মানবহৃদয় কী দুর্বল উপাদানে গঠিত! আমার বোন রত্নময়ীর উন্মাদদশার কারণ আমিই জানি! ভূতপ্রেত বাজে কথা! রত্নময়ীর মানসিক বৈকল্যের মূলে আমি! গোবিন্দদার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেছিলাম কেন জান কি? রত্নময়ীর শুভাশুভ জানবার জন্যই। তার সুস্থতার কারণ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তোমার পিতা নন, আমি। হ্যাঁ, আমিই।

আমি সুস্থশরীরে বেঁচে আছি জেনে রত্ন সুস্থ হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেই নেই।

কথা বলতে-বলতে হরিবাবু সেই হিজলগাছটির কাছে এলেন। কুড়ুলখানি মাটিতে সজোরে বিদ্ধ করে রেখে একটু হাসলেন। বললেন, প্রায়ই তুমি এখানে এসে বসে থাক দেখেছি। পাছে কেউ সন্দেহ করে, তোমার কাছে তাই আসি না। তবে তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে! এই সুযোগে বলে নিই। তোমার হাতে ওখানি কী বই?

বললাম, ফরাসি পণ্ডিত ভোলতেয়ারের লেখা। দেবনারায়ণদা পড়তে বলেছেন।

বইখানি দেখার পর হরিবাবু বললেন, তুমি হিউমের বই অবশ্য পড়বে। তিনিও একজন সুবিজ্ঞ দার্শনিক। যাই হোক, সেই কথাটা বলি। এবৎসর দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টি হয়নি। আকালের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্বাদ পেয়েছি বিহার মুল্লুকে ইতোমধ্যেই ভয়াবহ আকাল শুরু হয়েছে! তুমি কি লক্ষ্য করেছ, দলে-দলে ওই মুল্লুক থেকে সাঁওতাল-মুণ্ডারা বাঙলায় চলে আসছে? এই আবাদেও কয়েকটি দল এসে জুটেছে, জান কি?

হ্যাঁ। দেবনারায়ণদার কাছে শুনেছি। উনিও খুব উদ্বিগ্ন।

তিরু হাড়াম নামে একজনের কাছে 'বীরসা মহারাজ' নামে একজন মুণ্ডাসর্দারের বিস্ময়কর কীর্তিকলাপের কথা শুনলাম। সে নাকি শিক্ষিত লোক। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিল। তার কারাদণ্ড হয়। সম্প্রতি সে রাঁচি শহরের জেল থেকে মুক্তিলাভ করে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শুধু ইংরেজ নয়, দেশবাসী হিন্দুদের বিরুদ্ধেও তার ভীষণ আক্রোশ। আমাদের সে 'দিকু' বলে। একথার প্রকৃত অর্থ অসভ্য। বহু গ্রামে সে হানা দিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, দলে-দলে ওরা বাঙলায় আসছে, এই আবাদেও এসে জুটেছে, কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে কি না।

সম্বাদপত্রে পড়েছি এসব কথা। লাইব্রেরিতে কয়েকটি ইংরেজি-বাংলা সম্বাদপত্র আসে। হাসতে-হাসতে বললাম, সম্বাদপত্র মিথ্যাভাষী। কলিকাতার বাবুগণ স্বপ্নদর্শী।

হরিবাবুও হাসলেন। তুমি দেবনারায়ণবাবুর প্রতিধ্বনি করছ। তাঁর মতে, ব্রহ্মদের সম্বাদপত্র ছাড়া অন্যগুলিন মতিচ্ছন্ন ও মরীচিকাদর্শন করে। এবার আমার মুখে কিছু প্রকৃত সম্বাদ শ্রবণ করো। গোবিন্দদার কাছে যা শুনলাম, মনে হল, ইংরেজ কলেকটরি বরাবরকার রক্তপায়ী জীবের মতন এবারও অজন্মার ওজর গ্রাহ্য করবে না। জমিদারের উপর চাপ দেবে এবং তারা কৃষকদিগের উপর জুলুম করে খাজনা আদায় করবে। এর পরিণাম মর্মান্তিক হতে পারে। শফি, প্রস্তুত হও!

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, আবার কাকে হত্যা করতে হবে, দাদা?

হরিবাবু বললেন, এক নয়, একাধিক হত্যার প্রয়োজন হবে।

আমাকে নীরব দেখে একটু পরে হরিবাবু আস্তে বললেন, শফি, তুমি জন্মান্তরবার্দ কী জান কি?

জানি। কেন একথা?

হতে পারে তোমার জন্ম মুসলমান মাতার গর্ভে, কিন্তু তুমি পূর্বজন্মে অবশ্য

হিন্দু ছিলে।

সকৌতুকে বললাম, আপনি কি জানেন আমার দেহে মুসলমানদের পরমপুরুষ পয়গম্বরের কন্যার রক্ত আছে? আমরা সৈয়দ। আমার পিতামহ লখনউ শহরে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর পিতা ছিলেন পেশোয়ারবাসী। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তাই আমাদের বংশগত নামের সঙ্গে আলখোরাসানি যুক্ত আছে। খোরসান পারস্যদেশের অন্তর্গত।

আমাকে অবাক করে হরিদা বলে উঠলেন, শফি! শফি! তোমার দেহে তাহলে আর্যরক্তও আছে। তুমি মোক্ষমুলরের পুস্তক পাঠ করো। তুমি আর্য, আমিও আর্য। খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দ নাগাদ আর্যগণ ভারতে আগমন করেন। আর্যসভ্যতার কালে ইউরোপীয়রা নরমাংসভোজী আদিম জাতি ছিল! আর্যদের অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ এবং ঋষিদের বেদব্যাখ্যাই বেদান্ত! ব্রাহ্মগণ বেদান্তব্যাখ্যায় ভ্রান্ত। বেদমাতা গায়ত্রীই দশপ্রহরধারিণী দুর্গারূপে প্রকাশমানা হন। তিনিই ভারতবর্ষ। শফি, বন্দেমাতরম ধ্বনিতে ভারতাত্মার স্পন্দন আছে।

এই উচ্ছ্বসিত বাক্যসমূহ হরিবাবুর মুখ থেকে নির্গত হওয়ার কথা কল্পনাও করিনি। হাঁ করে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ তিনি কুড়ুলখানি কাঁধে তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, হেই সুধনিয়া! হুঁয়া ক্যা করছিস বে?

ঘুরে দেখলাম, সুধন্য আর বাঁকা বাগদি সামান্য দূরে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁকা লোকটিকে আমার পছন্দ হয় না। তাকে কোথায় যেন দেখেছি। ভগবানগোলায় মামুজির বাড়িতে যে ডাকাতদলটিকে দেখেছিলাম, তাদের একজনের চেহারার সঙ্গে বাঁকার অত্যন্ত মিল। একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।

সূর্য অস্তগামী। গাছপালার ফাঁক দিয়ে গোলাপি রোদ্দুর এসে পড়েছে এখানে। অন্যমনস্কভাবে ভোলটেয়ার সাহেবের বইখানির পাতা ওলটালাম। একখানে দৃষ্টি আটকে গেল — কী আশ্চর্য!

'Is it not quite natural that all the metamorphoses seen on earth led in the East, where everything has been imagined, to the notion that our souls pass from one body to anther ? A nearly imperceptible speck becomes a worm; this worm becomes a buttefly. An acorn is transformed into an oak, an egg into a bird. Water becomes cloud and thunder. Wood changes into fire and ashes. In short everything in nature appears to be metamorphosed... the idea of metapsychosis is perhaps the most ancient dogma of the known universe, and it still reigns in a large part of India and China.'

এদিন থেকেই আমার মনে এক চাপা আলোড়ন শুরু হয়। যখনই স্বাধীনবালাকে দেখতে পাই, তীব্র ইচ্ছা জাগে, তাকে বলি যে পূর্বজন্মে আমি কী ছিলাম বলে তার ধারণা হয়? হরিবাবু আমার দেহে আর্যরক্ত আবিস্কার করেছেন, একথাও তাকে বলার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তেজস্বিনী, মুখরা ওই যুবতীর প্রতি আমার বুঝি গোপন আতঙ্ক ছিল। তারক নরসুন্দর নামে একজন নাপিত সপ্তাহে দুদিন ব্রহ্মপুরে ক্ষৌরকর্মে আসত। খালের ধারে বটতলায় সে আশ্রমবাসীদের গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে দিত।

প্রবীণদের মধ্যে দাড়িগোঁফ রাখার ফ্যাশন ছিল। মধ্যবয়সী বা আমার মতো নবীন যুবকরা গোঁফ রাখার পক্ষপাতী ছিল। আমি অবিকল পান্না পেশোয়ারির গোঁফের অনুকরণ করেছিলাম। তারকের চৌকো আয়নাটিতে নিজের মুখ দেখতে-দেখতে নিজেই মুগ্ধ হতাম। সত্যিই আমি কবি হাফিজ-বর্ণিত মুখশ্রীর অধিকারী। কিন্তু ভোলটেয়ার মহোদয়ের সেই বাক্যগুলি পাঠের পর থেকে তারকের আয়নায় নিজের হিন্দুত্বের লক্ষণ খুঁজতাম। তারক সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইত, গোঁফের গড়নে কোনো হেরফের ঘটিয়ে ফেলেছে কি না। মৃদু হেসে বলতাম, আচ্ছা নরসুন্দরদাদা, সত্যি করে বলো তো আমাকে দেখে কি তোমার হিন্দু বলে মনে হয় ? তারক খুব রসিক লোক ছিল। বস্তুত এদেশে নরসুন্দরদের রসিকতা প্রথাসিদ্ধ এবং যত স্থূল হোক না কেন তারা সুযোগ পেলেই রসিকতা করবে। তা ছাড়া বহু লোক অথবা পরিবারের গোপন কেলেঙ্কারির তথ্য তার জানা থাকবেই। গালে জল ঘষতে-ঘষতে বা ক্ষুরটিকে চামড়ার ফালিতে শান দিতে-দিতে পছন্দসই মক্কেলকে সে সেই তথ্য পাচার করবেই। তো আমার কথায় তারক মুচকি হেসে বলত, মিয়াসাহেব। আপনি 'বড়খাসির' মাংস খাওয়া ছেড়েছেন বলেই আপনার রূপ খুলেছে। হ্যাঁ, কোন্ গুখেকোর বেটা বলে আপনি মোচলমান ? 'বড়খাসি' কথাটি গোরুর প্রতিশব্দ। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এই নরসুন্দর বা হিন্দু নাপিতরা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সদগোপ-গোপ প্রমুখ জাতির ক্ষৌরকর্ম যেমন করে, তেমনি মুসলমানদের ক্ষৌরকর্মেও তাদের আপত্তি নেই। এজন্য বার্ষিক কিছু ধান পায়। কিন্তু তারা কদাচ বাগদি কুনাই-কুড়র-হাড়ি-মুচি-ডোম প্রমুখ নিম্নবর্গীয়দের ক্ষৌরকর্ম করবে না। আবাদের নিম্নবর্গীয়দের জন্য হিন্দুস্থানী এক নাপিত বা হাজাম আসে। তার নাম ফাগুলাল। তার বাড়ি নুরপুরের চটিতে (ছোট্ট বাজার)। ফাগুলাল হাজাম আবাদ এলাকায় ঢুকলে হুলস্থূল পড়ে যায় দেখেছি। সে কেশবপল্লীর কাছে একটি প্রকাণ্ড গাবগাছের তলায় গম্ভীর মুখে বসে। হিন্দুস্থানী হাজামদের সঙ্গে বাঙালি হাজামদের আমূল ফারাক। ফাগুলালরা রসিক নয়, ভাঁড়ামি জানে না। একদিন দেবনারায়ণদার ঘরে কথা প্রসঙ্গে আমি এই বৈসাদৃশ্যের কথা তুললে উনি খুব হাসলেন। বললেন, তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ। তোমার পর্যবেক্ষণশক্তি অসামান্য। এবিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। ওইসময় বাঁকিপুরের ব্রাহ্মভ্রাতা গিয়াসুদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। নুরপুরের ধর্মসমন্বয়বাদী মৌলবি আফতাবুদ্দিন তাঁর আত্মীয় ছিলেন। গিয়াসুদ্দিন বললেন, আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপারে আমার চিন্তা হয়। সারা ভারতবর্ষ পানি বলে, শুধু বাঙালি হিন্দুরা জল বলেন। দেবনারায়ণদা অভ্যাসমতো বললেন, না গিয়াসভাই, দাক্ষিণাত্য বলে না। দেবনারায়ণদা বললেন, বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাঞ্চল একদা অনার্য-অধ্যুষিত ছিল। রামায়ণে সে বৃত্তান্ত আছে। ওখানকার ভাষা আর্যভাষা নয়। গিয়াসভাই ঠিক বলেছেন। আর্যভাষাভাষীরা সমুদায় পানিই বলে। আমরা শুধু জল বলি। শাস্ত্রীমহোদয় বললেন, অবশ্য পানি সংস্কৃত মূল থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু চিন্তা আছে। সবাই একগলায় বললেন, বলুন, বলুন। শাস্ত্রী মহোদয় বললেন, আমার দেশভ্রমণের বাতিক আছে। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করেছি। তবে আর্যাবর্তে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি। ধর্মব্রতী অংশ বাদে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বিদ্যমান। পোশাকপরিচ্ছদ,

ভাষা, এমন কি হিন্দু আর মুসলমানের নামেও ঐক্য সুপ্রচলিত। কিন্তু বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বিস্তর অনৈক্য। এই প্রদেশ ছাড়া কুত্রাপি মুসলমানদের যবন অথবা নেড়ে বলা হয় না। এ প্রদেশে আরও প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। গিয়াসুদ্দিনও পণ্ডিত ব্যক্তি। একটু হেসে বললেন, ইতিহাসবহির মর্মানুসারে সিদ্ধান্ত হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাপে বৌদ্ধরা আর্যাবর্ত থেকে পূর্বখণ্ডে চলে আসেন। তাঁর ছিলেন মুণ্ডিতমস্তক। এতৎপ্রদেশেও ব্রাহ্মণ্যপ্রকোপে তাঁরা মুসলমান হন। সেজন্য সমূহ মুসলমানসম্প্রদায়কে 'নেড়ে' বলা স্বাভাবিক। দেবনারায়ণদা তাঁর উদাত্ত হাসি হেসে বললেন, ব্রাহ্মভ্রাতা গিরিশচন্দ্র সেনকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় পবিত্র কোরানগ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দেন। একযুগ পূর্বে তিনি নিজে লখনউ থেকে আরবিভাষা শিখে মহৎ কর্মটি সুসম্পন্ন করেছেন। এতে আনন্দিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁকে মৌলবি খেতাব দিয়েছেন। কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দুদিগের নেতৃবৃন্দ চটে আগুন। তারা গিরিশবাবুকে যবন, নেড়ে ইত্যাদি গালি দিচ্ছে। তাতে দুঃখ নেই। শুধু দুঃখ যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অনুবাদ সমাপ্ত দেখে যেতে পারেননি। আপনারা জানেন কি, বঙ্গপ্রদেশের বহু মুসলিমকন্যা ভ্রাতা গিরিশচন্দ্রকে পিতা সম্বোধন করে চিঠি লেখেন? মুসলিম ভাইরা তাঁকে ভাই গিরিশচন্দ্র বলে সম্ভাষণ করেন। গিয়াসুদ্দিন সসম্ভ্রমে বললেন, গত বছর কলিকাতায় তাঁর দর্শনলাভ করে ধন্য হয়েছি। আফতাবুদ্দিন সম্প্রতি কলিকাতা গিয়াছেন। একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশের অভিপ্রায় আছে। তাঁর পত্রে অবগত হলেম, গিরিশভাই অসুস্থ। এই সময় শাস্ত্রী-মহোদয়ের চোখ পড়ায় আমাকে বললেন, শফি! তুমি চুপ করে আছে কেন? তুমি শুনলাম ইংরাজি-নবিশ হয়ে উঠেছ। আলোচ্য বিষযে তোমার কোনো প্রস্তাব থাকলে বলো। আমার মুখ দিযে বেরিযে গেল, জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে আপনার কী মত? শাস্ত্রীমহোদয় যেমন, তেমনি সভাস্থ সকল প্রবীণই অট্টহাসি হেসে উঠলেন। দেবনাবায়ণদা বললেন, জন্মান্তরবাদ অসিদ্ধ। জীবাত্মা মৃত্যুর পর পরমাত্মায় বিলীন হয়। হৃদয়নাথ বললেন, জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। পরমাত্মা মহাসমুদ্রবৎ। যেরূপ মহাসমুদ্র থেকে মেঘের উদ্ভব এবং বারিবিন্দু বর্ষিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত হয়। বারিবিন্দু আবার মহাসমুদ্রে গমন করে। এই সৃষ্টিচক্র অনন্তকাল ধরে চলেছে। এবার বলো, ইউরোপীয় সাহেবগণের এবিষয়ে কী মত? আমি ভোলটেয়ারের বইখানির কথা তুলব ভাবলাম। কিন্তু কী লাভ? দেবনারায়ণদা বললেন, হঠাৎ তোমার মাথায় এই প্রশ্ন জাগার কারণ কী, শফি? অগত্যা বললাম, তারক নরসুন্দর বলে, আশ্রমের ভোজনশালার আনাচে-কানাচে যে কুকুরগুলান ঘুরঘুর করে, তারা তাকে দেখলেই ঘেউঘেউ করে কেন? তারা পূর্বজন্মে সকলেই তার মক্কেল ছিল। তারা ক্ষৌবকর্ম করতে চায়। আমার কথা শুনে সভায় আবার অট্টহাসি উঠল। তখন আমি ভাবলাম, তারকের প্রভাবে আমি সম্ভবত কিছুটা রসিক হতে পেরেছি। অথবা আমি বছরের পর বছরের জমে-ওঠা বুকের ভেতরকার শীতলতা সহ্য করতে আর পারছি না বলেই পরিহাস-উন্মুখ হতে চাইছি? সেদিন বিকেলে একটি ঘটনা ঘটল। খালের ধারে বটগাছটার দিকে যাওয়ার সময় স্বাধীনবালার মায়ের মুখোমুখি হলাম। সুনয়নীর কুটিরের চারদিকে ফুল ও ফলের গাছ। সারাদিন ওঁকে ফুল-ফলের গাছের

পরিচর্যারতা দেখতাম। তাঁর স্বামীর ঘাতকের মৃত্যুর পর কিন্তু তিনি এতদিনে একবারও আমাকে অন্তত আভাসেও জানতে দেননি, তাঁর কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। স্বাধীনকেও এবিষয়ে কোনো প্রশ্ন করিনি। এদিন সুনয়নী মৃদুস্বরে আমাকে ডাকলেন, বাবা! শোনো। কাছে গিয়ে কী হল, প্রণামের জন্য নত হলাম। অমনি তিনি যেন সসংকোচে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। থাক্ বাবা, থাক্। আশীর্বাদ করি, দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করো। তোমাকে গোপনে একটা কথা বলতে চাই বলেই ডাকলাম। আস্তে বললাম, বলুন! সুনয়নী চারপাশ দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বললেন, কাউকে যেন বোলো না বাবা! তুমি মুসলমানের ছেলে বলেই বলতে সাহস পাচ্ছি। এখানে আমার মন তিষ্ঠোতে পারছে না। ছত্রিশ জেতের লোক একসঙ্গে খাচ্ছেদাচ্ছে। বাবা, আমি হিন্দুর মেয়ে। আমার এসব মেলেচ্ছ আচার সহ্য হচ্ছে না। এখানে আর কিছুদিন থাকলে আমি মরে যাব। আমি জানি, তুমি বাবামায়ের ওপর রাগ করে এখানে আশ্রয় নিয়েছ। তুমি মুসলমান। তুমিও এখানে বেশিদিন থাকবে না — থাকতে পারবে না। তাই তোমাকেই বলছি। সুনয়নী চুপ করলেন। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে বললেন, আমার আরও চিন্তা খুকুর জন্য। সে এখানে এসে যেমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, ভয় হয়, সে নষ্ট হয়ে যাবে। বাবা শফি, তুমি যদি রেতের বেলা দোপুকুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এস আমাদের, আমরা বহরমপুরে ফিরে যেতে পারব। দোপুকুরিয়ায় খুকুর বাবার এক জ্ঞাতি আছেন শুনেছি। নাম জানি না। সে আমরা খুঁজে বের করে নেব। সুনয়নীর এই কথা শুনছিলাম আর তাঁর কুটির ও ফুল-ফলের গাছগুলি দেখছিলাম। খুব বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। বললাম, স্বাধীন কী বলে? সুনয়নী বললেন, ওকে বলব দোপুকুরিয়ায় ওর কাকার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আসলে আমি স্ত্রীলোক, সঙ্গে উঠন্তবয়সী মেয়ে, রাতবিরেতে যাওয়ার সাহস নেই। সঙ্গে একজন শক্তসমর্থ পুরুষমানুষ থাকা দরকার। খুকুর কাছে শুনেছি, তুমি খুব ডানপিটে ছেলে। লাঠিখেলা তরোয়ালখেলা জান। কোন্ গুণ্ডাকে তুমি নাকি মেরে নাকাল করেছ। আরও শুনেছি, তোমার সঙ্গে খুকুর বাবার খুব চেনাজানা ছিল। একটু হেসে বললাম, ছিল। যামিনীবাবু আমাকে তাঁর বিপ্লবী দলে টানতে চেয়েছিলেন। এতক্ষণে সুনয়নী আমার খুব কাছে এলেন। ফিসফিস করে বললেন, জানি। খুকু বলেছে, তুমি মুসলমান হয়েও বন্দেমাতরমদলের লোক। তোমার কাছে নাকি খুকুর বাবার মতন পিস্তলও আছে। স্বাধীনবালার মায়ের এই কথায় চমকে উঠলাম। ভাবলাম, এতসব বলেছে স্বাধীন, কিন্তু কেন বলেনি যে আমি স্ট্যানলিকে খুন করেছি? বললাম, আপনি তো ইচ্ছে করলে দিনেই দেবনারায়ণবাবুকে বলে দোপুকুরিয়া চলে যেতে পারেন! আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি বললে তিনি বাধা দেবেন কেন? বরং পালকির ব্যবস্থা করেও দেবেন। সুনয়নী ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, বলেছিলাম। উনি ঠাট্টা করে বললেন, তুমি 'বেহ্ম' হয়েছ। কেউ তোমাকে নেবে না। বাড়ি ঢুকতে দেবে না। আসলে আমি বুঝতে পেরেছি, খুকুকে উনি কাজে লাগিয়েছেন। ছোটোলোকেদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য খুকুর মতন মেয়ে আর পাবেন কোথায়? তাই ওকে আটকে রাখতে চান। বাবা শফি, তোমাদের আল্লাপির-ভগবানের দোহাই, আমাকে মা বলে জেনো — যেন এসব কথা কারুর কানে যায় না।

আপনাকে কাল একসময় বলব। বলে খালের দিকে না গিয়ে বাঁধের পথে উঠলাম। তারপর মনে হল, আমি কি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম ? কেশবপল্লীতে হাজারিলালের কুটিরের দিকে অন্যমনস্কভাবে হেঁটে চললাম। কুটিরের কাছাকাছি পৌঁছে বাঁধের ডানদিকে নীচের আবাদি জমির একধারে একটি গাছের দিকে দৃষ্টি গেল। সেখানে উজ্জ্বল রোদ পড়েছিল। হাজারিলাল একটা কোদালের বাঁটে বসে আছেন এবং তাঁর মুখোমুখি বসে আছে স্বাধীনবালা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় মারল কেউ। দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালাম ? কেউ তো নেই! অথচ শরীরে কোথাও চপেটাঘাতের জ্বালা! শিউরে উঠলাম।...

'Angelos Satan me colaphiset!'

ওই অলৌকিক থাপ্পড়টি আমার পিতার প্রেরিত কোনো জিনের ; এই ধারণার পিছনে পূর্বসংস্কারের তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ অনস্বীকার্য। সত্যি বলতে কী, বেশ কিছুদিন আমি খুব ভীত আর আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। ওই কয়েক দণ্ডের জন্য আমি নিতান্ত অবোধ বালকে পরিণত হয়েছিলাম যেন। তাহলে কি সত্যিই পিতার প্রেরিত জিনেরা নিরন্তর আমার পাহারায় রত ? একজন হিন্দুকন্যার প্রণয়াসক্ত যাতে না হই, যাতে তজ্জনিত ঈর্ষায় আক্রান্ত না হই, সেই কারণে আমাকে সতর্ক করা হল! আমার বুজুর্গ পিতা অবশ্যই জানেন আমি কোথায় আছি। পান্না পেশোয়ারিকে আঘাত করা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমি অত্যন্ত নিরাপদ। এর একটাই ব্যাখ্যা হয়। লালবাগ শহর থেকে এক জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় পালিয়ে আসার মুহূর্ত থেকে পিতা তাঁর অনুগত জিনের মারফত আমার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। অতএব, আমি তাঁর অনভিপ্রেত কাজ করব না। ঠিক করলাম, স্বাধীনবালাকে ঘৃণা করতে থাকব। তার দিকে চোখ তুলে চাইব না। এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বাঁধ ধরে এগিয়ে বাঁদিকে নেমে শঙ্খিনীর ধারে সেই হিজলগাছটার কাছে যাবার উপক্রম করছি, পিছনে 'হাজারিলালের' চিৎকার শুনতে পেলাম, শফিসাব! ঠারিয়ে! ঠারিয়ে! ঘুরে দাঁড়ালাম! 'হাজারিলাল' ফের চেঁচিয়ে বললেন, থোড়াসা বাত আছে আপনার সোঙ্গে। দেখলাম, ওরা দুজনেই হেমন্তের হলুদধানখেতের আল দিয়ে জোরে হেঁটে আসছে। কাছে আসার পর প্রথমে স্বাধীনবালাই কথা বলল। শফিদা! দুপুরে তুমি কোথায় ছিলে ? দেবুজ্যাঠা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন — দেখো না, কী ঝামেলা! তার হাতে কিছু কাগজ আর একটি পেন্সিল ছিল। তার দিকে না তাকিয়ে বললাম, কী ঝামেলা ? জবাব দিলেন হরিবাবু। বাঁকা হেসে বললেন, দেবেন্দ্রপল্লীতে স্ত্রীলোক-গণনা। কেউ দেবনারায়ণবাবুর কানে তুলেছে, দেবেন্দ্রপল্লীর স্ত্রীলোকেরা নাকি মূর্তিপুজা করে। তাই ব্রহ্মমন্দিরের সান্ধ্য উপাসনায় তাদের উপস্থিতি বিরল। হাসবার চেষ্টা করে বললাম, দেবনারায়ণদা কি এবার হাজিরা খাতা খুলবেন নাকি ? হরিবাবু বললেন, বড়োলোকের নবাবি খুশখেয়াল। খুলবেন বলেই মনে হচ্ছে। স্বাধীনবালা বলল, নাম লিখতে গিয়ে হাজার কৈফতের ঠ্যালায় অস্থির। চাষাভুষো লোক ওরা। ভাবল, খাজনার অঙ্ক বাড়বে। বলে আমার দিকে তাকিয়ে চোখে ঝিলিক তুলল।

বলল, কাল তোমাকে নতুন-পল্লীতে পাঠাবেন — ওই যে দেখছ, সাঁওতালদের বসতি, ওখানে। না — ভয় পেয়ো না ! ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে নয়, লোকগণনায়। এই সময় হরিবাবু চাপা স্বরে বললেন, শফি ! আগামীকাল সন্ধ্যায় তুমি কোনোপ্রকারে আমার কুটিরে আসবে ? বিশেষ প্রয়োজন। বললাম, আসব। বলে বাঁধ থেকে নামতে যাচ্ছি, স্বাধীনবালা বলল, শফিদা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ? চলো, আমাকে আশ্রমে পৌঁছে দেবে। বললাম, কেন ? এখনও তো সন্ধ্যা হয়নি। হরিবাবু বললেন, আমিই যেতাম — যেতে হত। বিজয়পল্লীতে ইদানীং কিছু অবাঞ্ছিত লোক উপদ্রব করছে। তারা নেশাভাং করে এসময় উন্মত্ত থাকে। দেবনারায়ণবাবু জানেন। কিন্তু বাঁকা সর্দার নামে বিজয়পল্লীর যে মোড়লটি জুটেছে, সে ওঁর স্নেহধন্য। জমিদারি রক্ত, শফি ! সকলে তো আমার মতো সংস্কারবর্জন করতে পারে না। বাঁকা কুখ্যাত ডাকাত ছিল। পরে সে লাঠিয়ালি পেশা গ্রহণ করে। দেবনারায়ণবাবুর দক্ষিণ হস্ত সে। জানি না, লোকটির আমার হাতে মৃত্যু আছে কি না। স্বাধীনবালা বলল, চুপ করো, হরিদা ! সর্বত্র বীরত্ব দেখানো ঠিক নয়। শফিদা, বিজয়পল্লী বা বাঁকা-টাঁকার জন্য নয়,— সে একটু হাসল...ইদানীং আমার ভূতের বড়ো ভয়। হরিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, স্ট্যানলির ভূত। স্বাধীনবালা বলল, চুপ করো ! শফিদা, লক্ষ্মীটি ! আশ্চর্য, যখন ওর সঙ্গে পা বাড়ালাম, নিজের থাপ্পড় খাওয়ার অস্বস্তিকর জ্বালাটি আর নেই। আর সেই মুহূর্তে ঘৃণা করার ইচ্ছাটিও ঘুচে গেল। চারিদিকে কুয়াশার সঞ্চার। গাছে-গাছে পাখিরা তুমুল কলরব করছে। ইতস্তত পল্লীগুলিতে শান্ত নীরবতা এবং শঙ্খধ্বনি। ডাকলাম, খুকু ! স্বাধীনবালা প্রচণ্ড চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। বলল, আমার ডাকনাম তোমাকে কে বলল ? বললাম, তোমার মা। স্বাধীনবালা চুপ করে গেল। তখন বললাম, খুকু ! তোমার মা আমাকে আল্লাপির-ভগবানের দোহাই দিয়ে কথাটি বলতে নিষেধ করেছেন কাউকে। কিন্তু আমি ধর্ম মানি না। তাছাড়া কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনবালা থমকে দাঁড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কী কথা শফিদা ? একটু ইতস্তত করে বললাম, তুমি শিক্ষিতা। বুদ্ধিমতী। কলহ না করে মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিও। তবে কথাটি গোপন না রেখে তোমাকে বলার কারণ — আমি থেমে গেলে স্বাধীনবালা বলল কী ? চুপ করে থেকো না ! আমি নির্বোধের হাসি হেসে বললাম, হরিবাবু তোমার জন্য কষ্ট পাবেন ভেবেই কথাটি বলা দরকার। স্বাধীনবালা আবার চমকে উঠল। আবছা আলোয় তারে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত এবং চোখে ছটা দেখতে পেলাম। কিন্তু হঠকারী তাড়নায় আমিও উত্তেজিত। সুনয়নীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা দ্রুত এবং সংক্ষেপে ওকে জানিয়ে দিলাম। স্বাধীনবালার প্রতিক্রিয়া ম্লান হাসিতে প্রকাশ পেল মাত্র। শ্বাস ছেড়ে সে বলল, আমি জানি। মায়ের এখানে থাকতে কষ্ট হয়। মানিয়ে চলতে পারে না। তবে এ কোনো নতুন কথা নয়। মা আমাকে বহুবার বলেছে, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু মা বুঝতে পারছে না, কোথায় গিয়ে উঠবে ? কী খেয়ে বেঁচে থাকবে ? বহরমপুরে — তুমি জান না — আমরা পরাশ্রিতা ছিলাম। আমিই দেবুজ্যাঠাকে চিঠি লিখি। তখন উনি আমাদের নিয়ে আসেন। সে এতক্ষণে পা বাড়াল। খুব নিস্তেজ তার গতি। একটু পরে ফের বলল, তবে তুমি হরিদা আর আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ কর তা ভুল। আমি হরিদাকে শ্রদ্ধা করি। তার

দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং কষ্টস্বীকারের মধ্যে বাবাকে দেখতে পাই। স্বাধীনবালার কণ্ঠস্বর শুনে দুঃখিতভাবে বললাম, তুমি কি কাঁদছ, খুকু ? আমাকে ক্ষমা করো। আমার চোখে পাপ আছে। মুসলমান শাস্ত্রে পাপকে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ বলা হয়। খুকু কিছুক্ষণ আগে আমি যখন তোমাদের একত্র বসে থাকতে দেখি, তখন একটি অদৃশ্য হাতের থাপ্পড় খেয়েছিলাম, জান কি ? স্বাধীনবালা কোনো কথা বলল না। বললাম, থাপ্পড়টি জিনের ভেবেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, শয়তান আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল। মনীষী ভোলটেয়ারের দর্শনগ্রন্থে পড়েছি, বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, সেন্ট্ পলকে শয়তান একবার চপেটাঘাত করেছিল। Angelos Satan me colaphiset স্বাধীনবালা সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার বাঁ হাতটি ধরে বলল, শফিদা ! আমাকে ভুল বুঝো না ! তার হাতের স্পর্শে আমার হাত মুহূর্তে নিঃসাড় হয়ে গেল। পরক্ষণে সে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমার প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। তবে একটা কথা তোমাকে জানানো উচিত। আমাকে ঈশ্বর অনেক কিছু দান করেছে। একটি জিনিস বাদে। সে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকলে আস্তে বললাম, সেটি কী খুকু ? স্বাধীনবালা ফের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, পুরুষের প্রতি প্রেম। শফিদা এ জীবনে কোনো পুরুষ মাথা ভেঙেও এই জিনিসটি আমার কাছে পাবে না। দ্রুত বললাম, কেন ? স্বাধীনবালা এ প্রশ্নের জবাব দিল না। চলার গতি বাড়িয়ে দিল। আশ্রম পর্যন্ত আর একটি কথাও বলল না। তখন মন্দিরে আসর বসেছে। বেদিতে বসে দেবনারায়ণদা উদাত্তস্বরে উপনিষদ পাঠ করছেন। বহুশ্রুত কঠোপনিষদের একটি শ্লোকের সঙ্গীতময় ধ্বনিযুক্ত ভেসে এল কানে ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ

পরদিন সকালে গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে একজন মুসলমান যুবক আশ্রমে এলেন। গিয়াসুদ্দিন আমাকে দেখিয়ে তাঁকে সহাস্যে বলে উঠলেন, এই সেই পলাতক পিরজাদা। শফি ! এঁর নাম দিদারুল আলম। নুরপুরে নিবাস। তবে বহরমপুর শহরে ওকালতি করেন। আমার আত্মীয়। দিদারুল হাত বাড়িয়ে বললেন, আস্‌সালামু আলায়কুম ! বহুকাল পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রত্যুত্তর দিলাম এবং আমার কণ্ঠস্বর আড়ষ্টতা ছিল। দিদারুল গম্ভীর মুখ বললেন, আপনার আব্বাসাহেব আমাদের গ্রামে এসেছেন জানেন কি ? বললাম, না। দিদারুল বললেন, আপনার কথা গিয়াসভাইয়ের কাছে শোনামাত্র ছুটে এসেছি। একটু আড়ালে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। গিয়াসুদ্দিন বললেন, আমি দেববুভাইয়ের কাছে গিয়ে বসছি। তোমরা কথা বলো। দিদারুল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলুন। ওই খালের ধারে যাই ! আকস্মিকতার ধাক্কা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছি। শক্ত মনে খালের ধারে একটি জামগাছের তলায় গেলাম। দিদারুলের পরনের আচকান, মাথায় লাল তুর্কি টুপি, গোড়ালির উর্ধ্বে পায়জামা দেখে বুঝলাম এই নবীন উকিল ফরাজি। তিনি বিনা ভূমিকায় ভর্ৎসনার সুরে বললেন আপনি সৈয়দবংশীয়। আপনার আব্বা বুজুর্গ আলেম। অথচ আপনি এই হিন্দুদিগের আশ্রমে হিন্দু লেবাস (পোশাক) পরে হিন্দু চেহারা নিয়ে বাস করছেন ? তওবা, আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ ! এ আপনি কী করছেন ? যারা হিন্দুস্থানে সাতশো বছরের মুসলমান তহ্‌জিব-তমুদ্দনকে নাকচ করে

খ্রীস্টানশাহির মদতে বেদ-রামায়ণ-মহাভারতের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, আপনি তাদের কদমে কদম মিলিয়েছেন, ভাই ? আপনি নাকি প্রচুর কেতাব পাঠ করেন। আপনি বুঝতে পারছেন না — ডোণ্ট আনডারস্ট্যানড দ্যাট দা হিন্দুজ আর ডেলিবারেটলি ট্রাইং মিসলিড দেয়ার নিউ জেনারেশন ? দে আর মিসাইনটারপ্রিটিং দা হিস্ট্রি ! এডুকেশনাল কারিকুলাম পর্যন্ত অভিসন্ধি প্রণোদিত ! আপনি ব্রাহ্মদিগের লিবার‍্যাল অ্যাটিচ্যুডের কথা বলতে পারেন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মদিগের লাইন চেঞ্জ হয়ে গেছে। বিস্তর দলাদলি চলেছে তাঁদের মধ্যে। কিন্তু একটা বিষয়ে সকলের এক রা। হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন। যা কিছু মুসলমানের, তা পরিত্যাজ্য। বাঙ্গালা ভাষা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে আরবি-ফার্সি-তুর্কি বর্জন চলেছে। সংস্কৃতেব আধিপত্য — দিদারুলকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আপনিও কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করছেন ! দিদারুল হাসলেন। বললেন, অভ্যাস। বলেই শব্দটি বদলালেন, খাসিয়াৎ। তবে আমি একথা মানি না যে বাঙালি মুসলমানের জবান হবে উরদু। যাই হোক, ভাই শফিউজ্জামান আপনি সৈয়দ। আপনার দেহে পাক খুন বইছে। আপনাকে আমাদের সমাজের খুবই প্রয়োজন। আপনাকে আমি নিতে এসেছি। এখনই আমার সঙ্গে নুরপুরে চলুন। আপনার আব্বাসাহেবের কদম-মোবারকে (পবিত্র পদে) হাজের হলেই শয়তান আপনার সঙ্গ ছেড়ে ভেগে যাবে। দিদারুল হাসতে থাকলেন। আমার ইচ্ছা করল, এই উকিলটিকে স্ট্যানলির পিস্তলদ্বারা হত্যা করি। কিন্তু পিস্তলটি আমার ঘরে লুকানো আছে। আমি চুপ করে আছি দেখে দিদারুল আমার একটা হাত ধরে টানলেন। অমনি হাত এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, আপনি এখনই আশ্রম ছেড়ে চলে যান। যদি না যান, বিপদে পড়বেন। দিদারুল স্তম্ভিত হয়ে বললেন, সে কী কথা ! বললাম, আপনি যদি গিয়াসসাহেবের সঙ্গে না আসতেন, আপনাকে — আমি থেমে গেলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, সৈয়দজাদা ! এখনও হিন্দুস্থানে মুসলমান তত কমজোর হয়ে পড়েনি ! আপনার আব্বাসাহেবকে খবব দিলে তমাম এলাকার মুসলমান এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয়, আপনার ওপর জবরদস্তি করি। আপনি আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি কি ভেবেছেন, হিন্দুরা আপনাকে আপন বলে গ্রহণ করবে কোনোদিন ? সৈয়দজাদা। এ আপনার আকাশকুসুম খোয়াব। হিন্দুদিগের আপনি চেনেন না। যারা নিজেদের মধ্যে একজাতি অপরজাতিকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, তারা মুসলমানকে ভেতর-ভেতর কী চোখে দেখে, নিজেই ভেবে দেখুন। এবার আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। দ্রুত স্থানত্যাগ করলাম। দিদারুল গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি প্রায় শুকিয়েপড়া খালটি এক লাফে ডিঙিয়ে মাঠে গিয়ে পড়লাম। তারপব হলুদ এবং ভূলুণ্ঠিত পাকা ধানখেতের ভেতর দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন হাঁটতে থাকলাম। তখনও রাতের শিশির শুকোয়নি। হাঁটু পর্যন্ত ভিজে গেল। কোথায় সামান্য জলকাদা, কোথাও ঝোপজঙ্গল। সবখানে মাকড়সার জালে শিশিববিন্দুগুলিন ঝলমল করছিল। শঙ্খিনীর তীরে সেই হিজলগাছটির কাছে পৌঁছে মনে হল, আমি নিরাপদ। আঃ। কী রাজার ঐশ্বর্য চতুর্দিকে দীপ্যমান। কী রহস্য ওই অরণ্যের বুকে ঘননীলবর্ণ কুয়াশায়। কোথায় পাখি ডাকল। এই তো সেই পবিত্র ভূমি — যেখানে পৌঁছুলেই মনে হয়, কেউ একজন আছে, যে চিরকালের

নারী, যার জন্য পুরুষদিগের জন্ম, যাকে লক্ষ্য করে সমুদয় কবিগণ কবিতা রচনা করেন, 'Whose heart-strings are a lute'। শঙ্খিনী নদীর জলে পা ধুয়ে এসে মাটির সমান্তরাল হিজল ডালটিতে বসামাত্র মনে হল, কী আশ্চর্য! এই তো আমার রাজত্ব। কার সাধ্য আমাকে এখান থেকে স্থানচ্যুত করতে পারে?

I am monarch of all I survey,
My right there is none to dispute.......
[William Cowper (1731-1800)]

He says that woman speaks with Nature.
That she hears voices from under the earth.
That wind blows in her ears and trees whisper to her. That the dead sing through her mouth...
Woman and Nature—Susan Griffin

কচি ॥ বড়ো আব্বা ইকরাতনকে কেন তালাক দিয়েছিলেন, দাদিমা?

দিলরুখ বেগম ॥ সে ডাহিন আওরত ছিল।

কচি ॥ ডাহিন — ডাইনি? ডাইনি কী দাদিমা?

দি বেগম ॥ তারা নাঙ্গা হয়ে রেতের বেলা মাথায় চেরাগ জ্বেলে মাঠে-জঙ্গলে যায়। তারা গাছপালার সঙ্গে কথা বলে। হাওয়ার সুরে গাওনা করে। সেই গাওনা শুনে মুর্দারা কবর থেকে উঠে আসে।

কচি ॥ বোগাস! তোমাদের যুগের লোকেরা এক্কেবারে বাজে ছিল।

দি বেগম ॥ কচি! ইকরাতন সত্যিই ডাইনি ছিল। এক নিশুতি রেতে আয়মনিখালা আমাকে আর শাশুড়িসাহেবাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেখিয়েছিল। পুকুরের ওপারে খোঁড়াপিরের দরগায় ইকরাতন নাঙ্গা হয়ে মাথায় চেরাগ জ্বেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ও যে হিঁদুর মেয়ে ছিল, তা জানিস?

কচি ॥ বলেছিলে। আবদুল ডাকাত তাকে ভাগিয়ে এনেছিল!

দি বেগম ॥ ভাগিয়ে না, জবরদস্তি তুলে এনেছিল। তখন হিঁদু মরদের মউত হলে তার আওরতকেও মুর্দার সঙ্গে পুড়িয়ে মারত। আবদুল ওকে শ্মশানের চিতে

থেকে—

কচি ॥ কিন্তু তখন তো সতীদাহ অলরেডি বে-আইনি ! পুলিশ কী করছিল ? (একটু পরে) হুঁঃ ! পুলিশ যা করে, দেখতেই তো পাচ্ছি। খোকা ঠিকই বলে।

দি বেগম ॥ সেই দেখার পর শাশুড়িসাহেব পরদিন ইকরাতনকে ডেকে পাঠালেন। খুব নসিহত (ভর্ৎসনা) করলেন। বললেন, বউবিবি ! তুমি একে কলমা শেখাও। নামাজ পড়া শেখাও। ইকরাকে বললেন, তুমি রোজ দুকাঠা চাল পাবে। রোজ দুবেলা বউবিবির কাছে এসে ইসলামি এলেম তালিম করো। তাজ্জব লাগে বে ! ইকরাতন তারপর থেকে রোজ দুবেলা আসত। তাকে কোরানশরিফের 'আমপারা' পুরো মুখস্থ করিয়েছিলাম।

কচি ॥ (উত্তেজিতভাবে) দাদিমা ! বুঝতে পেরেছি, ইউরেকা !

দি বেগম ॥ কী হল ? চেঁচিয়ে উঠলি কেন ?

কচি ॥ তুমি বলছিলে ? বড়ো আব্বার নজর পড়েছিল মেয়েটার দিকে। বড়ো আম্মা তাই তাঁর হবু সতীনকে তৈরি করছিলেন।

দি বেগম ॥ কার দেলের (হৃদয়ের) কথা কে জানে ভাই ? তো নুরপুরে তাকে নিকাহ্ করে শ্বশুরসাহেব প্রায় একবছর থেকে গেলেন। এদিকে ওঁর এবাদতখানায় আলি বখ্‌শ্ একলা থাকতে নারাজ। রোজ রেতে তাকে নাকি কালা জিনেরা এসে জ্বালাতন করে। তখন আনিসুর সর্দার আর সব মাথা-মাথা লোক তোর দাদাজিকে বললেন, পিরজাদা ! আপনি গিয়ে এবাদতখানায় থাকুন। লোকেরা এসে হুজুরের নামে দানখয়রাত করছে। সব আলি বখ্‌শ্ মেরে দিচ্ছে। তাই নিয়ে ভাসুর-সাহেবের সঙ্গে আলি বখ্‌শের খুব কাজিয়া হত। উনি পয়জার মেরেছিলেন আলি বখ্‌শকে। সেই থেকে মাতব্বররা রফা করে দিলে। তোর দাদাজি গিয়ে এবাদতখানায় বহাল হলেন। শুনেছি, এবাদতখানায় উনি নামাজ পড়তেন আর সেই নামাজের সময়ে ওঁর পেছনে কাতার (সারিবদ্ধ) দিয়ে শাদা জিনেরা নামাজ পড়ত। ল্যাংড়াভ্যাংড়া মানুষ। কিন্তু খুব সাহসী আর গোঁয়ার ছিলেন। খুব বদমেজাজিও।

কচি ॥ তুমি তোমার স্বামী সম্পর্কে যখনই কথা বল, লক্ষ্য করেছি, বড্ড তুচ্ছতাচ্ছিল্য কর ওঁর সম্পর্কে ! কী ব্যাপার ?

দি বেগম ॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) কচি ! ছোটো মুয়ে বড়ো বাত কবি না।

কচি ॥ (হাসতে-হাসতে) ঠিক আছে বাবা ! তোমাদের প্রাইভেট ব্যাপারে নাক গলাব না ! এবার বলো, কেন বড়ো আব্বা ইকরাতনকে তালাক দিলেন ? ও দাদিমা ! প্লিজ ! আর কখনো ওকথা বলব না। বলো না কেন ইকরাতন বিবিকে তালাক দিলেন বড়ো আব্বা ?

দি বেগম ॥ (কিছুক্ষণ পরে শ্বাস ফেলে) 'কয়লা যায় না ধুলে/খাসিয়ৎ যায় না মলে।' শ্বশুরসাহেব যখন মসজিদে 'এত্তেকাফে' থাকতেন, তখন ইকরাতন আবার ডাহিনগিরি করত। হুজুরের কানে সেকথা পঁহুছে দিত লোকে ! তবে কথা কী জানিস, ভাই ? বনের পাখি খাঁচায় ঢোকালেই কি পোষ মানে ? ইকরাতনের চিরটাকাল বেপরদা মাঠেঘাটে ঘোরা খাসিয়ৎ। সে পরদায় বন্দী থাকতে পারবে কেন ? তাই যেন ইচ্ছে করেই তালাক নেবার জন্যেই ওইসব করত। শেষে শ্বশুরসাহেব দেখলেন, ভুল কাম হয়েছে। তাঁর ইজ্জত বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। তখন মজলিশ ডেকে তাকে তালাক দিলেন। তারপর নুরপুর থেকে আবার ফিরে এলেন মৌলাহাটে। সেদিন মৌলাহাটে আবার সে কী ভিড় ! কাতারে-কাতারে লোক আগাম খবর পেয়ে দুদিন

ধরে পথ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাদশাহি সড়কের দুধারে লোক। সক্কালে খবর হল, দূরে হুজুরের নিশান দেখা গেছে। টাঙ্গাগাড়িব মাথায় সবুজ নিশান, তাতে শাদা চাঁদতারা। ইসলামি নিশান।

কচি ॥ কিন্তু ইকরাতনের কী হল ?

দি বেগম ॥ হুঁ, সেকথা বলি। (একটু চুপ করে থাকার পর) সবই শোনা কথা। আয়মনিখালা ছিল আমার ছোট্ট দুনিয়ার জানালা। সে আমাকে তাবৎ খবর দিত। তো নুরপুরে বড়ো এক রেশম কারখানা ছিল। তার মালিক ছিল এক গোরা সাহেব। সে 'স্বদেশী'দের হাতে খুন হয়েছিল। তারপর কারখানাটা এক হিঁদু জমিদার কিনে নেন। কিন্তু চালাতে পারেননি। তাবৎ কারিগর আর সুতোকাটুনিরা কষ্টে পড়ল। তখন বেম্মপুরে — যেখানে তোর ছোটদাদাজি হিঁদু হয়ে থাকতেন, সেখানে তাঁতের কারখানা ছিল। তারা অনেকে সেই কারখানায় গেল। ইকরাতনও শুনেছি সেখানে গিয়ে সুতোকাটুনির কাম করত। তোর ছোটোদাদাজির সঙ্গে সেখানেই তার দেখা হয়।

কচি ॥ ছোটোদাদাজি জানতেন ইকরাতনকে ওঁর আব্বা বিয়ে করেছিলেন ?

দি বেগম ॥ জানি না ! শুনিনি। হিজরি ১৩২৩ সনে এক বর্ষার রেতে উনি এসেছিলেন। আম্মার সঙ্গে কয়ঘড়ি কথাবার্তা বলে বেরিয়ে গেলেন। শাশুড়িসাহেবা তখন জবাইকরা মানুষের মতন মেঝেয় ধড়ফড় করছেন। আর এমন বেদিল বেরহম মানুষ, অমন করে চলে গেলেন ! কেনই বা এসেছিলেন, কেনই বা আম্মার দেলে (হৃদয়ে) চাকু মেরে চলে গেলেন, কে বলবে সেই খবর ?

কচি ॥ একমিনিট দাদিমা ! হিজরি কত সন বললে ?

দি বেগম ॥ হিজরি ১৩২৩ সন। রবি-উস্-সানি মাসের ২৭ তারিখ।

কচি ॥ (পঞ্জিকা দেখে হিসেব করার পর) হুঁ, ইংরিজি ১৯০৫ সাল। জুলাইয়ের এনড অর অগাস্টের ফার্স্ট উইক। থাক বাবা। পরে কামালস্যারের কাছে জেনে নেব। কিন্তু আমার অবাক লাগছে দাদিমা, সনতারিখটা কেন তোমার মুখস্থ ? (দিলরুখ বেগম চুপ করে আছেন দেখে) বলো না দাদিমা ? ঠিক আছে, বলো না। (একটু পরে) ওঃ হো ! ইতিহাস বইতে পড়েছি, ওই বছর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন হয়েছিল। হিন্দুরা মুসলমানের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিল। বড়লাট কারজন আর ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ষড়যন্ত্র করে কাণ্ডটা বাধায়, জান তো ?

দি বেগম ॥ আমি ওসব জানি না ! আমি কি তোর মতো লেখাপডা জানি ?

কচি ॥ (হঠাৎ উত্তেজিত) সেই রাতটার কথা তোমার স্পষ্ট মনে আছে ?

দি বেগম ॥ (স্মৃতির ভেতর থেকে আচ্ছন্ন স্বরে) আছে। অবিকল সব দেখতে পাই। পানি বর্ষাচ্ছে। জানালায়—

কচি ॥ ওয়েট, ওয়েট ! ছোটোদাদাজির হাতে রাখি বাঁধা ছিল ?

দি বেগম ॥ কী ?

কচি ॥ রাখি, রাখি ! লাল সিলকের সুতোয় বাঁধা রাংতার নকশাকরা শাদা শোলার তকমা। এবার বুঝলে ?

দি বেগম ॥ (চমকে উঠে) ছিল ! দেখেছি !

কচি ॥ হুঁ — থাকা উচিত। তুমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম নিশ্চয় শুনেছ ?

দি বেগম ॥ কে সে ?

কচি ॥ ভ্যাট্! তুমি হোপলেস দাদিমা। জান? উনি তখন কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিলেন। বেরিয়ে পড়লেন নাখোদা মসজিদে গিয়ে মুসলমানদের হাতে রাখি পরাবেন বলে। কবিগুরুকে বলা হল, মুসলমানরা ওঁকে মেরে ফেলবে। ওঁকে আটকানো হল। আমার কষ্ট হয়, দাদিমা! মুসলমানরা কি এতই জানোয়ার? মুসলমানরাও ওঁকে বিশ্বকবি বলে মানেনি বুঝি? সেদিন যদি কবিগুরু নাখোদা মসজিদে গিয়ে মুসলমানদের হাতে রাখি বাঁধতেন, উঃ! কী ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যেত! (আস্তে) দেশভাগ হত না। তোমার চাচাজির ছেলেরাও পাকিস্তানে যেতেন না। মৌলাহাটে আমাদের কী বিরাট ফ্যামিলি হত, কল্পনা করো! কেন যে কবিগুরুকে ওরা মিথ্যে ভয় দেখাল, বুঝি না বাবা!

দি বেগম ॥ মানুষটা কে রে?

কচি ॥ (উঠে গিয়ে একটি বই এনে এবং খুলে) এই দেখো — ইনিই রবীন্দ্রনাথ।

দি বেগম ॥ চোখে তত শোজে না। কিন্তু ওনাকে তো অবিকল শ্বশুরসাহেবের মতন লাগছে রে! হ্যাঁ — ওইরকম পোশাক, ওইরকম বাবরি চুল, সফেদ (শাদা) দাড়ি। ওইরকমই!

কচি ॥ বলো তাহলে!

দি বেগম ॥ কিন্তু ছবি দেখা গোনাহের কাম, কচি! তুই আবার আমাকে গোনাহ্‌গার করলি!

কচি ॥ যাব্বাবা! মৌলাহাটে আর কি সেই পিরিয়ড আছে? কজন ফরাজি আছে আর? আবার তো হানাফি হয়ে গেছে লোকেরা। ঘরে ছবি টাঙায়। গানবাজনা করে। মহরমে তাজিয়া করে। (হাসিতে অস্থির হয়ে) আর তোমাদের পির ফ্যামিলি কী করছে? বড়োদাদাজির বংশধররা? আমরা? আমি আমি বেপরদা হয়ে স্কুলে যাচ্ছি। তার বেলা?

দি বেগম ॥ তোর আব্বা যত নষ্টের গোড়া। রফি ঠিক খোকার মতো হিঁদুঘেষা ছিল। রফিকে বোঝায় কার হিম্মত? পিরের খান্দানি রফিই নষ্ট করেছিল।

কচি ॥ কখনো না। ছোটোদাদাজি।

(খোকা এল হন্তদন্ত হয়ে। দিলরুখ বেগম পুরনো আমলের খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। কচি পা ঝুলিয়ে। বাইরে শরৎকালীন বিকেলের রোদ্দুর। ভ্যাপসা গরম দিনভর। খোকাকে দেখে দুজনেই চমকে উঠেছিল)।

খোকা ॥ দাদিজি! কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। কেউ জিগ্যেস করলে বোলো, জানি না। আর এই পুঁচকি মেয়ে! সাবধান! (সে দেয়াল থেকে ব্যাগ নামিয়ে প্যান্ট্-শার্ট্-তোয়ালে এইসব জিনিস দ্রুত ভরে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এক বৃদ্ধা এবং এক তরুণী হতবাক হয়ে বসে রইল)।.....

> 'She claims him with her great blue eyes
> She binds him with her hair ;
> Oh, break the spell with holy words,
> Unbind him with a prayer!'*
>
> —The Witch of Wenham—J.G. Whittier

'ফার্সি হুসিয়ারনামা কেতাবে জে২ প্রকারে বর্ণিত আছে, আওরতটির দেহেও সদৃশ নমুদ ছিল। বাঙালামুলুকে ইহাদিগের 'ডাহিন' কহা জায়। উহাকে শয়তানের

কবজ হইতে বাঁচাইবার নিমিত্ত নুরপুরনিবাসী মোছলেমবৃন্দকে কহিলাম, কেহ কি এই আওরতকে নিকাহ, করিতে তৈয়ার আছে ? সকলে বহুত২ ডর পাইল। কেহ করিল, হজরতে আলা ! আমরা শুনিয়াছি জে, আপনি জনৈক জমিদারবাবুর কন্যাকে শয়তানের কবজ হইতে বাঁচাইয়াছেন। আমরা উহাকে বাঁধিয়া আপনার হুজুরে হাজের করিতেছি। উহাদিগকে খামোশ করিলাম। কিছু দিবস পরে কাজীছাহেব আমাকে জ্ঞাত করিলেক কে বিবি ইকরাতন নিজমুখে কহিয়াছে জে তোমারদিগের পিরছাহেবের যদি আমার নিকাহ্ দেওয়ার একপ্রকার তাকিদ্ থাকে তাহা হইলে তিনিই আমাকে নিকাহ্ করুন। আমার অজুদ শিহরিত হইল। কহিলাম, প্রেরিত পুরুষ বহুত২ জেহাদে মৃত য়েহুদা এবং নাছারাদিগের বেওয়া আও:তগণকে মোছলেমদিগের সহিত নিকাহ্ দ্বারা ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন হাদিছে এমত বর্ণিত আছে। রসুলে আল্লাহ্ (সাঃ) নিজেও এমতে জনৈক নাছারা বেওয়াকে নিকাহ্ করেন।.....

"আরবদেশে আইয়ামে জাহ্লিয়াতের (অজ্ঞানতার যুগের) কাল হইতে একপ্রকার মনুষ্য বিদ্যমান ছিল। উহাদিগের 'কাহিন' বলা হইত। উহারা শয়তানের বান্দা-বাঁদী ছিল। ওই কাহিনরা মুখে একপ্রকার আওয়াজ করত সংগীতের মারফত আজগৈবি কথাবার্ত্তা জানান দিত। মসজেদে সপ্তরাত্র এত্তেকাফে অতিবাহিত করিয়া অষ্টরাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। বিবি ইকরাতন কোরান-শরিফ পাঠ করিতেছে ভাবিয়া কিয়দ্দণ্ড কর্ণপাত করিতেই জানিলাম সে আল্লাহের কালাম আবৃত্তি করিতেছে না। উহা অন্যপ্রকার কিছু হইবেক। তৎক্ষণাৎ গৃহ প্রবেশ করিয়া উহার মুখে আছার বাড়ি মারিলাম। শয়তানি আছা ধরিয়া ফেলিল।....

"বিবি ইকরাতন আদতে কাহিন-আওরত ছিল। উহাকে তালাক দিবার সমুদায় হেতু এরূপে বর্ণিত হইল।.....

"এক বৎসর পর লোকমারফৎ সম্বাদ পাইলাম জে হারামজাদী কাহিন পুনরায় হিন্দু হইয়াছে। বরমপুর অথবা বেঙ্কপুর নামক জায়গায় গিয়া তাঁত কারখানায় সূতা কাটিতে কাটিতে আমার কুৎসামূলক সংগীত গাহে। সেইদিবস জুম্মাবার ছিল। মসজেদে জাইয়া খুৎবাপাঠের সময় মোছলেম ভ্রাতৃবৃন্দকে কহিলাম, প্রেরিত পুরুষের তাওয়ারিখ (ইতিহাস)-লেখক ইব্নেহিশামের এই বৃত্তান্তটি শ্রবণ করুন।.....

'বনু খাত্মা (খাতমাবংশীয় ট্রাইব)-দিগের মধ্যে আস্মা-বিন্তে-মারোয়ান নামে জনৈক 'কাহিন' ছিল। সে রসুলে আল্লাহর (সাঃ) নামে কুৎসামূলক সংগীত গাহিত। একদিবস হুজুর পয়গম্বর (সাঃ) ব্যথিতচিত্তে কহিলেন, এমন কেহ কি নাই জে আমাকে মারোয়ানের কন্যার কুৎসা হইতে অব্যাহতি দিবেক ? সেইস্থানে বনু খাত্মার জনৈক ইমানদার উমায়ের-ইব্নে-আদি হাজির ছিল। সে তৎক্ষণাৎ তলওয়ার খুলিয়া ধাবিত হইল। সেই রাত্রে উমায়ের আস্মাকে কোতল করিয়া আসিয়া কহিল জে হে পয়গম্বর ! আমি উহাকে কোতল করিয়াছি। প্রেরিত পুরুষ কহিলেন জে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সেবা করিয়াছ। উমায়ের কহিল জে হে পয়গম্বর ! আস্মা নিদ্রিত ছিল এবং উহাব বক্ষে বাচ্চা ছিল। সে পাঁচটি বাচ্চার মাতা। হে রসুলে আল্লাহ্ আমার গোনাহ্ হইবেক কি ? প্রেরিত পুরুষ কহিলেন জে 'উহার জন্য দুইটি ছাগলও ডাকিয়া উঠিবে না।' ইহার অর্থ হইল জে গোনাহ্ দূরের কথা, একজন কাহিনকে কোতল করিলে কেহই তাহাব জন্য কাঁদিবেক না। বেরাদানে ইসলাম ! তাহার পর বনু খাত্মার সমুদায় লোক ইসলাম কবুল করিয়াছিল। 'ইব্নেহিশাম লিখিয়াছেন জে এই ঘটনা ইসলামের শক্তি সাব্যস্ত

করিয়াছিল। আরও কহি জে এই ঘটনা বদরের জঙ্গের (যুদ্ধের) পর ঘটিয়াছিল।.....

"জমাদিউল আউল মাসের ১১ তারিখে বিবি ইকরাতন কোতল হয়। সন স্মরণ নাই। সেইকালে তাবৎ মুলুকে ভয়ংকর বন্যা হয়। হাজার ২ মানুষ এবং জানোয়ার ভাসিয়া যায়। শয়তানী কাহিনের কাতেল (হত্যাকারী) তিনদিবস পরে তালডোঙ্গায় চাপিয়া ফিরত আসিল এবং কহিল জে হারামজাদীর লাস পানিতে ভাসিয়া গিয়াছে!.....

"সেই রাত্রে আসমান ছিদ্রযুক্ত হওনের নিমিত্ত পানি গিরিতেছিল। এবাদতখানায় বসিয়া আছি। আচানক দেল ফাটিয়া গেল। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলাম। হে পরওয়ারদিগার। হে কুল্‌মখলুকাতের মালেক! বনু আদমের মৃত্তিকা নির্মীত এই অজুদের ভিতরে তুমি কী গোপন চীজ (জিনিস) স্থাপন করিয়াছ জে সামান্য ধাক্কায় সমুদায় জিন্দেগী কাঁপিয়া উঠে? হতভাগিনী 'কাহিন' আওরত! কেয়ামতের পর হাশরের ময়দানে আমি উহার জন্য নেকির অর্দ্ধাংশ দানে তৈয়ার রহিলাম!....."

মেহেরবাঁ হোকে বুলালো মুঝে চাহো জিস্ ওয়াক্ত
ম্যায় গ্যায়া ওয়াক্ত্ নেহি হুঁ কে ফির্ আভি না শাকুঁ.....

মৌলাহাটে ফিরে আসার পর 'হজরত' বদিউজ্জামান (আর তাঁকে কেউ মৌলানা বা মওলানা বলত না) কিছুকাল এবাদতখানায় নিঃসঙ্গ কাটান। কথিত আছে, তাঁর খিদমতগার আলি বখ্‌শ্‌কে তিনি এসে আর দেখতে পাননি। পরে খবর হয়, আলি বখ্‌শ্ বীরভূম জেলার আমভুয়া গ্রামের মসজিদে আজান হাঁকার অর্থাৎ মোয়াজ্জিনের কাজ পেয়েছে। বোনকেও সেখানে নিয়ে গেছে। আলি বখ্‌শের কণ্ঠস্বর মোলায়েম এবং সুরেলা ছিল। তাছাড়া বদুপিরের খিদমতগার হিসেবে তার একটি পৃথক কৃতিত্ব ছিল জনসাধারণের কাছে, সরকারি চাকরির বেলায় দরখাস্তে এক্সপিরিয়েন্স শীর্ষক আইটেম যেমন প্রার্থীকে যোগ্যতর প্রতিপন্ন করে। অবশ্য আলি বখ্‌শের এই পলায়নের কারণ হুজুরের সঙ্গে ইকরাতন বিবির নিকাহ্।

প্রতিবন্ধী মনিরুজ্জামান তার পিতার ফিরে আসার খবর পেয়েই বাড়ি চলে যায়। সে এবাদতখানায় সম্ভবত জীবনে প্রথম অলৌকিকতার আস্বাদ পেয়ে থাকবে। জ্যোতির্ময় জিনগুলি অথবা নিঃসঙ্গতা (আলি বখ্‌শ্ তাকে পছন্দ করত না বলে এড়িয়ে চলত), প্রাকৃতিক পরিবেশজনিত রহস্যময় নৈঃশব্দ্য, আর এবাদতখানার ভেতরে বুজুর্গ পিতার চিহ্নগুলি — এই-সমস্ত তার জড়তাগ্রস্ত চেতনাকে পুনঃপুন আঘাতে জর্জরিত করত। আর অন্তত এটুকু সে বুঝত, তার আওরত তাকে পছন্দ করে না। সে ততদিনে ছেলের বাপ হতে পেরেছে এবং এটিকে সে কৃতিত্ব বলে গণ্য করছে এবং তার আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। অথচ ওই খুবসুরত আওরতটি তাকে বৃক্ষলতা কিংবা চতুষ্পদ প্রাণী গণ্য করে। তাই তার মনে অভিমান ছিল। জ্বালা ছিল। এবাদতখানার প্রশান্তি — যা একটি সরোবর, বনানী, নির্জনতা, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, চাঁদ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, পাখি ও পোকামাকড়ের দ্বারা নির্মিত পরাবাস্তবতা, তাকে একপ্রকার অলৌকিকতার আস্বাদ দিয়েছিল। নারীর জন্য প্রেম, পুত্রের প্রতি বাৎসল্য — এসব বাস্তবতাকে ওই সংক্রামিত পরাবাস্তবতা গ্রাস করে। মাকড়সার জাল যেমন পোড়ো বাড়ির দরজাকে ঢেকে রাখে, তেমনিভাবে স্ত্রী-পুত্র-জননী-সংসারকে মনিরুজ্জামান ধূসর একপ্রকার সূক্ষ্ম তন্তুজালে আবৃত দেখত। তার এবং

বুকুর মধ্যে একটি শিশু পরিণামে দূরত্ব সৃষ্টি করে। কিন্তু মনিরুজ্জামান সম্পর্কে একটি ঘৃণ্য বিষয়ের উল্লেখ জরুরি। পশুর তীব্র যৌনবোধ থেকে এই হতভাগ্য প্রতিবন্ধী নিস্কৃতি পায়নি ! সে স্বমৈথুনে অভ্যস্ত ছিল। এবাদতখানার পূর্বে জঙ্গলের মধ্যে সে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে আসত। বাড়ি ফেরার পর যখন তার ওই মেটামরফসিস ঘটে গেছে এবং সে পরাবাস্তবতাময় জীবনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তখনও সে হঠাৎ-হঠাৎ কামনাজর্জর হত এবং পায়খানাঘরের ভেতর যৌনতা থেকে মুক্তি চেয়ে নিত। এভাবেই বুকুকে বর্জনের চেষ্টা করত সে।

এদিকে হজরত বদিউজ্জামান কিছুকাল পরে ধীরে আত্মস্বসরণের সাধনায় লিপ্ত হন। তিনি চিত্তের প্রশান্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন ' স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়ার তাকিদ অনুভব করতেন। একদা ঠিক তাঁর স্ত্রী যেভাবে প্রতীক্ষা করতেন, তিনিও সেইভাবে প্রতীক্ষায় থাকতেন। হয়তো সেজন্যই আর খিদমতগার বহাল করেননি। বাড়ি থেকে খানা আনিয়ে আহার করতেন। কোনো-কোনো বেলা তিনি কোনো একটি খাদ্যে সাইদার স্পর্শ-গন্ধ-স্বাদ টের পেতেন। সাইদা আর বুকুর রান্নায় স্বাভাবিক পার্থক্য ছিল। বুজুর্গ ব্যক্তিটির রসনা কেন, দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য ছিল না সেই পার্থক্যের।

ক্রমশ তিনি কিছু গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপে মন দেন। পুকুরটির — পরবর্তীকালে যা পিরপুকুর নাম পায়, তার উত্তরপাড়ে একতলা কয়েকটি ঘর গড়ে ওঠে। সেটি এতিমখানা। মসজিদসংলগ্ন মক্তবটি পুরোপুরি মাদ্রাসা হয়ে ওঠে এবং এর পিছনে হরিণমারার বড়োগাজির প্রচুর মদত ছিল। মৌলানা নুরুজ্জামানের সঙ্গে এ নিয়ে তুমুল বাহাস (বিতর্ক) হয় বড়োগাজির। নুরুজ্জামান মাদ্রাসাটিতে দেওবন্দি কারিকুলাম চালু করতে চেয়েছিলেন। শুধু আরবি-ফারসি-উরদু ছাড়া আর কোনো ভাষায় পড়াশোনা হারাম — এই ছিল তাঁর মত। কিন্তু বড়োগাজি আলিগড়ি ধাঁচের পক্ষপাতী। তিনি বাঙলা আর ইংরাজিকেই আবশ্যিক করতে চান। সুবিখ্যাত ক্যালকাটা মাদ্রাসার দৃষ্টান্ত দেন তিনি (১৮২০ ইংরাজি সনের ১৫ জুলাই কলকাতার তালতলায় যার শিলান্যাস এবং ১৮২২ সনের অগাস্ট মাস থেকে পঠনপাঠন শুরু)। হজরত বদিউজ্জামান বড়োগাজির মতে সায় দেন। ফলে বাংলা ১৩০৯ সন, হিজরি ১৩২০ সন, খ্রীস্টীয় ১৯০২ সনে মৌলাহাট মাদ্রাসা স্কুল স্থাপিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যে সরকারি অনুমোদন এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে বড়োগাজি, সবিক্রমে কলকাতা থেকে ফিরে আসেন। অসংখ্য ছাত্র সংগৃহীত হয় এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে। 'হুজুরের' পাঞ্জা এবং নিশান নিয়ে বড়োগাজি, ছোটোগাজি, মৌলাহাটের চৌধুরিসাহেব, আনিসুর সর্দার প্রমুখ লোকেরা গ্রামে-গ্রামে সভা করে বেড়াতেন। পরের বছর বাইরের ছাত্রদের জন্য 'তালেবুলএলেমখানা' (হোসটেল) তৈরি হয়। ছাত্রদের তখনও 'তালেবুলএলেম' বলা হত এবং জনগণের উচ্চারণ-বিকৃতিবশে সেটি 'তালবিলিম্'-এ রূপ নিয়েছিল।

একদিন বদিউজ্জামান এবাদতখানার উত্তরের বনভূমিতে গিয়ে অভ্যাসমতো দাঁড়িয়ে আছেন (কিংবদন্তি অনুসারে তিনি ওইভাবে নির্জনে বৃক্ষবাসী জিনদের সঙ্গে কথা বলতে যেতেন), বাঘনখা নামে একটি বেঁটে চওড়া পাতাওয়ালা গাছের তলায় একটি যুবককে বসে থাকতে দেখেন। এইসব গাছের ফলন গড়ন বাঘের নখের মতো। বদিউজ্জামান অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, সে নির্জনে বসে কেতাব পড়ছে। তার মাথায় টুপি, পরনে যেমন-তেমন একটি কুর্তা আর চুস্ত্ পাজামা, খালি পা। মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিলেন বদিউজ্জামান, যুবকটির মুখের অর্ধাংশ শফির

মতো। তিনি একটু কেশে সাড়া দিতেই যুবকটি ঘুরল এবং হজরত পিরসাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর ছুটে এসে সসম্ভ্রমে তাঁর পদচুম্বন করল। বদিউজ্জামান জিগ্যেস করলেন, কে তুমি বাবা? যুবকটি মৃদুস্বরে কুণ্ঠিতভাবে বলল, আমি তালেবুলএলেম। আমার নাম জালালুদ্দিন। হজরত বললেন, তোমার মোকাম ?...জি, বীরভূমের মখদুমনগর গ্রামে।...এখানে তুমি কেতাব পড়তে আস দেখছি!...জি, হ্যাঁ...তুমি জান না এই জায়গায় কারুর আসা বারণ? জালালুদ্দিন বিব্রতভাবে বলল, হজরতে আলা! আমি নতুন এসেছি। কেউ আমাকে একথা বলেনি। গোস্তাকি মাফ করবেন। আর কখনও আসব না। এই বলে সে পা বাড়ালে বদিউজ্জামান ডাকলেন, বেটা! শোনো! তুমি কী কেতাব পড়ছিলে এখানে, দেখি। জালালুদ্দিন সংকোচে দুহাতে হুজুরের পাক হাতে কেতাবটি তুলে দিয়ে বলল, জনাবে আলা! এখানি উরদু শাইরি। হিন্দুস্থানের নামজাদা শায়ের (কবি) গালিবের কেতাব। হিজরি ১২৮৬ সনে উনি ইন্তেকাল করেছেন। বদিউজ্জামান কেতাবখানির পাতা ওলটাচ্ছিলেন। একটি পাতা তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন দেখে জালালুদ্দিন শালীনতাবশে চুপ করল। বদিউজ্জামান আস্তে বললেন, মির্জা গালিবের কথা আমি কিছু শুনেছি। সে তো শরাবি ছিল! তবে আল্লাহ্‌পাকেব কুদরত বোঝা দায়। ব্যানাবনে মুক্তা ছড়ানো বলে একটা কথা আছে। পরওয়ারদিগার কী খেয়ালে শরাবি দিওয়ানাদের দেলে হীরা-জহরত-মুক্তা ছড়ান, সেই কুদরত নাদান মানুষ কী করে বুঝবে? জালালুদ্দিন, কেতাবখানি এবেলা আমার কাছে থাউক। মগরেবের ওয়াক্তের পর তুমি এবাদতখানায় এসো। ফেরত দেব। জালালুদ্দিন এমন ভঙ্গিতে চলে গেল সে হুজুরের সঙ্গে এই আশ্চর্য মোলাকাত এবং কেতাব দেওয়ার কথা সাড়ম্বরে সকলকে বলবে। আচানক চোখঝলসানো নুর (জ্যোতিঃ) এবং পাক ছুরত (পবিত্র মূর্তি) এবং কাছে থেকেও দূরবর্তী কণ্ঠস্বরের মতো কণ্ঠস্বর শোনার কথাও সে হয়তো না বলে ছাড়বে না। বস্তুত কথিত আছে হজরত বদিউজ্জামানের কণ্ঠস্বর আসমান থেকে ভেসে আসার মতো বোধ হত। হিন্দুশাস্ত্রে যাকে দৈববাণী বা আকাশবাণী বলা হয়, হুজুরের কণ্ঠস্বরে সেই দূরত্ব ছিল।

বদিউজ্জামান গালিবের যে পঙ্‌ক্তিটি পড়ছিলেন, তা হল ঃ মেহেরবাঁ হোকে বুলালো মুঝে...

'যখনই ইচ্ছা, করুণাপ্রবণ হয়ে আমাকে ডেকে পাঠাও/আমি তো চলে যাওয়া সময় নই যে, ফিরে আসতে পারব না!'

সেই রাত্রে দুখু শেখ খানা আনে এবং বদ্দিউজ্জামান খানা খাওয়ার পর তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। খাগের কলম এবং কেশুরেপাতার রস আর মাটির হাঁড়ির তলার পোড়ো কালোরঙের গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি কালি তাঁর এবাদতখানায় সর্বদা মজুদ থাকত। একখণ্ড তুলোট কাগজে তিনি গালিবের পঙ্‌ক্তিটি লিখে দুখু শেখের হাতে দেন। বলেন, এই খতখানি তুমি বিবিসাহেবাকে দিও। খর্বদার! কালা জিন যদি দেখ ঝামেলা বাধায়, ফিরে এসে খবর দেবে। এসো, তোমার মাথায় দোয়া ফুঁকে দিই। কোনো ডর কোরো না। দুখু শেখ ইমানদার মানুষ। সে পুকুরের ঘাটে হুজুরের খাদ্যপাত্র ভক্তিভরে ধোওয়ার পর দ্রুত লানটিনহাতে ফিরে যায়। তার বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছিল। ইদানীংকালে বিবিসাহেবা তাকে দেখা দেন। কারণ হাদিস কেতাবে এমত বর্ণিত আছে, 'গৃহের বান্দারাও স্বজনবর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সামনে পরদার প্রয়োজন নেই।' দুখু শেখ প্রকৃতই একজন বান্দা ছিল। সে দলিজঘরে

থাকত। গেরস্থালির সব কাজ তাকেই করতে হত। সে রাত্রে বিবিসাহেবার পাক হাতে সে খতখানি সসম্ভ্রমে অর্পণ করে। বুকু তখন রান্নাশালের কাজ সামলে নিচ্ছিল। রফি তার বাবার পাশে ঘুমন্ত। বুকু আড়চোখে দৃশ্যটি দেখে এবং অবাক হয়। খতখানি পড়ার পর সাইদা শ্বাস ফেলে বলেন, বউবিবি ! দুখুভাইয়ের খানা বেড়ে দাও ! বুকু বলে, দলিজঘরে ঢাকা আছে।

সাইদা খান্দানি মিরপরিবারের মেয়ে। লালবাগ অঞ্চলের ওদিকে ভগবানগোলায় তখনও খান্দানি মুসলিমরা দ্বিভাষাভাষী। বাঙলা আর উরদু উভয় ভাষা জানতেন। খতখানি যে শাইরি (কবিতা), সাইদা তা বুঝতে পেরেছিলেন। খতের তলায় বদিউজ্জামানের আঙ্গুটির মোহরের ছাপ ছিল। বুকু হাতের কাজ শেষ করে বদনাহাতে পায়খানাঘরের দিকে যাওয়ার সময় শাশুড়িসাহেবাকে পেয়ারাতলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এবং একটু ইতস্তত করে জানতে চায়, কিসের খত আম্মা ? সাইদা আস্তে বলেন, খত না, তাবিজ—রফির জন্য।.....

Und so tragt er scine Bruder,
Seine Schatze, seine Kinder
Dem erwartenden Ergeuger
Freudebrausend an das Herz.*

কচি ॥ কিন্তু তাবিজ নয় ?

দিলরুখ বেগম ॥ (সকৌতুকে) উঁহু, খত্। চিঠি। চিঠিতে একটি বয়েৎ ছিল। মানে বুঝতে পারিনি।

কচি ॥ তারপর কী হল, দাদিমা ?

দি বেগম ॥ (মুখ টিপে হেসে, চাপা স্বরে) এক রেতে শাশুড়িসাহেবার দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। তখন আর আয়মনিখালা শুতে আসত না ওঁব কাছে। একলা শুতেই পছন্দ করতেন। তো ভাবলাম, বুঝি পেসাব করতে বেরুলেন। আমি কান করে আছি। একটু পরে—

কচি ॥ একমিনিট ! তোমার বুঝি ঘুম হত না বাত্তিরে ?

দি বেগম ॥ না রে ! নিঁদ এলেই খালি কতরকম খোয়াব (স্বপ্ন)। ইচ্ছে করেই জেগে থাকতাম। হাজার কথা মাথায় আসত। আর রেতের বেলা কী হয, সে আমি জানি ! ছোটো কথা বড়ো হয়। বুজকুড়ির মতন। ফোটে, ভেঙে যায়।

কচি ॥ হুঁ, পড়েছি ঃ 'Beware thoughts that Come in the night!' তোমার সেই ফারসি কেতাব 'হুঁশিয়ারনামায়' অবিকল একই কথা আছে। কে কার থেকে চুরি করেছে কে জানে ?

দি বেগম ॥ বকবক করবি, নাকি শুনবি ?

কচি ॥ সরি ! বলো !

দি বেগম ॥ তো খিড়কির দরজাটা একটু আঁটো ছিল। সহজে খুলতে চাইত না। সেখানে আওয়াজ শুনে ভাবলাম, উনি এত রেতে ওদিকে বেবুচ্ছেন কেন ? উঠে জানালা দিয়ে দেখি, উনি বেরিয়ে গেলেন। তখন আধখানা চাঁদ উঠেছে। একটু

* পযগম্বর হজরত মহম্মদ সম্পর্কে কবি গ্যযটেব কবিতার অংশ। ডেভিড ল্যুকের ইংরেজি অনুবাদ ঃ 'And thus he carries his brothers, his treasures, his children, all tumultuous with joy, to their waiting Parent's bosom.'

চাঁদনি ছিল। চত্তির মাস। খুব হাওয়া দিচ্ছে।

কচি ॥ তারপর ? তারপর দাদিমা ?

দি বেগম ॥ গেলেন তো গেলেন। আর আসেন না, আর আসেন না। ডরে কাঁপছি। অমন করে কোথায় গেলেন ? রুচি, ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়। এমনি চাঁদনি রাতে আমার আম্মা — (জোরে শ্বাস ছেড়ে চুপ করলেন)

কচি ॥ আঃ, বলো না !

দি বেগম ॥ ভাবছি তোর দাদাজিকে ডেকে তুলব নাকি। কিন্তু সে তো ল্যাংড়াভ্যাংড়া মানুষ। দুখুচাচাকেই ডাকি বরঞ্চ। এই ভেবে উঠতে যাচ্ছি, খিড়কির দরজায় আওয়াজ হল। জানালায় উঁকি মেরে দেখি, শাশুড়িসাহেবা ফিরে এলেন। (ফোকলা দাঁতে হেসে) তখন কি জানি উনি কোথায় গিয়েছিলেন ? পরদিন খবর হল, পিরসাহেব বাড়ি আসছেন। ফজরের নামাজে দুখুচাচা মসজিদে গিয়েছিল। সেই খবর আনল। তারপর দেখি কী, শাশুড়িসাহেবা ঘরদোর সাফ করছেন। তাড়া লাগিয়েছেন। সাজো-সাজো রব এই বাড়িতে।

কচি ॥ (প্রচণ্ড হেসে) মাই গুডনেস ! বড়ো আম্মা অভিসারে গিয়েছিলেন বলো ! দারুণ ! অসাধারণ ! ওঃ ! ভাবা যায় না !

দি বেগম ॥ (কপট ক্রোধে) হিঁদুগিরি ছাড় দিকি ! হিঁদু মেয়েগুলানের সঙ্গে মিশে তোর এই স্বভাব হয়েছে। না হিঁদুস্থান-পাকিস্থান হবে, না মৌলাহাটে হিঁদুদের বসতি হবে !

কচি ॥ দাদিমা ! তুমি বড্ড সাম্প্রদায়িক ! জান না ওরা তোমার মোছলেম বেরাদারদের জুলুমে ইস্টবেঙ্গল থেকে এ দেশে পালিয়ে এসেছে ? আজ শ্রাবণী নামে যে মেয়েটা এসেছিল, তুমি জান কি ও খড়ের গাদায় লুকিয়ে না থাকলে ওকে জবাই করা হত ? তখন ও এতটুকু ফ্রকপরা মেয়ে ! তবু দেখো, ওরা আমাদের ঘৃণা করছে না !

দি বেগম ॥ (আস্তে) মেয়েটা ভালো ! (শ্বাস ছেড়ে) তোর আব্বার হিঁদু বন্ধুরাও খুব ভালো ছিলেন। লুকিয়ে-চুরিয়ে রেতের বেলা এসে আমার হাতের খানা খেতেন। কত তারিফ করতেন। তোর আম্মা ওঁদের দেখা দিত। কথা বলত। তোর আম্মার নিমুনিয়া হল — ডবল নিমুনিয়া ! তখন তোর আব্বার হিঁদু বন্ধুরাই সদর থেকে 'সিবিল সার্জেং' ডাক্তার এনেছিলেন। বিলেত-পাস ডাক্তার। তোর আব্বার সাধ্যি ছিল তাঁকে আনবার ? সেই পেথম হাওয়াগাড়ি এল মৌলাহাটে। হাওয়াগাড়ি দেখলাম ! সিবিল সার্জেং তোর আম্মাকে পরিক্ষে করে বললেন, দের হয়ে গেছে। আর উপায় নেই। উনার হাওয়াগাড়িও রওনা দিল, তোর আম্মাও—

কচি ॥ আঃ ! ওসব কথা থাক। বড়ো আব্বার বড়ো আম্মার কথা বলো !

দি বেগম ॥ আর কী কথা ! সেই থেকে শ্বশুরসাহেব একহপ্তা করে এবাদতখানায় থাকতেন। তখনও এ তল্লাটে বোরখার চলন ছিল না। শাশুড়িসাহেবাদের বাপের তল্লাটে ছিল। শাশুড়িসাহেবার একটা বোরখা ছিল প্যাঁটরায় ভরা। কোনো-কোনো রোজ সেই বোরখা পরে উনি নিজেই এবাদতখানায় খানা দিতে যেতেন। দুখুচাচাও সঙ্গে যেত। সেই দেখাদেখি মৌলাহাটে অনেক বাড়িতে বোরখার ফ্যাসাং হল। বেশিদিন চলেনি। গাঁ তো তখনও চাষাভুষোর।

কচি ॥ কথাটা ফ্যাশান, ফ্যাশাং নয় ! তুমি এমন বংশের মেয়ে ! শুদ্ধ কথাবার্তা বলতে পার না ?

দি বেগম ॥ ওই হল। তবে প্রেথম-প্রেথম আমি বোরখা পরতে পারতাম না। দম আটকে যেত। রোজি — তোর বড়োদাদিজি বোরখা পরতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল ! ছোটোবেলা থেকে আমাদের দু-বহিনেরই পাড়া বেড়ানো খাসিয়াৎ ! কিন্তু তখন ওদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। না — রোজির দোষ ছিল না। জানিস তো আমরা যাঁওয়া (যমজ) বহিন ছিলাম ? এখন বুঝতে পারি, রোজিকে আমার কাছে তোর বড়োদাদাজিই আসতে দিতেন না। রোজির কোন দোষ নেই। সে তার মরদকে খুব ডর করত।

কচি ॥ আর তুমি তার উলটো ! দাদাজিকে মানুষ বলেই মনে করতে না !

দি বেগম ॥ (চটে গিয়ে) আঃ কচি ! ফের ছোটো মুখে বড়ো কথা ? মু বন্ধ্ কর্ !

কচি ॥ ঠিক-আছে বাবা ! ঘুম পাচ্ছে। আর ডেকো না। সামনে টেসট এগজামিনেশন !.....

চুন্ য়কি বাশদ্ হমি ন বাশদ্ দুঈ
হম্ মনি বর্ খিজদ্ ইন্‌জা হম্ তুঈ.....

.....জালালুদ্দিনকে আমি কেন এত স্নেহ করি ? বুড়বক্ উজবুগরা এই নিয়ে জল্পনাকল্পনা করে, কানে আসে। সেদিন হরিণমারার ছোটোগাজি কুণ্ঠিতভাবে বলছিলেন, হজরত ! জালালুদ্দিনকে আপনি মোজেজা দেখিয়েছেন। আর আমি এতদিন আপনার খিদমত করে আসছি, কিছুই পেলাম না ! বান্দার ওপর হুজুর নিশ্চয় কোনো কারণে নারাজ আছেন। এই ছোটোগাজি লোকটি মন সরল। সে তার বড়োভাইয়ের মতো ধূর্ত নয়। ভণ্ড নয়। সে যা বলে, মন খুলে বলে। কিন্তু দুনিয়ায় এমন মানুষই বেশি, যারা জিন্দেগানির চারপাশে ঢুঁড়ে বাড়তি জিনিস আদায় করতে চায়। এমন জিনিস, যা ধরাছোঁয়া যায় না, অথচ আছে। তবে সত্যিই তো, আমি যখন তাদের কাছে বুজুর্গ ব্যক্তি, তখন আমার মারফত ওই বাড়তি জিনিসের ঈষৎ আভাস তারা আশা কবতেই পারে। একটু হেসে বললাম, জালালুদ্দিনকে কী মোজেজা দেখিয়েছি গাজিসাহেব ? ছোটোগাজি বললেন, আপনি ওই জঙ্গলে পাখ-পাখালি পোকামাকড়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন, জালালুদ্দিন শুনেছে। গম্ভীরমুখে বললাম, গাজিসাহেব ! আল্লাহ কি সকল মানুষকেই হরবখ্‌ত্ মোজেজা দেখান না ? ওই দেখুন, আনারগাছটি কত উঁচু হয়ে উঠেছে। কোথায ছিল ওই গাছ ? একটি ছোট্ট বীজ থেকে পয়দা। আর ওই দেখুন ফুলগাছটিকে। কোথায ছিল ওই রঙিন জিনিসগুলিন ? এগুলিন কি মোজেজা নয় ? ছোটোগাজি সায় দিলেন বটে, কিন্তু মনে হল, তিনি চান, জাদুগিরের জাদুর খেল দেখাই। তিনি জালালুদ্দিনের নাম ফের উচ্চারণ করেই থেমে গেলেন। তখন তাঁকে বললাম, জালালুদ্দিন যদি কিছু দেখে থাকে, তার মধ্যে আল্লাহ্ ইলম্ (প্রজ্ঞা) দিয়েছেন বলেই দেখেছে। ঠিক এই সময় আচানক একটা ঘটনা ঘটল। চৈত্রমাসের শেষ দিন ছিল এটি। জঙ্গলের দিক থেকে প্রচণ্ড একটি ঘূর্ণিহাওয়া এসে পড়ল এবং ছোটোগাজির টুপিটি উড়িয়ে নিয়ে গেল। ঘূর্ণিহাওয়াটি উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর পুকুরের পানিতে হুলুস্থুল বাধিয়ে এতিমখানার গা ঘেঁষে সড়কে পৌঁছুল। ছোটোগাজি চোখ বুজে ফেলেছিলেন। বললাম, দেখুন, দেখুন ! ছড়ি তুলে দেখিয়ে দিলাম, তাঁর টুপিটি তালগাছ-সমান উঁচুতে ভেসে চলেছে। দেখামাত্র ছোটোগাজি আমার পায়ের সামনে কাটাগাছের মতো

আছড়ে পড়ে আবেগে কেঁদে ফেললেন, হজরত ! হজরত ! আমি নাদান বান্দা ! খাতাহ্ (ত্রুটি) মাফ করুন। ভর্ৎসনা করে তাঁকে টেনে ওঠালাম। তওবা নাউজুবিল্লাহ্ ! মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া কারুর কাছে নত হবে না। ছোটোগাজি ভিজে চোখে হাসলেন। অতিশয় উজ্জ্বল হাসি। এবার হাসতে-হাসতে বললাম, কমবখ্‌ত্ জিনের তামাসা ! শিগগির যান, টুপিটি সড়কের ওধারে ঢুঁড়ে দেখুন। ফেলে দিয়ে গেছে। ছোটোগাজি, তখনই হন্তদন্ত এবাদতখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। টুপিটির তল্লাসে উনি মাদ্রাসার একদল তালেবুল এলেমকে (ছাত্র) ডেকে নিয়ে যান। হ্যাঁ, টুপিটি পাওয়া গিয়েছিল। একটি কাঁটাঝোপে আটকে ছিল সেটি। যাই হোক, জালালুদ্দিনকে অতিশয় স্নেহের কারণ আমি বৈ এক আল্লাহ্ জানেন। আর কেউ জানে না। যদি সেদিন মির্জা গালিবের শাইরি কেতাবখানি আমার হাতে না আসত, সাইদার সঙ্গে হয়তো এ জিন্দেগিতে আর মিলন হত না। আজ জালালুদ্দিন আরেকখানি কেতাব দিয়ে গিয়েছিল। এখানি ফারসি কেতাব। 'চুন য়কি বাশদ্ হমি.....' বুকের ভেতর দরিয়ার ঢেউ উঠল। কী আশ্চর্য কথা লেখা আছে ঃ 'যদি শুধু এক থাকে। যদি না থাকে দুই। আমার ওপর সেই একের ঢেউ যদি আছড়ে পড়ে। তাহলে আর কথা কিসের। এবার সবই তুমি হয়ে গেছ। আমিও হয়ে গেছি তুমি।...' মারহাবা ! মারহাবা ! ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে পূর্বের নিচু পাঁচিলের দরওয়াজা খুলে জঙ্গলে ঢুকলাম। তন্ময় আচ্ছন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি, আশেপাশে একটি কাঠবিল্লি ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, পুকুরের কিনারায় ঘন কালকাসুন্দে ঝোপে হলুদ ফুলের ওপর শাদা ছোটো-ছোটো একঝাঁক প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, মনে খালি ওই বয়েৎ 'চুন য়কি বাশদ্ হমি.....' সেইসময় শুকনো পাতার আওয়াজ শুনে ঘুরে দেখি, কালো বোরখাপরা এক আওরত। দেখামাত্র চিনতে পেরে খুশি ও বিস্ময়ে বলে উঠলাম, সাইদা ! সাইদা আস্তে বলল, শফির খত্ এসেছে। ডাকের পিওন দিয়ে গেল। সে একখানি পোস্টকার্ড বোরখার ভেতর থেকে বের করে দিল। লক্ষ করলাম সে কাঁপছে। দ্রুত খতখানি পড়লাম। বাঙ্গালায় লেখা ঃ "মা, অদ্য রাত্রে আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়া চিত্ত এতই চঞ্চল হইল যে ইচ্ছা করিল, এতদ্দণ্ডে ছুটিয়া যাই। কিন্তু আমার এক্ষণে যাওয়ার উপায় নাই। যে কর্মচক্রে আবদ্ধ রহিয়াছি, তাহা হইতে কিয়ৎক্ষণ দূরে সরিলে প্রভূত ক্ষতি হইবেক। শুধু জানিয়া রাখুন, আমি জীবিত রহিয়াছি। কোনও একদিবস ফুরসত পাইলেই ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাত হউক কিম্বা মহাপ্রলয় ঘটুক, গিয়া চরণদর্শন করিব। অধম সন্তানকে মার্জনা করিবেন। সহস্র ২ প্রণামান্তে—শফিউজ্জামান।" খতখানি পড়েই বললাম, এই খত তুমি পড়েছ ? সাইদা কেঁদে ফেলল। তখন ভর্ৎসনা করে বললাম, ছিঃ সাইদা ! শফিকে মুর্দা গণ্য করবে। সে হিঁদু হয়ে গেছে। সে খতে কোনো ঠিকানা দেয়নি। কিন্তু আমি জানি সে কোথায় আছে। সাইদা আত্মসংবরণ করে বলল, আপনি জানেন ? বললাম, জানি। কিন্তু তোমার দেলে বাজবে বলে বলি নাই। নুরপুরে থাকার সময় সম্বাদ পাই, সে বেহ্মপুর নামে এক নয়া আবাদে আছে। সম্বাদদাতা আমার হুকুম চেয়েছিল, জবরদস্তি শফিকে সেখান থেকে তুলে আনবে। আমি তাকে বলি, এ খবর ঝুট্। সে অন্য কেউ হবে। আমার শফিউজ্জামান দেওবন্দে আছে। সাইদা কান্নাজড়ানো স্বরে বলল, কেন আপনি ওকে ধরে আনতে হুকুম দেননি ? বললাম, সাইদা ! তুমি বুঝতে পারছ না, তাতে আমার নামে হানাফিরা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি রটনার মওকা পেত। সাইদা রুষ্টভাবে বলল, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বাকি তো রাখেননি কিছু ? শুধু শফির বেলায় — সে কথা শেষ না করে দ্রুত চলে গেল।

দেখলাম, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দক্ষিণে ঘুরে সে সড়কে উঠল। সড়কের ধারে বটতলায় আয়মনি গায়ে চাদর জড়িয়ে (আজলাফ আওরতদের ওটাই পরদা) দাঁড়িয়ে আছে। দুই আওরত সড়ক পেরিয়ে চলে গেলে পোস্টকার্ডটি আবার পড়তে থাকলাম। তারপর আমিও আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। এবাদতখানায় ঢুকে দরওয়াজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ ক্রন্দন করলাম! মনে-মনে বললাম, হায় রে, কানাঘোড়ার সওয়ার! আর আল্লাহ্ ছাড়া তোকে বাঁচানোর শক্তি কারুর নেই! আসরের (বৈকালিক) নামাজের জন্য ঘাটে অজু করতে গেছি, সেই সময় দুখু এসে সম্ভাষণ করে মৃদুস্বরে বলল, হুজুর! বিবিসাহেবার হুকুম হয়েছে, হুজুরের কাছে একখানা খত আছে, নিয়ে এসো! হুঁ, খতখানি আমার কলিজায় বিঁধে ছিল। দুখুর হাতে তা ফেরত দিয়ে অজু করতে গেলাম। পানির ধারে দাঁড়াতেই উলটো দুনিয়াটি চোখে পড়ল। অমনি মনে হল, আমার ঔরসে ওই উলটো দুনিয়ার এক উলটো মানুষ জন্মেছিল!.....

'Celui qui prodigua
Les lions aux ravins du Jabel Kronnega,
Les perles a la mer et les astres a l'omber
Peut bien donner un peu de joie
a l'homme sombre.'
—Hugo.

এক বিকেলে ব্রাহ্মণী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই পিরের সাঁকোর চিহ্নমাত্র নেই। আচানক বুক হু-হু করে উঠল। মনে হল, অতর্কিত শূন্যতার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। কোথাও কিছু নেই, শুধু শূন্যতা। তারপর মনে হল, থামগুলি দেখতে পাচ্ছি। সিঁদুরের উজ্জ্বলতা থামগুলিকে নিটোল, মসৃণ, কোমল করে তুলতে-তুলতে এক নাঙ্গা আওরত — তওবা! নাউজুবিল্লাহ্! শয়তানের জাদু। তবে এতখানি না করলেই পারতাম। সূর্য দিগন্তে লাল চাকার মতো আটকে আছে। একফালি ঝিরঝিরে স্রোত বালির চড়ায় এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি পাখি নাচের ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আকাশে শনশন শব্দে বুনো হাঁসের ঝাঁক চলেছে উলুশরাব দিকে। ঝাঁকটির গতিপথ লক্ষ করতে পিছু ফিরলে দেখলাম তিনজন লোক আসছে। চিনতে পারলাম। বড়োগাজি, জালালুদ্দিন, আর একজন কেউ। কাছে এলে চিনলাম, নুরপুরের সেই উকিল দিদারুল আলম। কী ব্যাপার? সম্ভাষণের পর বড়োগাজি বললেন, হজরতে আলা! জরুরি কারণে আপনাকে বিরক্ত করলাম। দিদারুল এখনই ফিরে যাবে। আপনাকে বলেছিলাম 'তবলিগ-উল-ইসলাম সমিতি'র কথা। দিদারুলের ইচ্ছা, জেলাসমিতির সভাপতি আপনি হোন। দিদারুল একটি ছাপানো বাঙলা ইস্তাহার দিল। দিয়ে বলল, হজরত! এখানেই আমরা বরং মগরেবের নামাজ পড়ে নিই। এবাদতখানায় গিয়ে দস্তখত আর মোহরের ছাপ দেবেন। ইস্তাহারে চোখ বুলিয়ে বুঝলাম, কাজটি মহৎ। নামাজের ওয়াক্ত্ হয়েছিল। নদীর পানিতে অজু করে বালির শুকনো চড়ায় ছড়িটি সামনে পুঁতে আমরা নামাজ পড়লাম। এও আল্লাহের মহিমা! এরা না এলে শয়তানের জাদু আমাকে বিপন্ন করত। ফিরে যাওয়ার সময় দিদারুল অনর্গল কথা বলছিল।....হজরত! যে ইউরোপীয় মনীষীদের জোরে হিন্দুরা নিজেদের

ধর্মের নতুন-নতুন ব্যাখ্যা করছে, তাঁদেব জোরে আমরাও ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা করতে পারি। আপনি জানেন হজরতে আলা ? মনীষী হিউগো রসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে কাব্য রচনা করেছেন! ইস্তাহারে সেইসব উদ্ধৃতি দিয়েছি। হিউগো পয়গম্বরের উক্তি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন ঃ 'জেবেল (আরবি শব্দ, অর্থ ঃ পর্বত) ক্রোনেগার গিরিখাতে সিংহেরা যাঁর কৃপায় অবাধে বিচরণ করে, সমুদ্রে মুক্তা এবং মহাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যাপ্ত থাকে, বিষাদগ্রস্তকে তিনিই কিয়ৎপরিমাণে আনন্দদান করতে পারেন।' আরেক মনীষী গ্যেটে প্রশংসা করে লিখেছেন — বড়োগাজি সম্ভবত আমাকে জ্ঞান দেওয়ায় অপমানিত বোধ করব ভেবেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দিদাবুল! হুজুরের অজানা কিছু নেই। দিদাবুল জিভ কেটে বলল, জি হ্যাঁ। মাফ করবেন হজরত!...আমি অন্যমনস্ক। আমার বুকের ভেতর তখন গিরিখাতের সিংহেরা গর্জন অথবা হাহাকার করছে — যত দূরে সরে যাচ্ছি ব্রাহ্মণী নদী থেকে, তত ওই গর্জন অথবা হাহাকার। যত সরে চলেছি তত পিছনে সমুদ্রের তলায় ঝলমল মুক্তার মতো স্মৃতি, আর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জে পিঙ্গলচক্ষু এক নাঙ্গা আউরত আমার দিকে তাকিয়ে আছে।.....

'And now.... I will rehearse a tale of love which I heard from Diotima of Mantineia, a woman wise in this.... She was my instructress in the art of love....'
(Socrates to Agathon: 'Symposium–Plato)

সেই সন্ধ্যায় পূর্বকথানুসারে যখন কেশবপল্লীতে 'হাজারিলালের' কুটিরে যাই, বুঝি নাই যে আবার আমার একটি মেটামরফসিস আসন্ন। জীবন কী রহস্যময় বিষয়! প্রতিটি পরবর্তী পদক্ষেপে কী ঘটিবে তুমি জান না, জানিবার কোনো উপায় নাই। কর্মফল-তত্ত্বে বিশ্বাস নাই, কারণ উহা যুক্তিবিরহিত। একই কর্মে এক২ প্রকার ফল ফলিতে দেখ না কি? সর্বত্র যেন আকস্মিকতা ওত পাতিয়া আছে। দুইয়ে দুইয়ে চারি হইবার গ্যারান্টি নাই।

হরিবাবু আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। হাতে একটি লাঠি ও একটি লণ্ঠন লইয়া বাহির হইলেন। মাথায় হিন্দুস্থানীদের মতন পাগড়ি, গায়ে কম্বল এবং পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যা। হিমের গাঢ়তা জীবজগতকে

নৈঃশব্দ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। বলিলেন, এ কী ! তুমি আলোয়ান আন নাই কেন ?

হাসিয়া বলিলাম, আমার রক্তে কিছু আছে। শীত কাবু করিতে পারে না। কিন্তু আপনি কি অন্যত্র যাইবেন ?

হ্যাঁ। হরিবাবু চাপা স্বরে বলিলেন। আমারই ভুল হইয়াছে ! তোমাকে আভাসে বলা উচিত ছিল আমরা একটি দুর্গম স্থানে যাইব !

আপনার সহিত নরকে যাইতেও আপত্তি নাই। তবে আমি নিরস্ত্র।

হরিবাবু হাসিলেন !... না, না। নরহত্যা করিতে যাইতেছি না। একটু অপেক্ষা করো। বলিয়া তিনি তাঁহার কুটিরের তালা খুলিয়া ঢুকিলেন। তাহার পর একখানি তুলার কম্বল আনিয়া বলিলেন, গায়ে জড়াইয়া লও। মাথা পর্যন্ত ঢাকো।

বাঁধের শিশিরসিক্ত ঘাসে দুইজনে হাঁটিতেছিলাম। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, এইপ্রকার প্রশ্ন করার অভ্যাস আমার নাই। শৈশব হইতেই এই নির্লিপ্ততা আমার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। আমার পিতার যাযাবর স্বভাবই ইহার মূলে। সর্বক্ষণ সকল মুহূর্তের জন্য আশৈশব প্রস্তুত থাকিয়াছি, কোথাও যাইতে হইবে। দেবনারায়ণদা সেদিন ঐতয়ের ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ভাবিলাম, যাযাবর নরগোষ্ঠী ছাড়া এমন উক্তি কাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইবে ? ওইসকল শাস্ত্রপ্রণেতা নাকি আর্য ছিলেন। হরিদা সেদিন উদাত্তস্বরে আমার রক্তেরও আর্যত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন। হ্যাঁ, এই একটি ক্ষেত্রে ২+২ = ৪ হইল বটে। মনে মনে হাসিতে থাকিলাম।

শফি ! শস্যচোরদের হাত হইতে শস্য বাঁচাইতে কৃষকেরা আমাকে যেভাবে তুমি দেখিতেছ, সেইভাবে রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্র দেখিতে যায়। হরিবাবু চাপাস্বরে বলিলেন। কিন্তু কাহারও সম্মুখে পড়িলে তুমি কী কৈফিয়ত দিবে ভাবিতেছি।

বলিলাম, আপনি জানেন না, ইতিমধ্যে সর্বত্র ছিটগ্রস্ত, অর্ধোন্মাদ, এমন কি বদ্ধপাগল বলিয়া আমার সুখ্যাতি রটিয়াছে ?

হরিবাবু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, উহা অংশত সত্যও বটে। তবে জিনিয়াস ব্যক্তিরা এইরূপ হইয়া থাকেন। শফি, তোমার মধ্যে প্রতিভাধর পুরুষের তাবৎ লক্ষণ পরিস্ফুট।

হরিবাবু কি বিদ্রূপ করিতেছেন ? গম্ভীর হইয়া চুপচাপ হাঁটিতে থাকিলাম। তিনি বুদ্ধিমান। একটা কিছু আঁচ করিয়া বলিলেন, তুমি কি রাগ করিলে আমার কথায় ? শফি, তুমি জান না তুমি কী। স্ট্যানলিকে হত্যার কালে তোমার এক শক্তি দেখিয়াছি। আবার তুমি যখন গভীর দার্শনিক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ নিষ্ঠাবান ছাত্রের মতন অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর, তখনও তোমার মধ্যে আর-এক শক্তি দেখিয়াছি। দেবী দুর্গা এবং দেবী সরস্বতী উভয়ের অনুগ্রহ লাভ না করিলে ইহা সম্ভব হয় না !

ইচ্ছা হইল বলি, যমুনাপুলিনের বংশীধারী গোপীবল্লভেরও বুঝি বা অনুগৃহীত আমি — নতুবা কেন এই হৃদযতন্ত্রী কোনো এক চিরন্তনী শ্রীরাধার জন্য নিরন্তর ব্যাকুলসুরে বাজিতেছে আর বাজিতেছে ? কিন্তু হরিবাবু শাক্ত। গোঁড়া শাক্ত তো অবশ্যই। বৈষ্ণবদের কথা শুনিলেই চটিয়া আগুন হন দেখিয়াছি। তাই চুপ করিয়া থাকিলাম। ধর্ম ব্যাপারটার মধ্যে আসলে একটা বিশ্বজনীন সামান্যতামূলক আদল রহিয়াছে। ফরাজি এবং সুফিদের সঙ্গে যথাক্রমে যেন শাক্ত এবং বৈষ্ণবের কেমন একটা মিল ! ইহুদিদের তোরাপন্থী এবং কাব্বালাপন্থী, খ্রীস্টানদের ক্যাথলিক এবং

প্রেসবাইটেরীয় গোষ্ঠী...

হরিবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। বলিলাম, কী হইল?

তিনি লণ্ঠনটি নাড়িতে থাকিলেন। এবার কিছু দূরে একটি আলো কিয়ৎক্ষণ আন্দোলিত হইয়া যেন নিভিয়া গেল। এখান হইতে অনাবাদি এলাকার শুরু। কাশবন, উঁচু গাছপালার জঙ্গল, জলাভূমি। বাঁধ বাঁকা হইয়া পশ্চিমে উঁচু এলাকায় গিয়া শেষ হইয়াছে। হরিবাবু উত্তেজিতভাবে বলিলেন, উহারা আসিয়া গিয়াছে। জুতো খুলিয়া হাতে লও। অল্প একটু জলকাদা হইতে পারে।

উহারা কাহারা এই প্রশ্ন করা আমার স্বভাব বহির্ভূত। বামদিকে নামিয়া গিয়া অল্প নহে, যথেষ্ট জলকাদায় পড়িলাম। হিমে দুই পা নিঃসাড়! কাশবনের শিশিরে ভিজিয়া জবুথবু অবস্থা হইল। কিছুদূর চলার পর সম্মুখে ঘনকালো পাহাড়সদৃশ অথবা অন্ধকারেরও অন্ধকারতম একটি অংশের নিকটবর্তী হইয়া হরিবাবু অনুচ্চস্বরে বলিলেন, বন্দেমাতরম্!

ওই উঁচু কালো বিশালতার অভ্যন্তর হইতে প্রতিধ্বনিত হইল, বন্দেমাতরম্!

এতক্ষণে বুঝিলাম উহারা কাহারা। বিশালতাটি উঁচু গাছপালার জঙ্গল। একটি বটগাছের তলায় প্রকাণ্ড শিকড়গুলি লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট হইল। শিকড়গুলিতে তিনজন লোক বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরিবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন। সত্যচরণ বসু, কালীমোহন বাঁড়ুজ্জে, তৃতীয় জন অমলকান্তি দাশ। প্রথম দুইজনের বয়স পঁচিশ কিংবা দুই-এক বৎসর কমবেশি হইবে। তৃতীয়জন আমার বয়সী। তাহার মুখে দিকে তাকাইয়া ছিলাম। কোথায় যেন দেখিয়াছি! হঠাৎ সে উঠিয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল। বলিল, কী আশ্চর্য! তুমি সেই শফি না? ছোটদেওয়ানসায়েবের ভাইপো!

অমনি আমিও তাহাকে চিনিলাম। বলিলাম, কেমন আছ অমল?

অমলকান্তি উচ্ছ্বসিতভাবে বলিল, তোমাকে যে চিনিতে পারিলাম, তাহার কারণ তোমার ওই শীতল চাহনি। নতুবা তুমি গোঁফ রাখিয়া ধুতিশার্ট পরিয়া এমনই বাবু হইয়াছে যে কাহার বাপের সাধ্য চিনিতে পারে? উপরন্তু তোমার বপুখানিও পান্না পেশোয়ারির মতন প্রকাণ্ড হইয়াছে।

দ্রুত বলিলাম, পান্না পেশোয়ারির সম্বাদ কী?

তুমি জান না? অমলকান্তি অবাক হইয়া বলিল। ...সে কতকাল হইল, তোমাদের জাহান্নাম গুলজার করিতেছে। কেহ ইঁট মারিয়া তাহার ঘিলু বাহির করিয়াছিল। পুলিশ চুল্লুকে সন্দেহ করিয়া প্রচণ্ড পীড়ন করিয়াছিল। শেষে প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস পায়। কিন্তু তুমি হঠাৎ স্কুল ছাড়িয়া কোথায়—

বাধা দিয়া কালীমোহন বলিলেন, অমল! পরে বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলিও। অগ্রে কাজের কথা হউক।

মৃদুস্বরে তাঁহারা 'কাজের কথা' শুরু করিলেন। আমার বুকের ভিতর তখন ঝড় বহিতেছে। আনন্দ, নাকি অন্যকিছু, জানি না। শুধু জানি আমি রূপান্তরিত হইতেছি। খালি সিতারার মুখ ভাসিয়া আসিতেছে। দূরে সরিয়া যাইতেছে। আবার কাছে আসিতেছে। সিতারা আমার সহিত যেন জলক্রীড়া করিতেছে, যে-জলক্রীড়ায় একদা দিনশেষে সে আমার সঙ্গে মাতিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। ডাক দিয়াছিল, আও শফিসাব! খেলুঙ্গি!

'কাজের কথা' চলিতেছিল। মহিমাপুর এবং পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি মহালে

এবার শুখায় অনাবাদ। কিন্তু জমিদারদের বেতনভোগী পরগণাম্যানেজারগণ এখনই প্রজাদের হুমকি দিতেছে। ওইসময় পরগণায় গত বৎসরও ভাল ফসল হয় নাই। কৃষক প্রজাদের অবস্থা সর্ব্বস্বান্ত। বিহারমুলুকের মুণ্ডার্সদার বীরসা মহারাজের দৃষ্টান্তে বহু স্থানে কৃষকেরা জোট বাঁধিতেছে! ইংরাজ অফিসার এবং পুলিশবাহিনীর কাছে রাজধানী কলিকাতা হইতে লাটবাহাদুরের হুঁশিয়ারি আসিয়াছে, এমত সম্বাদ আছে। এমন কী, লোহাগড়া পরগণার দিকে সংপ্রতি বহরমপুর সেনানিবাস হইতে একটি গোরাপল্টনও রওনা হইয়া গিয়াছে। গোরাদের ভয়ে পথিপার্শ্বের তাবৎ গ্রামের মানুষজন গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে-জঙ্গলে লুকাইয়া পড়িতেছে। ওদিকে বিহারের রাঁচীমুলুকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে হাজার-হাজার সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোঁড়া-মুসহর প্রমুখ আদিবাসী বাঙ্গালাদেশে চলিয়া আসিতেছে। এই মহাসুযোগের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। কলিকাতা হইতে বিপ্লবী বন্দেমাতরম্ গুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দের নির্দেশ সম্বলিত একটি লাল হরফে ছাপা ইস্তাহার কালীমোহন পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

নিজের রূপান্তশীল অংশের প্রান্ত হইতে অসহায় বিদ্রোহের বার্তা শুনিতেছি। এ আবার এক সন্ধিকাল জীবনে। কবেই বুঝিতে পারিয়াছি, আমি বিদ্রোহের ধাতুনির্ম্মীত একটি সত্তা। অথচ মাঝে-মাঝে আমার মধ্যে একপ্রকার 'টাগ অফ ওয়ার' চলিতে থাকে। উষ্ণতা এবং শীতলতা, জাড্য এবং গতির বড়ই জটিল টানাপোড়েন।

কালীমোহন আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, লোহাগড়া থানায় আপনার স্বজাতিভুক্ত এক দারোগা আছে। তাহার নাম মৌলুবি কাজেম আলি, সে এক জহলাদ। তাহার সুব্যবস্থার দায়িত্ব আপনিই লউন।

'স্বজাতি' শব্দটি আমাকে আঘাত হানিল। কিছুক্ষণ আগে অমলকান্তি 'তোমাদের জাহান্নাম' বলিয়াছিল, উহা কানে লই নাই। অমল লালবাগে আমার সহপাঠী ছিল। তাহার পিতা নবাববাহাদুরের কর্মচারী ছিলেন। কেল্লাবাড়ি এলাকায় বাস করিতেন দেখিয়াছি। অমলের দিকে চাহিয়া আস্তে বলিলাম, আমার অসুবিধা আছে। অন্তত মাঘ মাস পর্যন্ত আমার পক্ষে এই আবাদ এবং আশ্রম ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া কঠিন। দেবনারায়ণদার আশ্রিত আমি। তিনি—

বাধা দিয়া হরিবাবু বলিলেন, না কালীদা! লোহাগড়া শফির অজানা জায়গা। উহার একটা কিছু ঘটিয়া গেলে এই আবাদ ও আশ্রমের ওপর প্রত্যাঘাত আসিবে। ফলে আমার বিপদ ঘটিবে। এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ বলুন বা আশ্রয় বলুন, আর আমি পাইব না। সত্যচরণ এবং অমলকান্তি উভয়েই হরিবাবুর কথায় সায় দিলেন।

সত্যচরণ বলিলেন, ওই দারোগার ব্যবস্থা এখনই করিলে উল্টা ফল হইতেও পারে। শফিবাবুই বলুন, ইহা ঠিক কি না যে, মুসলমানের গায়ে হাত পড়িলে মুসলমানসমাজ ক্ষেপিয়া উঠিবে ? আমরা মুসলমানদেরও পাশে লইতে চাই কি না ? কলিকাতা এবং ঢাকায় আমাদের কিছু সংখ্যক মুসলমান সদস্য আছেন। ইংরেজকে তাড়াইতে হইলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন কি না ?

সত্যচরণবাবুকে আমার অত্যন্ত পছন্দ হইল। কালীমোহনবাবুকে গম্ভীর দেখাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, হরিনারায়ণ! শীত করিতেছে। অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইলে বিপদের আশঙ্কা আছে কি ?

হরিবাবুর সহাস্যে বলিলেন, না। ইহা বসতি অঞ্চল হইতে দূরে, উপরন্তু দুর্গম। কেহ দেখিলে ভাবিবে ভূতপ্রেত।

তিনি এবং অমল উৎসাহে শুষ্ক পত্র ও কাঠকুটা কুড়াইতে থাকিলেন। শিশিরে সিক্ত হওয়ার ফলে আগুনের বদলে ধোঁয়াই বেশি হইল। বৃত্তকারে বসিয়া তাঁহারা মৃদুস্বরে আবার 'কাজের কথায়' মগ্ন হইলেন। আমি শুধু সিতারার কথা ভাবিতেছিলাম। সে পূর্ববৎ ঝড়ে অথবা প্লাবনতরঙ্গে একবার কাছে একবার দূরে সরিতেছিল।

আর ঠিক এইসময় আমার বুজুর্গ পিতার ন্যায় আমি একটি মোজেজা অথবা 'Vision' দেখিলাম। কিম্বা খ্রীস্টীয় তত্ত্বে ইহাকেই Revelation কহে কি না জানি না।

একদা প্রকৃতিজগতে একটি নদীর তীরে এক আদিম নারী আমাকে দেহের সোপানে টানিয়া তুলিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, এইরূপে দেহের সোপানসমূহ অতিক্রম করিয়াই হয়তো প্রেমের মন্দিরে পৌঁছাইতে হয়। তখন আমি এক অপরিণতবুদ্ধি অপিচ এঁচোড়েপাকা কিশোর মাত্র। কিন্তু তাহার পর এক প্রাচীন জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত রাজধানীর প্রান্তে অপর এক নারী — যে আদিম নহে, অভিজাতবংশীয় কন্যা — অপর এক নদীর তীরে 'আও শফিসাব, খেলুঙ্গি' বলিয়া ডাক দিয়া মনের সোপানে স্থাপন করিয়াছিল। ওই সোপানের শীর্ষেই প্রকৃত প্রেমের মন্দির। স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি দীপ জ্বলিতেছে নিস্কম্প, অনির্বাণ। ধূপের সুগন্ধ ছড়াইতেছে। উহাতে সিতারার সিক্ত কেশের ঘ্রাণ। তরঙ্গের ভাষায় সে কহিতেছে, আও শফিসাব, খেলুঙ্গি! আও শফিসাব, খেলুঙ্গি! আও শফিসাব, খেলুঙ্গি!

সিদ্ধান্ত করিলাম, অন্তত একবেলার জন্যও লালবাগে যাইব।...

> ...'Daphne's soft breast was enclosed in
> thin bark, her hair grew into leaves, her
> arms into branches, and her feet... were
> held fast by sluggish roots, while her face
> became the treetop. Nothing of her was left.
> except her shining loveliness...'
>
> Metamorphoses— Ovid.

বাঁকিপুরের মুসলিম জমাত ছিল হানাফি সম্প্রদায়ের। হজরত বদিউজ্জামান নুরপুরে থাকার সময় বাঁকিপুরের মাতব্বর লোকেরা ফরাজিমতে দীক্ষা নেয়। বিত্তশালী এই লোকগুলির প্রভাবেও বটে, আবার 'বদুপিরের' কেরামতি বা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে জনরবের ফলে বাঁকিপুরের সমস্ত মুসলমান ফরাজি হয়ে উঠেছিল। গিয়াসুদ্দিনের ওপর তাই প্রবল চাপ পড়তে থাকে। কারণ তিনি 'হিঁদু' হয়েছেন! ব্রহ্মপুরের আশ্রমে যাতায়াত করেন। অন্যদিকে তাঁর গ্রামের হিন্দু বাবুজনেরাও ব্রাহ্মদের প্রতি প্রচণ্ড বিরূপ ছিলেন তাঁরাও মুসলমানদের তলে-তলে প্ররোচিত করতে থাকেন। তাঁকে একঘরে করা হয়। তিনি ছিলেন বাঁকিপুর পাঠশালার শিক্ষক। তাঁকে তাই পণ্ডিত গিয়াস বলা হত। নিরক্ষররা বলত 'পুণ্ডিত'। তাঁর ভিটেটুকু বাদে আর মাটি ছিল না! বহুকাল আগে স্ত্রী মৃত। একটিমাত্র কন্যা ছিল। তার নাম রেহানা। প্রাইমারি পরীক্ষায় সে কৃতিত্বের দরুন মাসিক দুটাকা হারে বৃত্তি পেত। তাকে আর পড়ানোর মতো স্কুল গ্রামাঞ্চলে ছিল না। তখন যে সব 'উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়' ছিল, সেগুলিতে শুধু ছেলেদেরই পড়ানোর ব্যবস্থা। ফলে দুটাকা বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। গিয়াস পণ্ডিত অগত্যা তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। তখন মুসলিম

সম্প্রদায়ে কন্যাপণ প্রচলিত। রেহানাকে যে-কোনো বিত্তশালী পরিবারে পাত্রস্থ করা যেত। রেহানার গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, ঈষৎ রোগাটে গড়ন, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের গড় লাবণ্য তার ছিল। তাছাড়া সে বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যা-অভিলাষিণী কিশোরী। কিন্তু গ্রাম্য বিত্তশালী পরিবারের তৎকালীন প্রায় নিরক্ষর গাড়ল সদৃশ বয়স্ক পাত্রদের নোলায় যতই জল ঝরুক, গিয়াস পণ্ডিত - বিরোধী তৎপরতা — যা ক্রমশ বর্বর আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল, তাদেরকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং প্রতিক্রিয়াবশে তারাও মারমুখী হতে থাকে। গিয়াসুদ্দিনের আত্মীয়স্বজনও তাঁকে ত্যাগ করেন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ গিয়াসুদ্দিন, অথচ ব্রহ্মপুরে আশ্রমে এলে তাঁকে দেখে বোঝাও যেত না কিছু। হাস্য-পরিহাস এবং গম্ভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় মগ্ন হতেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বাতাসে খবর ছড়ায়। দেবনারায়ণ সেই খবরে প্রথম-প্রথম ততটা গুরুত্ব দিতেন না। অবশেষে একদিন আসন্ন মাঘোৎসবের প্রস্তুতি উপলক্ষে আলোচনাসভার পর গিয়াসুদ্দিন গোপনে মুখ ফুটে সব কথা বলেন এবং তখনই খেয়ালি দেবনারায়ণ দুখানি গোরুর গাড়ি, একটি পালকি এবং একদল পাইক পাঠিয়ে বাঁকিপুর থেকে গিয়াসুদ্দিন, রেহানা এবং গেরস্থালিটি উপড়ে আনার ব্যবস্থা করেন। গিয়াসুদ্দিন ও তাঁর কন্যা রেহানা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হবেন আগামী মাঘোৎসবে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের দীক্ষা দেবেন। কলিকাতার ব্রাহ্ম সংবাদপত্রে এই উত্তেজনাপ্রদ সংবাদ ছাপা হয়। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ডাকে ব্রাহ্মরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠান গিয়াসভাই এবং তাঁর কন্যাকে। ব্রহ্মপুরে তখন সে এক আবেগপূর্ণ কাল। প্রবল ব্যস্ততা।

আর সেই আবেগপূর্ণ কালে শফি ভিন্নতর এক নিজস্ব আবেগে উদ্বেলিত। সে লালবাগ যাবে। কিন্তু দেবনারায়ণ তাঁকে প্রায় বন্দী করে ফেলেছেন। বালিকাবিদ্যালয়, কুটিরশিল্পকেন্দ্র, কতকিছু পরিকল্পনা দেবনারায়ণের। টাকার দরকারে অনাবাদি জঙ্গুলে মাটি যৎকিঞ্চিৎ সেলামি ও খাজনায় বন্দোবস্ত করছেন। উঠবন্দি ভূমিব্যবস্থা, যার অপর নাম সন-গুজারি জমিবিলি (অর্থাৎ বাৎসরিক ফসল ফলানোর অধিকার দান) -প্রথা, আবাদে বহুক্ষেত্রে চালু ছিল। এই মত্তকায় চতুর লোকেরা রায়তি বন্দোবস্তে মাটির মালিকানা লাভে তৎপর হয়। বিহার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ এবং শাসকদের অত্যাচারে পালিয়ে আসা আদিবাসীদের এক পয়সা দিনমজুরিতে নতুন রায়তরা দ্রুত মাটি কাটিয়ে বাঁধ তৈরি শুরু করে। জঙ্গল অদৃশ্য হতে থাকে। শঙ্খিনী নদীর ধারে বাঁধের কাজ শুরু হয়েছিল অঘ্রানের শেষাশেষি। সেই সময় শফি লালবাগ যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল।

নদীর ওপারে নবাববাহাদুরের মহাল। সেই মহালের গ্রামগুলি থেকে আপত্তি উঠেছিল, ওপারে বাঁধ দিলে সেইসব গ্রামের জমি বন্যায় ডুবে যাবে। এমন-কি বসতিও বিপন্ন হবে। দরখাস্ত পেয়ে নবাববাহাদুর কালেক্টর সাহেবকে জানান। লালবাগের এস ডি ও বাহাদুর গিলবার্ট ছিলেন রাগীও ত্রূরপ্রকৃতির এক অসট্রেলিয়ান ইংরেজ। তিনি সে সার্কেল অফিসারটিকে তদন্তে পাঠান, তাঁর নাম মৌলবি জব্বার খান (তৎকালে শিক্ষিত মুসলিমদের মৌলবি বলা হত)। জব্বার খান অবাঙালি মুসলমান এবং প্রভুর চেয়ে এককাঠি সরেস। তদন্ত করে বাঁধ তৈরি বন্ধের হুকুম দিয়ে গেলেন। নতুন রায়তরা দেবনারায়ণকে এসে ধরল। দেবনারায়ণ প্রতিকারের আশ্বাস দিলেন। তারপর নিভৃতে শফিকে ডেকে বললেন, নবাববাহাদুরের এক দেওয়ান সাহেব তোমার আত্মীয় — তুমিই বলেছিলে। ভাই শফি, এই বিপর্যয়ে

তুমিই এখন ভরসা। তুমি গিয়ে তাঁকে বলো। তিনি যেন নবাববাহাদুরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা ফয়সালা করেন। ফয়সালা যাই হোক না, আমি মেনে নেব। তোমাকে একা যেতে হবে না। গিয়াসভাইও যাবেন। কারণ তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। শফি তখনই রাজি হয়ে গেল। শঙ্খিনী নদী ভাগীরথীতে মিশেছে। এখনও এই নদীপথের গম্যতা আছে। তবে মাঘের শেষাশেষি এই গম্যতা থাকবে না। জল কমে যাবে। পৌঁছুতে ভাটি, ফিরতে উজোন। তাই দুজন দাঁড়ি, একজন মাঝি এবং রতন রাজবংশী পাইক নিয়ে ছোট্ট একখানি বজরায় গিয়াসুদ্দিন আর শফি ভোরবেলা নৌকায় রওনা দিল। গিয়াসুদ্দিন সারাপথ তত্ত্ব আলোচনায় শফির কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিলেন। 'তৌহিদ' আর 'সোহহম্' এই দুই তত্ত্ব যে এক, তিনি তার ব্যাখ্যা করছিলেন। 'ফানা' এবং 'মোক্ষ', 'ফুক্‌রওয়া-ফানা' এবং 'অস্মিতালোপ', 'ফানা' এবং বৌদ্ধ (মিলিন্দপঞ্চহ-বর্ণিত) 'পুদ্‌গল-শূন্যতার' একত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়াসপণ্ডিত এতই ব্যাকুল যে শফির মনে হচ্ছিল, ইনি এতদিনে এমন একজন স্বধর্মাবলম্বীকে পেয়েছেন, যাকে বোঝাতে চাইছেন, তাঁর হিন্দুধর্মের বেদবেদান্ত-অনুরাগ এবং ব্রাহ্মধর্মে প্রবল আসক্তির পিছনে কোনো বিষয়স্বার্থ নেই! গিয়াসপণ্ডিতকে বড়ো করুণ দেখাচ্ছিল শফির। শেষে বললেন, ডিইস্‌ট্‌দের কথা পড়েছি। রাজা রামমোহন রায় তাঁদের অনুরাগী ছিলেন। তুমি তো ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী, এবার তুমি ডিইস্‌ট্‌ এবং খ্রীস্টধর্মের সম্বন্ধে কিছু বলো। খ্রীস্টতত্ত্বে অনুরূপ কিছু আছে কি? তবে তার পূর্বে বলো, তুমি ইংরাজিতে পারদর্শী হলে কীভাবে? শফি অগত্যা বলল, আমি লালবাগে নবাববাহাদুর ইনস্‌টিটিউশনে ছাত্র ছিলেম। ওখানে ইংরাজিই এজুকেশন-মিডিয়াম ছিল। এবার গিয়াসুদ্দিন তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিরক্তিকর প্রশ্ন করতে থাকলেন। শফি দায়সারা জবাব দিল মাত্র। বুদ্ধিমান গিয়াসুদ্দিন বুঝতে পারলেন, যুবকটি চঞ্চলচিত্ত, ঈষৎ ছিটগ্রস্ত এবং স্বল্পভাষী। অথচ এর মধ্যে কী একটা আছে, চোখের চাহনির সাপের শীতলতা এবং সৌন্দর্যময় বলিষ্ঠ গড়নে সিংহের শৌর্য প্রাচীন যোদ্ধাদের কথা স্মরণ করায়। গিয়াসুদ্দিন গুনগুন করে অস্পষ্ট কী গান গাইতে থাকলেন। হয়তো ব্রহ্মসংগীত। দুপুর নাগাদ নৌকা ভাগীরথীতে পৌঁছলে মাঝিরা নৌকা বাঁধল। তীরবর্তী গঞ্জ থেকে চালডাল মাছ কিনে আনল। গিয়াসুদ্দিন স্নানকাতুরে। শফি গঙ্গার কাজলজলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার হঠাৎ মনে হল, সিতারা এত হিম কেন? এই জলে সিতারার স্বাদ পেতে চেয়েছিল সে।

শঙ্খিনীতে স্রোত ছিল। ভাগীরথী প্রায় নিশ্চল। মাঝে-মাঝে বালির চড়ায় নৌকা ঠেকে যাচ্ছিল। যখন দূরে ইমামবাড়া আর হাজারদুয়ারি প্রাসাদের শীর্ষদেশ দেখা গেল, তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। হিমের স্পর্শ তীব্রতর। মাঝি চাঁদঘড়ি বলল, তাও পেছনে উত্তুরে হাওয়া, নৈলে মুখআঁধারি বেলা হয়ে যেত। মিঁয়াসায়েব, কেল্লার ঘাটে তো নৌকো বাঁধতে দেবে না। কোথা বাঁধব হুকুম দিন। শফি আস্তে বলল, সাহানগর ঘাটে বাঁধবে চলো!

শফি ব্যগ্রদৃষ্টে তাকিয়ে জাফরগঞ্জের সেই ঘাটটি পেরিয়ে এল। ওই ঘাটে সিতারা তাকে ঠিক এমনি দিনান্তকালে ডাক দিয়েছিল, আও শফিসাব! খেলুঙ্গি। ঘাটটি ফাঁকা। এই শীতে এখন কি কেউ স্নান করতে আসে? শফি আপনমনে একটু হাসল। কেল্লাবাড়ির সামনে দিয়ে নৌকো চলার সময় তার চাঞ্চল্য জাগল। সে শীতের বিকেলের বিবর্ণ ও ধূসরতামাখা আলোয় প্রতিটি চবুতরা, ছত্রতল, তীরবর্তী রাস্তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল। নিচু নদীগর্ভ থেকে ওইগুলি দিগন্ত বলে মনে হচ্ছিল।

তখন সে উঠে ছইয়ে হেলান দিল। এই সময় গিয়াসুদ্দিন বললেন, বহু বছর পরে লালবাগ এলাম। আহা, কী দৈন্যদশ্য ঘটেছে! মাঝিভাই, 'সাহানগর ঘাট' তো দূরে পড়বে। বরং 'লম্পটের ঘাট' তো আগেই। শফি, কী বলো? শফি আনমনে বলল, হুঁ।

এই লম্পটের ঘাটেই এক গোরা উপদ্রব করত। কাছেই সিপাহিব্যারাক। দেশি সিপাহিরাও মেয়েদের জ্বালাতন করত। সেটাই হয়তো এই নামের কারণ। অথচ কিংবদন্তি অন্যরূপ। ইংরেজ ইতিহাসওয়ালারা কখনও স্বয়ং নবাব সিরাজুদ্দৌলা কখনও তাঁর সেনাধ্যক্ষ মির মদনের লাম্পট্যকে এই ঘাটের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। শফি এতক্ষণে শুনতে পেল, গিয়াসপণ্ডিত ঘাট-বৃত্তান্ত নিয়ে বকবক করছেন। বললেন, তুমি জান? ইতিহাসবহিতে শয়তানরা লিখেছে, মদন নামে এক হিন্দু নবাব সিরাজুদ্দৌলার জন্য স্নানার্থিনী সুন্দরীদের নৌকায় তুলে নিয়ে যেতেন! অরে মূর্খ উজবুকের দল! এ মদন সংস্কৃত ভাষার মদন নয়। উচ্চারণবিকৃতিতে 'মাদান' মদন হয়েছে! মাদান খাঁটি আরবি ওয়র্ড। তোমার আব্বার ন্যায় এক বুজুর্গ পির ছিলেন পারস্যদেশে। তাঁর নাম হজরত মাদান শাহ্। আর বাঙলাপ্রদেশের গ্রামে তুমি মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচুর মদন শেখ দেখবে। তুমি দেওবন্দি আলেম মওলানা মাদানির নাম শুনেছ? শফি আনমনে মাথা নাড়ল। চতবুতরা, ছত্রতল, রাস্তা — কেল্লা এলাকার কোথাও সিতারা নেই। পরে ভাবল, কেন সে থাকবে? সে কাল্লু সাতমারের স্ত্রী হলেও খান্দানি নবাববংশজাত কন্যা। সে নির্জন ঘাটে যেতে পারে। এমন জায়গায় তাকে এখন দেখা যাবে কেন? গিয়াসুদ্দিন বললেন, ইংরাজিতে একটি প্রবাদবাক্য আছে না? 'যে কুকুরকে বধ করতে চাও, তাহার বদনাম রটনা করো!' তুমি ইংরাজিনবিশ। বলো তো বাক্যটি ইংরাজিতে কী? শফি আস্তে বলল, মনে পড়ছে না। সে কেল্লার পূর্বফটকের পাশে বারি চৌধুরীর ঘরখানি লক্ষ করছিল। ঘরখানি বন্ধ। সে তাঁর সামনে কোন্ মুখে দাঁড়াবে, ভাবছিল। গিয়াসুদ্দিন বললেন, সিরাজুদ্দৌলার নামে যথেচ্ছ কুৎসা না রটালে ইংরাজ রাজত্ব কায়েম হত না। তুমি তো এই শহরে ছিল। লক্ষ্য করেছ, ওই এক কবর বাদে তাঁর আমলের একটুকু স্মৃতিও কোথাও রাখা হয়নি। অথচ মোতিঝিলে তাঁর খালা (মাসি) এবং খালুর (মেসো) স্মৃতির সবগুলিন বিদ্যমান! কোথায় গেল সুরম্য প্রাসাদ হীরাঝিল? দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, 'সিইয়ার-উল-মুতাখ্‌শারিন' কিংবা 'মোজফ্‌ফরনামাহ্' বহিদুইখানির প্রণেতাদ্বয় মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজ কর্মচারী। চাটুকার আর স্বার্থপর না হলে হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলাব এরূপ কুৎসা কেউ রটাতে পারে না। আমার বক্তব্য নয় যে মুসলমান শাসকমাত্রেই মহৎ, নিষ্কলঙ্ক, কিংবা হিন্দু শাসকরাও তদ্রূপ ছিলেন। শাসকচরিত্রে সাধারণ মনুষ্যের দোষগুণ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রস্তাব হল যে, সেই শাসকের ঐতিহাসিক ভূমিকা কী ছিল? ইংরাজ শাসনে নাকি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে! অশ্বডিম্ব হয়েছে! গিয়াসুদ্দিন ক্রুদ্ধভাবে বললেন, উহারা ভারতবাসীদিগের হস্তে রেলগাড়ি, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি বিবিধ রঙিন খেলনা তুলিয়া দিয়া মোহাবিষ্ট করিয়াছে! আমরা অতিশয় মূর্খ!

গিয়াসুদ্দিন প্রাক্তন রাজধানী দেখতে-দেখতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, শফির মনে হল একথা। তার বলতে ইচ্ছা হল, মানুষ পা তুলে সরে গেলেই সেখানে ঘাস গজায়, এটাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন উত্তেজিত হওয়া বৃথা। মনুষ্যনির্মিত বস্তুপিণ্ডের ধ্বংস অনিবার্য এবং সেই অভিমানী, ভূলুণ্ঠিত, মনুষ্য-ইজ্জতকে প্রকৃতি

তাঁহার স্নেহকরতলে আবৃত করিয়া আব্রুরক্ষার ভান করে। অতএব পরিতাপ অর্থহীন।...

কিছুক্ষণ পরে দুজনে কেল্লাবাড়ির উত্তরফটকে পৌঁছুলেন। সেই সময় শফি বলল, আপনি ফটকে গিয়ে চুল্লু নামে একজনের খোঁজ করুন। আমার কথা বলার দরকার নেই। সে আপনাকে দেওয়ান আব্দুল বারি চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাবে। যদি চুল্লুকে না পান, ওই পাহারাদের বললেই ওরা আপনাকে চাচাজির বাড়ি দেখিয়ে দেবে। সেখানে রহিম বখশ নামে একজন আছে। চাচাজির সঙ্গে সে দেখা করিয়ে দেবে।

গিয়াসুদ্দিন খুব অবাক হয়ে বললেন, সে কী! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

এখনই আসছি। আপনি চাচাজিকে দেবনারায়ণদার চিঠিটি দিয়ে কথাবার্তা বলুন। উনি লালবাগে না থাকলে অগত্যা নৌকোয় গিয়ে অপেক্ষা করবেন। তখন আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির হবে।

গিয়াসুদ্দিন স্তম্ভিত মুখে বললেন, কী আশ্চর্য। মনে-মনে বিরক্ত হয়ে বললেন, সত্যিই যুবকটি ছিটগ্রস্ত। পা বাড়িয়ে ফের মনে-মনে উচ্চারণ করলেন, বদ্ধ উন্মাদ!

শফি অন্ধ ঘোড়ার মতো পা ফেলছিল। নহবতখানা পেরিয়ে বাঁদিকের মহল্লায় ঢুকে সে চলার গতি কমাল। পিলখানার ঘরগুলির দশা আরও শোচনীয় দেখাচ্ছিল। তখনও আলো আছে, ধূসর রঙের আলো। তার বুক কাঁপছিল, আবেগে আর উৎকণ্ঠায়। এতক্ষণে একটি ইংরেজি প্রবাদ তার স্মরণ হল, 'আউট অব সাইট আউট অব মাইন্ড!' আর-কোন্ বইয়ে যেন পড়েছিল, যাহাকে ভালবাস, তাহাকে কদাচ চক্ষুর আড়াল করিও না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চাটুজ্জের বইয়েই কি?

সেই ঘর, সেই বেড়া, সেই পেয়ারাগাছ। কিন্তু এরা কারা? শফি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বারান্দা থেকে কেউ বলল, কৌন হো?

শফি একটু কেশে বলল, কাল্লু আছে?

জীর্ণ কম্বল গায়ে এক বুড়ো এসে বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে বলল, বাবু! কাকে ঢুঁড়ছেন?

কাল্লুকে। পিলখানার সাতমার কাল্লুর বাড়ি না এটা?

বুড়ো বলল, হাঁ। কাল্লু তো একবরষ আগে রোশনিমহল্লা চলে গেসে। থানায় সিপাহিব নোকরি করছে। আপ বোশনিমহলেমে যাকে পুছিয়ে, বোল দেগা। এখোন কাল্লু কৈ মামুলি আদমি নেহি।

শফি অবাক হয়ে বলল, কাল্লু পুলিশের চাকরি করছে?

জি হাঁ বাবুসাব! কাল্লু তো ছোটাদেওয়ানসাবকা পাশ নোকরি কবত। ছোটাদেওয়ানসাব দোবরয আগে নোকরি ছোড় কর চলা গেয়া। কাল্লুকো উনহি পুলিশকা নোকরি মিলা দিয়া! তো আপনি কোথা থেকে আসতেছেন বাবুসাব?

শফি জবাব না দিয়ে ফিরে চলল। শীতের সন্ধ্যা নিঝুম হয়ে এসেছে। বাজার এলাকায় নৈঃশব্দ্য। মিটিমিটি আলো, জড়োসড়ো মানুষজন, একটা এক্কা গাড়ি তার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল এবং কোচোয়ান নিশ্চয় তাকে গাল দিয়ে গেল। রোশনিমহল্লায় পৌঁছে পান্না পেশোয়ারির ঘবটা সে চিনতে পারল। ঘরের সামনে উঁচু চবুতরা ফাঁকা। কিন্তু ঘরের ভেতর কারা লম্ফ জ্বেলে তাস খেলছে। চত্বরটার সামনে কয়েক মুর্হূত দাঁড়িয়ে শফি একটি পুরনো বাস্তবতাকে নিবিড়ভাবে বুঝতে চেষ্টা করল। এইখানে একজন হত্যাকারীর জন্ম হয়েছিল! বাস্তবতাটি রক্তাক্ত এবং

শক্তিশালী। শফি চমক উঠল। লম্ফ হাতে অন্য পাশের ঘরের দরজা থেকে কেউ তাকে প্রশ্ন করছে, কৌন হুঁয়া খাড়া হ্যায় জি?

এ এক বুড়ি। লোলচর্ম! শফি বলল, এখানে কাল্লু সিপাহির বাড়িটা কোথায়?

বুড়ি গলিতে নেমে বলল, উদেখিয়ে। উও পেড়— দেহ্‌ড়ি, হাঁ— ওহি কাল্লু সিপাহিকা ঘর।

বাড়িটার সামনে গিয়ে শফি বুঝল, কাল্লুর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। দেউড়িওয়ালা একটা বাড়িতে সে আছে। উঠোনে একটা কিসের গাছ। দরজা খোলা, কিন্তু চটের পরদা ঝুলছে। মিয়াসাহেব হয়ে গেছে নবাবি হাতির সাতমার কাল্লু খাঁ পাঠান। শফি চাপাস্বরে ডাকল, কাল্লু! কাল্লু!

আবছা আঁধারে পায়ের শব্দ হল। তারপর চটের পরদার ফাঁকে একটি ছোট্ট মুখ বেরুল। সেই সময় ভেতর থেকে কেউ বলল, কৌন রি? বোল্ দে, সিপাহিসাব ডিবটিমে হ্যায়। থানেমে যানে বোল্ দে।

'সিপাহিসাব-।' ওই কণ্ঠস্বর কার? শফি গলা একটু চড়িয়ে বলল, আমি শফিউজ্জামান। সে সিতারার নাম উচ্চারণ করতে পারল না। তার কণ্ঠস্বরে কাঁপন ছিল।

এবার লম্ফের আলো চটের পরদার ওধারে উঁচু থেকে নিচু হয়ে এগিয়ে আসতে-আসতে — কৌন?

শফি। শফিউজ্জামান।

পরদা সরে গেল। লম্ফের আলোয় একটি মুখ, উজ্জ্বল গ্রীবা, বুকে একটি শিশু — প্রশান্ত, কিন্তু নির্লিপ্ত স্ত্রীমুখ। তারপর নীরবতা। তুম্ — আপ্, তারপর আপনি বলেই থেমে যাওয়া।

শফি বলল, চিনতে পারছ না, সিতারা? আমি শফি।

এবার সিপাহিবধূ একটু হাসল। তাজ্জব। তুমি এ কেমন হয়ে গেছ শফিসাব? একদম বাঙালিবাবু। ধুতি-উতি, শার্ট-উর্ট পিন্ধকার্ — কী হয়েছে তোমার? হা খোদা! কার সাদ্য আছে তোমাকে চিহিন্‌বে? আও, আও! অন্দর আও।

শফি চটের পরদা তুলে ঢুকে লম্ফের আলো অনুসবণ করল। সেই সময় দ্রুতদৃষ্টিপাতে বাঁদিকে একটি চালাঘরে গোরু আর ছাগল, ডানদিকে মুরগির দরমা, একপাশে পাতকুয়ো, গোসলখানা আর পায়খানাঘর, লাউগাছের বলিষ্ঠ লতা, পুঁইমাচা, তাবপর সামনে চারটি ধাপের ওপর বারান্দায় দুখানি কুরসি দেখতে পেল। কুরসি জীর্ণ, কিন্তু অভিজাত। কারণ একদা তা মখমলে মোড়া ছিল। মখমলের লালিত্য ক্ষয়ে গেছে। টুটাফাটা অংশ সেলাইকরা। সিতারা, বয়ঠো — বোসো আরামসে বলে একটি কুরসির দিকে ইশারা করল। চোখের সেই দীপ্তি কই? সুরমার টান আছে। কিন্তু দৃষ্টিব্যাপী ধূসরতা। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে। শফি কুরসিতে বসল। মুহূর্তে অনুমান করল, কাল্লু এগুলি কেল্লাবাড়ি থেকে আত্মসাৎ করেছে। দুখানি ঘর। একখানি খোলা। ভেতরে তাকিয়ে শফি আবার অবাক হল। নিচু কড়িকাঠ থেকে একটি কাচের ঝালরদেওয়া সুন্দর ঝাড়বাতি জ্বলছে। এও কেল্লাবাড়ি থেকে আত্মসাৎ! একটি প্রকাণ্ড পালঙ্ক, পুরু গদির ওপর নকশাদার চাদর আর তাকিয়া, ঝুলন্ত কয়েকটি রঙিন সিকের কাঁসা-পেতলের বিবিধ তৈজস। শফি দেখল, বছর তিনেক বয়সের সালোয়ার-কামিজপরা মেয়েটির মুখের আদলে সিতারার অতীত ঐশ্বর্য প্রতিফলিত, সে ঘরের মেঝেয় দু-পা ছড়িয়ে বসল এবং সিতারা তার

ছোট্ট উবুর ওপর বুকের ঘুমন্ত শিশুটিকে স্থাপন করল। তারপর লম্ফটির সাহায্যে একটি চৌকোনো সুদৃশ্য 'লানটিন' জ্বালল। এও, শফির মনে হল, কেল্লাবাড়ি থেকে আত্মসাৎ। লম্ফটি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে লানটিনটি বারান্দায় এনে সিতারা স্থির ও শান্ত দাঁড়াল। তাকে দেখতে থাকল শফি। পরনে ফিকে নীল কামিজ, শাদা সালোয়ার। শাদা উড়নিতে মাথা এবং বুক ঢাকা। তার দুহাতে অনেকগুলি রেশমি চুড়ি, কিন্তু কবজি থেকে দূরে আঁটোভাবে আটকানো। তার নাকে প্রকাণ্ড নাকছাবি ঝিলমিল করছে। কানে রুপোর মোটা দুটি ঝুমকো। সেই সিতারা! কিন্তু সেই সিতারা নয়। শান্ত, উদাসীন, নির্লিপ্ত। হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল, চায় পিও। তারপোরে কোথা হচ্ছে।

একদিন এমনি সন্ধ্যারাতে সিতারা তাকে চা খাইয়েছিল। কিন্তু সেই সিতারা নয়। শফি বলল, চা খাব না। তুমি বসো।

সিতারা একটু হাসল। ...তুমি মেহমান। চায় পিও। নাশতা-উশতা করো। তারপোরে কোথা।

না।

সিতারা তাকাল। আস্তে বলল, কেনো? আমাকে তুমি এখনো নাপসন্দ্ কর বুঝলাম। তো ঠিক হ্যায়!

শফি হাসবার চেষ্টা করে বলল, সিতারা! তোমার জন্য পান্না পেশোয়ারিকে—

জানি। মালুম করেছিলাম। তুমি আমার ইজ্জতরাখনেওয়ালা! আমি কুছু ভুলি নাই। নেভি ভূলোঙ্গি।

শফি চুপ করে রইল। সিতারাও চুপ করে রইল। একটু পরে শফি মুখ তুলে একটু হাসল।... তুমি বলেছিলে, 'পুরা জওয়ান' হয়ে তোমার কাছে আসতে। মনে পড়ে? কেন বলেছিল সিতারা?

সিতারা হাসল না। নির্বিকার মুখে বলল, হাঁ। তুমি পুরা জওয়ান হয়েছ। পান্না পেশোয়ারির চেহ্‌রা হইয়েছে। লেকিন বাঙ্গালি বাবু হইয়েছ। কী বেপার? তুমি সৈয়দজাদা। পিরসাহাবের খান্দান। কেনো তুমি—

বাধা দিয়ে শফি বলল, তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন?

সিতারা একথার জবাব দিল না। বলল, ছোটোদেওয়ানসাব তো নৌকরি ছেড়ে চলে গেসে। তুমি কার ঘরে এসেছ?

শফিও একথার জবাব দিল না। বলল, বিড্ডুর খবর কী?

বিড্ডু কলাকাত্তা চলে গেসে। নৌকরি-উকরি করে।

শফি বলল, কাল্লুভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না।

সিতারা এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। জেরাসে বয়ঠো! আমি খবর ভেজছি। থানেমে হ্যায় মালুম পড়ে। তোমার কথা মুন্নির আব্বা হরঘড়ি বলে।

মুন্নি কে?

সিতারা ঘরের ভেতর ছোট্ট মেয়েটিকে দেখাল। উও মুন্নি। উসকি বাদ একঠো লড়কা আয়া। বদ নসিব! এক মাহিনা জিন্দা থা। উসকা বাদ উও লড়কি। তিন মাহিনা উমর (বয়স)। সিতারা হাসল — আত্মস্থ, জননীর হাসি। তারপর বলল, সিপাহিজী বোল্‌তা 'তিন্নি', আমি বলি 'জানি'। কেনো কি আমার খান্দানে একজন ছিল, জানি বেগম। আংরেজ-লোকের সাথে জঙ্গ করেছিল। আমার দাদিজান তিন্‌হি — জান? আব্বাহজরত জিন্দা থাকলে পুছ করতে।

শফি বলল, চলি সিতারা!

শফি উঠে দাঁড়ালে, সিতারা বলল, তুমি — তুম এক আজিব আদমি শফিসাব! জেরাসে ঠাহার যাও — সিপাহিজিকো বোলাতি! তোমার খবর পেলে জরুর আ যাবে! এক মিনট্!

শফি বলল, পরে দেখা হবে।

সে দ্রুত ধাপ বেয়ে নেমে গেল উঠোনে। দরজার চটের পরদা তুলে বেরুনোর সময় একবার ঘুরে উঁচু বারান্দায় লানটিনের আলোয় একপলকের জন্য স্থির ও ঋজু নারীমূর্তিটিকে দেখল, যেন বা এক বৃক্ষ। শীর্ণ, ফলবতী, তবু লাবণ্যে ঝলোমলো। উহাকে তাই ভালবাসিতে সা‹ যায়। Even as a tree, Phoebus loved her...' জলদেবী দাফনিকে তাহার প্রেমিক দেবতা বৃক্ষরূপিণী দেখিয়াও প্রেম ত্যাগ করিতে পারেন নাই।...

'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক-পলক লোহু চোষে...'

ব্রহ্মপুর আশ্রমে মাঘোৎসবে সেবার প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। আশ্রম এবং এই নতুন গ্রামটি বিশাল নিম্নভূমির উত্তরে উঁচু এলাকায় অবস্থিত। আশ্রম, কাছারি, বিদ্যালয়, আশ্রমিকদের বাসগৃহ — এসবের পিছনে একটি বিস্তীর্ণ বাঁজা ডাঙায় শামিয়ানা খাটিয়ে সভা হয়। জেলার হিন্দু ভদ্রলোক শুধু নন, মুসলমান মিয়াঁরাও এসে জোটেন। চাষাভুষো সর্বশ্রেণীর মানুষ হুজুগের বশে ভিড় করেছিল। জমিদারও এসেছিলেন জনাকতক। তাঁদের সঙ্গে যে পাইকবাহিনী ছিল, তারা লাঠি উঁচিয়ে ভিড় সামলানোর কাজে যোগ দেয়। আগের দিন সদর থেকে একদল সশস্ত্র পুলিশ আসে এবং ক্যাম্প পেতে খবরদারি শুরু করে। বোধ করি গুপ্তপুলিশও ঢের ছিল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতৃত্ব আমাকে দিতে চেয়েছিলেন দেবনারায়ণদা। আমার নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই। একথা শুনে ক্ষুব্ধ দেবনারায়াণদা হৃদয়নাথ শাস্ত্রীর মধ্যম পুত্র অজয়কে দায়িত্বটি দেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়কে দেখে নিরাশ হয়েছিলাম। মাঝারি গড়নের মানুষটি, মুখে দাড়ি, বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। এই হাজার-হাজার মানুষকে তিনি কী শোনাবেন? বিকেলে বেদমন্ত্র পাঠ এবং ব্রহ্মসংগীতের পর সভায় বক্তৃতা শুরু হল। বড়ো হট্টগোল। তার মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী মঞ্চে দাঁড়ালেন। একটি হাত বরাভয়মুদ্রায় ঊর্ধ্বে তুলে কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মনে হল, মেঘ গর্জন করে উঠল। 'ভ্রাতৃবৃন্দ! ভগিনীগণ!' মুহূর্তে সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। মাঝে-মাঝে, একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজে ফেলছিলাম। অবিকল আমার পিতার কণ্ঠস্বর। সেই আগুনের হলকা, সেই বজ্রধ্বনি, সেই ঐশী বার্তা ঘোষণা! সুললিত আরবি শ্লোকগুলির মতোই হঠাৎ-হঠাৎ সংগীতময় বৈদিক স্তোত্র আবৃত্রি। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। সূর্য দিগন্তে নেমেছে, তবু বিরামহীন অনর্গল বাক্যস্রোত, যেন ভাঙা বাঁধের পথে বন্যার কল্লোল — না, উপমাটি সঙ্গত হইল না, বন্যা ধ্বংসের স্রোত, আর ইহা যেন সৃজনপ্রবাহ; এবং মুসলমানদের উদ্দেশে উচ্চারিত হল, 'মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! পবিত্র কোরাণগ্রন্থে আছে, পরমস্রষ্টা কু-উন্ এই ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। এর অর্থ ঃ হউক। অমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হল। আর আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে আছে, পরমস্রষ্টা ব্রহ্ম উচ্চারণ করলেন ঔং— এই নাদব্রহ্মই সমগ্র সৃষ্টির মূলাধার।' কাঁধে কার হাত পড়লে ঘুরে দেখি, হাজারিলাল। সে কানে-কানে বলল, এসো। সভা শেষ হতে রাত্তির হবে। ওই দেখো, বিলিতি বাতিগুলিন

জ্বালানো হচ্ছে। তার পেছন-পেছন উঠে এলাম। আশ্রম এলাকায় ঢুকে হরিবাবু বললেন, রত্নময়ী এসেছে। গোবিন্দদা কথা রেখেছেন। এসো, সে তোমার সঙ্গে পরিচয়ে উৎসুক। কারণ তোমার বাবার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল — তুমি তো সেসব কথা জান। বললাম, তাকে কোথায় রেখেছ? হরিবাবু জবাব দিলেন না। মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখি স্বাধীনবালা দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্তমুখে বলল, এত দেরি কেন? সভা ভাঙলেই মা এসে পড়বে জান না? হরিবাবু শুধু হাসলেন। আমি বললাম সভা রাত্তির অব্দি চলবে। স্বাধীন বলল, আমি সভায় যাচ্ছি। সে চলে গেল।

সুনয়নীর কুটিরের দাওয়ার বাঁশের খুঁটি ধরে স্বাধীনের বয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শীর্ণ, ছিপছিপে গড়ন। কাঁধে খোঁপা ঝুলছে, পাতাচাপা ঘাসের রঙ তার মুখের। হরিবাবু বললেন, রত্ন! এই তোমার সেই পিরবাবার ছেলে শফি।

রত্নময়ী সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম্‌।

আমি স্তম্ভিত। হরিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, রত্ন পূর্বজন্মে মুসলমান ছিল। যাই হোক, তোমরা বাক্যালাপ করো। সভা উপলক্ষে বিস্তর 'টিকটিকির' উপদ্রব হওয়ার সম্ভাবনা। আমি সভার ভিড়ে গা-ঢাকা দিতে গেলাম। রত্ন, তুমি গোবিন্দদাকে বলবে, যেন কেশবপল্লীতে আমার ঘরে গোপনে তোমাকে নিয়ে যান! কিছু কথা আছে।

হরিবাবু দ্রুত চলে গেলেন। রত্নময়ী নেমে এসে জবাফুলের ঝোপের পাশে দাঁড়াল। তার গায়ে একখানি সবুজ কাশ্মীরি নকশাদার আলোয়ান জড়ানো। খোঁপা খসে গিয়েছিল। আলতো হাতে বেঁধে আমার দিকে তাকাল। কোটরগত উজ্জ্বল দুটি চোখ। ঈষৎ তীক্ষ্ণ নাক। হরিবাবুর চেহারার সঙ্গে কোনো মিল নেই। বলল, তাহলে আপনি সত্যিই হিন্দু হয়েছেন?

একটু হেসে বললাম, আমি ধর্ম মানি না। নাস্তিক।

সে আমাকে কেমন দৃষ্টে দেখছিল। মনে হল, আমার গায়ে আঁচ লাগছে। যেন অপ্রকৃতিস্থ চাহনি। একটু পরে তেমনি অপ্রকৃতিস্থ ভঙ্গিতে বলল, আপনার আব্বা আমার জিনটিকে তাড়াতে পারেনি। মাঝে-মাঝে সে আমাকে বিব্রত করে। আমিও ছাড়ি না।

এবার বললাম, আপনার আরবি উচ্চারণ শুনে মনে হল আপনি আরবি জানেন। কোথায় শিখলেন?

রত্নময়ী হাসল। আমার প্রিয় জিনটির কাছে। তাকে যদি দেখতে চান, কৃষ্ণপুরে যাবেন। আপনার দাওয়াত (নেমন্তন্ন) রইল। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গেও যেতে পারেন। আমার পিতাঠাকুর আপনার আব্বার খুব ভক্ত।

সে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলার পর একমুহূর্ত থেমে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, বাট হি হিজ এ টির‍্যান্ট্‌। দা স্যাটান হিমসেল্‌ফ্‌। আই হেট হিম।

ফের স্তম্ভিত হয়ে বললাম, কেন?

হি হ্যাজ কিলড্‌ মাই মাদার। হি লিভস উইথ এ কনকুবাইন — ইউ নো, এ বাইজি!

তার হাবভাবে অপ্রকৃতিস্থতা বাড়ছে লক্ষ করে বললাম, আপনি ইংরেজিও চমৎকার বলেন!

আই ওয়াজ টট্‌ ইংলিশ বাই অ্যান ইউরেশিয়ান গভরনেস! হার নেম ওয়াজ

কেটি — কেটি উডবার্ন। রত্নময়ী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ডু ইউ নো হোয়াই শি হ্যাড লেফ্‌ট দা জব ? দা ব্রুট জমিনডার ওয়ান্‌স্ অ্যাটেমটেড টু রেপ দা লেডি ! আই হেট হিম, হেট হিম ! সশব্দে থুথু ফেলল রত্নময়ী।

প্লিজ—

রত্নময়ী তাকাল। পরমুহূর্তে হেসে উঠল। ..আমি আরবি ভাষায় বাবাকে গাল দিতাম। এইসব কথাই বলতাম। আপনার আব্বাও এসব শুনেছিলেন। আরবি ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন, জন্মদাতার কোনো খাতাহ্ (ত্রুটি) নজর করতে নেই। তাঁর সঙ্গে আমার বাহাস্ (তর্ক) হয়েছিল। বলেছিলাম, যিনি গর্ভে আমায় ধরেছেন তাঁর বুঝি কোনো মূল্য নেই ? জানেন ? সে কী বাগস্ !

আমিও হাসতে-হাসতে বললাম, আর লোকে'বা ভাবল বুঝি আপনার জিনটা—

বাধা দিয়ে রত্নময়ী বলল, জিনটা আছে। তাকে আমি দেখতে পাই। তার সঙ্গে কথা বলি। এই যে দেখছেন, আমি কেমন টিপ পরে সেজেগুজে আছি, কেন ? তার সঙ্গে দেখা যে-কোনো সময় হতে পারে বলে ! সে চায়, আমি সুন্দরীটি সেজে থাকি। আমি সেই মেয়ে — 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী/ পলক-পলক লোহু চোষে।' কিছু বুঝলেন ?

হুঁ।

ফাহিম্ আইয়ু সা'ইন্ ?

সরি। আমি আরবি জানি না।

রত্নময়ী রুষ্টস্বরে ভেংচি কেটে বলল, বলছি — কী বুঝলেন ? মুসলমানের ছেলে, পিরের বাচ্চা ! বলে — আরবি জানি না !

মুখ গম্ভীর রেখে বললাম, বুঝলাম যে আপনি রাত্তিরে বাঘিনী হয়ে জিনটার রক্ত চুষে খান। কিন্তু বেচারা জিন যে রক্তশূন্য হয়ে মারা পড়বেন !

ডোন্টা জোক উইথ মি।

বিব্রত হয়ে বললাম, সরি ম্যাডাম ! তারপর এদিক-ওদিক দ্রুত তাকিয়ে নিলাম। হরিবাবু আর স্বাধীন এক পাগলি জমিদারকন্যার পাল্লায় আমাকে ফেলে দিয়ে কেটে পড়ল। একে কীভাবে সামলাই ? সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। গায়ে আলোয়ান নেই। ভীষণ শীত করছে। উত্তরের সভা থেকে উত্তরের হাওয়ায় এখন সমবেত সংগীতধ্বনি ভেসে আসছে।

স্বাধীনবালা এসে বাঁচাল। বলল, মা একেবারে ব্রহ্মস্বাদে আপ্লুত। চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরছে। আমি ভাবলাম, আলো কোথায় আছে — দিদি খুঁজে পাবেন নাকি।

সে সোজা ঘরে ঢুকে শলাইকাঠি জ্বেলে লণ্ঠন ধরাল। ডাকল, দিদি। হিম লাগবে। ঘরে আসুন। শফিদা, চলে এসো।

বললাম, চলুন ! বড্ড হিম লাগছে।

কিন্তু রত্নময়ী দাঁড়িয়ে রইল। তখন স্বাধীন এসে তাকে টানতে-টানতে ঘরে নিয়ে গেল। আমি বললাম, চলি খুকু !

স্বাধীন বলল, এসো না বাবা ! তোমার এত তাড়া কিসের ?

চাদব নেই দেখছ না ? শীত করছে।

স্বাধীন তার গা থেকে মোটা তাঁতের চাদরটা ছুড়ে দিয়ে বলল, নাও, গায়ে জড়াও।

চাদরে নারীর ঘ্রাণ ! আমার এ কী বোধশক্তি — পঞ্চেন্দ্রিয় কেন এত তীক্ষ্ণ !

অস্বস্তি, অথচ মোহাবিষ্ট অবস্থা — আমি আক্রান্ত। এই আচ্ছাদন যেন বাঘিনীর মতো পলকে-পলকে আমার রক্ত শুষে নিচ্ছে! ঘরে ঢুকলাম না। দোরগোড়ায় মাটিতেই বসে পড়লাম, জুতো উঠোনে খুলে রেখে এসেছি। স্বাধীন বলল, ওখানে কেন? এই মোড়ায় বসো।

বললাম, থাক্। আমি প্রকৃতিচর মানুষ।

রত্নময়ী তক্তাপোশে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আমাকে দেখছিল। স্বাধীন কী বলতে যাচ্ছিল আমাকে, রত্নময়ী বলে উঠল, ওঁকে আমি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছি। সে খি খি করে হাসতে লাগল।

স্বাধীন সকৌতুকে বলল, শফিদাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন! ও কে আপনি জানেন? দুর্দান্ত বাঘ!

রত্নময়ী হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।...

We are the bird's eggs, flowers, butterflies...
we are leaves of ivy and sprigs of wallflower.
...lilies and roses and peach, we are air.
We are flame... We are Woman and
Nature. And he says he cannot hear us speak.
But we speak.

Woman and Nature– Susan Griffn.

কে আপনি?

মানুষ।

কী মানুষ?

পুরুষমানুষ।

জাতি?

মানুষ।

ধর্ম?

মানুষত্ব।

দেশ?

পৃথিবী।

স্বাধীন মূৰ্ছিতা রত্নময়ীর চেতনা ফেরাতে গেলে সে উঠে বসে এবং আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে প্রশ্নগুলি করে এবং ওই উত্তরগুলি দিই। মনে হয় দুজনেই এভাবে একপ্রকার খেলা করছিলাম। স্বাধীন মুখ টিপে হাসছিল। রত্নময়ীর শেষ বাক্যটি ছিল ঃ পৃথিবী একটি আবর্তনশীল গ্রহ এবং মানুষ দ্বিপদ প্রাণী-মাত্র। সম্ভবত উহার মুখ দিয়া 'জিনটিই' বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতেছিল। স্পষ্ট মনে আছে, ধর্মের প্রশ্নে আমি 'মনুষ্যত্ব' বলিনি, 'মানুষত্ব' বলেছিলাম। এ দুয়ের তফাত আছে।

গিয়াসপণ্ডিত হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করতেন। তিনি বাবু গোবিন্দরাম সিংহকে রত্নময়ীকে চিকিৎসার জন্য অনুরোধ জানান। বলেন, এই ব্যধির নাম হিসটিরিয়া। হোমিওপ্যাথিতে এর উৎকৃষ্ট ওষুধ হল ইগনেশিয়া। শুনেছি, গিয়াসপণ্ডিত কয়েক ডোজ ওষুধও দিয়েছিলেন। পরে গোবিন্দরাম রত্নময়ীকে নিয়ে কৃষ্ণপুর রাজবাড়িতে ফিরে গেলে একদিন গিয়াসপণ্ডিত আশ্রমের একটি বৈঠকে কথাপ্রসঙ্গে বলেন, পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা বহু দুঃখক্লেশ-সন্তাপ মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয় এবং পরিণামে সেইগুলিন মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করে। সেই বৈঠকেই দেবনারায়ণদা সহসা একটি অদ্ভুত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আমি বাকরহিত এবং কুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসি। প্রস্তাবটি হল, গিয়াস-কন্যা রেহানার সঙ্গে আমার বিবাহ!

ব্রহ্মপুরে ক' মাস পরে দেবনারায়ণদা একটি হাট বসান। ক্রমশ কিছু দোকানপাটও বসতে থাকে। সামান্য সেলামি আর বার্ষিক খাজনায় দেবনারায়ণদা মাটির বন্দোবস্ত করতে ব্যগ্র ছিলেন। বুঝতে পারতাম, তাঁর ধর্ম প্রচারণাকে উত্তরোত্তর আর্থিক চাপ দাবিয়ে রাখছে। তাঁর পরিকল্পিত স্বর্গরাষ্ট্রে এভাবেই নারকীয় সংক্রমণ ঘটছিল। ব্রাহ্ম বালক আর বালিকাদের দুটি পৃথক বিদ্যালয় ছিল। সেখানে অ-ব্রাহ্ম ছাত্র-ছাত্রীদের নেওয়া হতে থাকে। যে বাঁজা ডাঙ্গায় শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেছিলেন, এক বছরের মধ্যে সেটি বসতিতে পরিণত হয়। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দাপট বাড়তে থাকে। সেখানে দেবদেবীর পূজাও শুরু হয়। কিন্তু আশ্রম এলাকাকে দেবনারায়ণদা কঠোর হাতে রক্ষা করতেন। তাহলেও ক্রমশ তাঁর প্রিয় আবাদ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। দুর্ধর্ষ বাঁকা সর্দার বিজয়পল্লীতে চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন চালু করে। সঙের দলের মজা দেখতে খুব ভিড় হয়েছিল। ক্রুদ্ধ দেবনারায়ণ পাইকদল পাঠান। দাঙ্গার উপক্রম হয়। ব্রহ্মপুরের ভদ্রলোকেরা গিয়ে রক্ষা করেন। তারপর ব্রহ্মপুরে একটি পুলিশ-ফাঁড়ি বসে।

আদিবাসীরাও নিজেদের ধর্ম পালন করত। মুরগি বলি দিত। মাঝে-মাঝে তাদের সঙ্গে বাঁকার দলের দাঙ্গা বাধত। তীর-ধনুক-টাঙ্গি হাতে সাঁওতালরা দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মতো দাঁড়াত। খুনখারাপি হত। এভাবে আবাদে অশান্তি বাড়ছিল। কিন্তু দেবনারায়ণ তবু তাঁর স্বর্গরাষ্ট্রস্থাপনে বিশ্বাস হারাননি। তাঁত-কারখানা, তালাই আর মাদুর তৈরি, সমবায়কৃষিঋণ দানসমিতি — এসব কাজে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। স্ট্যানলির নুরপুর রেশমকুঠি কিনেছিলেন এক হিন্দু জমিদার। চালাতে পারেননি। সেখান থেকে দলেদলে হিন্দু তাঁতি আর মুসলিম জোলারা এসে ব্রহ্মপুরে ভিড় করে। প্রায় একশোটি তাঁতে সারাক্ষণ মাকুর খটাখট শব্দ শোনা যেত। সুতোকাটুনি মেয়েরা খোলা মাঠে বা গাছতলায় বসে সুর ধরে গান গাইতে-গাইতে চরকায় সুতো কাটত।

একদিন সেই সুতোকাটুনিদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে চমকে উঠি। তাকে খুব চেনা মনে হচ্ছিল। তাঁত-কারখানার জন্য দেবনারায়ণ একজন ম্যানেজার নিযুক্ত

করেছিলেন। তাঁর নাম বসন্ত প্রামাণিক। কালো, লম্বাটে এবং মোটা হাড়ের কাঠামো এই লোকটির মেজাজ ছিল রুক্ষ। আশ্রম এলাকায় তিনিই প্যানট কোট পরে থাকতেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না। দেবনারায়ণদার মতে, বসন্তবাবু অভিজ্ঞ এবং দক্ষ লোক। তবে তিনি আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে চলতেন। তখন আমি আশ্রম লাইব্রেরিয়ান। মাসে আর হাতখরচ নয়, রীতিমতো পনেরো টাকা বেতন পাই। সেই কয়েকটি বৎসর আমি গ্রন্থকীটে পরিণত হয়েছিলাম। তো সেকথা থাক। একদিন দুপুরে গাছতলায় ওই সুতো-কাটুনিকে দেখার পর বসন্তবাবুকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি! তখন বসন্তবাবু আমাকে প্রচণ্ড অবাক করে বলেন, সে কী! করুণাকে আপনি চেনেন না? কে না চেনে ওকে? ও আপনার স্বজাতির মেয়ে। দেবনারায়ণবাবু ওকে হিন্দু ধর্মে — অবশ্য ব্রাহ্মধর্মেই বলা উচিত, দীক্ষিত করেছেন। তবে — কাউকে বলবেন না যেন, ওর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। বসন্তবাবুর চেহারাতেও রুক্ষতা ছিল। হাসলে মনে হত, কামড়াতে আসছেন। সেই হাসি হেসে ফের বললেন, সুতোকাটুনিরা গোপনে আমাকে বলেছে, করুণা ডাকিনীবিদ্যা জানে। নিশুতি রাত্তিরে নাকি গাছে চড়ে সে। সেই গাছ আকাশে উড়িয়ে কামরূপ-কামাখ্যায় যায়। ভোরের আগে ফিরে আসে। অল সর্টস অফ ননসেনস টকিংস! আই ডোনট বিলিভ শফিবাবু! আসলে মেয়েটা চরিত্রহীনা। আপনি দেখবেন, শি উইল ডিমরালাইজ দা হোল সেট্‌ল্‌মেনট। আমাব মশায় কর্তার ইচ্ছায় কম্ম। দেববাবুর সুনজরে না থাকলে ওকে অ্যাদ্দিন তাড়িয়ে দিতাম।

হুঁ, চিনলাম। এ নিশ্চয় মৌলাহাটের সেই আবদুলের বউ ইক্‌রা। কিন্তু মেয়েটি ধূর্ত এবং সাতিশয় কপট। বিকেলে সুতোকাটুনিরা সুতো জমা দিতে কারখানার সামনে ভিড করে। সে সুতো জমা দিয়ে কাটুনিপাড়ার দিকে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল। বেলা পড়ে এসেছে। খালের এধারে উঁচু জমির ওপর ছিটেবেড়ার ছোট-ছোটো ঘর। আগাছার ঝোপের ভিতর দিয়ে একফালি সংকীর্ণ পায়েচলা পথ। আমার পায়ের শব্দে সে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে বললাম, ইক্‌রা, আমাকে চিনতে পারছ?

সে ভুরু কুঁচকে সেই বেডালের মতো পিঙ্গল দুটি চোখে আগুনের ছটা এনে বলল, কে ইক্‌রা? আমার নাম করুণা।

ইক্‌রা! আমি মৌলাহাটেব শফি! আমি তোমাকে যেমন চিনি, তুমিও আমাকে চেন!

বাজে কথা বলবেন না, বাবু! এক্ষুণি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

ক্রোধ সংববণ কবে চলে এলাম। বুঝলাম এই নারী ভয়ংকরী। ভাবলাম, দেবনারাযণদাকে এর সম্পর্কে সতর্ক কবা দবকার। কিন্তু ওই কালে বহির্জগৎ সম্পর্কে এক প্রগাঢ় নির্লিপ্ততা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আরও কিছুদিন পরে বসন্তবাবু একরাত্রে আমার ঘবে এলেন। একথা-সেকথার পর হঠাৎ দেঁতো হেসে চাপা গলায় বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কিছু মনে করবেন না যেন।

বললাম, না। আপনি বলুন!

আপনি নাকি এক পিরসাহেবের ছেলে। সত্য কি?

হ্যাঁ।

মৌলাহাটের পিরসাহেবই কি আপনার বাবা?

চোখে চোখ রেখে মাথা দোলালাম। উনি চুপ করে আছেন দেখে তখন বললাম, কেন?

শুনলাম — আই মিন, কাটুনিদের মধ্যে আমার লোক আছে, অবশ্যই স্ত্রীলোক, আপনার বাবা নুরপুরে ছিলেন কিছুকাল।

আস্তে বললাম, শুনেছিলাম।

শোনেননি করুণা যখন মুসলমান ছিল, তখন তাকে আপনার বাবা বিয়ে করেছিলেন, পরে ডিভোরস করেন ?

দিস ইজ অ্যাবসার্ড !

বসন্তবাবু দেঁতো হাঁসি হেসে বললেন, করুণা তাই বলেছে। সে আপনার বাবার নামে অকথ্য-কুকথ্য নিন্দামন্দ করেছে। কাটুনিরা অনেকেই জেনে গেছে সে-কথা। বোঝেন তো ওসব ছোটোলোক মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপার। ওদের পেটে কথা থাকে না। আমি দেববাবুকে বলতে সাহস পাই না। আপনি বলুন ওঁকে। শিগগির মেয়েটাকে এখান থেকে তাড়ানো দরকার।

কেন ?

বসন্তবাবু ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ গোঁফে তা দিলেন। তারপর চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন। আমার সন্দেহ হল, লোকটি ইক্‌রা ওরফে করুণার প্রেমভিখারি। কিন্তু আমার পিতা ইক্‌রাকে বিয়ে করেছিলেন, ভাবতে অবাক লাগল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। পিতার মুখে অসংখ্যবার শাস্ত্রীয় বাচন শুনেছি, যা তিনি জীবনযাপনেও সতর্ক এবং দৃঢ়ভাবে পালন করতেন, 'হে মুসলমান ! পাক কেতাবে আল্লাহ্ বলেছেন, যদি মনে কর একাধিক আওরতের প্রতি সমান আচরণ ও সুবিচার করতে পারবে, তবেই দুটি, তিন এবং চার পর্যন্ত নিকাহ্ করতে পার।' তাছাড়া তিনি কোথাও কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করছে শুনলে ক্ষুব্ধ হতেন। সতর্ক করে দিয়ে শাস্ত্র আবৃত্তি করতেন। তাঁর পক্ষে ইক্‌রাকে বিয়ে করা অসম্ভব।

গিয়াসপণ্ডিতের কন্যাকে বিয়ে করতে চাইনি বলে উনি আমার সঙ্গে আগের মতো কথাবার্তা বলতেন না। নেহাত প্রয়োজনে দু-চারটি কথা বলতেন মাত্র। সেবার আশ্রমে বাঙলা নববর্ষ উৎসব হল। হৃদয়নাথ শাস্ত্রী বেদপাঠ করলেন। দেবনারায়ণদা বাইবেলের "সাম্‌স্" অংশ পড়লেন। গিয়াসপণ্ডিতের কন্যা রেহানা কোরান আবৃত্তি করল। (হায় ! এই বিদূষী তরুণীর মধ্যে একটি খাঁচার পাখিই দেখিয়াছিলাম। আমি যে প্রকৃতিচর — বনের পাখিই আমার প্রিয়)। ত্রিপিটক পাঠ করলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আচার্য ভবতোষ গাঙ্গুলি। শেষে দেখি, 'হাজারিলাল' — হরিবাবু তুলসীদাসের কয়েকটি দোঁহা সুর ধরে আবৃত্তি করলেন।

আগের দিন চৈত্রসংক্রান্তিতে বিজয়পল্লীতে খুব জমকালো গাজন হয়েছিল। সভার ব্রাহ্ম বক্তারা প্রত্যেকে একথা উল্লেখ করে কড়া সমালোচনা করলেন। বিশেষ করে সঙের গানে ও নাটকে নাকি 'ওই ইতরজনেরা নামী সজ্জনদের সম্পর্কে কুৎসা ও খেউড় কীর্তন করেছে।' তারপর গিয়াসপণ্ডিত বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বাঙলা নববর্ষ এবং হিজরিসনের সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনার পর হঠাৎ জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে শুরু করলেন। একটু পরে চমকে উঠলাম শুনে : 'মৌলাহাটের মহাসম্মানিত একেশ্বরবাদী সাধকপুরুষ হজরত সৈয়দ বদিউজ্জামান, যাঁর সুবিদিত ওহাবি ভাবধারার মধ্যে আমাদিগের ব্রাহ্মধর্মের বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান — যেহেতু আমরাও ধর্মক্ষেত্রে নিরাড়ম্বর সারল্য এবং তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ — ত্যাগের দ্বারা ভোগব্রতে ব্রতী, হজরত বদিউজ্জামানও অনুরূপ ব্রতের প্রচারক এবং বিলাসিত বর্জন করে পরমব্রহ্মের সম্মুখীন হওনের নিমিত্ত আহ্বান করেন, তিনিও তৌহিদ বা একত্ববাদের

প্রবক্তা, সেই হেতু তিনিও আমাদিগের নমস্য — অথচ গতকল্য বিজয়পল্লীতে দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা তাঁর নামেও সঙের ন্যক্কারজনক গীতাদি নাট্যাদি অভিনয় করত কুৎসা রটিয়েছে। এমন কী, এক দুর্জন হারামজাদ ব্যক্তি শনের দাড়ি এঁটে টুপি পরে ওই মুসলমান আচার্যের নকল করেছে। ধিক ! শত ধিক ! সুধন্য নামে আরেক দুর্বৃত্ত যুবক স্ত্রীলোক সেজে দাড়িটুপিজোব্বাধারী শয়তানের সঙ্গে — ছি ! ছি ! মুখে উচ্চারণ করতে ঘৃণা বোধ হয়।'

সভায় ধিক্কারধ্বনি শোনা গেল, অবশ্য তা মৃদু এবং ম্রিয়মাণ। আমি বাঁধের পথে বিভ্রান্তভাবে হেঁটে গেলাম। বিজয়পল্লীর কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালাম। তারপর উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে-হাঁটতে আবাদ এলাকা পেরিয়ে শঙ্খিনীর ধারে নতুন বাঁধে একটি ঝুঁকে পড়া গাছের ছায়ায় শুকনো বালির চড়ায় বসে পড়লাম। একটি সাঁওতাল যুবক তীর-ধনুক হাতে ওপারের জঙ্গল থেকে নদীতে নামল। হাঁটুজল পেরিয়ে এসে সে আমাকে দেখতে পেল এবং নির্লিপ্ত দৃষ্টে তাকিয়ে নিয়ে চলে গেল। নিসর্গের অন্তর্ভুক্ত একটি সত্তার প্রকাশ যেন, একটি ক্ষুৎকাতর কাঠবেড়ালির সঞ্চরণ যেভাবে দেখি। উহাদিগের বিদ্রোহের বৃত্তান্ত পড়িয়াছি। উহার বস্তুত নিসর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। 'দিকু'গণ উহাদিগকে আবার নিসর্গের অঙ্গীভূত করিয়াছে। ওই কৃষ্ণকায় যুবকটিকে দেখিয়া হঠাৎ আবার Revelation ঘটিল। নিসর্গ কি সত্যই প্রশান্তিময় ? নাকি আমার 'দিকু'-অবচেতনাঘটিত বিভ্রম ? এখানে ধারাবাহিক সংগ্রাম। টিকিয়া থাকার জন্য মরণপণ যুদ্ধ। প্রকৃতির যে নিভৃত বৃত্তটি নিসর্গরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উহার মধ্যেও সংগ্রামস্রোত বহিতেছে। বৃক্ষলতাও এখানে সংগ্রামরত। মাটি ও জলও সংঘর্ষে লিপ্ত। জড় ও অজড়, স্থাবর ও জঙ্গম মুখোমুখি লড়িতেছে। কোথাও জাড্য নাই। হেনরি ডেভিড থরো কি ইহাকেই 'strange feelings' বলিয়াছেন ? বড়ো বিলম্বে উপলব্ধি করিলাম বাক্যটির প্রকৃত মর্মার্থ কী। 'Disobedience' তত্ত্বের উৎস এইখানেই নিহিত। আত্মস্থ আত্মসমর্পণ নহে, অবাধ্য হও।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছায়া ঈষৎ প্রলম্বিত হয়ে স্রোত ছুঁই-ছুঁই করছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। নদীর স্বচ্ছ জল পান করে যখন ফিরে চলেছি, তখন আমার ভিতরকার ঘাতক-সত্তা দীর্ঘ নিদ্রার পর আড়মোড়া দিচ্ছে। শুকনো খাল পেরিয়ে সুনয়নী দেবীর কুটিরের সামনে পৌঁছে স্বাধীনকে দেখতে পেলাম। সে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু শুনছিল বা দেখছিল। সুতোকাটুনিদের কারখানার দিক থেকে চ্যাঁচামেচি কানে এল। ওরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে। নতুন ঘটনা নয়। স্বাধীন আমাকে দেখে বলল, এদিকে কোথায় গিয়েছিলে ? একটু থেমে ফের বলল, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন ? কী হয়েছে ?

কিছু না। বলে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর ডানদিকে তাকাতেই একটি বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল। দুটি স্ত্রীলোক মুখোমুখি যুযুধান মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দুজনকে নিরস্ত করার জন্য চ্যাঁচামেচি করছে। একজনকে চিনতে পারলাম। ইকরা ওরফে করুণা। অন্যজন প্রৌঢ়া। হাড়গিলে চেহারা। সে বেশি মারমুখী। নিছক কৌতূহলে কিছুটা কাছাকাছি গেলাম। তাঁতশালার পুরুষেরা বারান্দা থেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে মজা উপভোগ করছে। সম্ভবত বসন্তবাবু ভাতঘুম দিচ্ছেন স্বগৃহে। নতুবা এতখানি বাড়াবাড়ি ঘটত না। প্রৌঢ়া যে মুসলমান, তার চেহারা আর কথাবার্তায় স্পষ্ট। সে চেরা গলায় বলছে, বেউশ্যা ডাহিন মাগী ! আমার

নন্‌দাই (ননদের স্বামী) বুজুর্গ পির — তেনার ঘরে একশো জিন পোষা আছে, দ্যাখ্, না তোর কী খোয়ার করে! খপর যেতে দেরি! হা আল্লা, এখানে কি মোসলমান নাই একজনাও, এই হারামজাদিকে জবাই করে গাজি হয়?

বুক ধড়াস করে উঠল। আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। ইকরার পিঙ্গল চোখ থেকে আগুন জল হয়ে ঝরছে। মনে হল, ইতিমধ্যে যথেষ্ট গাল দিয়ে তার পুঁজি শেষ। অথবা ক্রোধে সে বাকরহিত।

প্রৌঢ়ার দিকে তাকালাম। অথবা স্মৃতির দিকে। চেনা মনে হয় কি? প্রতিপক্ষ পরাহত বুঝে সে ফের হুংকার দিল। থাম্, থাম্! পিরসাহেব যদি বা তোকে মাফ করেন, আমি করব না। আজই ভগবানগোলায় খপর ভেজছি মিরের ব্যাটার কাছে। তার নামে বাঘেগোরুতে একঘাটে পানি খায়। এখানেই তার লোক আছে ঘাপটি পেতে। থাম, ডেকে আনছি বাঁকা বাগদিকে।

চিনলাম। অজিফা-মামীই বটে! মামা তাঁকে তালাক দেওয়ার পরদিন ভগবানগোলায় গিয়েছিলাম। অজিফা-মামী তাহলে পেটের দায়ে এখানে এসে সুতোকাটুনি হয়েছে।

দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে চলে এলাম। নিজের ঘরে ঢুকে আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলাম। কী বিচিত্র এই জীবন! অভিজাতবংশীয় দুটি লোক — একজন শ্যালক, অপরজন তাঁর ভগ্নিপতি — তাঁদের পরিত্যক্তা দুটি স্ত্রীলোক অপ্রসাঙ্গিক কলহে লিপ্তা! হতভাগিনীদের কে বোঝাবে তাঁরা বস্তুত কী? একজন দস্যুসর্দার, অপরজন ধর্মগুরু। কিন্তু দুজনেই পুরুষ।

সেইরাত্রে অন্ধকার ঘরে স্বপ্নের মধ্যে আমি এই প্রকার কথোপকথনে লিপ্ত হইয়াছিলাম। আমার সম্মুখে দুইটি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান ছিল।

তোমরা কে?
আমরা পাখি, ফুল, প্রজাপতি।
কে তোমবা?
আমরা বায়ু, অগ্নিশিখা।
তোমরা কি মনুষ্য নহ?
আমরা স্ত্রীলোক, প্রকৃতি।
তোমরা কি মনুষ্যের ভাষা বুঝিতে পার না?
উহারা শুনিতে পায় না।
তোমরা কী বলিতেছ?
আমরা কথা বলিতেছি।....

'Heaven is nearer through football
than through the Gita.

সকালে 'হাজারিলালে'র খোঁজে গেলাম। আমার মধ্যে স্বাধীন-কথিত 'দুর্দান্ত বাঘ' গরগর করছিল। গত কয়েকটি বছর আমি নিজের ভিতর যেন সমাহিত ছিলাম! শুধু গ্রন্থপাঠ আর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। জীবন এবং জগৎকে ব্যাখা করার চেষ্টা। হরিবাবু আমার হাবভাব আঁচ করেই আর বিশেষ যোগাযোগ করতেন না। কিন্তু মানুষের মনের রহস্য বোঝা কঠিন। কোথায় আঘাত লাগে, কোথায় ঝনঝন শব্দ ওঠে! পিতার নামে কুৎসার আঘাতই কি আমাকে বিলম্বিত 'হাইবারনেশন' থেকে জাগিয়ে

দিয়েছিল ? জানি না। বুঝি না। শুধু এইটুকু বুঝি, প্রচণ্ডভাবে বেজে উঠেছিল মনের অন্য একটি তন্ত্রী। গ্রাম্য প্রবাদে আছে ঃ 'লঙ্কাধামে রাবণ মলো/বেউলা কেঁদে রাঁড়ি হল ?' হাসির কথা নয়। এমনই হয়।

হরিবাবু তাঁর কুটিরের সামনে গাবগাছের তলায় বাঁশের মাচানে বসে পাথরের থালায় ছাতু খাচ্ছিলেন। আমাকে আসতে দেখে তাকিয়ে রইলেন। কাছে গিয়ে অনুচ্চস্বরে বললাম, বন্দেমাতরম্!

হরিবাবু হাসলেন। কী ব্যাপার ? হঠাৎ—

মাচানে বসে বললাম, মনে বাতব্যাধি ধরে গেছে। একটা কিছু করতে চাই। ছোটাছুটি, চিৎকার, হত্যা — এরকম কিছু।

হরিবাবু চুপচাপ ছাতু শেষ করলেন। ঘটি থেকে গলায় জল ঢাললেন। তারপর নীচের গভীর নয়ানজুলিতে ঘোলা জলে পাত্রটি সযত্নে ধুয়ে আনলেন। সেটি কুটিরের ভেতর রেখে মাচানে এসে বসলেন। গামছায় গোঁফ আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুছে বললেন, নতুন কোনো বই পড়লে বুঝি ?

সব বই-ই পুরনো, হরিদা! নতুন—

চুপ। বাতাসের কান আছে। হাজারিদা বলো!

হাজারিদা আমি এখানে আর থাকব না। আমার চুপচাপ সঙ সেজে বসে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

ফুটবল খেলো!

নড়ে বসলাম। বললাম, পরিহাস করছেন ?

হরিবাবুর মুখে কৌতুকের চিহ্ন ছিল না। গম্ভীরমুখে বললেন, তুমি নিশ্চয় স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছ ?

শুনেছি। শাস্ত্রীমশাইয়ের ছেলে অজয়ের কাছে তাঁর চিকাগো বক্তৃতা নামে একটি বইও পড়েছি। আমাদের লাইব্রেরিতে ওঁর কোনো বই দেখিনি।

হরিবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, ব্রাহ্মরা ওঁকে সম্ভবত পছন্দ করে না। অথচ সারা ভারতবর্ষ স্বামীজির নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। তোমাকে যে ফুটবল খেলতে বললাম, বাক্যটি তাঁরই। 'Heaven is nearer through football than through the Gita'.

কেন একথা বলেছেন উনি ?

হরিবাবু চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, আমরা থেমে নেই। তুমি তো নিয়মিত সম্বাদপত্র পড়।

নিয়মিত নয়, মাঝে-মাঝে পড়ি।

বন্দেমাতরম্ সমিতির সদস্যরা নতুন একটি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে। গত ২৪ মার্চ জনৈক ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র — তিনি পি মিত্র নামে খ্যাত, তিনি, সতীশচন্দ্র বসু, পুলিনবিহারী দাশ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি কলিকাতায় 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি দল গড়েছেন। প্রকাশ্যে এই গুপ্ত বিপ্লবী দলের কাজকর্ম হল, তরুণ-তরুণীদিগের খেলাধুলা, ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা, লাঠি-ছোরাখেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কালীমোহনদা ব্রহ্মপুরে এসে স্বামীজি সংঘ নামে একটি ক্লাব স্থাপন করে গেছেন। তুমি যেন আশ্রমে এসব কথা ঘূণাক্ষরে আলোচনা কোরো না।

আমি কী করব, বলুন ?

শফি, বললাম তো ফুটবল খেলো!

আপনি খেলেন কি?

আমার কথায় ক্ষোভ ছিল। হরিবাবু মুচকি হেসে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দ গীতার একটি উক্তি শ্লোগানের মতো সারা ভারতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন : 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। ফুটবলও একপ্রকার বলের সঞ্চার করে দেহে। তবে হাজারিলালকে ফুটবল খেলতে দেখলে টিকটিকি মাথা নেড়ে দেবে। ব্যস! কাজেই হাজারিলাল — যার দেশ কি না বিহার মুল্লুক এবং যেখানে লাঠিখেলা না জানলে মরদ বলে না, সে লাঠিখেলা শেখাবে। শেখাচ্ছে।

লাঠি! ধুস! তলোয়ারখেলা হলেও মনে হয়।

ধীরে-ধীরে সবই হবে। পিস্তল বন্দুক বোমা — সব হবে। হরিবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন ফের, তোমার ডিউটি-পিরিয়ড কি বাঁধা?

হ্যাঁ। নটা থেকে বারোটা, সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত্রি নটা। তবে আমি তত ডিউটিফুল নই। কখনও খুকুকে, কখনও রেহানাকে বসিয়ে দিয়ে ঘুরতে বেরোই।

হরিবাবু আস্তে বললেন, নেচার-বায় ছাড়ো! নেচারে কিছু নেই হে! হোয়াট রিমেনস ইজ ম্যান।

দারুণ কথাটা তো! কার?

জানি না। কোথায় যেন পড়েছিলাম। যাই হোক, অজয়কে বলো — সে তোমার ক্লাবের মেমবার করে নেবে। আশা করি, দেববাবুর আপত্তি হবে না। স্বাধীনের ব্যাপারে তো হয়নি!

অবাক হয়ে বললাম, স্বাধীন ওই ক্লাবে যায় নাকি? কী করে?

ছোরাখেলা শেখে।

একটা কথা। আপনারা কি বন্দেমাতরম্ শ্লোগান ছেড়ে দিয়েছেন?

হরিবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তোমার মাথা খারাপ? বন্দেমাতরম্ই আমাদের প্রেরণা। বলে আমার দিকে ঘুরলেন। কেন? তুমি কি—

দ্রুত বললাম, আমি তো এসেই আপনাকে বন্দেমাতরম্ বলে সম্ভাষণ করলাম। আপনি প্রত্যুত্তর দিলেন না।

ভেবেছিলাম, আফটার অল তুমি মুসলমান। তাই হয়তো ওভাবে দূরে সরে গিয়েছিল। হ্যাঁ — একটা কথা। বহুকাল ধরে বলব ভেবেছি, বলিনি। ধর্মত ন্যায়ত যখন ওটা তোমারই, তখন—

কিসের কথা বলছেন?

স্ট্যানলির পিস্তলটার কথা।

ওটা আছে।

মরচে ধরে অচল হয়ে গেছে হয়তো।

না। মাঝেমাঝে রাত্রে ওটা খুলে তেল দিই। তবে কার্তুজগুলানের অবস্থা জানি না। পরীক্ষা করে দেখব।

হরিবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, না, না। প্রয়োজনে কার্তুজ পাবে।

হাসতে-হাসতে বললাম, দূর জঙ্গলে গিয়ে টেসট করব।

হরিবাবু কাঁধে হাত রেখে শ্বাস ছেড়ে বললেন, ভাই শফি! লোহাগড়ার কৃষকবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। তবে যা হয়, মঙ্গলের জন্যই হয়। কৃষকদিগের ব্যাপারটা হল হড়কা বানের মতো। ওরা আদর্শ বোঝে না। বৈষয়িক স্বার্থ বোঝে। কিন্তু এই বিরাট কাজে আদর্শবাদেরই প্রয়োজন। আদর্শবাদ

শিক্ষা ছাড়া গড়ে ওঠে না। সেই কারণে শিক্ষা-ব্যবস্থার সহযোগী হতে চাই আমরা। শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই স্বাধীনতা চাই। হরিবাবু খি-খি করে হাসতে থাকলেন। কথা আছে না? 'যার শিল তার নোড়া/তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া!'

তিনি হঠাৎ মাচান থেকে নামলেন। বললেন, ভুলে গিয়েছিলাম। স্বাধীনকে রত্ন একটি চিঠি লিখেছিল। স্বাধীন তোমাকে কিছু বলেনি?

বলেছিল, আমাকে তিনি নেমন্তন্ন করেছিলেন। যাচ্ছি না কেন।

তুমি চিঠিটা নিয়ে যাও। আমার কাছে থাকা ঠিক নয়। স্বাধীনকে ফেরত দিও। বলে হরিবাবু কুটির থেকে একখানি খাম এনে দিলেন। বললেন, তুমি পড়ে দেখো। তেমন কিছু গোপনীয় নেই এতে।

I was once the trunk of a fig free.
A carpenter, doubtful whether to make me
into a god or a bench, finally decided to
make me a god.

Satires—Horace.

'স্ট্যানলির পিস্তলটি বেঢপ গড়নের। উহার যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সমুদয় বন্ধ ঘরে কোনো কোনো রাত্রে নাড়াচাড়া করিতে-করিতে শিখিয়া ও বুঝিয়া লইয়াছিলাম। উহাতে চক্রাকারে আঠারোটি খোপ ছিল। স্ট্যানলি মৃত্যুর পূর্বে একটিও কার্তুজ ব্যবহার করিবার সুযোগ পায় নাই। সুতরাং আঠারোটি কার্তুজ খোপে সজ্জিত ছিল। সতর্কতাহেতু কার্তুজগুলিন খুলিয়া অস্ত্রটি পরীক্ষা করিতাম। হরিবাবুর সঙ্গে ক্লাববিষয়ক কথাবার্তার পর একদিন বহুদূরে দুর্গম কাশবনের ভিতর গিয়া ঘোড়া টানিলাম। ফটাস করিয়া অদ্ভুত শব্দ হইল। বন্দুকের শব্দের সহিত ইহার পার্থক্য বুঝিলাম। বারিচাচাজির বন্দুকে হ্যামার বলিয়া একটি যন্ত্র ছিল। পিস্তলটিতে তাহা ছিল না। পরবর্তী কার্তুজ কীভাবে ব্যবহার করিব, তাহা নির্ণয়হেতু দ্বিতীয়বার ঘোড়া টানিলাম। কোনো শব্দ হইল না। ঝাঁকুনি লাগিল না। নিরাশ হইয়া আবার ঘোড়া টানিলাম। আবার কার্তুজটি বারুদের কটুগন্ধ ছড়াইয়া শব্দ করিল। তখন বুঝিলাম দুইবার করিয়া ঘোড়া টানিতে হইবে! পরে জানিয়াছিলাম, পিস্তলটি আটোমেটিক নহে। কাশবনের ভিতর একটি হিজলগাছ একাকী দাঁড়াইয়া ছিল। টিপ পরীক্ষা করিতে মাতিয়া উঠিলাম। গুঁড়িতে একস্থানে কাদার ক্ষুদ্র পিণ্ড সাঁটিয়া আনুমানিক কুড়িহাত দূর হইতে পদ্ধতিঅনুসারে দুইবার ঘোড়া টানিলাম। এবার দক্ষিণ হস্তে পিস্তল এবং বামহস্তে দক্ষিণহস্তের কব্জি চাপিয়া রাখিলাম. যাহাতে পিতলের ঝাঁকুনিহেতু নলের মুখ লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। গুলি লক্ষ্যভেদ করিল। আনন্দে লাফাইতে ইচ্ছা করিল।.....

"স্বামীজিসংঘের সদস্য হওয়ার পর একটা বিষয় লক্ষ্য করি। ক্লাবঘরে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এবং সাধুসন্ন্যাসীদিগের চিত্র লটকানো ছিল। সকলেই হিন্দু। মধ্যস্থলে দেবী কালীর প্রকাণ্ড ছবিটির সামনে দাঁড়াইয়া সকল সদস্য করযোড়ে মস্তক ঈষৎ নত করিযা প্রণাম করে এবং অনুচ্চ স্বরে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া প্রাঙ্গণে খেলিতে যায়। আরও একটি প্রক্রিয়া দেখি। দেয়ালের তাকে একখানি গীতাগ্রন্থ ছিল। উহার সম্মুখেও প্রণাম এবং উহাতে হাত রাখিয়া অনুচ্চস্বরে 'আমি দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ-বলিদানে প্রস্তুত' এই বাক্যটি মন্ত্রবৎ উচ্চারণ করা হয়। ধর্মের প্রতি ঘৃণাহেতু প্রথম-প্রথম সংকোচবোধ করিতাম ; মুসলমানবংশজাত বলিয়া নহে। পরে এই প্রক্রিয়ার

প্রতি সংকোচ কাটিতে থাকে। বহু অহেতুক আচরণ মনুষ্যগণের মধ্যে দেখা যায়। আমি ব্যতিক্রম নহি। শঙ্খিনীর তীরে কত বৃক্ষের কাণ্ডে হাত রাখিয়া তাহাকে জীবিত প্রাণী ভাবিয়া শিহরিত হইয়াছি! এরূপ অসংখ্য আচরণে আমি অভ্যস্ত। অথচ উহার কোনোপ্রকার উদ্দেশ্য বা উহার মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নাই। সুতরাং আমি সংকোচ কাটাইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু আশঙ্কা করিতাম, এই প্রক্রিয়া মুসলমানদিগের দূরে সরাইয়া রাখিবে! সত্যচরণবাবু বলিয়াছিলেন, মুসলমান-সমাজকেও আমরা সঙ্গে চাই। কিন্তু এই নিয়ম বিপ্লবীদের পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইবে। মুসলমানগণ সম্ভবত তাঁহাদের বৈরীভাবাপন্ন হইবে।—

"সমস্যা হইল, আমি মুসলমানবংশজা ন। এ-অবস্থায় আমি যদি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করি, 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইবারও অ'শঙ্কা আছে। উহারা ভাবিবে, আমি মুসলমান বলিয়াই এরূপ বলিতেছি। উহারা যদিও আমাকে হিন্দু সাব্যস্ত করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমি হিন্দু বা মুসলমান নহি, একজন মনুষ্য — দ্বিপদ প্রাণীদিগের একটি সামান্য নিদর্শনমাত্র। এইসব ভাবিয়া প্রশ্নটি তুলি নাই। বিস্ময়ের কথা, উহাদের কাহারও মনে এই প্রশ্ন কেন জাগে না?.....

"বহুকাল যাবৎ আমার একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহা অন্য কিছুই নহে, একটি ঘোড়া। ঘোড়াটি বারিচাচাজির সেই ঘোড়াটির ন্যায় তেজস্বী ও গতিশীল হওয়া চাই! এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আশ্রমবাসী ভদ্রজনেরা পাল্কী এবং অব্রাহ্ম হিন্দুসকলও পাল্কী ও এক্কা, টমটম, টাঙ্গা প্রভৃতি ঘোড়ায় টানা গাড়ি ব্যবহার করিতেন! শুধু সরকারী পদস্থ ব্যক্তি, ডাক্তার এবং পুলিশের দারোগারা ঘোড়ার পিঠে চাপিতেন। ব্রহ্মপুরে মিয়াঁ-মুসলমানের বসতি হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রায় সর্বত্র দেখিয়াছি, অধিকসংখ্যক মুসলমান ঘোড়াসওয়ার হওয়ার পক্ষপাতী। কদাচিৎ কোনো জমিদার ও বিত্তবান হিন্দু ভদ্রলোক ঘোড়াসওয়ার হইতেন। অবশ্য ইহা গ্রামাঞ্চলের কথা। নগরাঞ্চলে প্রবণতা অন্যরূপ হইতে পারে। তবে ইহা হইতে আমার সিদ্ধান্ত হইল, এতদ্দেশীয় সর্বশ্রেণীর মুসলমানগণের ঘোড়সওয়ার হওয়ার প্রবণতাতে একটি ট্রাডিশনের লক্ষণ পরিস্ফুট। বহির্দেশীয় জাতিবর্গের ভারতজয়ের পিছনে প্রাচীনকালে সম্ভবত অশ্বারোহণ মুখ্য উপাদানস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বেদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-শাস্ত্রাদিতে অশ্বচালিত রথের সগৌরব বৃত্তান্ত রহিয়াছে। কিন্তু অশ্বারোহীর কথা নাই। অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব আরোহীবিহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া যোদ্ধবর্গ পদব্রজে তাহার অনুসরণ করিতেন। ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যায়, বহির্দেশীয়রাই অশ্বারোহণে সক্ষম। এই যুগে যাহারা ভারতজয়ে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা সকলেই অশ্বারোহী হইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়াছে। আরব, তুর্কী ও মোগলগণও অশ্বারোহী হইয়া এই দেশ জয় করে। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ এবং অশ্বচালিত রথে আরোহণ এই দুইয়ে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণে প্রবৃত্ত হওয়া আর অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া অস্ত্রচালনা করার মধ্যেও শৌর্য এবং গতিশীলতার প্রভূত ফারাক! প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দুদিগের মধ্যে উক্ত প্রবণতা ছিল না বলিয়াই তাহারা বিদেশীর পদানত হয়, অনুমান করি। তবে বিজিত হইবার পর বিজেতাদের সহযোগিতায় হিন্দুবা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে মনোযোগী হয়। আমার এবম্প্রকার ধারণার কারণ, অতি সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানও অন্তত একটি অশ্ব পুষিবেই। কিন্তু সাধারণ হিন্দুদিগের মধ্যে অশ্ব পালনের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। অশ্ব গতি, শৌর্য এবং দূরত্বের প্রতীক। ঋগ্বেদ সংহিতায় অশ্বসূক্ত পাঠ করিয়াছি। আর্য ঋষিগণ

অশ্বের মধ্যে ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির সকল শক্তিতে তাঁহারা 'অশ্ব' কথাটিকে যুক্ত করিয়াছেন। সেই হেতু কি তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠে মনুষ্যের আরোহণ পাপকর্ম বিবেচনা করিতেন ? যেন অমর দেবতা ছাড়া নশ্বর মনুষ্যের পক্ষে অশ্বারোহী হওয়া গর্হিত কর্ম। তবে অশ্বচালিত রথে আরোহণ করার প্রথা অনুমোদন করিয়াছেন। যেহেতু — যেন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের অধিকার শুধুমাত্র দেবতাদিগেরই ! এই ধারণার মাশুল হিন্দুদিগকে যুগযুগ ধরিয়া গুণিতে হইয়াছে।—

"আমার বেতনের সমুদয় অর্থ সঞ্চিত ছিল। গুণিয়া দেখিলাম দুইশত টাকা জমিয়াছে। কিন্তু কথাটি দেবনারায়ণদার কাছে তুলিতে তিনি সহাস্যে বলিলেন, তোমার দেখিতেছি ঘোড়ারোগ ধরিয়াছে। অবশ্য আমার উহাতে আপত্তির কারণ নাই। তবে ভাবিয়া দেখ, ঘোড়ার বিস্তর ঝামেলা আছে। উহার জন্য আস্তাবল আবশ্যক। খাদ্য এবং সেবাযত্ন প্রয়োজন। বলিলাম, হাজারিলাল কথা দিয়াছে, সে তাহার কুটিরের পার্শ্বে একটি চালাঘর গড়িয়া দিবে। জলাভূমিতে ঘোড়ার প্রচুর খাদ্যও আছে। সে বিহারমুলুকের লোক। ঘোড়ার সকলকিছু অবগত। দেবনারায়ণদা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, দেখ বাপু ! ঘোড়ারোগ কঠিন রোগ। তবে ইহার সঙ্গে আমাকে জড়াইও না। তোমার ঘোড়া, তুমিই দেখিবে। আমার কী বলিবার আছে ? পরদিন হাজাবিলালকে সঙ্গে লইয়া রহিমপুর ঘোড়াহাটায় হাজির হইলাম। অসংখ্য ঘোড়ার মধ্যে একটি সুন্দর কালো ঘোড়া পছন্দ হইল। ঘোড়া সম্পর্কে আমার বহুবৎসর পূর্বের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া বুঝিলাম, এইটি আমার উপযুক্ত হইবে। আমাকে অবাক করিয়া বিশাল গুম্ফধারী হিন্দুস্থানীটি দাম হাঁকিল, বাবুজী, দেড়শও রূপেয়া কিম্মত ! ইয়ে পাহ্‌লোয়ান ঘোড়েকা মালেক ভি জবরদস্ত্ পাহ্‌লোয়ান থা। লেকিন উও মর গেয়া। উস্‌কা বাল্‌বাচ্চা কৈ নেহি হ্যায় উস্‌কা জেনানা ক্যা করে ? মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া টাকা গুণিয়া দিলাম। রক্ত নাচিয়া উঠিল। 'হাজারিলাল' চুপিচুপি বলিলেন, ঠকিয়াছ। এই হাটে সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়ার দাম একশত টাকার বেশি নহে ! তাঁহার কথায় কান দিলাম না। বাকি টাকায় রেকাব-জিন-লাগাম-চাবুক সমুদয় খরিদ করিলাম। 'হাজারিলাল' সারাক্ষণ বকবক করিতেছিলেন। দুইশত টাকায় পাকি প্রায় দুইশতমন চাউল পাওয়া যায়। কখনও ক্ষুব্ধভাবে বলিতেছেন, অশ্বপৃষ্ঠে বিপ্লবের দিন আর নাই। বিপ্লবীরা পদাতিক না হইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস পড়িয়া দেখ ! সম্মুখসমরে ইংরাজশক্তির সহিত আঁটিয়া উঠিবে না। গুপ্তভাবে চিতাবাঘের ন্যায় আচমকা একেকটি শক্তিকেন্দ্রের টুঁটিতে কামড় বসাইতে হইবে। সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্যক্তিহত্যাই উদ্দিষ্ট সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সমর্থ। রহিমপুরের রাস্তায় পৌঁছিয়া একলম্ফে কৃষ্ণকায় অশ্বটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বলিলাম, হরিদা ! ইহাকে একটি নাম দিন। 'হাজারিলাল' পরিহাসবশে বলিলেন, পাহ্‌লোয়ান ! আমার মনঃপূত হইল। চিৎকার করিয়া সম্বোধন করিলাম, পাহ্‌লোয়ান ? পরক্ষণে চাবুক নাচাইয়া দুই হাঁটুর ধাক্কা দিলাম। ঘোড়াটি সুশিক্ষিত। ধূলিধূসর পথে বিদ্যুৎবেগে ধাবিত হইল। আধক্রোশটাক গিয়া লাগাম খিঁচিয়া ধরিলাম। গতি সম্বৃত হইল। সেখানে একটি বৃক্ষতলে নামিয়া 'হাজারিলালে'র অপেক্ষা করিতে থাকিলাম। তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই ধীরে ধীরে হাঁটিতেছিলেন। মুখখানি গম্ভীর দেখাইতেছিল। পৌঁছিয়াই কিন্তু খি খি করিয়া হাসিতে থাকিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, পাহ্‌লোয়ান ! পাহ্‌লোয়ান বটে !

"পাহ্‌লোয়ানকে পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলাম ! কেন জানি না, আশ্রমিকরা

আমার এই 'ঘোড়ারোগ'টিকে পছন্দ করিতেন না। এই বৎসর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। গিয়াসপণ্ডিত তাঁহার কন্যা এবং গৃহস্থালিসহ আশ্রমত্যাগ করেন। এলাকায় তাঁহার বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিন্দামন্দ ইহার অন্যতম কারণ হইতেও পারে, তবে শুনিয়াছিলাম, দেবনারায়ণদার সঙ্গে কোনো বিষয়ে প্রবল মতান্তর উহার উপলক্ষ্য। তাঁহার মতে নাকি 'ব্রাহ্মগণ যে ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে ব্রতী, তাহা শুধু ধর্মকেন্দ্রিক নহে উপরন্তু মধ্যবর্তী প্রায় সাতশত বৎসরের মুসলমান শাসনকালের সভ্যতা-সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ সমন্বয়বাদী ধারাটির প্রতি তাঁহারা শীতল মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুসলমানদিগের কৃতিত্বের প্রতি অবলোকন করিতেছেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই-চারিজন বাদে মোটামুটিভাবে সকলেই সুপ্রাচীন বৈদান্তিক এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ও সমুদয় তত্ত্বচিন্তাকেই প্রাধান্য দিতেছেন। ইহা শুভ লক্ষণ নহে। মৌলবি গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যতিক্রম। পত্রাকারে এটি কলিকাতা হইতে গিয়াসুদ্দিন পরে আমাকে জানান এবং এ বিষয়ে চিন্তা করিতে বলেন। তিনি কলিকাতার তালতলায় তাঁহার আত্মীয় মৌলবি আফতাবুদ্দিনের নিকট আছেন। 'জাগরণ' নামে পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হইয়াছেন। 'উদারহৃদয় কতিপয় অ-ব্রাহ্ম হিন্দুও এই পত্রিকায় লিখিতেছেন!'.....

"অশ্ব-উন্মাদনাবশে ইহার প্রতি গুরুত্ব দিই নাই। মাঝেমাঝে স্বাধীন আসিয়া জানাইত, রেহানা তাহাকে পত্র লেখে। স্বাধীন মুচকি হাসিয়া বলিত, রেহানাকে বিবাহ করিলে সুখী হইত! একদিন পুনরায় সে ওই কথা বলিলে আমিও অনুরূপ কৌতুকে বলিয়া উঠিলাম, জীবনে একজনকে বিবাহ করিলেই হয়তো সুখী হইতাম! স্বাধীন বলিল, সে কে? বলিলাম, নাম বলিব না। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, একথা সে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে পুরুষপ্রেম বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। স্বাধীন সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হইয়া স্থানত্যাগ করিল। আমিও হাসিতে গিয়া গম্ভীর হইলাম। এই যুবতীকে কি আমি সত্যই ভালোবাসি? না তো! আমার হৃদয়ে ঠিক উহার মতোই নারীপ্রেম বলিয়া কোনো পদার্থ নাই! তাহা গলিয়া পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।...

"সেই বৎসর বসন্তকালে ডাকপিওন আমাকে একখানি খাম দিয়া গেল। আমার নামঠিকানা সুন্দব ইংরাজিতে লেখা। খুলিয়া চমকিয়া উঠিলাম।

> 'প্রিয় পুরুষমানুষ!
> দাওয়াত দিযাছিলাম। প্রতীক্ষা করিতে করিতে কি চুল পাকিয়া যাইবে? আরবি গ্রন্থে পড়িয়াছি, আরবগণের মধ্যে প্রথা আছে, দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিলে সে শত্রু গণ্য হয়। সৈয়দরা তো আরব। সংপ্রতি শ্রীমতী স্বাধীনবালার পত্রে অবগত হইলাম, আপনাকে ঘোড়ারোগে ধরিয়াছে। উত্তম সম্বাদ। আমার প্রেমিক জিনটিরও অবস্থা তাই। সে ঘোড়ার পিঠে আমাকে চাপাইয়া পদ্মার চরে লইয়া যায়। উহার সহিত আপনাকে ডুয়েল লড়াইতে ইচ্ছা করে। চরে বসিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে দেখিব, দুই ঘোড়সওয়ার ডুয়েল লড়িতেছে। অধিক বাক্য নিষ্প্রয়োজন। ইতি—র।
>
> পুনশ্চ ঃ পিতৃদেব তাঁহার প্রিয়তমাসহ কলিকাতাগমন করিয়াছেন।

তাই বলিয়া আতিথ্যের ত্রুটি ঘটিবে না। মুন্সিচাচাকে আপনার কথা বলিয়াছি।'

"মনস্থির করিতে দুইদিন কাটিয়া গেল। হরিবাবুকে জানাইব কি না, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলাম, কাহাকেও কিছু জানাইব না। তবে দেবনারায়ণদাকে বলিতে হইল বহু বৎসর হইল পিতামাতার চরণদর্শন করি নাই। তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম। কৃষ্ণপুর উত্তরপূর্ব কোণে বিহার সীমান্তে অবস্থিত। দূরত্ব প্রায় আট-নয়ক্রোশ হইবে, শুনিয়াছি। পথিমধ্যে দুই স্থানে বিশ্রাম করিলাম। একবার পথ ভুল করিলাম। গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া যাইবার সময় লক্ষ্য করিলাম, সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টে আমাকে দেখিতেছে। ভাবিতেছে, না জানি কোন জমিদারনন্দন হইবে! তৎকালে হিন্দু জমিদারদিগকে তাঁহাদের হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজা রাজা বলিয়া উল্লেখ করিত। জমিদারবাটীকে 'রাজবাড়ি' বলিত। মুসলমান জমিদারের সংখ্যা জেলায় মুষ্টিমেয়। তবে তাঁহাদিকে প্রজারা 'নবাব' বলিত না, জমিদারই বলিত। নবাব বলিতে জেলায় শুধু লালবাগের নবাববাহাদুর। ইংরেজ বহু জমিদারকে বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে রাজা খেতাব দিত। তাছাড়া মুসলমান শাসনকালের রাজা খেতাবপ্রাপ্ত কিছু জমিদারও ছিলেন।.....

"মাটির রূপ বদলাইতেছিল। বন্ধুর, বৃক্ষবিরল, উষর প্রান্তর চতুর্দিকে। বামদিকে সড়ক ঘুরিল। ক্রমশ বৃক্ষলতাগুল্মাদি দৃষ্টিগোচর হইল। সমতলভূমি ও শস্যক্ষেত্র শ্যামলতা ক্লান্তি দূর করিল। এতক্ষণে বিশাল পদ্মা উত্তরে বিলম্বিত দেখিলাম। তাহার বিশালতা মনোমুগ্ধকর। ক্রোশটাকে দূরত্বে কিছু ইটের বাড়ি দেখিতে পাইলাম। রাস্তায় টাঙ্গা, এক্কা এবং বলদ গাড়ির প্রাচুর্য দেখিয়া বুঝিলাম কৃষ্ণপুর সমৃদ্ধ গঞ্জ হইবেক। এইবার দেহে মুহুর্মুহু শিহরন ঘটিতে থাকিল। গঞ্জে ঢুকিয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে 'রাজবাড়ি'র রাস্তা দেখাইয়া, এমন কী আমার পশ্চাতে হন্তদন্ত আসিতে থাকিল। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, রাজবাড়ির চতুর্দিকে গভীর পরিখা। সম্মুখস্থ ফটকের দরজায় একজন সঙীনধারী প্রহরী এবং অপর একজন গোর্খাপ্রহরী কুকরি কোষবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরিখার কাঠের সেতু পার হইলে তাহারা সেলাম দিল। বলিলাম, মুন্সী আবদুর রহিমকে সম্বাদ দাও। আমি ব্রহ্মপুর আশ্রম হইতে আসিতেছি। লালবাগের হাভেলিতে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, সঙীনধারী একটি দড়ি ধরিয়া টানিল। ভিতরে আবছা ঘণ্টার শব্দ হইল। এ.. বিশাল কপাটের একাংশে ঘুলঘুলিতে একটি মুখ ভাসিয়া উঠিল এবং অদৃশ্য হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কপাটের একটি ফোকর খুলিয়া একজন বৃদ্ধ মুসলমান বাহির হইলেন। তিনি যেন ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। মৃদুস্বরে তিনি কিছু বলিলে প্রহরীদ্বয় কপাট খুলিয়া দিল। বলিলাম, আপনিই কি মুন্সিজি? তিনি মৃদু হাস্যে মাথা দোলাইলেন। বলিলেন, আসুন। চারদিকে উচ্চ প্রাচীর, প্রাঙ্গণে বাগিচা, মর্মরমূর্তি, কেন্দ্রে দ্বিতল একটি প্রাসাদ। অন্যদিকে সারবন্দি একতলা ঘর। অনুরূপ একটি ফটক দৃষ্টিগোচর হইল। ঘোড়া হইতে নামিলে একজন লোক ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতের লাগাম সবিনয়ে গ্রহণ করিল। মুন্সিজি বলিলেন, আপনার ঘোড়ার সেবাযত্নের ত্রুটি হইবেক না। মকবুল সহিস ঘোড়ার সহিত বাক্যালাপে পটু। বুঝিলাম, ইনি রসিক ব্যক্তি।.....

"প্রকাণ্ড হলঘরে দেয়ালচিত্র, জানোয়ারের স্টাফকরা মস্তক, প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের টেবিল, বিবিধ আসন সজ্জিত। ঝাড়বাতি ঝুলিতেছে। মুন্সিজি আমাকে একটি আসনে

বসাইয়া একজন ভৃত্যকে দিয়া খবর পাঠাইলেন, বলিলেন, গোবিন্দবাবু মহালে গিয়াছেন। রাজাবাবুও কলিকাতায় তবে কোনো ত্রুটি ঘটিবেক না। এই সময় ভৃত্যটির সঙ্গে হলঘরের একপ্রান্তের গালিচা-মোড়া সোপান বাহিয়া ঝর্নাধারার মতন রত্নময়ী আসিল। সে 'আসসালামু আলাইকুম' সম্ভাষণ করিল না। হাস্যমুখে শুধু কহিল, আমার সৌভাগ্য! আসুন। তাহাকে অনুসরণ করিলাম। মুন্সিজি হয়তো স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। দ্বিতলে বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া উত্তর-পূর্বকোণে একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢুকিয়া রত্নময়ী বলিল, ওই দেখুন পদ্মা! ওই সেই চর। তাহাকে সেদিনকার মতন অপ্রকৃতিস্থা দেখাইতেছিল না। বলিলাম, এ ঘরে কে থাকে? রত্নময়ী বলিল, দাদা থাকিতেন। এক্ষণে আপনি থাকিবেন। দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলাম, আমার জন্য আপনি ঝামেলায় পড়িবেন না তো? রত্নময়ীব কোটরগত চক্ষুদুটি জ্বলিয়া উঠিল। বলিল একজন মুসলমানীবাইজী অপেক্ষা একজন সৈয়দবংশীয় পিরের সন্তানের স্পর্শে এই প্রাসাদ কি অপবিত্র হইবে? বরং এক্ষণে জাহান্নাম বেহেশতে পরিণত হইল। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু আমি তো ধর্মবিশ্বাসী নহি। সুতরাং বাইজী অপেক্ষাও নারকী শয়তান! রত্নময়ী শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলিল, ডোণ্ট নো দ্যাট স্যাটান ওয়াজ ওয়ান্স অলসো অ্যান অ্যাঞ্জেল ইন দা সেমিটিক ট্র্যাডিশন? চমকিত হইয়া বলিলাম, হ্যাঁ, তাহা সত্য। সেই নাকি বিশ্বের প্রথম বিদ্রোহ। শয়তান সর্বচর — অবাধ তাহার অর্থ, বিদ্রোহই কোনো সত্ত্বাকে প্রকৃত স্বাধীন করে। বিদ্রোহই স্বাধীনতার প্রবাহে ভাসাইতে পারে। রত্নময়ী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঠোঁটের কোণে হাসির কণা রাখিয়া বলিল, এত স্বাধীনতার গৌরব প্রচার কেন? আশা করি, স্বাধীনবালার প্রেমে পড়েন নাই? হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, খুকু অর্থাৎ স্বাধীন বলে, তাহার হৃদয়ে পুরুষপ্রেম বলিয়া কোনো পদার্থ নেই। আমিও তদ্রূপ প্রেমহীন পুরুষ। রত্নময়ীর কী হইল, সহসা আমার পায়ে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া আস্তে কহিল, ইউ আর অ্যান অ্যাঞ্জেল!—"
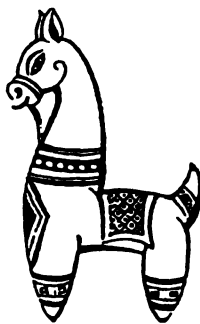
ভুল্ ভুল্ জুল্ জুল্ উম্‌কি বুস্‌বার জুর্.....

হজরত সৈয়দ আবুল কাশেম মুহম্মদ বদি-উজ্-জামান আল্-হুসায়নি আল্-খুরাসানি জীবনের বাস্তবতাগুলিকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরতে বাজপাখির মতো বেঁকে মাটির দিকে নেমে এসেছিলেন। কিন্তু বক্রগতি সেই ছোঁগুলি প্রতিবারু ব্যর্থ হত। ভূমিচর

প্রাণীগুলি এবং আকাশচর প্রাণীগুলির মধ্যে মৌলিক ফারাক আছে! ওজন তথা ভরঘটিত ফারাক। গতিজনিত ফারাক। ভূমিচরমাত্রের গতি সমান্তরাল এবং ধীর। আকাশচরমাত্রের গতি বক্র এবং দ্রুত। এই ফরাজি ধর্মগুরু, যিনি কিনা জীবনের বাস্তবতাসমূহকে ঐশী বিধি অনুসারে ব্যাখ্যা করতেন, তিনিই সুফী-উচ্চতায় উত্থিত হন ঘটনাপরম্পরায়। উচ্চতা বাস্তবতার দুশমন, তিনি বুঝতেন। মাঝে-মাঝে তাই অবতরণের জন্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি ক্রমশ টের পান, তাঁর দেহ-মন মাধ্যাকর্ষণকে পরাজিত করেছে। অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম, মাকড়সার জালের মতো অলৌকিকতা তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। তিনি ছোঁ মেরে লৌকিক দুনিয়ার মাটিতে অবস্থিত কোনো লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হতেন। কিন্তু সেটি স্পর্শমাত্র নিস্ফল ও বস্তুপিণ্ড বোধ হত ; এভাবেই 'কাহিন' আওরত ইকরাতনকে তিনি ত্যাগ করেন,ধর্মসংস্কারবশে নয়। তারপর সাইদার দিকে ছোঁ মারেন। বোঝেন, এ সাইদা ভিন্ন এক নারী। একটি গৃহিণী মুরগি। তার চেয়ে বড়ো কথা, সাইদাও তাঁর স্বামীর সূক্ষ্ম ও রহস্যময় শরীরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করতে পারছিলেন না। সাইদা মুগ্ধ ও ভীত হয়ে পড়ছিলেন ক্রমশ। বুজুর্গ স্বামীর শরীর ঘিরে নুরের রোশনি (জ্যোতিঃপুঞ্জ)! ভাবতেন, এ সেই মানুষ নয়, জিনপরিবৃত এক সূক্ষ্ম সত্তা। রক্তমাংস-অস্থিহীন অবয়ব। তবু তিনি ফের গর্ভবতী হন। বদিউজ্জামান খুশি হয়ে ভাবেন, তাহলে বাস্তবতা তাঁর লক্ষ্যবিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তিনমাস পরে এক দুপুরে সাইদা যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে ঘরের মেঝে রক্তে ভাসিয়ে দেন। জিনেরা ভ্রূণরূপী লৌকিকটি টেনে ছিঁড়ে বের করেছিল তাঁর জঠব থেকে! এক মাস তিনি শয্যাশায়িনী ছিলেন। বদিউজ্জামানও স্তম্ভিত এবং ভীত হন। এবাদতখানা থেকে সপ্তাহঅন্তর বাড়ি যাওয়া বন্ধ করেন। কথিত আছে, এই সময় একরাত্রে শনশন শব্দ শুনে এবাদতখানা থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন। সেরাত্রে হলুদ রঙের জ্যোৎস্না ছিল। প্রাঙ্গণে একটি কালো ও দীর্ঘ গাছ দেখে তিনি অবাক হন। আগন্তুক বৃক্ষটির সঙ্গে তাঁর এইসব কথাবার্তা হয়—

কে তুমি ?

কাহিন ! *

ইকরাতুন্নেসা ?

করুণা।

কী চাও ?

কিছু না !

কেন এলে ?

দেখতে এলাম আপনি কী সুখে আছেন।

আমি সুখী।

দেখলাম আপনি দুঃখী।

বৃক্ষটিতে আঘাত করার জন্য বদিউজ্জামান ছড়ি তুললেন। এই সময় বৃক্ষটি থেকে একটি নাঙ্গা স্ত্রীলোক নেমে এল। নীল চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছিল। বদিউজ্জামান আর্তনাদ করলেন, জিনগণ! এই খান্নাসের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও! অমনি একদল শাদা জিন, তাদের পরনে শাদা পোশাক আর পাগড়ি, কাহিন

---

* আরবি 'কাহিন' বলতে ভবিষ্যদ্বক্তা, ছড়া বা গীতে খিস্তিকারী। বাঙলার 'ডাইনি'র সঙ্গে এর কিছু মিল আছে। শব্দটি হিব্রু 'কাহেন'-জাত। কাহেন অর্থ পুরোহিত।

স্ত্রীলোকটিকে ধবে ফেলল এবং তাকে তুলে নিযে আকাশে চলে গেল। কিন্তু বৃক্ষটি থেকে গেল। বদিউজ্জামান জানলেন, বৃক্ষটি তাব বাহন ছিল। মৌলাহাটেব বোঁদেব চৌকিদাব হাশেম সেই বাত্রে প্রচণ্ড ঝডেব মুখে পডে। অথচ আকাশে মেঘ ছিল না। সে চাঁদেব আলো হলুদবর্ণ দেখে ভয পায। আব তাবপব এবাদতখানাব প্রাঙ্গণে একটি আকস্মিক ছিপছিপে গডনেব অজানা গাছ দেখা যায। সমস্ত গাছই ভুঁইফোড। কিন্তু এমন বাতাবাতি ভুঁইফোডেব দৃষ্টান্ত নেই। খববটি ক্রমে চাউব হয! এবাদতখানায বিনা হুকুমে ঢোকাব উপায ছিল না। তাই দূব থেকে গাছটি দেখাব জন্য ভিড হত। সেই ভিড এত বাডতে থাকে যে হজবতে আলা গাছটি কেটে ফেলাব জন্য হুকুম দেন! হোসেন কাঠুবেকে তলব কব হয। সে গাছটিব গুঁডিতে কুডুলেব কোপ মাবলে চেবা গলায একটি আর্তনাদ ওঠে। কানে সুচেব মতো বেঁধে সেই আর্তনাদ। চাবদিকেব গ্রামগুলিতে মানুষজন তা শুনতে পেযেছিল। আব গাছটি থেকে বক্ত ছিটকে পডে। হোসেন কুডুল ফেলে পালিযে যায! তখন হজবত গাছটিব সামনে গিযে এই দোযাটি পাঠ কবেন ঃ 'হুল হুল জুল জুল.....' কাউকে প্রিয ও বশীভূত কবতে হলে এই আবৃত্তিতে 'বহুত২ ফাযদা হয, কেতাবে এমত বর্ণিত হইযাছে।' গাছটি ক্রমশ বাডতে থাকে। সেটি এখনও এবাদতখানাব ধ্বংসস্তূপেব শিযবে দাঁডিযে আছে। তাব গোডায ক্ষতচিহ্নটি এখনও স্পষ্ট দেখা যায। গাছটি কী, কেউ জানে না। এমন গাছ কোথাও কেউ দেখেনি।.....

কচি ॥ দোযাটা আবেকবাব বলো না, দাদিমা!

দিলবুখ বেগম ॥ হুল হুল জুল জুল উমকি বুসবাব জুব। কচি! কচি। এমন কবে কোথায যাচ্ছিস?

কচি ছুটে বেবিযে গেল বাডি থেকে। বাদশাহি সডকে পিচ পডেছে। বাসস্টপে একটা বাস দাঁডিযে আছে। সাইকেল বিকশো, দোকানপাট, ভিড ঠেলে সে পাটোযাবিজিব আডতঘবেব পেছন দিযে আগাছাব জঙ্গলে ঢুকল। সামনে ধ্বংসস্তূপ। একটি প্রকাণ্ড পেযাবাগাছ। ঝাঁকডা কুলগাছ। উঁচু কববটিব শিযবে সেই অচেনা লম্বা গাছটি দাঁডিযে আছে। কচি মনে-মনে আবৃত্তি কবল দোযাটি। তাবপব গাছটিব গাযে হাত বাখল। শুধু এটুকু বুঝল সে, এই গাছেব শিকডগুলি মাটিব তলা দিযে তাব প্রপিতামহেব হাডগুলি ছুঁযেছে। সে কববটিব দক্ষিণে গেল। হুজুবেব নিষেধ ছিল, যেন তাঁব কববে সাঁজবাতি জ্বালানো না হয, কোনো মাজাব তৈযাব না কবা হয, কোনো ফলক বসানো না হয — কাবণ 'এগুলিন বেদাযাত কর্ম্ম।' কিন্তু সবই হযেছিল। মাববেল ফলকে ফাবসি আব বাঙলায জন্মমৃত্যুব সনতাবিখ লেখা ছিল। ক্ষযে-ফেটে শ্যাওলা ধবে গেছে। আমবুললতা ঢেকে ফেলেছে ফলকটিকে। শুধু পডা যায ঃ 'জন্ম হিজবি সন ১২৬১.....মৃত্যু হিজবি সন ১৩৪০..... জন্ম বাংলা সন ১২৫১..... মৃত্যু সন ১৩২৭—' কচি মনে-মনে হিসেব কবে অবাক হল। হিজবি সনেব হিসেবে ৭৯ বছব বযস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন তাব প্রপিতামহ। কিন্তু বাঙলা সনেব হিসেবে ৭৬ বছব হয। হিজবি চান্দ্রসন, বাঙলা সৌবসন। এই গণ্ডগোলেব কাবণ কি তাই? কামালস্যাবেব মতে, হিজবি সনেব হিসেবেব চেযে বাঙলা সনেব হিসেব বেশি নির্ভবযোগ্য। তবে বিজ্ঞানসম্মত হিশেব খ্রীস্টীয সন অনুসাবে কবা যায। কামালস্যাব তাকে একটি পঞ্জিকাসংক্রান্ত বই দিযেছেন। কচি হন্তদন্ত বাডি ফিবল! দিলবুখ বেগম উনুনে ভাত বসিযে শুকনো পাতা ঠেলে দিচ্ছিলেন। তাঁব নাতনিটি ছিটগ্রস্ত। আলি-আউলিযা-বুজুর্গদেব বংশ এবকম হয হযতো। কচি ঘব

থেকে বেরিয়ে এসে উজ্জ্বল মুখে বলল, দাদিমা ! তোমাদের হিসেব বোগাস ! তোমার শ্বশুরের জন্ম ইংরেজি ১৮৪৫ সালে, মৃত্যু ১৯২০ সালে। দ্যাট মিন্‌স্‌—উনি ৭৫ বছর বেঁচে ছিলেন।

কচি বৃদ্ধার কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখে হাঁটু ভাঁজ করে চাপা স্বরে বলল, জান ? গাছটার কাছে দোয়াটা পড়লাম। অমনি ওর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। ও বলল — কী বলল বলো তো ?

বৃদ্ধা একটু হাসলেন।.....আমি কি কাহিন আওরত যে গাছের কথা বুঝি ?

গাছটা বলল, তোমার বড়োআব্বা আর আমি সুখের সংসার বেঁধে আছি।

তওবা ! তওবা ! গোনাহ্‌ হবে ভাই ! ওসব বাত করতে নেই।

আঃ ! তুমি জান না, ভালোবাসা এমন জিনিস — যাকে ভালোবাসি, সে যদি বুকে ছুরি মেরে খুন করে, তবু তাকে ভালো না বেসে উপায় থাকে না ! আর দাদিমা, ভালোবাসা আর ঘৃণা একই প্রবৃত্তির দুটি দিক। বুঝলে কিছু ?

আলুগুলান ফালি-ফালি করে কাট্‌ দিকিনি। তা'পরে পোস্তটুকুন বেঁটে দিবি। আমার অজুদে আর জোর নেই।.....

গোরস্তানে বেশরা মস্তান আর বদু পিরের বাহাছ আর বহুত২ জিনের জঙ্গের পর বিবি কামরুন্নিসার গোর হইতে উঠার বয়ান ॥

হিজরি ১৩২৩ সনের রমজান মাসের ২৭ তারিখে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। আংরেজিনবিশ বড়োগাজি সইদুর রহমান, পরে যিনি জেলবোর্ডের চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত করেন, তাঁর বার্ধক্যজনিত স্মৃতিবিভ্রম স্বাভাবিক। তবে তিনি বলে গেছেন, সেটি খ্রীস্টীয় সন ১৯০৫ এবং শীতকাল ছিল এবং তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ইসলামি শাস্ত্রে ওই তারিখের রাত্রিটির নাম 'শবে কদর' অর্থাৎ সম্মানের রাত্রি। কারণ ওই তারিখেই প্রথম আল্লাহের পবিত্র বাণী অমর্ত্যলোক থেকে মর্ত্যলোকে বহন করে আনেন ফেরেশতা জিব্রাইল, যা কোরান নামে পরে গ্রন্থিত হয়। তাই মুসলমানরা চান্দ্র মাসের ওই তারিখটিকে পবিত্র মনে করে। প্রার্থনা-দান-ধ্যানে সম্মানিত রাত্রিটিকে বরণ করে। হানাফি আমলে মৌলাহাট গোরস্তানে ওই রাত্রে মৃতদের জন্য প্রার্থনায় দলে-দলে জীবিতরা গিয়ে দাঁড়াত। ফরাজি আমলে সেই ট্রাডিশনে হুজুর বদিউজ্জামান কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। তবে পাকা কবর তৈরি নিষিদ্ধ বলে ফতোয়া দেন। ফলে তাঁর জননী কামরুন্নিসার কবরটি পাকা করার ইচ্ছা সত্ত্বেও শিষ্যরা নিবৃত্ত হয় এবং কবরটি কয়েক বছরের মধ্যেই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। শুধু উত্তরশিয়রে একটি কুঁচফুলের ঘন ঝোপ কবরটির স্থান নির্দেশ করত। রমজান মাসে রোজা বা উপবাসব্রত। সূর্যাস্তের পর উপবাসভঙ্গ এবং সান্ধ্য নামাজ। হুজুরের কী ইচ্ছা হয়, মায়ের কবরজেয়ারতে বের হন এবাদতখানা থেকে। অলৌকিকক্ষমতাসম্পন্ন ময়ূরমুখো ছড়িটি তাঁর হাতে ছিল (কথিত আছে, যেহেতু জীবজন্তুর মূর্তি নিষিদ্ধ, তাই ছড়ির বাঁটটিকে আমজনতা 'ময়ূর-মুখো' বলে বর্ণনা করলেও হুজুরের মতে ওটি নিছক নকশা বা অলংকার মাত্র)। তখনও দিনের আলো মুছে যায়নি। হুজুরকে গোরস্তানের দিকে যেতে দেখে একদল লোক সম্মানিত দূরত্বে তাঁকে অনুসরণ করে। এদের মধ্যে হরিণমারার বড়োগাজিও ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন। হুজুর তাঁর মায়ের কবরের দক্ষিণে পৌঁছুলে উত্তর থেকে কুঁচফলের ঝোপের

গায়ে একটি ঢ্যাঙা জীবন্ত দ্বিপদ প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। তার গায়ে হুজুরের মতোই আলখেল্লা। কিন্তু সেটি কালো রঙের। তার গলায় পাথরের রঙিন মালা ছিল, যা নক্ষত্রের মতো জুগজুগ করছিল। তার মাথায় আওরতদের মতো দীর্ঘ কেশ ছিল। তার হাতে একটি প্রকাণ্ড লোহার চিমটে ছিল। সেই চিমটের গোড়ায় আংটা পরানো ছিল। সে চিমটেটি বুকে ঠুকছিল এবং ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছিল। হুজুর থমকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে পারেন। তারপর আস্তে বলেন কে তুই ? এখানে কী করছিস ? সে পালটা পুছ করে, তুই কে ? এখানে কী করছিস ? হুজুর তার পাক আশবাড়ি (ছড়ি) তোলেন এবং সেও তার চিমটেটি তোলে। এইবার ছড়ি ও চিমটের মুখ থেকে নীলরঙা আগুন ঠিকরে পড়তে থাকে। লোকসকল ভয়ে দূরে অবস্থান করে।

ছড়ি কহে অরে২ বেশরা মস্তান।
নাপাক করিতে আইলি পাক গোরস্তান ॥
চিম্‌টা কহে আগে শুনি তোঁহার কিবা কাম।
লম্পট বুজরুগ হৈলি যাইবি জাহান্নাম ॥
ছড়ি কহে চিনিলাম তুহি শা ফরিদ।
মুয়ে হক্‌ মওলা আর বগলমে ইট ॥
এইভাবে শুরু হইল বহুত বড়া জঙ্গ।
মুন্সী মেরাতুল্লা ভনে কহন না জায় রঙ্গ ॥

লোককবি মুন্সি মেরাতুল্লার বৃত্তান্ত অনুসারে এরূপ গালিগালাজের পর দুজনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। শরিয়ত এবং মারফতের সেই বাহাস একবর্ণও লোকেরা বুঝতে পারেনি। মুন্সিজির বৃত্তান্তে সেই মস্তান বাবার কালো আলখেল্লা দুদিকে সরে নাঙ্গা শরীরের প্রকাশ এবং চিমটে দিয়ে বাঁ স্তনের দুআঙুল নীচে জ্বলন্ত পিদিমের মতো 'কলব্‌' প্রদর্শন, ডান স্তনের দুআঙুল নীচে লালরঙের 'রুহ্‌' প্রদর্শন, বুকের মাঝখানে হলুদরঙের 'খাফি' প্রদর্শন, কপালের মাঝখানে শাদারঙের 'সিরর' প্রদর্শন, মাথার তালুতে নীলরঙের 'আখ্‌ফা' প্রদর্শন এবং নাভিমূলের নীচে বিজলির ছটার মতো 'নকস্‌' প্রদর্শনের বর্ণনা আছে। পক্ষান্তরে হুজুর শুধু 'তৌহিদ' (একত্ব) শব্দটি ছাড়া লা-জবাব ছিলেন। এরপর লোকসকল চর্মচক্ষে দেখে, সন্ধ্যাকালীন আকাশের দুইটি নক্ষত্র থেকে দুইদল শাদা জিন এসে দুইজনের পক্ষাবলম্বন করে। গোরস্তানে শনশন শব্দে ঝড় বইতে থাকে। ধুলো ওড়ে। বৃক্ষলতা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। জিনদের হাতে বিজলির তলোয়ার ছিল। তারা ধাতব কণ্ঠস্বরে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করছিল। বহুত২ জঙ্গ শুরু হয়ে গেলে লোকসকলের পায়ের তলায় (গোরস্তানে খালি পায়ে যাওয়ার নিয়ম) মাটি কাঁপতে থাকে। তারপর তারা দেখে, হুজুরের আম্মাজান কামরুন্নিসার কবরস্থল ফেটে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং বিবিজি শাদা কাফনপরা অবস্থায় উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি যুযুধান জিনেদের প্রতি চিৎকার করে বলেন, তফাত যাও ! ভাগো ! বিব্রত, শরমেন্দা ও ভীত জিনযোদ্ধারা নিজেদের নক্ষত্রাভিমুখে নিমেষে প্রত্যাবর্তন করে। আর বিবিজি প্রথমে উত্তর শিয়রে দাঁড়ানো মস্তানের কপালে সস্নেহে চুম্বন করেন, পরে দক্ষিণদিকে দাঁড়ানো 'হুজুরে'র কপালে চুম্বন করেন। বিবিজি ক্রন্দন করতে থাকেন। দুইদিক থেকে দুই দ্বিপদ মর্ত্য-সন্তান তাঁর উদ্দেশে নত হন। তখন বিবিজি, শাদা কাফনঢাকা মূর্তিটি, আসমানে উত্থিত হন। দুই মানুষ একই স্বরে হাহাকার করে ডাকেন, আম্মা ! আম্মাজান ! শাদা সেই মূর্তির মাথা

আর নিম্নমুখী হয় না। উর্ধ্বে ঋজুগতিতে আসমানে বিন্দু হতে-হতে ছায়াপথের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। আর দুই দ্বিপদ মর্ত্যবাসীর মধ্যে বিচিত্র মিলন ঘটে। তাঁরা পরস্পরকে অলিঙ্গন করেন। ক্রন্দন করেন। তারপর মস্তান ও হুজুরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। মস্তান উত্তরে, হুজুর দক্ষিণে, এভাবে ক্রমশ, লোকসকলের প্রতি দৃক্‌পাত না করে দুইজনে দুইদিকে যান। ইহাকে স্ব-স্ব স্থলে প্রত্যাবর্তন কহা যায়।

হিন্দু আওরতগণ মরদগণের সহিত মৌলাহাটে আগমনকরতঃ ঈদগাহে মুছলমানদিগের হস্তে রেশমীধাগা বাঁধিয়া দেয় তাহার বয়ান ॥

"মাঠের ঈদ্‌গাহে সেই বৎসর কাতারে২ মুছল্লিদিগের জমায়েতে খুৎবাপাঠের কালে এছলামের তরিকা (পন্থা) বুঝাইতেছি, আচানক দূরে বাদশাহী সড়কের দিকে নজর হইল। খামোশ রহিলাম। মুসল্লিগণ মুখ ঘুরাইয়া দেখিতে চাহিল, আমি আল্লাহের কোনও প্রকার নমুদ দেখিতেছি কি না। একটি মিছিল আসিতেছিল। বিগত কয়েক মাহিনা যাবৎ গুজব রটিতেছিল, হিন্দুগণ মোছলেমদিগের উপর গোস্বা করিয়াছে। বাংলা মুলুক দুই অংশে পৃথক করা হইয়াছে। বড়লাট কারজেন বাহাদুর এবং ঢাকার নবাববাহাদুর ছলিমুল্লাছাহেব পরামর্শকরত এরূপ খণ্ডন করিয়াছেন এবং মোছলেমগণ ইহাতে নাকি অধিক২ ধনদৌলত লাভ করিবে। হিন্দুদিগের গোস্বা হইতেই পারে। তবে আমি ফতোয়া দিয়াছিলাম, আংরেজশাহী বেমতলবে কিছু করে না। তাই হুঁশিয়ার হওয়ার দরকার আছে। বড় গাজীছাহেব এবং দিদারুলের তবলীগ-উল-এছলাম সমিতির ভিতর ইহা লইয়া কাজিয়ার কথা শুনিয়াছি। কিন্তু আমি ফতোয়া জারি করি জে এই জিলার মোছলেম বেরাদানের কোনও সুফল নাই। ইহারা কমজোর হইয়া পড়িবে। সেই কারণবশত চালাক আংরেজ-শাহীকে মদত না দেওয়ার জরুরত রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন২ গ্রাম এবং গঞ্জ এবং শহরের হানাফিরা আংরেজশাহীকে মদত দিতেছে। ইহাতে হিন্দুরা মোছলেমদিগের দুশমন হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ওই মিছিল আর ঝাণ্ডা দূর হইতে দেখিয়া বুঝিলাম উহারা হিন্দু, দেলে ডর বাজিল। জামাতের সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ কহিল জে কাফেরগণ আমাদিগের সহিত জঙ্গ করিতে আসিতেছে। পলকে জামাত লণ্ডলণ্ড হইল। বিস্তর লোক গ্রামের দিকে ছুটিল। আওয়াজ দিতে থাকিল, নারায়ে তকবির। আল্লাহ আকবর! উহারা ঢালতলোয়ার লাঠিবল্লম আনিতে গেল। সেইসময়ে দেখিলাম, মিছিলে আওরত লোকও রহিয়াছে। হট্টগোল থামাইতে চিৎকার করিয়া কহিলাম 'খামোশ হও!' উপস্থিত সকলে খামোশ রহিল। তখন কানে আসিল, মিছিল হইতে আওয়াজ আসিতেছে, 'বন্দে মাতরং!' জামাতে গাজীভ্রাতা দুইজনাই হাজের ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, হরিণমারার বাবুদিগের দেখা যাইতেছে। বড়গাজী কহিলেন, ডর নাই। উহারা মোছলেম ভ্রাতাদিগের হস্তে 'রাখী' পরাইতে আসিতেছে। মিছিল ঈদগাহের দিকে ঘুরিল। আনিসুর সর্দ্দারকে হুকুম দিলাম, শীঘ্র২ জাইয়া মোছলেমদিগের নিবৃত্ত করুন। তিনি ছুটিয়া গেলেন। মিছিলের সম্মুখে বালিকাসকল ছিল। তাহাদের হস্তে রেশমী ধাগা ও তক্‌মা ঝিলমিল করিতেছিল। তাহাদিগের মুখে হাসি ছিল। মাশাল্লাহ্!.....

"সেই হিজরী ১২৭৪ সনে আমার আব্বার জওয়ান বয়স এবং আমার বালক বয়সে একবার তামাম হিন্দুস্তানে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহী আংরেজশাহীর বিরুদ্ধে

কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া জঙ্গ লড়িয়াছিল। আমার অজুদ শিহরিত হইল ; কাঁপিয়া উঠিলাম। মিম্বার হইতে নামিয়া গেলাম। আমার পেছনে মোছলেমগণ, আমি সম্মুখে। হিন্দুগণ আওয়াজ দিলেন, 'বন্দে মাতরং!' আল্লাহের কুদরত! একটি বালিকা, মনে হইল বেহেশতের হুরী হইবেক, ছুটিয়া আসিয়া আমার দক্ষিণ হস্তে রেশমী ধাগা ও তকমা বাঁধিয়া শের (মাথা) ঝুঁকাইবামাত্র তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া বুকে টানিলাম। আবেগবশত আমার চক্ষু সিক্ত হইল। কহিলাম, 'বেরাদনে ঔর বহিনে হিন্দুস্তান! আজ পাক খুশির দিবসে পুনরায় আংরেজশাহীর ফেরেববাজির (প্রতারণা/ধূর্তামি) বিরুদ্ধে আমরা মিলিত হইলাম। আল্লাহ আমাকে জে বাড়তি চশম্ (চক্ষু) দিয়াছেন, উহা দ্বারা নজর হইতেছে আংরেজশাহীর বিরুদ্ধে বহুত বড় জঙ্গের জামানা আসিতেছে। তামাম হিন্দুস্তানে সমুন্দরের আওয়াজ উঠিবেক! আপনারা তৈয়ার থাকুন!'.....

"বালিকা যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা সকল হিন্দু আরও মোছলেমদিগের হস্তে রেশমী ধাগা ও তক্‌মা বাঁধিয়া দিতেছিল। বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরাও সেই কর্মে রত থাকিলেক্। তাহার পর উহারা আচানক্ (গান) গাহিয়া উঠিলেক্। দুই কর্ণে অঙ্গুলি গুঁজিব জে হস্ত উঠিল না। বাকরহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম। উহারা গাহিতে গাহিতে গ্রাম অভিমুখে গমন করিলেক্। পরে গানটি বড়োগাজী আমাকে লিখিয়া দেন। উহা এইরূপ ঃ

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান...

"উহারা চলিয়া গেলে আবার ঈদের জামাত শুরু হইল। তৎকালে স্মরণ হইল জে আমি গানা শুনিয়াছি। উহার কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। তখন পাক হাদিছের একটি বৃত্তান্ত শুনাইলাম। এক দিবস মদিনাশহরে দফ (বাদ্য) বাজাইয়া একটি লোক গানা করিতেছিল। রসুলে আল্লাহ (সাঃ) সেইসময় রাস্তা দিয়া জাইতেছিলেন। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর দুইকদম বাড়াইয়া কহিলেন জে সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলে পিছনের কেহ উহাকে দেখিতে পাইবেক না। তোমরা যাহারা সম্মুখে আছে, উপবেশন কর। অতএব বেরাদানে এছলাম! কোনও২ কালে গানা জায়েজ। কিন্তু উহার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হয়। উহার উদ্দেশ্যসমুদায় চিন্তা করিতে হয়। এই জে আমি দোওয়া পাঠ করি, উহাও একপ্রকার গানা নহে কি? মুয়াজ্জিন জে আজান হাঁকে, উহার সুর আছে। সেই সুর আল্লাহের সৃষ্ট কুলমখ্‌লকাতকে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে) নাড়া দেয়। বনু-আদম আল্লাহপাকের দিকে মুখ ঘুরায় এবং ছেজ্‌ফারত হয় নাকি?'.....

"সেই দিবস ঈদের পর সড়কে দাঁড়াইয়া বড়গাজি আমাকে কহেন জে ওই গানটি শাইরি করিয়াছেন জনৈক বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিও তৌহিদের প্রচারক। তাঁহারা 'ব্রাহ্ম', পুছ করিলে বড়গাজি যাহা বলেন, শুনিয়া তাজ্জব হইয়া জাই। ব্রাহ্মগণও 'লাশরিকালাহু' এই মতে বিশ্বাসী! তাঁহারা আল্লাহকে নিরাকার ব্রহ্ম কহেন। বুতপরস্থির (পৌত্তলিকতার) নিন্দা করেন। মাশাল্লাহ্! ওই 'শাইর' বাবুকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। শুনিলাম জে তিনি বীরভূম জিলার বোলপুর সন্নিকটে এবাদতখানা বানাইয়া বাস করেন এবং তিনি ওই এবাদতখানা এলাকায় বুত্-পরস্তি হারাম বলিয়া হুকুম জারি করিয়াছেন। মারহাবা! মারহাবা!".....

'ওয়া দারু লাহাবির্ রাক্‌মাতায়নে কা আন্নাহা
মারাজিয়ো ওয়ালমিন ফি নাওয়াশের মি সামী—'

—জুয়াহের্ বিন্-আবুসাল্‌মা*

বালকটি এবাদতখানার পূর্বদিকের জঙ্গল থেকে গুঁড়ি মেরে এসে নীচু পাঁচিলে উঁকি দিচ্ছিল। সে ভাবল, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। পাঁচিল ডিঙিয়ে সে ঢুকে পড়ল। তখন চিনতে পারলাম, মনিরুজ্জামানের ছেলে। মুখ টিপে হেসে নজর রাখলাম দেখি সে কী করে। আনার (ডালিম) গাছের ভেতর ঢুকে গেলে বুঝলাম সে কী করবে! কিছুক্ষণ এবাদতখানার দিকে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে রইল সে। তারপর গাছটা নড়তে থাকল। তখন পাকশালার কিনারা ঘুরে ফুলঝোপের আড়াল দিয়ো চুপিচুপি কাছে গেলাম। সে আনারটি ছেঁড়ার চেষ্টা করছিল। খপ করে হাত ধরে ফেলে বললাম, কমবখ্‌ত্! চোট্টা! হো হো করে হাসছিলাম। সে ভড়কে গিয়েছিল। এবার লাজুক হেসে মুখ নামাল। বললাম, আনার এখনও পাকেনি। এসো, আঞ্জির (পেয়ারা) পেড়ে দিই। পাশের আঞ্জির গাছ থেকে ডাঁসা কয়েকটা আঞ্জির পেড়ে দিলাম। সে কোর্তায় সেগুলি কোঁচড় করে রাখল। বলল, দাদাজি! আনার কবে পাকবে? বললাম, আর দেরি নেই। এসো, দুভাই মিলে আঞ্জির খেতে-খেতে বাতচিত করি। সে বলল, আম্মা বকবেন। বললাম, বলবে দাদাজির সঙ্গে আঞ্জির খাচ্ছিলাম। তখন বলল, দাদিজি বকবেন। বললাম, সবাই তোমাকে বকে বুঝি? সে মাথা দোলাল। বললাম, আব্বা বকেন না? বলল, না।.....মুনিরুজ্জামানের ছেলেকে খুব নজর করে দেখে আসছি। ওর দেহে একটুও খুঁত নেই। আল্লাহের কুদরত। তবে বড়ই শরমেন্দা। কিন্তু ঘাটের সিঁড়িতে বসে আঞ্জির খেতে-খেতে সে আজ জবান খুলে দিল। গেরস্থালি ও দৈনন্দিন যা কিছু ঘটে, সবই খুঁটিয়ে বর্ণনা করল। বুঝলাম, তার সঙ্গে আঞ্জির খাচ্ছি বলে সে আমার সম্পর্কে অস্বস্তি কাটিয়ে ফেলেছে। বলল, কুলসুমবুড়ি (ছাগল) শেয়ালের মুখে মারা পড়েছে। আপনি একটা জিন পাঠাননি কেন, দাদাজি? দাদিজি দুদিন কেঁদেছেন, জানেন? হুঁ, কুলসুমকে বাচ্চা থেকে বড়ো করেছিল সাইদা। ওর দুঃখটা বুঝি। বললাম, তোমার দাদিজিকে বোলো, শেয়ালটাও জিন্দা নেই। তাকেও জিন মেরে ফেলেছে। সে হঠাৎ ফিক করে হাসল। বলল, দাদাজি! কাল খালাআম্মা এসেছিলেন। দাদিজি বলছিলেন, বেটি! তোমার খুশিবেটির সঙ্গে রফির শাদি দেব। আম্মা খুব রাগ করেছিলেন। খাল-আম্মা চলে গেলে বললেন, কেন ওকে ওকথা বললেন? আম্মা কেঁদে ফেললেন।.....হুঁ, এই বালকটি বড় জবান-তোড (মুখর)। সত্যই সে লাজুক নয়। নুরুজ্জামানের মেয়ে শামিম-আরা ওরফে খুশির সঙ্গে নিজের শাদির কথা নিজের মুখে বলে খুব হাসতে লাগল। বললাম, অ্যাই বেশরম! এখনই শাদির কথা কেন তোমার? বড়ো হও। পাস করো। এলেমদার হও — তবে না শাদি? রফিকুজ্জামান বলল, খুশিকে আমি শাদি করব বুঝি? দাদাজি, আপনি যেন কী। খুশি বড্ড জংলি, জানেন? আম্মা বলেন, একেবারে ওর নানাজির মতো। দাদাজি, আপনি জানেন তো? এবার আমি প্রাইমারি মক্তব পাস করেছি! দাদিজি বলেছেন, আমি বড়োগাজির মতো কলকাতা পড়তে যাব। কলকাতা গেছেন আপনি?...হুঁ, সাইদা বেশ গুছিয়ে বসেছে সংসারে। শুধু একটাই ওর কষ্ট — শফিউজ্জামান। পানির দিকে তাকিয়ে রইলাম। উলটো

---

* প্রাক-ইসলাম যুগের আরব কবি।

দুনিয়াটি নজর হল। বুক কেঁপে উঠল। তারপর ডাকলাম, কমরুজ্জামান! বালক অবাক হয়ে তাকাল। বলল, কে কমরুজ্জামান? আমি তো রফিকুজ্জামান। একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ — রফিকুজ্জামান! তো তোমার মাথা নাঙ্গা কেন? টুপি পর না কেন? হরঘড়ি মাথা ঢেকে থাকবে। বালক বলল, কেন দাদাজি? বললাম, নাঙ্গা শের দেখলে কালা জিন তার টুপি পরিয়ে দেয়। তখন মানুষ খারাপ হয়ে যায়।.বলে তার মাথায় দোয়া পড়ে ফুঁ দিলাম। বালক বলল, দাদাজি! লোকে বলে আপনি মাটিছাড়া হয়ে আসমানে উড়তে পারেন। সত্যি?— চুপ করে আছি দেখে সে তাগিদ দিল, বলুন না দাদাজি? শ্বাস ছেড়ে বললাম, হ্যাঁ রফিকুজ্জামান! আমি দুনিয়াছাড়া হয়ে আসমানে ভেসে আছি। দেখতে পাচ্ছ না? পাবে। আরও বড়ো হও। জানতে পারবে আমার তকলিফ কী। বালকটি কি কিছু বুঝল? কী করে বুঝবে? হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, এই রে! আম্মা আমাকে বকবেন। নুন আর দেশলাই কিনতে পয়সা দিয়েছেন। সে কোর্তার পকেট থেকে একটা তামার পয়সা বের করে দেখাল। তারপর দৌড়ে চলে গেল। সেই সময় মনে ভেসে এল প্রাচীন এক আরব কবির একটি কবিতা। 'সুন্দরী রমণীর দেহে আঁকা উল্কির মতো সুন্দর ওই মরুবালুকার ওপর তোমার তাঁবুখানি।' প্রাচীন আরবে মেয়েরা উল্কি দেগে নিত দেহে। সাইদা! তোমার জীবনের মরুবালুকার ওপর সুন্দর তাঁবু বেঁধেছ। আর আমি আকাশের ওপর ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছি জীবনভর। আমি এক অলীক ঘোড়ার সওয়ার, তার দুটি ডানা আছে। "সফেদ জিনগুলান আমাকে আসমানে উঁচা জায়গায় শাহী তখ্‌তে বসাইল। লেকিন আমার দেল বনু-আদমের থাকিয়া জাইল! উহা গোশ্‌ত্‌ আর খুন দ্বারা তৈয়ারী।".....

বাবু গোবিন্দরাম আসিয়া ছফির বৃত্তান্ত কহেন আর হুজুর পুত্রকে রক্ষার জন্য জিন ভেজেন তাহার বয়ান ॥

জালালুদ্দিন বলল, হজরতে আলা! কিছু কেতাবে গায়েবি (অদৃশ্য) দুনিয়ার কথা লেখা আছে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

বদিউজ্জামান একটি গাছের দিকে ছড়ি তুলে বললেন, ওটি কী?

একটি গাছ।

তুমি কি পুরা গাছটি দেখতে পাচ্ছ?

জি, হ্যাঁ।

বদিউজ্জামান একটু হাসলেন।...কথাটা ঠিক হল না জালালুদ্দিন। তুমি কখনই পুরা গাছটিকে দেখতে পাচ্ছ না।

জালালুদ্দিন অবাক হল।...কেন হজরতে আলা?

জালালুদ্দিন! গাছটি আসমানে ভেসে নেই। মাটির তলায় ওর শেকড়-বাকড় আছে। কিন্তু তুমি তা দেখতে পাচ্ছ না। তাহলে দেখো, গাছটির এক অংশ দেখতে পাচ্ছ, সেটা জাহের (দৃশ্য)। অপর অংশ দেখতে পাচ্ছ না, সেটা বাতেন। তাকেই বলে গায়েব।

হুজুরে আলা! এ তো তাহলে মারফতি তত্ত্ব হয়ে গেল!

উঁহু। ওরা 'জাহের'কে স্বীকার করে না। বলে, জাহের অংশ চোখের ভুল। গায়েব অংশই সত্য। কিন্তু আমি বলি, জাহির-গায়েব উভয়ই সত্য। জাহির হল

শরিয়ত, গায়েব হল মারফত।

কিন্তু ইমাম শরিফ বলেছেন—

বাধা দিয়ে হজরত বদিউজ্জামান বললেন, আমি ইমাম শাফির মজহাব (সম্প্রদায়)-ভুক্ত। কিন্তু সেটা শরিয়ত বিষয়ে। জালালুদ্দিন ! মারফত বিষয়ে আল্লাহ আমাকে দিনে-দিনে ইল্ম্ (প্রজ্ঞা) দান করেছেন। গায়েবি দুনিয়া আমার নজর হয়। শরীর আর তার ছায়া যেমন, প্রথমে সেইরকম মালুম হত। তারপর ছায়াকেই আসল জানতে পারলাম।

জালালুদ্দিন খুশি হয়ে বলল, হজরত ! আফলাতুনের (প্লেটো) কেতাবে ঠিক এই তত্ত্ব পড়েছি বটে !

আফলাতুনের চেয়ে ইল্ম্দার দুনিয়ায় কমই ছিলেন।

এই সময় আনিসুর সর্দারের মৃদু কাশির শব্দ শোনা গেল। হুজুর ইশারায় ডাকলেন তাঁকে। সম্ভাষণ-বিনিময়ের পর আনিসুর বললেন, সেই জমিদারবাবুর লোক বাবু গোবিন্দরাম হুজুরের মোলাকাত মাঙছেন।

বদিউজ্জামান তাঁকে নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। বাবু গোবিন্দরাম ফটকে ঢুকেই ঝুঁকে এবাদতখানার একটু মাটি মাথায় রাখলেন। তারপর গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে প্রাঙ্গণে দাঁড়ালেন। হুজুর বললেন, বেটির জিনটি কি আবার জ্বালাতন শুরু করেছে বাবু ?

গোবিন্দরাম বললেন, আজ্ঞে না, পিরসাহেব ! আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।

জালালুদ্দিন এবং আনিসুর সঙ্গে-সঙ্গে এবাদতখানা থেকে পেরিয়ে গেলেন। হুজুর বললেন, আসুন বাবু, ঘাটে বসে কথা শুনি।

ঘাটের মাথায় মুখোমুখি বসার পর গোবিন্দরাম আস্তে বললেন, আপনি আপনার কনিষ্ঠ পুত্র শফির খবর রাখেন কি ?

বদিউজ্জামান মাছের চোখে তাকিয়ে বললেন, সে আমার কাছে মুর্দা (মৃত), বাবু !

গোবিন্দরাম আস্তে বললেন, জেলার কালেকটর বাহাদুর শফিকে সাত বছরের জন্য জেলা থেকে নির্বাসন-দণ্ড জারি করেছেন। এ জেলায় তাকে দেখলেই পুলিশকে গুলি করে মারার হুকুমও জারি হয়েছে।

বদিউজ্জামান ফের একই স্বরে বললেন, সে মুর্দা।

পিরসাহেব ! গোবিন্দরামের চোখের কোনায় একফোঁটা জল দেখা গেল। ধরা গলায় বললেন, তার মতো মহৎহৃদয় যুবক দেখা যায় না। সে জেদি, খেয়ালি, বেপরোয়া বটে। নরহত্যায় তার হাত কাঁপে না। কিন্তু তবু বলব, তার গুণের অন্ত নেই। বিদ্বান পণ্ডিতও এ জেলায় তার তুল্য দেখি না। তার তুল্য সেবাব্রতীও দেখা যায় না। অমন দেশপ্রেমিকও দুর্লভ। গোবিন্দরাম শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, আমি নেমকহারাম নই। কিন্তু আমার মালিক জমিদার বাবু অনন্তনারায়ণ ত্রিবেদী বড়ো অত্যাচারী, মদ্যপ এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন। আমি দুবছর হল, চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করছি। গত বছর জমিদারবাবু খুন হয়েছেন। তাঁর খুনী কে আমি তাও জানি। কিন্তু—

শফি ? বদিউজ্জামান আস্তে বললেন।

গোবিন্দরাম জবাব দিলেন না এ প্রশ্নের। বললেন, শফির বিরুদ্ধে কালেকটর

বাহাদুরের ওই হুকুমজারির পিছনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের বড়োমানুষরা আছে। এমন কী, হরিণমারার বড়োগাজিও আছেন।

বদিউজ্জামান চমকে উঠলেন। ফের আস্তে বললেন, তিনি আর আমার কাছে আসেন না। শুনেছি, সদরশহরে থাকেন। মোছলেম লিগ না কিসের মাথা হয়েছেন।

আঁজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছেন। গোবিন্দরাম একটু চুপ করে থেকে বললেন, জেলায় আপনার নামযশ আছে। আপনি এর বিহিত করুন।

কী করব ?

আপনি খত লিখে দিন! বড়োগাজিকে লিখুন। খানবাহাদুর দবিরউদ্দিনকে লিখুন। আর একখানা লিখুন কালেকটার বাহ'দুরকে। আমি সেই খত নিয়ে যাব। হ্যাঁ, আর-একখানা খত লিখুন দিদারুলকে। তিনি ও একজন নামকরা লোক। মুসলিম লিগের জিলা সেক্রেটারি।

দিদারুল ! বদিউজ্জামান ক্ষুব্ধভাবে বললেন। সে তবলীগ-উল-এছলাম সমিতি ভেঙে দিয়েছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন তিনি মুসলিম লিগের নেতা।

বদিউজ্জামান গম্ভীরমুখে বললেন, আমি আজকাল বাইরের দুনিয়ার খবর রাখি না। এবাদত-বন্দেগিতে কাটাই। আর শফি আমার কাছে মুর্দা ! সে মুসলমানি ছেড়ে আপনাদের জাতি হয়েছে শুনেছি।

গোবিন্দরাম একটু হাসলেন। পিরসাহেব ! হিন্দু হওয়া যায় না। হিন্দু হয়ে জন্ম নিতে হয় !

বলেন কী ! তাজ্জব কথা !

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে গোবিন্দরাম সোনার বোতাম সাজানো পানজাবির পকেট থেকেট একটি চিঠি বের করে দুহাতে দিলেন। খতখানি পড়ে দেখুন !

কার খত ?

কৃষ্ণপুরের জমিদারবাবুর মেয়ে — যার জিনকে আপনি ভাগিয়েছিলেন। সে এখন জমিদারির মালিক হয়েছে। তবে দু-তিনটি মহাল বাদে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। সব নীলাম হয়ে গেছে।

চিঠিটি আরবি ভাষায় লেখা। মাত্র দুলাইনের চিঠি ? সম্বোধনহীন, বেনামি। "শফিকে রক্ষার জন্য শীঘ্র একজন জিন পাঠান।"

বদিউজ্জামান হাসবার চেষ্টা করে বললেন, বেটি পাগলি ! জমিদারি চালায় কীভাবে ?

গোবিন্দরাম বললেন, কর্মচারীরা চালায়। তবে কতদিন এভাবে চলবে জানি না। মেয়েটার জন্য আমার কষ্ট হয়। কিন্তু কী করব ? সত্যই সে এক উন্মাদিনী। হিংস্র প্রকৃতির মেয়ে। তার ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় করে।

বদিউজ্জামান কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, দেখছি।

গোবিন্দরাম বললেন, আমাকে এখনই ফিরতে হবে। খতগুলি দয়া করে যদি—

বদিউজ্জামান হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বললেন, শফি মুর্দা। আমি মুর্দার জন্য জিন্দাদের কাছে খত লিখব না, বাবু ! আপনি আসুন।

গোবিন্দরাম ক্ষুব্ধভাবে উঠে দাঁড়ালেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, আপনার ইচ্ছা ! তারপর বেরিয়ে গেলেন।

বদিউজ্জামান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এবাদতখানায় ঢুকলেন। দরজা

ভেতর থেকে বন্ধ করে গালিচার বসলেন। বিকেলের আলো কমে যাচ্ছে। ঘরে আবছা আঁধার! কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ক্রন্দনের পর দুইহাত তুলে মৃদুস্বরে প্রার্থনা করলেন, "আল্লাহ! তুমি জিন ও ইনসান (মানুষ) পয়দা করিয়াছ। আমি এই জিন্দেগিতে কিছু চাহি নাই তোমার কাছে। এক্ষণে মাত্র একজন জিনকে ভিখ্ মাঙিতেছি। তাহাকে পাঠাইয়া দাও, মালেক!"....

আবরুকে ব-সুদ্ খুন-এ-জিগর্ হস্ত্ দিহদ্
ব-উমিদ্-এ-করম্-এ-খাজা ব-দারোয়াঁ মা-ফারোশ্—

রোজ নানা জায়গা থেকে অসংখ্য চিঠি আসে। মৌলাহাটে ডাকঘরের অন্য দরখাস্ত গেছে। শুনেছি মনজুর হয়ে যাবে। এখনও ডাকঘর ওই হরিণমারায়। দুপুর নাগাদ ডাকপিওন এবাদতখানার ফটকে এসে হাঁক মারে, 'চিঠ্‌ঠি'! লোকটির মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে খাকি ঢোলা কোর্তা, পরনে ধুতি, পায়ে বেঢপ জুতো। তার গোঁফখানা দেখার মতো। নাক ও কান বেজায় লম্বা। তার কাঁধে ঝোলে চামড়ার প্যাঁটরা। সে হিন্দু। কিন্তু বুজুর্গদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। বারদুতিনও হাঁকে কখনও। অপেক্ষা করে। তার ভক্তিই তাকে ধৈর্যশীল করে। আমাকে দেখামাত্র সে ব্যস্তভাবে জুতো খুলে ফেলে। বান্ডিলবাঁধা চিঠিগুলো দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে গেলে সে চিঠির বান্ডিলটা আমার পায়ের কাছে রাখার জন্য নত হয়। তাকে নসিহত করেও ফায়দা হয়নি। সে কি আমাকে ছুঁতে হবে বলে এমন করে? প্রথম-প্রথম এই কথাই ভাবতাম। পরে মনে হয়েছিল, ধারণাটা ঠিক নয়। এর আগেও কত জায়গায় বসবাস করেছি এবং চিঠি এলে হিন্দু ডাকপিওন আমার হাতেই তা তুলে দিয়েছে। কিন্তু সেইসব চিঠি এইসব চিঠি নয়। উর্দু, ফারসি, বাঙলায় লেখা প্রশস্তি, দোয়াপ্রার্থনা, হুজুরের নামে পাঠানো নজরানার টাকা পৌঁছেছে কি না, কার কী কঠিন অসুখ এবং আমার 'পাক খেদমতে হাজির' হওয়ার জন্য অনুমতি কিংবা কোনো শরিয়তি বিষয়ে মছ্‌লা বা ফতোয়া চাওয়া, এইসব নানা ধরনের চিঠি। মানুষের কত যে সমস্যা! রাগ লাগে, দুঃখ হয়, হাসি পায়। চিঠিগুলি আমাকে নিয়ে অথবা আমি চিঠিগুলি নিয়ে খেলা করি। কোথাকার এক আওরত আমাকে প্রায় স্বপ্নে দেখে। হাসতে-হাসতে গম্ভীব হই। এই চিঠির জবাব দিই না। তবু তার চিঠি আসে। বুকে ডর বাজে, কবে না এসে সামনে দাঁড়ায়! তবু এইভাবে যে চিঠি আসে, সেও, বুঝি আল্লাহের কুদরত! শেষ পর্যন্ত এই হয়ে উঠল তাজা, জিন্দা, ছটফটে — হয়তো যন্ত্রণায়, হয়তো আনন্দে চঞ্চল যে দুনিয়া আর জীবন, তাকে দেখার জানালা। এই জানালা দিয়ে মানুষের জীবনের স্পন্দন টের পাই। হাজার-হাজার মুখ। হাজার-হাজার আশাস্বপ্ন-খাহেস। যেন ঘরে বসে বাইরে ঝড় দেখছি। মিছিল দেখছি। সমুন্দর দেখছি। উথাল-পাথাল ঢেউ দেখছি। ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউগুলি কি আমাকেও এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে না? ওই ঝড় কি আমাকেও ঝাপটা মারছে না? হুঁ — আমিও তো মানুষ। আমার নির্লিপ্ততার আলখেল্লা ফরিদুজ্জামানের কালো পোশাকটির মতোই দুভাগ হয়ে যায়, নাঙ্গা রক্তমাংসের শরীর থরথর করে ওঠে। সেদিন একটি চিঠি পেলাম ঃ 'আমার ছোট ভাই, তিনবৎসর বয়স, ইন্তেকাল করিয়াছে। হুজুর দোয়া করুন, সে যেন বেহেস্‌তে ঠাঁই পায়।' হাতের লেখা দেখে মনে হল বালিকাই হবে। জবাব দিলাম ঃ 'বাচ্চাদের ইন্তেকাল হইলে বেহেশ্‌ত্ সুনিশ্চিত জানিবা! শোক করিবা না। উহা হারাম।' চিঠিগুলি বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যেন গোপন সাঁকো তৈরি করেছিল আমার জন্য। তাই দুপুর হলেই ঘাটের সিঁড়ির মাথার উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে

থাকি। বাদশাহি সড়কে দূরে লালপাগড়ি নজর হলেই বুকের ভেতর ঢেউ ওঠে। আজ কী চিঠি আসছে ? কার কী খবর নিয়ে আসছে ? শফি — আল্লাহ্ তার জন্য নিশ্চিত কোনো শক্তিশালী জিন পাঠিয়েছেন। তবু মানুষের মন — আমি মানুষ ! ডাকপিওন এসে পায়ের কাছে বান্ডিলবাঁধা চিঠির তাড়া রাখল। মানিঅর্ডার ফরম রাখল, তার ওপর কিছু টাকা। তার কানে খাগের কলম গোঁজা ছিল। ছিপিআঁটা একটি দোয়াত ছিল চামড়ার প্যাঁটরায় একটি খোপে। সবই সসম্ভ্রমে রাখল। দস্তখত করে টাকা চিঠির বান্ডিল তুলে নিলাম। সে ফরম, দোয়াত, কলম তুলে নিল। তারপর মাটি থেকে ধুলো খিমচে মাথায় রাখল ! মানুষ মানুষের কাছে কেন ওভাবে নত হবে পাই ভেবে নে ! টাকাগুলি এতিমখানার জন্য কয়েকজন পাঠিয়েছেন। এবাদতখানার বারান্দায় বসে চিঠিগুলি পড়তে থাকলাম। একটি পোস্টকার্ড, লাল কালিতে লেখা ফারসি দুলাইন কথা, একটি বয়েৎ ঃ আবরু-কে 'রক্ত দিয়ে কেনা ইজ্জত, হে সম্মানিতজন, কোনো স্বার্থের বদলে দারোয়ানের কাছে বেচে দিও না।' তলায় শুধু ফরাসি 'রে' হরফ। র — কে এই 'র' ? আচানক নড়ে উঠলাম। আমার নাম ঠিকানা সাধারণ কালিতে লেখা এবং আংরেজিতে ! র—হুঁ, রত্নময়ী ! কৃষ্ণপুরের সেই জমিদারকন্যা। বুঝলাম আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে শফির কথা। কিন্তু এই বয়েৎ কেন ? তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আবিষ্কার করলাম, কালির রঙ সাধারণ লাল নয়। একটু কালচে। জায়গায়-জায়গায় ধ্যাবড়া। ইয়া আল্লাহ্ ! এ কি খুন ! রক্ত দিয়ে লিখেছে ? কিন্তু কেন এই বয়েৎ লিখল সে ? আমি নিজের বা কারুর ইজ্জত কোন্ দারোয়ানের কাছে বিকিয়ে দিতে যাচ্ছি যে এমন হুঁশিয়ারি দিল ? মন তোলপাড় হয়ে রইল। শফির বিরুদ্ধে সরকারি হুকুম আমি সাইদাকে গোপন করে রেখেছি। জানি না, ইতিমধ্যে সে-খবর মৌলাহাটে রটেছে কি না। রটলে কেউ-না-কেউ আমাকে কি জানাবে না ? নাকি শফি হিন্দু হয়ে গেছে এবং আমার কাছে সে মৃত সাব্যস্ত হওয়ায় কেউ একটা আমাকে মুখ ফুটে বলতে পারে না ? না ? দিনটা বড়ো বেসামাল কেটে পেল। সারারাত ঘুম হল না। পরদিন বিকেলে দেখি, বাদশাহি সড়কে একটি কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে কোনো সওয়ার আসছে। ঘোড়সওয়ার এবাদতখানার ফটকের দিকে এসে থামল। একটি গাছে ঘোড়া বেঁধে ফটকের সামনে দাঁড়াল। চিনতে পারলাম। দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরি। শুনেছিলাম যে কবে নাকি একদিন এসেছিল। বউবিবিদের মায়ের সম্পত্তির বণ্টননামা করে গেছে ! কিন্তু মেজবউবিবি মায়ের সম্পত্তি নেয়নি। খুশি হয়েছিলাম শুনে। আত্মহত্যাকারিণীর সম্পত্তি হারাম। মেজবউবিবি বড় নেককার (পুণ্যবতী) মেয়ে। চৌধুরি লোকটিকে দেখে আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। এগিয়ে গিয়ে বললাম, বেশরা, মোছলেমনামধারী লোকদের জন্য এবাদতখানার দরোয়াজা বন্ধ। লোকটিকে রুগ্ণ দেখাচ্ছিল। পোশাকও আংরেজের মাফিক। পাতলুনের ভেতর কামিজ গোঁজা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, কী চাই আপনার ? আবার কী নিতে এসেছেন আমার কাছে ? যান — আর কিছু দেবার নেই আপনাকে। আমার গলা কাঁপছিল। চোখ ভিজে যাচ্ছিল। ফের বললাম. বলুন কী চাই এবার ? বারি চৌধুরি আস্তে বললেন, হজরত ! কিছুই চাই না। আপনার কাছ থেকে যা নিয়ে গিয়েছিলাম, তা আর ফিরিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনার একটি দস্তখত চাই। বললাম, শফি মুর্দা ! বারি চৌধুরি বললেন, আপনার কাছে মুর্দা। কিন্তু জেলার হাজার হাজার মানুষের কাছে সে জিন্দা। তারা তাকে

চায়। তারা দস্তখত দিয়েছে। কিন্তু আপনার দস্তখতের দাম তাদের চেয়ে বেশি! কালেকটার সাহেব বলেছেন, যদি শফির আব্বা জিম্মাদার হন যে, ছেলেকে তিনি সরকার-বিরোধী কাজ থেকে দূরে রাখবেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে হুকুম তুলে নেওয়া হবে। হজরত! আপনাকে জিম্মাদার সত্যিই হতে হবে না, শুধু নামকাওয়াস্তে একটা দস্তখত দিন। শফির আসল জিম্মাদার থাকব আমি। — বারি চৌধুরি চোখ মুছে ফের বলল, সে বেপরোয়া। সে জেলায় মাঝে-মাঝে যাতায়াত করছে। আমার ভয় হয়, কখন পুলিশের সামনে পড়লে তাকে গুলি করে মারবে। তাই তার শুধু বেঁচে থাকার জন্য আপনার দস্তখত চাইছি। কালেকটারসাহেব আপনার নামযশের কথা জানেন। তিনি জানেন, আপনি বুজর্গ পির। আপনি দয়া করে শুধু একটা দস্তখত দিন। শিলমোহরও দিন। বলে সে একটা কাগজ বের করল পকেট থেকে। কাগজটি হাত বাড়িয়ে নিয়েই মনে পড়ে গেল রত্নময়ীর রক্তে লেখা বয়েৎটি। সঙ্গে-সঙ্গে কাগজটি ছিঁড়ে ফেললাম। দ্রুত পিছন ফিরে চলে এলাম। এবাদতখানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কতক্ষণ বসে ছিলাম, স্মরণ হয় না। দরজায় ধাক্কা মারল কেউ। তারপর সাইদার সাড়া পেলাম। ভাবলাম, সে দুখুকে সঙ্গে নিয়ে খানা এনেছে। দরজা খুলে চমকে উঠলাম। সাইদার বোরখার মুখের পর্দা তোলা। দুচোখে কান্না এবং আগুন। আপনি এমন বেদিল (হৃদয়হীন) এমন বেহরম (নির্দয়)! বলে আমার জোব্বা খামচে ধরে বুকে মাথা ভাঙতে লাগল। বুঝলাম, বারি চৌধুরি সাইদাকে সব বলেছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই পোস্টকার্ডটি তুলে সাইদার চোখের সামনে ধরলাম। বয়েৎটি আবৃত্তি করে বললাম খুন দিয়ে এক হিন্দু মেয়ে এটি লিখেছে। সারা জিন্দেগি খুন দিয়ে কেনা ইজ্জত দারোয়ানের পায়ে বিকিয়ে দিতে বল সাইদা? তখন সাইদা চুপ করে রইল।—

I met a lady in the meads,
Full beautiful– a faery's child,
Her hair was long, her foot was light,
And her eyes were wild.

–Keats.

"এইসনে আনারগাছটিতে বহুত২ আনার ফলিয়াছে। আল্লাহের নেয়ামত থরেবিথরে ঝলমল করিতেছে। কোথায় ছিল এইসকল মেওয়া? আল্লাহ বেহেশ্‌ত্‌ হইতে কি একটুকুন নমুদ দর্শাইতেছেন বনু-আদমকে? তাহাই বটে! গায়েবী দুনিয়ার নমুদ জাহেবী দুনিয়ার পহুছিয়াছে। আফলাতুন সঠিক কহিয়াছেন! নাকি পাক আল্লাহ যাহা ছিল, না, যাহা নাই সমুদায় সৃষ্টি করেন? বড় ধন্দে পড়িলাম দেখিতেছি।—

"অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া আছি। আচানক নজর হইল, একটি ক্ষুদ্র হাত, উহাতে একগাছি চুড়ি ঝিলমিল করিতেছে, একটি আনার আঁকড়াইয়া ধরিল। অমনি আওয়াজ দিলাম। দেখিলাম গাছটির আড়ালে কিছু আন্দোলন ঘটিতেছে। উঠিয়া পড়িলাম। একটি বালিকা দৌড়াইয়া জঙ্গলে ঢুকিতেছে। দুইখানি ক্ষুদ্র পা হরিণীর সদৃশ, চুল উপচাইয়া পিঠে পড়িয়াছে এবং একবারের জন্য সে মুহ্‌ ঘুরাইয়া বুঝিতে চাহিল জে আমি তাহাকে তাড়া করিতেছি কি না। আমার চক্ষে ছটা বাজিল। বেহেশতের হুরী দেখিলাম কি? কে এই খুব্‌ সুরত্‌ বালিকা? বয়ঃক্রম ছয়-সাত বৎসর হইবে মালুম হয়। দ্বিতীয় দফা পুষ্করিণীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিজলীর ঝিলিক মারিয়া সে গায়েব হইয়া গেল। তবে এতিখানারই কোন এতিম বালিকা হইবে।

শরমেন্দা বোধ করিলাম। এই ঘাটে দাঁড়াইয়া উত্তরের পাড়ে এতিমখানার ঘাটে নজর রাখিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে এতিমখানার খিদমতগার-বাবুর্চি ইরফান এবং মকবুল দেগচি তৈজসাদি ধুইতে বাহির হইল। ইশারায় ডাকিলাম। তাহারা দৌড়াইয়া পশ্চিমের সড়ক ঘুরিয়া এবাদতখানার সদর ফটকে হাজির হইল। পূর্ব্বের জঙ্গল ইলাকায় আমার বিনা হুকুমে কেহ পা দেয় না। লোকসকল জানে জে আমি ওই জঙ্গলে গাছ-লতা-পশু-পাখি সকলের সহিত কথাবার্তা কহি এবং কখনও২ জেনদিগের সঙ্গেও মুলাকাত করি।—

"ইরফান এবং মকবুল বহত তাজ্জব হইল। নিজ হস্তে আনার পাড়িতে২ পুছ করিলাম, 'এতিমখানায় কতজন এতিম আছে' ? উহারা কহিল, 'একুশ জন।' — 'কম বোধ হইতেছে কেন ?' —'হজরত ! উহার. আসে এবং পলাইয়া যায়। কোন২ মাহিনা পঞ্চাশজন, আবার কমিয়া দশজনও হয়।' বুঝিলাম, জিম্মাদাররা কারচুপি করিতেছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। নয়টি পাকা আনার পাড়িয়া কহিলাম, 'মাথায় লম্বা চুল, খুবসুরত্ একটি লেড়কি আছে, হাল্কা দুব্লা — উহাকে পুরা একটি আনার দিবে। বাকিগুলিন সমান টুক্‌রা করিয়া বাঁটিয়া দিবে। তোমরাও হিস্যা লইও।' আনারগুলিন দুইজনে লইয়া গেল। উহাদের চেহারায় মালুম হইল জে তাজ্জব এবং খুশী হইয়াছে। আর মনে হইল, এইজন্যই আনার গাছটির জন্ম হইয়াছিল এবং সে এত অধিক মেওয়া ফলাইয়াছিল। এক্ষণে সে নিজেকে খালি করিয়া খুশি হইয়া মিটিমিটি হাসিতেছে। কেন একথা মনে হইল, আল্লাহ জানেন—

"কিছুদিবস বাদ জঙ্গলে ঢুকিয়াছি ! আচানক দেখিলাম, জঙ্গল ইলাকার শেষে খোলা টুকরা জমিনে সেই বালিকাটি আপন মনে খেলিতেছে। ঘুরিয়া আমাকে দেখিবামাত্র স্থির হইয়া গেল। বালিকাটির-এ কি দেখিতেছি — চক্ষু দুইটি পিঙ্গলবর্ণ, রোশনি ঝিকমিক করিতেছে ! পলকে হরিণী গায়েব হইল। সেইরোজ মগরেব বাদ এতিমখানায় জাইয়া হুকুমজারি করিলাম, 'ওই লেড়কি জেন না পলাইয়া যায়। আর দেখ, উহাকে বাগ্‌দাদী কায়দাবহি (আরবি বর্ণপরিচয়) কিনিয়া দিবে। জালালুদ্দিন উহার শিক্ষার ভার লউক।' জালালুদ্দিন হাজির ছিল ! কহিল, হজরতের হুকুম তামিল করিতে ত্রুটি ঘটিবেক না।"—

'Oh! faciles nimium qui tristia crimina caedis Fluminea tolli posse putatis aqua!'

Fasti– Ovid

রত্নময়ী কেন সেদিন হঠাৎ আমাকে প্রণাম করেছিল, জানি না। খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামের পর বিকেলে ইচ্ছে হল, পদ্মার চরে ঘুরতে যাব। একজন পরিচারিকা চা দিয়ে গেল। তার কাছে জানতে পারলাম, রত্নময়ীর শরীর খারাপ। শুয়ে আছে। নীচে গিয়ে মুন্সিজির খোঁজ করলাম। বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে শুকনো ফোয়ারার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তখন উনি এলেন। কপালে হাত তুলে নিঃশব্দে আদাব দিলেন। বললাম, একটু বেরুব ভাবছি। 'পাহ্‌লোয়ানকে' আনতে বলুন। মুন্সিজি একটু হেসে বললেন, সে হচ্ছে। রাজবাড়ি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হল, বলুন শুনি। বললাম, কী ধারণা হবে ? মুন্সিজি প্রথমে যেন অবাক হলেন। তারপর বললেন, এই বাড়িতে আমি তিরিশ বছর আছি। আমারও তবু যখন ধারণা হয়নি, তখন আপনারই বা কেমন করে হবে ? তবে ঠাহর করে দেখুন, বাড়িটার গায়েও মুসলমানি ছাপ। আপনি লালবাগে মোতিমহল দেখেছেন কি ? বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ। বাড়িটা নবাবি ধাঁচের মনে হচ্ছে! মুন্সি আবদুর রহিম আমার হাত ধরে ফোয়ারার শুকনো বৃত্তাকার মারবেল চত্বরের কাছে নিয়ে গেলেন। পাশাপাশি বসলাম দুজনে। তারপর বললেন, এখান থেকে একক্রোশ দূরে বিহার মুলুক। নবাবি আমলে এই বাড়িটার মালিক ছিলেন বিহারের ফতেগঞ্জের এক মুসলমান ফৌজদার। পরে লিটন নামে এক ইংরেজ কিনে নেন। তাঁর কাছে কেনেন অনন্তনারায়ণবাবুর বাবা! তাহলে দেখুন মুসলমানি আর ইংরেজি দুই জমানা এ বাড়িতে গেছে। অনন্তনারায়ণবাবুর দোষ নেই। ইংরেজি আর মুসলমানি দুইরকম কেতায় তিনি বড়ো হয়েছেন। নাবাববাহাদুরের ক্লাসফ্রেনড ছিলেন ইংলনড দেশে। সেই থেকে দোস্তি। ফলে লালবাগ হাভেলি থেকে মন্নুজান বাইজির এ বাড়িতে আসা। কিছু বুঝলেন ? বললাম। মুন্সিজি হাসলেন। —বোঝেননি এখনও। এ বাড়ির চাকর-নোকর-ঝি-আয়া-বাবুর্চি-খানসামা, খাওয়াদাওয়ার রীতি সবেতেই ইংরেজি-মুসলমানি কেতা মিশে আছে। অনন্তনারায়ণবাবুর আত্মীয়স্বজন গোঁড়া হিন্দু এবং তাঁরা বিহারে থাকেন। তাঁরা বহু বছর এ বাড়ির সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। তাতে অনন্তনারায়ণবাবুর আরও সুবিধে হয়েছে। মুসলমানপ্রধান

এলাকা। লাঠিয়াল-পাইকবরকন্দাজ সবাই মুসলমান। কর্মচারীরাও বেশির ভাগ মুসলমান। আর প্রজারাও ভাবে, তাদের 'রাজাবাবু' আধা-মুসলমান। কলমা পড়তে বাকি! — মুন্সিজি হাসলেন। কিন্তু বাঁকা হাসি। তারপর আস্তে বললেন, একজন ভণ্ড লম্পট, মাতাল — আস্ত শয়তান! তার অধীনে চাকুরি করছি যদি বলেন, তার জবাব শুনুন। জহরত-আরার জন্য! জিগ্যেস করলাম, কে জহরত-আরা? মুন্সিজি দুঃখিত মুখে বললেন, আপনি পিরের খান্দান। মুসলমান। তবু জিজ্ঞেস করছেন? ইচ্ছে হল, একটা কড়া জবাব দিই! কিন্তু বৃদ্ধ লোকটির জন্য কেন কে জানে করুণা হচ্ছিল। চুপ করে থাকলাম। তখন মুন্সিজি বললেন, জহরত-আরা ফারসি কথা। জহরত মানে রত্ন। আরা মানে ছটা। এবার হেসে ফেললাম। বললাম, বুঝেছি। মুন্সিজি বললেন এতটুকু থেকে মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মতো দেখে আসছি। ওর বয়স যখন সাত বছর, তখন ওর মা কড়িকাঠ থেকে ঝুলে — বাধা দিয়ে বললাম, রত্নময়ীর ধারণা, তার মাকে তার বাবা খুন করেছিলেন। মুন্সিজি একটু চুপ করে থেকে বললেন, রাজবাড়িতে গুজব রটেছিল। সে-গুজব বাইরেও ছড়িয়েছিল। জহরত-আরার কানে গিয়ে থাকবে। তবে ওর লালন-পালনের কোনো ত্রুটি করেননি অনন্তনারায়ণবাবু। মেমসায়েব রেখে বাড়িতে ইংরেজি শিখিয়েছেন। আমার কাছে নিজের চেষ্টায় আরবি শিখেছে। একজন হিন্দুপণ্ডিত কিছুকাল বাঙলা-সংস্কৃত শেখাতেন। পরে জাতিপাতের ভয়ে তিনিও গতিক বুঝে কেটে পড়েন। কিন্তু জহরত-আরা বুদ্ধিমতী। অত্যন্ত মেধাবী। ঝটপট সবকিছু শিখে নেওয়ার ক্ষমতা ওর আছে। বললাম, বাবু গোবিন্দরাম কেমন লোক? মুন্সিজি গম্ভীর মুখে বললেন, খুবই সাচ্চা লোক। কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনিও আর থাকবেন না। মালিকের প্রতি আমার মতোই অসন্তুষ্ট! তিনি একজন উদারহৃদয় হিন্দু। জহরত-আরাকে তিনিও আমার মতো স্নেহ করেন। আমরা দুজনে পরামর্শ করেই আপনার আব্বা-হজরতের কাছে ওকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলাম। জমিদারবাবুকে দিয়ে চিঠি আমরা লিখিয়ে নিয়েছিলাম। জানেন তো উনি খুব ভালো ফারসি জানেন। মুন্সি আবদুর রহিম তাঁর শীর্ণ আঙুল খুঁটতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্বাস ছেড়ে ফের বললেন, আপনার আব্বা-হজরতের দয়ায় জহরত-আরার অসুখ একেবারে সেরে গিয়েছিল। কিন্তু আবার কিছুদিন থেকে সেই আগের মতো বেহুঁশ হয়ে পড়ছে। বেহুঁশের সময় আরবি জবানে আগের মতো নিজের বাবার বিরুদ্ধে কুৎসিত কথাবার্তা বলছে। মাঘমাসে ব্রহ্মপুরে — আবার দ্রুত বাধা দিয়ে বললাম, রত্নময়ীর দাদার কথা বলুন, শুনি! মুন্সিজি ভীষণ চমকে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, জহরত আপনাকে কতটুকু বলেছে জানি না। সদর শহরে থেকে কালেজে পড়ার সময় হরিনারায়ণ স্বদেশীদের পাল্লায় পড়ে। কালেকটারকে গুলি করতে গিয়েছিল। একজন দারোগা মারা পড়ে গুলিতে। কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল জানি না। পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছিল। বিচার চলার সময় জেলহাজত থেকে সে পালিয়ে গেছে। কীভাবে পালাতে পারল কে জানে? অনন্তনারায়ণবাবুর ব্যাপার তো বললাম। ইংরেজদের সঙ্গেও খুব দহরম মহরম আছে ওঁর। কাজেই ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঢোলশহরত জারি করেছেন। খবরের কাগজেও সেকথা ছাপিয়েছেন — ইংরেজি কাগজে। বুঝলেন তো? বললাম, বুঝলাম। হরিবাবু কোথায় আছেন, জানেন কি? মুন্সিজি বিষণ্ণভাবে হেসে বললেন, মাঘমাসে ব্রহ্মপুর থেকে ফিরে এসে জহরত আমাকে সব বলেছে। আমার ধারণা দাদার সঙ্গে ওর দেখা হওয়াটা উচিত হয়নি। আগে জানলে

গোবিন্দবাবুকে নিষেধ করতাম। ব্রহ্মপুর থেকে ফিরে আসার পর থেকেই অসুখটা আবার দেখা দিয়েছে। এখন আমার খালি ভয় হচ্ছে, বেহুঁশের ঘোরে বাঙলা জবানে যদি দৈবাৎ দাদার সম্পর্কে কিছু বলে ফেলে, মুশকিল হবে। সরকার হরিনারায়ণকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেই জেনে রাখুন। আর দেখুন শফিসাহেব! জীবনে অনেক ঠকে শিখেছি, মানুষকে খুন করে মানুষের ভালো করা যায় না। আপনি কজনকে খুন করবেন? এত বড়ো দুনিয়া, এত মানুষ! কতজনের ভালোর জন্য কতজনকে খুন করতে হবে? মুর্খ মানুষ এই কথাটা কেন বোঝে না যে খুনীর হাতের রক্ত কিছুতেই ধোয়া যায় না! যতই করুন, রক্তের ছাপ হাত থেকে মোছা যাবে না। — দার্শনিক বৃদ্ধের দিকে করুণা এবং বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ রোমান কবি ওভিদের একটি কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ে গেল ঃ 'হায়! যারা ভাবে, হত্যার মতো কদর্য অপরাধ সহজেই নদীর জলে ধোয়া যাবে, তারা কী গোবেচারা!' শিউরে উঠলাম। বললাম, 'পাহ্‌লোয়ানকে' আনতে বলুন সহিসকে। পদ্মার চরে ঘুরে আসি। মুন্সিজিও উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল, আরও অনেক কথা যেন বলার ছিল।—

Love begin in shadow and end in light'

"পদ্মার ধসিয়া-পড়া ঢালু তীরে দুর্বাঘাসের হরিদ্বর্ণ কোমলতা এবং তাহারও নিম্নে একফালি নীলাভ জলের অধিকতর কোমলতার পর চরের ধূসর বালির মিশ্রিত কোমলতা একটি কালো চতুষ্পদ প্রাণীর কঠিন খুরে বিক্ষত হইতেছিল! পাহ্‌লোয়ান, তুই বর্বর। তুই একজন ভ্যানডাল! পাহ্‌লোয়ান, বলিল, কাহাকে গালি দিতেছ? আমি নিমিত্ত মাত্র। পাহলোয়ানের সহিত নির্জনে এরূপ কথোপকথনের সূত্রপাত হইল। চরটি ক্রমে-ক্রমে কচ্ছপের পিঠের আকৃতি বোধ হইল এবং বালি দৃঢ়তম হইতে মাটিতে পরিণত হইল। শীর্ষদেশে, কেন্দ্রস্থলে একটি বৃক্ষ দেখিলাম। যখন বৃক্ষটি দেখিতেছিলাম, তখন পাহ্‌লোয়ান বলিল, অমন করিয়া কী দেখিতেছ? বলিলাম, একটি বৃক্ষ। পাহ্‌লোয়ান এবার একটি আশ্চর্য বাক্য উচ্চারণ করিল। যখন প্রান্তরে কোনও বৃক্ষকে দেখ, তখন প্রান্তর দৃষ্টির অগোচরে থাকে। বলিলাম, ঠিক বলিয়াছ। বৃক্ষ ও প্রান্তর একই সঙ্গে দর্শন অসম্ভব বটে! পাহ্‌লোয়ান বলিল, অথচ দেখ, প্রান্তর না থাকিলে বৃক্ষ থাকে না। প্রান্তরই বৃক্ষকে প্রকাশ করে। বলিলাম, এমন কথা কেন বলিতেছ? কৃষ্ণকায় অশ্বটি মুন্সি আবদুর রহিমে পরিণত হইল। বলিল, অবতরণ কর। বলিতেছি। তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলে সে বলিল, পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে সকল বস্তু — জড় হউক, কী অ-জড় হউক, মায়াবিভ্রম মাত্র। তুমি সতর্ক হও। মায়াবিভ্রম — উহা মরীচিকা। উহার দিকে ধাবিত হইও না। শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হইবে! ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, ইহার অর্থ কী? ইহা বলারই বা উদ্দেশ্য কী, রূপান্তরিত সত্তাটি বলিল তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে সকল কিছু দর্শন কর। তুমি সিতারা বেগম, স্বাধীনবালা মজুমদার, কিম্বা রত্নময়ী ত্রিবেদীকে ওই বৃক্ষবৎ দেখিয়াছ। আরও ভাবিবার আছে। দেখ, দেখ! বৃক্ষে একটি পক্ষী আসিয়া বসিল। এবার বৃক্ষটি আর নিতান্ত বৃক্ষ রহিল কি? উহা পক্ষীময় হইল। এবার দেখ, একজন মানুষ আসিয়া বৃক্ষতলে দাঁড়াইল। বৃক্ষটি আরও পরিবর্তিত হইল। উহার নির্জনতার আকৃতি লোপ পাইল। দেখ দেখ মানুষটির কাঁধে একটি বন্দুক! বৃক্ষটি নিজস্বতা হারাইল। পক্ষী, মানুষ, বন্দুক, বৃক্ষ মিলিয়া একটি জটিল বিভ্রম। সক্রোধে বলিলাম, বিভ্রম গুঁড়াইয়া

ফেলিতেছি। দেখ, কী করি! বলিয়া অগ্রসর হইলাম। এই বিশাল চরসমাকীর্ণ নদীটি পূর্ববাহিনী। পশ্চিম হইতে অস্তসূর্যের পীতাভ লাল আলোয় মানুষটিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একজন গোরা সাহেব! সে বৃক্ষের মূলে বসিয়া কাণ্ডে হেলান দিয়া উত্তরে কিছু দেখিতেছে। আমি ও পাহ্‌লোয়ান দক্ষিণে নিম্নভূমিতে থাকায় সে আমাদের দেখিতে পায় নাই বোধ হইল। নিকটবর্তী হইলে সে আমার পায়ের শব্দে চমকিয়া মুখ ঘুরাইল। তাহার পর ধমক দিয়া বলিল, হেই ব্যাবু! ইদার মাত্‌ আও! গো অ্যাওয়ে! সে ইঙ্গিতে স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। সম্ভবত গোরা সাহেবটি হাঁস মারিতে আসিয়াছে! তবু আমি তাহার দিক যাইতেছি দেখিয়া সে বন্দুক তাক করিয়া বলিল, ইউ ড্যাম নেটিভ কুত্তা! ভাগো! সহাস্যে দ্রুত বলিলাম, স্যার! আই মে হেল্প ইউ টু ফাইন্ড্‌ আউট এ প্লেস হোয়্যার ইউ উইল সি থাউজ্যাণ্ড্‌স অ্যান্ড থাউজ্যাণ্ড্‌স্‌ অফ্‌ ওয়াইল্ড ডাক। গোরা শিকারী বন্দুক নামাইল। চকিতদৃষ্টে চতুর্দিকে দেখিয়া লইলাম। উঁচু চরটির উত্তব-পূর্বাংশ ঢালু হইয়া পরিব্যাপ্ত কালো জলে মিশিয়াছে। দূরে কয়েকটি নৌকা। পশ্চিমেও জল — কিন্তু উহা দিনশেষের ম্রিয়মাণ আলোকে ঈষৎ রঞ্জিত। দক্ষিণে দূরে উঁচু জনহীন। দক্ষিণ-পূর্বে আরও দূরে কৃষ্ণপুর দিগন্তরেখার সহিত মিশ্রিত। গোরাসাহেব উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ডোন্ট মাইন্ড ব্যাবু! আই অ্যাম ড্যাম টায়ার্ড। লেট্‌স্‌ গো দেয়ার। ও মাই গড! সে বন্দুক তুলিবার পূর্বেই ভূতলশায়ী হইল। তাহার বুকে মাত্র একহাত দূর হইতে পিস্তল-এর গুলি গিয়া ঢুকিয়াছিল। তাহার তলপেটে একটি পা দাবাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িলাম। দ্বিতীয় গুলি তাহার কপাল ফুটা করিল। বন্দুকটির জন্য লোভ সম্বরণ করিলাম। পুনর্বার চাবদিক চকিতদৃষ্টে দেখিয়া লইয়া ধীরে গম্ভীর শরীরে পাহ্‌লোয়ানের নিকট ফিরিলাম। দেখিলাম, উহার দার্শনিক সত্তা লোপ পাইয়া পুনরায় চতুষ্পদ বাহনে পরিণত হইয়াছে। পাড়ে উঠিয়া একটু ভাবনা হইল। পাহ্‌লোয়ানের খুর এবং আমার জুতার ছাপ ফেলিয়া আসিলাম! তবে হরিবাবু এবং স্বাধীনবালার কাছে সগৌরবে এবং সবিস্তারে বর্ণনার যোগ্য একটি কীর্তি বটে! পাড় হইতে কিছুদূর শস্যশূন্য জমি এবং ঝোপঝাড়ের পর কাঁচা রাস্তায় পৌঁছাইয়া ভাবিলাম, রত্নময়ীকে ঘটনাটি বলিব কি? তৎক্ষণাৎ মনে হইল, কিন্তু কেন এই কদর্য কর্মটি কবিলাম? মুন্সিজির সেই উক্তির উপযুক্ত প্রত্যুত্তরদান হইল কি? স্ট্যানলির পিস্তলে আর চৌদ্দটি কার্তুজ অবশিষ্ট রহিল। যদি গুলি না ছুটিত, গোরা শয়তানটির বন্দুক কাড়িয়া লইতাম সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এ কাজ করিলাম? পাহ্‌লোয়ান! বল্‌ তো ভাই, কেন আবার এই দুর্মতি ঘটিল? পাহ্‌লোয়ান চুপ করিয়া রহিল। তখন বলিলাম, ওই শালা আমাকে নেটিভ কুত্তা বলিযা তাক করিয়াছিল। উত্তরের ফটক দিয়া 'রাজবাড়িতে' ঢুকিলাম। ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে যাইলে রত্নময়ীকে দেখিতে পাইলাম। আবছা আঁধারে ফোয়ারার বৃত্তাকার বেদীতে একা বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সেই সহিস দৌড়াইয়া আসিল। পাহ্‌লোয়ানকে কিছুক্ষণ টহল খাওযাইবার নির্দেশ দিয়া রত্নময়ীর কাছে গেলাম। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আমার প্রিয়তমের দেখা হয় নাই? কিছু তফাতে বসিয়া বলিলাম, একজন গোরা সাহেবকে দেখিয়াছি। নিশ্চয় সে তোমার প্রিয়তম নহে? রত্নময়ী বলিল, বুঝিয়াছি। তুমি মতিগঞ্জের কুঠিয়াল রিজলিকে দেখিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কে? রত্নময়ী বলিল, সে রেশম কারবারী। তাঁতী এবং জোলাদিগকে বেমরশুমে দাদন দেয়। রেশমী থান রেলপথে কলিকাতা চালান করে। বাবার সহিত তাহার খুব বন্ধুতা আছে। আস্তে বলিলাম,

লোকটি কি প্রকৃতির ? রত্নময়ী শুধু বলিল, বাবার বন্ধু ! বুঝিলাম সে কী বলিল ! একটু পবে বলিলাম, বৈকালে শুনিয়াছি, তোমার শরীর খারাপ। বাহির হইলে কেন ? রত্নময়ী আস্তে বলিল, তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। সে কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। বলিলাম, আমি এখনই রওয়ানা হইব। দাওয়াত করিয়াছিলে। দাওয়াত খাইয়াছি। এইবার বিদায় চাহি। রত্নময়ী শ্বাসমিশ্রিত স্বরে বলিল,দাওয়াত শব্দের অর্থ শুধু খাদ্যবিষয়ক নহে। তোমাকে আমার জিনটির সঙ্গে ডুয়েলে লড়িতে ডাকিয়াছিলাম। তুমি বিস্মৃত হইয়াছ দেখিতেছি। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, কোথায় সে ? তাহাকে ডাক। দেখি, লড়িতে পারি নাকি। রত্নময়ী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমার সহিত আইস। দেখাইতেছি। এইসময় প্রাসাদের পার্লারের এদিকে, ফোয়ারার পিছনে আবছা একটি মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। বলিলাম, কে ? মুন্সিজি সাড়া দিয়া বলিলেন, কতদূর ঘুরিলেন ? মনে হইল, লোকটি আড়ালে দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছিল। বলিলাম, বিহারের মাটি দেখিয়া আসিলাম। মুন্সিজি বলিলেন, চরে যান নাই ? বলিলাম, না। ঘোড়া লইয়া যাইবার রাস্তা দেখিলাম না। পার্লারের কড়িকাঠ হইতে একটি ঝাড়বাতি জ্বলিতেছে। সেখানে মুন্সিজি আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন, মা জহরত ! রত্নময়ী বলিল, জী, মুন্সিজির মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, অন্য কিছু বলিবেন। কিন্তু বলিলেন, বেশী চলাফেরা করিও না। বেশী কথাবার্তা বলাও ঠিক নহে। মুন্সিজি কথাটি বলিয়াই চলিয়া গেলেন। হলঘরেও ঝাড়বাতি জ্বলিতেছিল। রত্নময়ী গালিচাঢাকা কাঠের সোপানে বালিকার ন্যায় উঠিতেছিল — চঞ্চল ও দ্রুতগতি। উত্তর-পূর্ব কোণে হরিবাবুর সেই কক্ষের বারান্দায় এক পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ছিল। রত্নময়ী বলিল, দুইখানি চেয়ার পাতিয়া দাও। আর বাবুমহাশয়ের জন্য চা লইয়া আইস। কিছু খাদ্যও আনিবে। আপত্তি করিবার সুযোগ পাইলাম না। রত্নময়ী চেয়ারে বসিয়া বলিল, বস। জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে বসিয়া আমি এবং দাদা পদ্মা দেখিতাম। একটু পরে চাঁদ উঠিবে। সে হাসিল। পুনরায় বলিল, ওইখানে আমার প্রিয়তম জিনটি শাদা ঘোড়ায় আমাকে চড়াইয়া খেলা করে। কী ? চুপ করিয়া রহিলে যে ? তুমি কি আমাকে মিথ্যাবাদিনী ভাবিতেছ ? রত্নময়ীর কথায় তীব্রতা ছিল। বলিলাম, না। তুমি যখন বলিতেছ, তখন উহা সত্য বলিয়া মানিব। রত্নময়ী উষ্ণস্বরে বলিল, আমি কিছু বলিলেই উহা সত্য হয় না। তুমি বলিলেও হয় না। যাহা সত্য, তাহা সত্য। ইংলিশ প্রবচনটি নিশ্চয় অবগত আছ যে 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।' তোমাকে দেখাইতেছি। বলিয়া সে বারান্দা দিয়া ছায়ার ভিতর মুছিয়া গেল। আমাকে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ কবিতে হইবে। মানসিক অস্থিরতা প্রবলতর হইতেছে। চরে পাহ্‌লোয়ান ও আমার পদচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। পদচিহ্নগুলি ষড়যন্ত্রপূর্ণ চাপাস্বরে কথাবার্তা বলিতেছে। পবিচারিকা ইংলিশ খাঞ্চায় (ট্রে) খাদ্য এবং চায়ের সরঞ্জাম বেতের টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল। এই বাড়ির মানুষগুলি পুতুল। কোনও অদৃশ্য হাত ইহাদের চালনা করিতেছে যেন। সেই চালনায় বন্ধ ফটক খুলিয়া যায়। সহিস দৌড়াইয়া আসে। বান্দা-বাঁদীরা হুকুম তামিল করিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করে না। মনে হইল, বাড়িটি একটি কারখানা। কিম্বা এই প্রথম জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশের জন্য এইসব ধারণা হইতেছে। সম্ভবত সকল রাজা-নবাব-জমিদার-বিত্তশালীদের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা এমনভাবে ঘড়ির কাঁটার নিয়মে চালিত হয়। কক্ষের ভিতর শেজবাতি ছিল। তাহার আলোকে বারান্দা ঈষৎ আলোকিত ! কিয়ৎক্ষণের মধ্যে রত্নময়ী আসিয়া কক্ষ হইতে বাতিটি আনিয়া টেবিলে

রাখিল। তাহার হাতে একখণ্ড কাগজ ছিল। বসিয়া বলিল, এই দেখ। ইহাতে সত্য চিত্রিত করিয়াছি। আলোয় কাগজটি ধরিলাম। উহাতে নিম্নরূপ ছক রহিয়াছে।
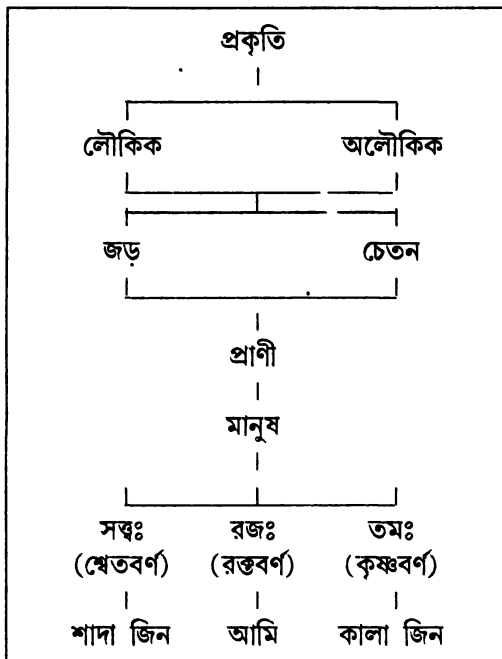
রত্নময়ী গম্ভীরমুখে বলিল, কিছু বুঝিলে? চিন্তা কর। খাইতে খাইতে চিন্তা কর। গভীর মনোযোগের ভান করিয়া বলিলাম, আহার চিন্তার প্রতিকূল। বরং পানীয় — বিশেষত উষ্ণ পানীয় মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করার অনুকূল। রত্নময়ী দ্রুত চা প্রস্তুত করিল। চায়ে চুমুক দিয়া বলিলাম, 'আমি'টা কে? রত্নময়ী শ্বাসমিশ্রিত স্বরে বলিল, আমি উহা দেখিলে আমি! এক্ষণে তুমি দেখিতেছ। সুতরাং তুমি এক্ষণে 'আমি' হইয়াছ। মুখে গাম্ভীর্য রাখিয়া বলিলাম, 'আমি' রক্তবর্ণ কেন? রত্নময়ী চক্রান্তসঙ্কুল অথচ যন্ত্রণাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিল, 'আমি' নিয়ত আক্রান্ত। শরবিদ্ধ। রক্ত ঝরিতেছে। তাহার দিকে চাহিলাম। সে আমার দিকে চাহিয়া আছে। চক্ষুদ্বয়ে নিঃশব্দ অশ্রুজনিত সিক্ততা। বিস্মিত হুইয়া বলিলাম, তুমি কাঁদিতেছ কেন রত্নময়ী? (বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নবেলের প্রসিদ্ধ উক্তিটির প্রতিধ্বনি করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু তৎকালে উহা স্মরণ ছিল না)। রত্নময়ী বলিল, কেহ আমাকে উদ্ধার করার নাই বলিয়া কাঁদিতেছি! ভাবিয়াছিলাম — সে চুপ করিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, কী ভাবিয়াছিলে? এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তখন বলিলাম, তুমি বিত্তবান ব্যক্তির কন্যা। কেন-না-কেহ একদিন তোমাকে বিবাহ করিবে। বিত্ত-ঐশ্বর্য এমন বস্তু, যাহা জাতিপাতজনিত সংস্কার পদদলিত করিয়া থাকে। ডোজ বেশ কড়া হইয়া ছিল। আমি ঠিক ইহাই চাহিয়াছিলাম। রত্নময়ী সহ্য করিতে পারিল না। হুংকার ছাড়িয়া বেতের টেবিলটি উল্টাইয়া দিল। সুদৃশ্য বাতি এবং চীনামাটির সুন্দর পাত্রগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। অন্ধকারে উহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে ঝড় বহিতেছিল। তাহার পর সে

মূর্ছিতা হইল। চেয়ার উল্টাইয়া মুহূর্তে উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। বিস্ময়ের কথা, এই বাড়ির অদৃশ্য জাদুকরের হাতের খেলা এমনই নিপুণ যে তৎক্ষণাৎ লণ্ঠন হাতে পরিচাক পরিচারিকারা আসিয়া পড়িল। উহারা কি সতত এই জিনগ্রস্ত রাজকন্যাটির গতিবিধির প্রতি নজর রাখিয়া আড়ালে ওত পাতিয়া থাকে? উহাদের হাতে কম্পিত শীর্ণ যুবতীদেহটি অর্পণ করিয়া দ্রুত চলিয়া আসিলাম। হলঘরে নামিলে মুন্সিজির সহিত দেখা হইল। বলিলাম, আমি এখনই রওনা দিতেছি। আসুন, পাহ্‌লোয়ানের আস্তাবল দেখাইয়া দিন। মুন্সিজি বিলম্ব করিলেন না! বুঝিলাম, তিনি এই অবাঞ্ছিত আপদবিদায়ের জন্য ব্যগ্র ছিলেন।..."

'Stand out of my way you are blocking the sun.'
–Diogenes to Alexander, the Great.

একদিন 'হাজারিলালে'র কুটিরে যাবার সময় বিজয়পল্লীর পাশে বাঁধের কিনারায় একটি প্রকাণ্ড ছাতিমগাছের তলায় ভিড় দেখলাম। ভিড়ের কারণ একজন সাধু কিংবা ফকির। মাথায় জটা আছে। কিন্তু পরনে কালো আলখেল্লা। গলায় মোটা-সোটা লাল পাথরের মালা। হাতে একটি প্রকাণ্ড লোহার চিমটে। চিমটের ডগায় তামার আংটা। সে চিমটেটি বুকে ঠুকছে। ঝুন-ঝুন শব্দ হচ্ছে। বাঁকা সর্দার এবং আরও কিছু লোক সামনে বসে আছে। বাঁকা গাঁজা ডলছিল। একটু পরে বুঝলাম, সাধু নয়, মুসলমান ফকির। একে লোকে মস্তানবাবা বলে। সে চোখ বুজে বিড়-বিড় করে দুর্বোধ্য কিছু আওয়াচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলাম। 'হাজারিলাল' কুটিরে নেই। পাহ্‌লোয়ানের চালাঘর খালি। এদিক-ওদিক খুঁজে দেখি, একটু দূরে জলার ধারে পাহ্‌লোয়ান ফাঁড়িঘাস চিবুচ্ছে। পেছনের পা-দুটি যথারীতি বাঁধা। সে লাফ দিয়ে চলাফেরা করে এবং পছন্দসই ঘাস বেছে খায়। কিছুক্ষণ বাঁশের মাচানে একা চুপচাপ বসে কাটালাম। সারাক্ষণ অস্বস্তি। পদ্মার চরে চিহ্ন রেখে এসেছিলাম। পরদিন বিকেলে কালবোশেখির ঝড়বৃষ্টিতে সেগুলি ধুয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগে যদি ধূর্ত কোনো দারোগার চোখে পড়ে থাকে? একটি কালো ঘোড়া এবং তার সওয়ার কৃষ্ণপুরের অসংখ্য ঘোড়া সওয়ারদের মধ্যে যদি মিশে গিয়ে না থাকে? মাচান থেকে নেমেছি, টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। অগত্যা কুটিরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি থামলে জুতো খুলে ধুতি গুটিয়ে ফিরে চললাম। বিজয়পল্লীর সামনে গিয়ে দেখি সেই মস্তানবাবা একা দাঁড়িয়ে ভিজছে। আমাকে দেখামাত্র সে কালো আলখেল্লা দুদিকে সরিয়ে নিজের নগ্ন শরীর দেখাল। থমকে দাঁড়ালাম। লোকটির শরীর ঘন লোমে ঢাকা। কিন্তু চামড়ার রঙ ফ্যাকাসে, শাদা। মুখের রঙের সঙ্গে কোনো মিল নেই। খাড়া নাক। লাল চোখ! পুরু কাঁচাপাকা ভুরু। মুখে শিশুর হাসি। সে খি খি করে হাসছিল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কী দেখলি? জবাব না দিয়ে চলে আসছি, বাঁধের উলটোদিকের একটি ঘরের দাওয়া থেকে একটি লোক একগাল হেসে বলল, বড্ড খারাপ স্বভাব মশাই! কাউকে মানে না। সব্বাইকে ওইরকম! বাঁকার জন্য ওর রক্ষে। নৈলে কবে মেরে তাড়িয়ে দিত। সে কথা বলতে-বলতে আমার সঙ্গ নিল। মাথা থেকে পিঠ ঢেকে পেছনে হাঁটু অব্দি লম্বা তালপাতার একরকম আচ্ছাদন তার। কোটরের মতো দেখতে এই আচ্ছাদনের স্থানীয় নাম 'টাপোর।' বর্ষায় চাষীরা কেউ মাথাল, কেউ তালপাতার এই টাপোর পরে মাঠের কাজ করে। লোকটি বলতে-বলতে চলল, পয়সার ওপর কিছু লোভ নেই। খাওয়াদাওয়াতেও

তেমনি। কেউ দিল খেল, নয়তো না। তবে সিদ্ধপুরুষ বলে মনে হয়, জানেন? ছেলেপুলেদের খুব ভালোবাসে। সে হাসতে লাগল। ভালোও বাসে, আবার ওই দুষ্টুমিও আছে। বুঝলেন? যদি বলে, ও মস্তানবাবা, হিসি করোদিকিনি, দেখি! অমনি হিসি করে দেখাবে। অবশ্যি সাধুফকির-সিদ্ধপুরুষরা ওইরকমই হয়। — দেবনারাণয়দার স্বর্গরাজ্যের অবস্থা দিনে-দিনে এভাবে বদলে যাচ্ছে তাহলে। সেদিনই ওঁকে মস্তানবাবার কথাটা বললাম। একটু চুপ করে থেকে বললেন, লোকটিকে দেখেছি। একদিন সন্ধ্যার প্রার্থনাসভা থেকে চোখ পড়ল, একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রহ্মকীর্তনের সময় বুকে চিমটে ঠুকে তাল দিতে-দিতে নাচতে লাগল। কীর্তন শেষ হল। তখন ও গান গেয়ে উঠল। গলাটা গাঁজা খেয়ে নষ্ট করেছে। কিন্তু সুরেলা। সত্যি বলতে কী, সমস্ত সভা স্তব্ধ, নিস্পন্দ। তুমি কোথায় ছিলে জানি না। ছিলে কি? বললাম, নিশ্চয় ছিলাম না। তাহলে শুনতে পেতাম। দেবনারায়ণদা বললেন, একখানা মারফতি গান গাইল। মনে হল, জীবাত্মা-পরমাত্মার কথাই বলছে। গানের বাণীটি শোনো। পরে লিখে নিয়েছি! বলে তিনি একটি ডায়রিবই খুলে পড়ে শোনালেন ঃ

সবে বলে আল্লা-আল্লা আমি জানি দুই।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লা মিছা জানি মুই॥
একদেশেতে দুজন রাজা
কেউ কারুরো নয়কো প্রজা
আরশে প্রেমের খেলা বুঝলি না গো তুই॥

দেবনারাণয়দা বললেন, ফকিরদের মধ্যে অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সবরকম আছে দেখেছি? এ একটি গভীর গবেষণা আর চিন্তার বিষয়। বহু বছর আগে আরেকজন মারফতি ফকিরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে এমন পাগলাটে প্রকৃতির নয়। গম্ভীর লোক। তার একখানি গান লেখা আছে।

যার আকার নাই তার খুঁজলে কী পাই বল আমারে।
নিরাকার নিরঞ্জন সে ভাই শুনি সর্বশাস্তরে॥
কী দেখে নাম প্রচার হয়
যার নাই কিছু তাহার পিছু কী হবে দোড়ে-দোড়ে॥

দেবনারায়ণদাব কাছে যাওয়া ভুল হয়েছিল। হাতে পেলে সহজে নিষ্কৃতি দেন না। এবার তিনি গুনগুন করে ব্রহ্মসঙ্গীতে গাইতে শুরু করলেন। শাস্ত্রীজি এসে উদ্ধার করলেন। ডাকঘরে গিয়েছিলেন। আশ্রমের চিঠি-পত্রিকার বোঝা বয়ে এনেছেন। বাইরে ভিজে ছাতি রেখে বললেন, বছরের লক্ষণ ভালো বোধ হচ্ছে না। দেবনারায়ণদা চিঠি-পত্রিকার বান্ডিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে বেরিয়ে গেলাম। লাইব্রেরি-ঘরে স্বাধীন জানালার পাশে বসে খুব মন দিয়ে কী বই পড়ছিল। মুখ তুলে একটু হাসল। বললাম, হাসছ কেন? স্বাধীন বলল, কানে আসছিল দেবুজ্যাঠা তোমাকে গান শেখাচ্ছেন! বললাম, না—না—মস্তানবাবা! স্বাধীন ভুরু কুঁচকে বলল, মস্তানবাবা? তারপর হেসে উঠল। ও, বুঝেছি! লোকটা ভারি অদ্ভুত জান? সেদিন ব্রহ্মমন্দিরে গেটের সামনে দেখি, মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, কী দেখছ অমন করে? বলে কী — বেটি! বাবুকে শিগগির বল্ গিয়ে, এত বড়ো দরজা করেছে, এক্ষুণি বন্ধ করে দিক। নৈলে এখান দিয়ে মন্দির-টন্দির সব পালিয়ে যাবে। চমকে উঠে বললাম, কী আশ্চর্য! স্বাধীন বলল, আশ্চর্য মানে?

বললাম, তোমাকে দেখাচ্ছি। আলমারি থেকে বাঁধানো প্রকাণ্ড একটি বই বের করলাম। ব্যস্তভাবে খুঁজতে থাকলাম। স্বাধীন কয়েকবার প্রশ্ন করে তাকিয়ে রইল। বহুক্ষণ পরে পাতাটি খুঁজে পেলাম। বললাম, সমাচারদর্পণ পত্রিকার এই পাতাটি পড়ে দেখো। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর শনিবারের সংখ্যায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'দৈঅজিনিস' সম্পর্কে কী লেখা আছে দেখো। তুমিও অবাক হয়ে যাবে। স্বাধীন বাঁধানো পত্রিকাবইটি নিয়ে পড়তে থাকল। বললাম, দিও-জেনিস। ইংরেজিতে 'সিনিসিজম' প্রসঙ্গে তাঁর কথা পড়েছি। তিনিই নাকি আলেকজান্দারকে বলেছিলেন, 'সরে দাঁড়াও ! রোদ আড়াল কোরো না।' স্বাধীন বিরক্ত হয়ে বলল, পণ্ডিতি ছাড়ো। পড়তে দাও ! একটু পরে সে উত্তেজিতভাবে বলল, শোনো, শোনো !

'ঐ দৈঅজিনিস এক দিন এক ক্ষুদ্র শহরের উচ্চ প্রাচীর
ও অতি উচ্চ তাহার দ্বার দেখিয়া শহরের
কর্তারদিগকে কহিল যে তোমরা দ্বার বন্ধ কর নতুবা
শহর পলাইয়া যাইবে।'—

এর কিছুদিন পরে স্বাধীনকে জিগ্যেস করলাম, কী খুকু ? গোপনে জ্ঞানী মস্তানবাবার দীক্ষা নিলে নাকি ? স্বাধীন খাপ্পা হয়ে বলল, লোকটা অসভ্য। পাগল। ছিঃ ! হেসে ফেললাম। বুঝলাম 'বেটিকে' কী দেখিয়েছে সে।

কাহারও শিরচ্ছেদ করা হত্যা নহে ; একটি উপাদানকে
অপর একটি উপাদানে পরিবর্তিত করা মাত্র

—পকুধ কচ্চায়ন (দীঘনিকায়)

আশ্রমের তন্তুবার সমিতির ম্যানেজার বসন্তবাবুকে পছন্দ করি না, জানেন। তবু গায়েপড়া স্বভাব ! এ ধরনের লোকেরা সচরাচর ছিদ্রান্বেষী হন ! সবখানে খুঁত খুঁজে পান এবং অপরকে সেটি দেখিয়ে দিতে ছটফট করে বেড়ান। গায়েপড়া স্বভাবের কারণ হয়তো এটাই। জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা খুঁতযুক্ত আমিও মানি। প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্তও হই। কিন্তু আমি বসন্তবাবু নই। কিছুদিন আগে তিনি একটি আশ্চর্য খুঁতের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটি সুতোকাটুনি করুণা ওরফে ইকরাতনের মধ্যাঙ্গ। সেখানে স্ফীতি ছিল। বসন্তবাবু বহু আগেই ওই ওই স্ত্রীলোকটিকে 'ব্যাড ক্যারেকটার' ছাপ সেঁটে দিয়েছিলেন। এবার বলেন, ম্যাথামেটিকস শফিবাবু ! ২+২ = ৪ হওয়া অনিবার্য। বর্ষার এক সন্ধ্যায় বসন্তবাবু আমাকে জানান, খুঁতটি মেরামত করা হয়েছে। গর্ভবতী সুতোকাটুনি দেবনারায়ণদার হুকুমে স্বর্গলোক থেকে নির্বাসিত এবং বিজয়পল্লীতে আশ্রয় নিয়েছে। দেবনারায়ণদার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামব কি না ভাবছিলাম। কিন্তু তাঁর নীতিবাদ, জেদ আর খেয়ালের কথা জানি। আমিও নিজের স্বভাব সম্পর্কে সচেতন। নানা কারণে এখন আমার এই সুদৃঢ় আশ্রয় প্রয়োজন। তাই চুপ করে থাকলাম। বসন্তবাবু মাঝে-মাঝে গায়ে পড়ে জানিয়ে যেতেন বাঁকাসর্দার একটি হবু-রক্ষিতা লাভ করেছে। স্ত্রীলোকটিকে সে একটি কুটির গড়ে দিয়েছে। তখনও বিষয়টির গভীরতা আর রহস্য আঁচ করিনি। শ্রাবণ মাসে হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। আকাশ ভয়ংকর নীল হয়ে উঠল। ওই সময় পাঁচ কোঁশ দূরে রায়দীঘি গ্রামের পুলিশের থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন হরিবাবু। দারোগা চন্দ্রনাথ হাটি এবং জমাদার ফারাকত খাঁ এই দুজন ছিল লক্ষ্যবস্তু। স্ট্যানলি হত্যার পর সারা মহকুমায় বহু নির্দোষ লোককে বিকলাঙ্গ করা হয়েছিল। তার সঙ্গে এই দুই বীরপুঙ্গবও জড়িত ছিল। আমরা রাত্রে রওনা হব। বিকেলে ভ্রমণের ছলে

কেশবপল্লীতে হরিবাবুর কাছে যাচ্ছিলাম। বিজয়পল্লীর সামনে ছাতিমগাছটির তলায় প্রায়ই মস্তানবাবাকে ঘিরে ভিড় থাকত। এদিন একটি দৃশ্য দেখে থমকে গেলাম। মস্তানবাবা হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে। তার সামনে দুহাতে ন্যাকড়ায় জড়ানো একটি শিশু নিয়ে একটি স্ত্রীলোক বসে আছে, সে করুণা নয়। কারণ করুণা তার পাশে। মস্তানবাবা চোখ বুজে বিড়বিড় করছিল। হঠাৎ ঝুঁকে শিশুটির বুকে জোরে ফুঁ দিয়ে বলল, যা। এবার স্ত্রীলোক দুটি উঠে দাঁড়াল। করুণার কোলে শিশুটিকে অপর স্ত্রীলোকটি তুলে দেওয়ামাত্র চিনতে পারলাম। অজিফামামী। ইচ্ছে হল,চিৎকার করে বলি, ভুল ! মিথ্যা ! অসম্ভব ! কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। দ্রুত স্থানত্যাগ করলাম। স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব সত্যই বিচিত্র ! 'হাজারিলাল' আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ? অসুখ করেনি তো ? বললাম, না। খবর জানতে এলাম। হরিবাবু চাপাস্বরে বললেন, আমাদের মধ্যে চর ঢুকেছে সন্দেহ হয়। খবর এসেছে, গতকাল রাত্রে রায়দীঘি থানায় একজন গোরা সার্কেল অফিসার পঞ্চাশ-ষাটজন সিপাহি নিয়ে শিবির করছে। কাজেই পরিকল্পনা স্থগিত। সংঘের সদস্যদের আপাতত কয়েকদিন স্থানান্তরে আত্মগোপন করার নির্দেশ দিয়েছি। আমি এইমাত্র স্বাধীনকে দিয়ে তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছি। রাস্তায় দেখা হয়নি ? বললাম, না তো ! হরিবাবু বললেন, তাহলে মাঠের রাস্তায় গেছে। তুমি এখানে থেকো না ! আমি কয়েকদিন বিলের জঙ্গলে কাটাব। আর শোনো, তোমার ঘোড়াটির ব্যবস্থা করা দরকার। তুমি আশ্রমে আছ। দেববাবু তোমার পৃষ্ঠরক্ষা করবেন। কিন্তু ঘোড়াটি তোমার-আমার সংযোগসূত্র। বরং ওকে নিয়ে গিয়ে শিগগির বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। একটু ভেবে বললাম, দেবনারায়ণদার কেন জানি না, ঘোড়া সম্পর্কে কিছু কুসংস্কার আছে বলে ধারণা। হরিবাবু হেসে বললেন, ঋগ্বেদের অশ্বসূক্তের কথা উল্লেখ করবে। বললাম, সুধন্যকে যদি মাহিনা দিই, সে পাহ্লোয়ানের দেখাশুনা করবে না ? হরিবাবু চিন্তিতমুখে বললেন, ছোকরা বড়ো অন্যমনস্ক। তবে দেখি, কী করা যায়। বলে উনি হাঁক দিলেন, সুধনিয়া ! হো সুধনিয়া ! সুধন্য তার কুটির থেকে সাড়া দিল। তারপর দৌড়ে এল। 'হাজারিলাল' বললেন, আরে সুধনিয়া ! বাত শুনো। হামি কয় রোজকে লিয়ে আপনা মুল্লুক যাচ্ছে। তু শফিবাবুর ঘোড়ার জিম্মাদারি লে। মাহিনামে তনখা মিলেগা। হামরে দেতে তিন রুপৈয়া। আমার দিকে ইশারা করলে বললাম, পাঁচ টাকা পাবে। 'হাজারিলাল' লাফিয়ে উঠলেন, আরে ব্যাস ! পাঁচ রুপৈয়া ! শালে, তু বড়া আদমি বন্ জায়গা। পাঁ-চ রুপৈয়া ! ঢাই মন চাউলকা দাম ! জয় বজরঙ্গবলী ! সুধন্যের চোখেমুখে উজ্জ্বলতা ঝলমল করছিল। জীবনে কখনও সে পাঁচ টাকা একসঙ্গে দেখেছে কি না সন্দেহ। তাকে অগ্রিম হিসেবে দুইটি রুপোর টাকা দিলে সে স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে দুহাতে গ্রহণ করল। 'হাজারিলাল' চোখ নাচিয়ে বললেন, তব্ তো শফিবাবু হৈয়ে গেল। এ সুধনিয়া ! যা ! উও দেখ্ পাহ্লোয়ানজি ঘাস খাচ্ছে। দোস্তি-উস্তি করতে হোবে তো, না কী ? সুধন্য দৌড়ে বাঁধের নীচে নেমে গেল। এই আদিম পৃথিবীতে ঘোড়াটি ক্রমশ কিছুটা বন্যস্বভাবগ্রস্ত হয়ে উঠছে দিনেদিনে। কিন্তু কিছু করার নেই। মাঝে-মাঝে এসে তাকে সঙ্গ দিই। বাঁধের পথে বহুদূর যাই। লক্ষ করি, কদম ভুল করছে। কখনও অবাধ্যতার লক্ষণ দেখি। মনে হয়, প্রকৃতি ওকে করতল-গত করে ফেলছে। সে একদা আমার সঙ্গে চমৎকার বাক্যালাপ করত। তাকে দার্শনিক বোধ হত। এখন মনে হয়, সে যেন দিওজিনিসে রূপান্তরিত হচ্ছে। স্বাধীনতাময়, সিনিক, উন্মার্গী একটি কালো প্রবাহ।

সভ্যতাকে খুরে ভাঙচুর করতে-করতে সে ছুটতে চায়। আমার মতো ? হ্যাঁ, ঠিক আমার মতো। উদ্দেশ্যহীনতায় আক্রান্ত দুটি প্রাণী। সেদিন ফেরার পথে বিজয়পল্লীতে দেখলাম, মস্তানবাবা বুকে চিমটে ঠুকে ছ্যাতরানো গান করছে। ভিড় করে লোকেরা শুনছে। বাঁদিকে একটি চালাঘরের উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে অজিফা মামী শিশুটির দেহে তেলহলুদ মাখাচ্ছে। স্বর্গভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটি উঠোনের উনুনে পাতা ঠেলে জ্বাল দিতে-দিতে মুখ ঘুরিয়ে শিশুটিকে দেখছে এবং তার মুখে কী এক হাসি। তখনই সিদ্ধান্ত করলাম, শিশুটি বধযোগ্য। হত্যা কী ? একটি উপাদানকে ভিন্ন উপাদানে পরিবর্তিত করা মাত্র ! প্রকৃতিতে ইহা সতত ঘটিতেছে। সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মের অভিব্যক্তি। 'স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তম।' লাইব্রেরিতে ঢুকে বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দীঘনিকায়' খুলে বসলাম। স্বাধীন লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল। ফিরে এসে আস্তে বলল, হরিদা খবর পাঠিয়েছেন — তাকে থামিয়ে বললাম, জানি। হরিবাবুর কাছ থেকে এখনই আসছি। স্বাধীন বলল, কী বই পড়ছ ? বললাম, শোনো !

> 'মহারাজ ! যে করে এবং করায়, যে ছেদন করে এবং ছেদন করায়, যে অঙ্গহীন করে এবং অঙ্গহীন করায়, যে শোক ও নির্য্যাতনের কারণ হয়, যে কম্পিত হয় এবং কম্পিত করায়, যে প্রাণনাশ করে, যে সন্ধি ছিন্ন করে, যে অদত্ত গ্রহণ করে, যে লুণ্ঠন করে, যে চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, গুপ্ত স্থান হইতে যে হঠাৎ পথচারীকে আক্রমণ করে, যে পরদারগমন করে, মিথ্যাভাষণ করে, তাহার এইসকল কর্ম্মছাড়া পাপ হয় না। যদি কেহ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা পৃথিবীর প্রাণীগণকে এক মাংসখণ্ডে, এক মাংস-পুঞ্জে পরিণত করে, তজ্জন্য কোন পাপ হয় না, পাপের আগম হয় না। যদি ওই ব্যক্তি আঘাত করিতে২ ছেদন করিতে২ হত্যা করিতে২ ছেদন করাইতে২ অঙ্গহীন করাইতে২ গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পাপ হইবে না, পাপের আগম হইবে না।'—

স্বাধীন শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলল, এসব কার উক্তি ? বললাম, অক্রিয়াবাদী দার্শনিক পূরণ কসসপের। তিনি বুদ্ধ ও মহাবীরের সমকালের লোক। স্বাধীন বলল, কী ভয়ানক কথা ! বললাম, খুকু ! তুমি একদিন স্ট্যানলিকে হত্যার জন্য আমাকে পিস্তল দিয়েছিলে। অবশ্য সে তোমার পিতৃঘাতী ছিল। কিন্তু হরিবাবু এবং আমি তাকে হত্যা করেছিলাম। স্ট্যানলির স্ত্রীপুত্রকন্যার দিক থেকে চিন্তা করো। তাদের মর্মযাতনার কথা ভাবো। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হয়েছে, 'অস্মিতা' অর্থাৎ আমি-ভাব যাবতীয় ক্লেশের অন্যতম প্রধান কারণ। বৌদ্ধ মিলিন্দপঞ্হ গ্রন্থে সে-জন্যই হয়তো বলা হয়েছে, 'পুগ্‌গলো নূপলব্‌ভতি।' পুদ্‌গল অর্থাৎ আত্মা নেই। স্বাধীন রুক্ষ স্বরে বলল, চুপ করো ! পণ্ডিতি অসহ্য লাগে। বুঝলাম, স্বাধীন এই মুহূর্তে আমাকে চিনতে পারল। তাব চোখে ভীতি এবং মুখে পাণ্ডুরতা ছিল। সে সশব্দে শ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বইটি বন্ধ করে বসে রইলাম। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা শুরু হয়েছে। দেবনারায়ণদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। কানে এল, 'আত্মানং বিদ্ধি।' মনে পড়ল পিতার শাস্ত্রীয় ভাষণে মুসলমানদেব পয়গম্বরের উক্তির বজ্র-প্রতিধ্বনি, 'যে নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহকে চিনেছে।' আর গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসও বলেছিলেন, 'নিজেকে জানো !' কিন্তু কে আমি ? কিছু আকস্মিক ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একটি চেতনামাত্র। আমার পুদ্‌গল নেই। পদ্মার চরে পাহ্‌লোয়ান

বলেছিল, 'আমি নিমিত্ত মাত্র।' মধ্যরাত্রে বেরিয়ে পড়লাম। বিজয়পল্লীতে একটি একদিকখোলা চালাঘরে বধ্য ক্ষুদ্র মাংসপুঞ্জ অপর একটি বৃহৎ মাংসপুঞ্জের সংলগ্ন হয়ে জৈবিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মে যথাক্রমে নিদ্রিত এবং ভূতলস্থিত। এবার আর-একটি জৈবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রিয়াশীল হতে চলেছে। কিন্তু চালাঘরটির কাছে যেতেই আরও একটি জৈবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রিয়াশীল হল। একটি অস্পষ্ট হুংকার, পায়ের শব্দ, অন্ধকারের কালো একটি জীব, ঝুনঝুন কোমল ধ্বনিপুঞ্জ, আবার হুংকার। ঘুরে দেখি, মস্তানবাবা! ঝোপঝাড় ভেঙে নেমে গেলাম। ধানখেতে জলকাদা এবং সকল আদিম ব্যাপকতার আঠালো পিচ্ছিল স্তরগুলি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে-নিতে পিছনে আবার হুংকার ' তৎক্ষণাৎ জানিলাম, ক্ষুদ্র ওই মাংসপুঞ্জ আমার বধ্য নহে।...

Then the sluices of th.; sky opened
and
everything human was transformed
into mud...

–Epic of Gilgamesh.

এক বৃষ্টির দিনে বারান্দায় শাস্ত্রীজির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দেববাবু! এ কী শুরু হল? যেন আকাশ ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। অন্য কেউ বললেন, ছ্যাঁদা কী বলছেন শাস্ত্রীজি? বলুন, আকাশের দরজা খুলে দিয়েছেন ঈশ্বর। ঘরের দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখি, প্রভাসরঞ্জনবাবু। দুজনে ছাতি রেখে বৃষ্টি দেখছেন। প্রভাসরঞ্জন একজন আশ্রমিক। শুনেছি প্রচুর জমি দেবনারায়ণদাকে দেওয়া ঋণবাবদ শুধু সুদের হিসেব দেখিয়ে হাতাতে পেরেছেন। ওঁকে দেখলেই মস্তানবাবা অথবা দিওজেনিসের উক্তি মনে পড়ে যায়, ব্রহ্মমন্দিরের দরজা দিয়ে একদা ঠিকই মন্দির পালিয়ে যাবে। অথচ দেবনারায়ণদার পেয়ারের লোক। আরও শুনেছি প্রভাসরঞ্জনের বড়ো ছেলে নরেশরঞ্জন-এর সঙ্গে স্বাধীনবালার বিয়ের একটা প্রস্তাব উঠেছে। স্বাধীনের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বলার কথা থাকতে পারে না। কিন্তু বৃষ্টির দিনে প্রভাসরঞ্জনকে দেখে মনে হল, স্বাধীনকে আমার কিছু বলা উচিত। নরেশকে আমি বাঁকাসর্দারের সঙ্গে গাঁজার ছিলিম টানতে দেখেছিলাম।

সারা ভাদ্র মাস শুকনো গেছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি এই বৃষ্টি শুরু। শুধু বৃষ্টি নয়, ঝড়ও। ঘরে চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ মনে হল, পাহ্‌লোয়ান কী অবস্থায় আছে? ছাতি নিয়ে এই দুর্যোগে আধক্রোশ দূরত্ব পেরুনো কতখানি কষ্টসাধ্য হবে, হিসেব করতে থাকলাম। সেই সময় দেবনাবায়ণদার ঘরে তর্কাতর্কি বেধেছে কানে এল। শাস্ত্রীজির মতে, আকাশ মহাশূন্য নিরবয়ব, পদার্থহীন সত্তা। অতএব আকাশ ছ্যাঁদা হওয়া বা দরজা খুলে দেওয়া নিছক আলঙ্কারিক প্রয়োগ। প্রভাসরঞ্জন বলেছেন, আমরা আধুনিক যুগে এরূপ ব্যাখ্যা করছি মোক্ষমুলর মহোদয়ও বৈদিক ঋক্‌গুলিনের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তৎকালে লোকদিগের ওইরূপ বিশ্বাস ছিল। দেবনারায়ণদা বললেন, মহাভারতে মহাপ্লাবনের বৃত্তান্ত মনে পড়ে কি? 'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্...' কেশব মীনশরীর ধারণ করে বেদ রক্ষা করেন। প্রভাসরঞ্জন বললেন, এরূপ মহাপ্লাবনের গল্প গ্রিস, সুমের সর্বত্র গ্রন্থাদিতে আছে। শাস্ত্রীজি বললেন, বাইবেল এবং কোরান গ্রন্থেও আছে। এগুলির রূপক। গীতার উক্তি স্মরণ করুন, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ...'

বাইরে দুর্যোগ। আর এই বিদ্বান লোকগুলি তত্ত্ব আলোচনা করছেন। ক্রমে-ক্রমে ছাতি মাথায় আরও আশ্রমিকগণ আসছেন আচার্যের ঘরে। তত্ত্ব আলোচনা আরও জমে উঠছে। কে হেঁড়ে গলায় বলে উঠলেন, শুনেছি সুনয়নী দেবী উৎকৃষ্ট খিচুড়ি রান্না করতে পারেন। খবর দেওয়া হোক ওঁকে। অপর একজন বললেন, খবর নিয়েই আসছি রন্ধনশালা থেকে। হইচই পড়ে গেল। এইসময় শৈশবে শোনা নিরক্ষর চাষাভুষো লোকেদের একটা ছড়া মনে পড়ল :

তিনদিনকার গাজলে
মহিষ মরে হিজলে
টিকটিকিরা বাতায়
উকুন মরে মাথায়
মানুষ মরে খালে
গুধা মায়ের কোলে...

দেবনারায়ণদার গলা শোনা গেল, খনার বচনে কী আছে যেন ? মঙ্গলে পাঁচ/ শনিতে সাত/ বুধে তিন/ আর সব দিন-দিন। কী বারে লেগেছে হে ভবেশ ? ভবেশ বললেন, বুধবার। দেবনারায়ণদা বললেন, ধুস ! আজ তো তিনদিন হল। থামবার লক্ষণ কোথায় ? প্রভাসরঞ্জন অট্টহাসি হেসে বললেন, বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে, পরমেশ্বর পাপের শাস্তি দিতে নেচারকে লেলিয়ে দেন। ব্রহ্মপুরে স্বামীজী সংঘ এবার দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে না ? কেউ বললেন, শিবনাথপল্লীর সেই এঁড়ে চকোতি শুনলাম বারোয়ারি পূজা দেবে। দেববাবু স্পর্ধা মার্জনা করবেন। স্বহস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন। দেবনারাণয়দা বললেন, আমি নিরুপায় মধুবাবু ! আশ্রমবাসীদের মধ্যে বিস্তর অ-ব্রাহ্ম আছেন। তাঁদের পরিবারবর্গ আছে। হুজ্জত হোক, পুলিশের দারোগার বুটজুতো আশ্রমের পবিত্র মাটি কলঙ্কিত করুক, এ আমার অভিপ্রেত নয়। প্রভাসরঞ্জন ঘোষণা করলেন, ওয়েট অ্যানড সি। পরমেশ্বর পাপীদিগের শাস্তি স্বহস্তে দেবেন।

পাহ্‌লোয়ানের জন্য আমি অস্থির। ছাতি মাথায় নেমে আশ্রমসীমানা পেরিয়ে যাওয়া মাত্র দমকা বাতাসে ছাতি উলটে গেল। বৃষ্টিও গেল বেড়ে। একটি গাছের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু প্রচণ্ড শব্দে কোথায় বাজ পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে কুঁজো হয়ে দৌড়ুনোর চেষ্টা করে আশ্রমে ফিরে এলাম। ওলটানো ছাতি ঠিকঠাক করে ঘরে ঢুকে ভিজে জামাকাপড় বদলে নিলাম। অস্থির মনে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে দেখি, স্বাধীন চুপচাপ একা বসে আছে। আমাকে দেখে কেমন একটু হাসল। বলল, তোমার দুর্দশা আগাগোড়া দেখলাম ! কোথায় যাচ্ছিলে ? বললাম, পাহ্‌লোয়ানের অবস্থা দেখতে। স্বাধীন বলল, সে তো বাঁধের ওপর হরিদার তৈরি আস্তাবলে আছে। সুধন্য আছে। তার জন্য ভাবনা কিসের ? যার জন্য ভাবনা হওয়া উচিত, তার কথা তোমার মনে পড়ল না ? সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল, হরিবাবু নাবাল অঞ্চলে জঙ্গলের ভেতর এখনও কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছেন। বললাম, তাই তো ! স্বাধীন মৃদুস্বরে বলল, ক্লাবে খবর দেওয়া দরকার। কিছু ছেলে ফিরে এসেছে দেখেছি। তাদের হরিদার খবর নেওয়া উচিত। একটু ভেবে বললাম, হরিবাবু নির্বোধ নন। স্বাধীন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কে জানে ! যদি বাঁধ ভেঙে যায় ?

আমি কী মানুষ ! স্বাধীনের হরিবাবুর জন্য দুর্ভাবনাকে প্রেম ভেবে ঈর্ষায় জ্বলে উঠলাম। সে বলেছিল, তার হৃদয়ে পুরুষপ্রেম নেই। তাহলে এ কী ? পরমুহূর্তে

মনে পড়ল, ও ! আমার পুদ্‌গল নেই। তাই আমারও হৃদয় এবং প্রেম নেই। তাহলে ঈর্ষা নিরর্থক।

স্বাধীন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, তোমার ছাতিটা এনে দাও। বললাম, কুটিরে যাবে ? সে শক্ত মুখে বলল, না। ক্লাবে। দেখি, যদি ওরা কিছু করে।

আমার আত্মা নেই। তাকে ছাতিটা এনে দিলাম। আত্মা না থাকায় 'শিভালরি'ও আমার কাছে নঞর্থক। শুধু বললাম, দেখো, ছাতি উলটে না যায়। স্বাধীন ছাতির আড়ালে আত্মগোপন করে হাঁটতে থাকল। এই সময় দেবনারায়ণদার ঘরের সামনে কে এসে চিৎকার করে বলল, শঙ্খিনীর ধারে নতুন বাঁধ ভেঙে গেছে। আবাদ ভেসে যাচ্ছে।...

> 'And now we have come to the place, where,
> I toldst thee, thou shouldst see, the wretched
> men and women, who have lost
> the good of their intellect...'
>
> Inferno–Dante.

ও'মালি সায়েবের জেলা গেজেটিয়ারে এই ভয়ংকর প্লাবনের বিবরণ আছে। পদ্মা-ভৈরব-জলঙ্গী-ভাগীরথী-ব্রাহ্মণী-দ্বারকা-ময়ূরাক্ষী, জেলার মূল নদীগুলি তাদের অববাহিকার সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন করেছিল। পুরুষানুক্রমে জেলার লোকে 'বড়বানের বছর' বলে বিভীষিকাটির স্মৃতি বহন করেছে। আর শা' ফরিদ মস্তানবাবা বলেছিলেন, দরজা দিয়ে মন্দির পালিয়ে যাবে। পালিয়ে গিয়েছিল বটে। ব্রহ্মপুরে সেই প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতীদের আগমন এবং একটি মিশনও স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিক্রিয়া সামলাতে পারেনি। দেবনারায়ণ স্বপ্নদর্শী। বস্তুজগতের এই হঠকারী উপদ্রবের প্রতি সচেতন ছিলেন না। ফলে কোনো সেবাদল ছিল না তাঁর। সারা আবাদ মৃতদেহের দুর্গন্ধে ভরে ওঠে। যারা বাঁচতে পেরেছিল, তারা কেউ ছিঁচকে চোর কেউ দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়ে ওঠে। উঁচু এলাকাগুলিতে লুঠপাঠ শুরু করে। বাঁকা সর্দার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রহ্মপুরের ফাঁড়িটি পুরোপুরি থানায় পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেবনারায়ণের হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে এসব পরের কথা। স্বামীজিসংঘের যুবকরা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে ত্রাণে নেমেছিল ! আবাদের বুকে তখন সমুদ্র। একটি নৌকায় উদ্ধারকারী একটি দল জঙ্গলের গাছগুলি থেকে অনেক মানুষকে উদ্ধার করে। সেই নৌকায় স্বাধীনবালা ছিল। সন্ধ্যার মুখে ফেরার সময়। একটি বটগাছ থেকে চিৎকার ভেসে আসে। গাছে শফি ছিল। নৌকায় তাকে ধরাধরি করে নামানো হয়। সে শুধু 'পাহ্‌লোয়ান' কথাটি উচ্চারণ করে অজ্ঞান হয়ে যায়। স্বাধীন বুঝতে পারে সে তার ঘোড়ার খোঁজে বেরিয়ে ভেসে গিয়েছিল। সেবাশুশ্রূষা আর চিকিৎসার পর সে-সুস্থ হয়ে উঠলে একদিন স্বাধীন তাকে হরিনারায়ণের কথা জিগ্যেস করে। শফি একটু হেসে বলে, তিনি একটি কঙ্কাল। স্বাধীন বলে, দেখেছিলে ? শফি বলে, বটগাছের ঝুরিতে আটকে ছিলেন। টেনে গাছে তুলতে গিয়ে বুঝলাম তিনি জড়পদার্থমাত্র। খুকু, ওই বটগাছের তলায় একরাত্রে আমি, হরিবাবু, কালীমোহন, সত্যচরণ—

স্বাধীন দ্রুত সরে যায় তার কাছ থেকে। সে বছর মাঘোৎসব হয়নি। দেবনারায়ণবাবু কলকাতা চলে যান। তারপর থেকে মাঝে-মাঝে আসতেন। খাজনা আদায়ের চেষ্টা করতেন। এক হৃদয়নাথ শাস্ত্রী আশ্রম চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতেন। শফি তার মাসিক বেতন নিয়মিত পেত, এটা আশ্চর্য বটে ! একদিন সুনয়নী

ব্যস্তভাবে এসে শফিকে ডেকে চুপিচুপি বলেন, খুকুর কী হয়েছে, তুমি জানো ? শফি বলে, না তো ! কী হয়েছে মাসিমা ? সুনয়নী কান্নাজড়িত স্বরে বলেন, তুমি এসে দেখে যাও। সুনয়নীর কুটিরে গিয়ে শফি দেখে, স্বাধীন শাদা থান পরে দাঁড়িয়ে আছে। শফী বলে, এ কী খুকু ! স্বাধীন নির্লজ্জ মুখে নির্দ্বিধায় বলে, আমি বিধবা হয়েছি। সুনয়নী তার গালে চড় মারেন। তবু বৃক্ষবৎ ঋজু ও স্থির সেই যুবতী অকপট বলে, আমার স্বামী বানের জলে ভেসে গেছেন। আমি বিধবা হব না কেন ? শফি বলে, খুকু। তুমি বলেছিলে তোমার হৃদয়ে — স্বাধীনবালা তাকে বাধা দিয়ে বলে, প্রেম এবং বিবাহ সম্পর্কহীন। সেই রাত্রে সুনয়নী কন্যাকে ত্যাগ করে চলে যান। কথিত আছে, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদিগের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। এরপর বৈশাখ মাসের এক দুপুরে হৃদয়নাথ শাস্ত্রী ডাকঘর থেকে ফিরে ভীতমুখে বলেন, কাণ্ড দেখো শফি ! দেববাবু দুধ দিয়ে সাপিনী পুষেছিলেন, দেখ। 'জেলা সমাচার' পত্রিকায় বড়ো-বড়ো হরফে খবর : 'পুনরায় কালেক্টর বাহাদুরের উপর আক্রমণ/ পিস্তলসহ যুবতী ধৃত।' শফি তাকিয়ে আছে দেখে শাস্ত্রীজি চাপা স্বরে বলেন, পড়ে দেখো পুরোটা ! স্বাধীনবালার কীর্তি দেখো। শফি, প্রত্যাঘাত আসিতেছে। আশ্রমের পবিত্রভূমি কলুষিত হইবে। আমি বৃদ্ধ। কিন্তু তুমি যুবক। শীঘ্র পলাইয়া যাও। শফি সন্দেহবশে দ্রুত ঘরে ঢোকে এবং তার পিস্তলটি খোঁজে। নাই। নির্বোধ খুকু জানে না, পিস্তলটিতে দুইবার ঘোড়া না টানিলে গুলি ছোটে না। শাস্ত্রীজি উত্তেজিতভাবে বলেন, কী করিতেছ ? পালাও। নরক আসিতেছে।...

I will do such things—
What they are yet I know not—
but they shall be
The terror of the earth.....

উন্মাদ হইবার পূর্বে রাজা লিয়র ওই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি উন্মাদ হই নাই, যদিচ উন্মাদনা থাকিতে পারে।

উহাতে নীট্‌সের দর্শনের বীজ রহিয়াছে।

এবং শোপেনহাওয়ার, বাকুনিন.....

এবং পকুধ কচ্চায়ন, পূরণ কস্‌সপ...

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ছেদন করিতে২ ছেদন করাইতে২ অঙ্গহীন করিতে২ অঙ্গহীন করাইতে২....

উহা তোমার পরিকল্পনা, মানসিক কর্ম্ম তৎকালে।

পরিকল্পনাহেতু কৃষ্ণপুরে পঁহুছিলাম।

পূর্ব্বে তোরণের প্রহরীদ্বয় তোমাকে হাঁকাইয়া দিয়াছিল। কারণ তোমার বেশভূষা মলিন, দরিদ্রবৎ আকৃতি, কোটরগত চক্ষে করুণা-প্রার্থনার কাপট্য ছিল।

উত্তরতোরণে গিয়াছিলাম, যেখানে প্রজাসাধারণকে অবাধ অপমানিত প্রবাহ বোধ হইতেছিল।

খাজাঞ্চিখানা, দরখাস্ত, গোমস্তা, মুহুরি, শবদেহে কীট, থকথকে, কদর্য ক্লেদপুঞ্জ ভাসিতেছিল।

মুন্সি আবদুব রহিম ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে বলেন।

তুমি যাও বাবু গোবিন্দরামের নিকট।

সাদরে গ্রহণ করেন তিনি।

পদ্মতীরে তাঁহার বাসগৃহ ছিল।

গঙ্গাতীরে ক্ষুদ্র একতলা দালানবাটিকা এবং নিরলঙ্কৃত জীবনযাপন করিতেন।

তুমি চাকুরি চাহিলে। ছবিলাল গোমস্তা হইলে। সাত টাকা মাহিনা।

মহালে যাইতাম। দাড়ি রাখিয়াছিলাম।

তুমি কৃষকদিগের বলিতে, যে-মাটি চষিতেছ, উহা তোমারই।

বলিতাম, কেহ কাহারও প্রজা নহে। রাজা মাড়াইকল! রাষ্ট্র খাঁচাকল। পেয়াদাপাইক বরকন্দাজ পুলিশ সেনাবাহিনী সমুদয় বেতনখোর দুর্বৃত্ত। খাজনা দিও না।

তাহারা বুঝিত না।

ক্রমে২ বুঝিয়াছিল।

আশ্চর্য্য দেখ, কৃষকেরা তোমাকে সাধু ভাবিয়া নত হইত আর গ্রামে পুলিশ আসিলে পূর্ব্বে সম্বাদ সংগ্রহ করিত।

চৌকিদারগণ মাংসপুঞ্জ হইত! যেরূপ পকুধ কচ্চায়ন কহিয়াছেন, এক উপাদান অন্য উপাদানে পরিবর্ত্তিত হওয়ার কথা, সেইরূপ।

বাবু গোবিন্দরাম সিংহ বলিতেন, জ্বালাইয়া দাও! ভাঙ্গিয়া ফেল! পূণ্য হইবে।

নিশীথরাত্রে তাঁহার গৃহে যাইতাম। তিনি প্রতীক্ষা করিতেন! পরামর্শ দিতেন।

একদিন তিনি বলেন যে জমিদারবাবু গঙ্গাতীরব্যাপী নিত্য অপরাহ্ণে অশ্বরোহণে গমনাগমন করেন, যাহা বহুকালবধি শৌখিনতা।

আমাকে নির্জ্জনে দণ্ডায়মান দেখিয়া অনন্তনারায়ণ বলেন, এই বেটা, ঘোড়ার লাগাম ধর। মুত্র ত্যাগ করিব।

তিনি ঝোপমধ্যে যোধপুরী ব্রিচেশের বোতাম খুলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় মূত্রত্যাগে রত হন। কিন্তু কানে পৈতা জড়াইতে ভোলেন না।

ঝোপটি পুষ্পবতী সৌন্দর্যময়ী ছিল।

উহা পৃথিবীতে প্রকৃতির চুম্বনের চিহ্ন।

প্রকৃতি অপমানে জর্জ্জরিত হইলেন দেখিয়া অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া নিকটে গেলাম এবং মুখ ঘুরাইবার সঙ্গে-সঙ্গে....

কুকরি দ্বারা গর্দ্দানে কোপ মারিলে। অশ্বটিও তুষ্ট হইল। কারণ সে চিত্রার্পিত ছিল।

গঙ্গার উত্তর দেশ হইতে গোর্খারা চাকুরি খুঁজিতে আসিত।

এক ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধ গোর্খার নিকট চারি আনার কুকরি খরিদ করিয়াছিলে।

উহা চর্ম্মকোষে আবদ্ধ ছিল, কারুকার্য্যখচিত সুন্দর বিভীষিকা!

আর দেখ, তুমি কৃষকদিগের বলিতে, ভাইসকল! তোমরা পৃথিবীকে সাজাইয়াছ। তোমরা রূপকার!

বলিতাম, তোমরা প্রকৃতির মহৎ সন্তানহেতু প্রকৃতির স্বাধীনতাস্রোতে ভাসিতেছ।

বৃক্ষলতা রৌদ্র বৃষ্টি নদী শস্য মেঘ যেরূপ স্বাধীনতাময়।

বাবু গোবিন্দরাম পলাইতে পরামর্শ দেন, যেহেতু মুন্সি আবদুর রহিম আমাকে চিনিতেন!

তুমি রত্নময়ীর সহিত সাক্ষাত করিতে চাহিয়াছিলে!

সাময়িক মোহ মাত্র। অথবা তাহাকে জানাইবার ইচ্ছা ছিল যে, তাহার বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছি।—

দক্ষিণে যাইতে২ বাদশাহী সড়কে একটি চটীতে উপস্থিত হইলে।

তখন রাত্রিকাল।

চটীর পিছনে উচ্চ দীঘির পাড়ে আলো জ্বলিতেছিল। চটীর মালিক বলেন, 'মুসলমান সাধুর ওই ডেরায় যাইলে আশ্রয় পাইবেন।'

সেখানে অজিফামামী এবং মস্তানবাবাকে আবিষ্কার করিয়াছিলাম।

স্ত্রীলোকটির ক্রোড়ে একটি সুন্দর শিশু ছিল, যে বালিকা।

একদা এই ক্ষুদ্র বর্ণাঢ্য মাংসপুঞ্জরূপী উপাদানকে ভিন্ন উপাদানে পরিণত করিতে গিয়াছিলাম ভাবিয়া অনুশোচনা জাগিল।

তোমার চক্ষু সেই প্রথম অশ্রুসিক্ত হয়, জীবনে একবার।

মস্তানবাবাকে সজাগ প্রহরী জানিয়াছিলাম বলিয়া সভয়ে চলিয়া আসিলাম।

বাদশাহী সড়কে চলিতে২ স্মরণ হইল, এই পথ মৌলাহাটে পৌঁছিয়াছে। তখন পূর্বমুখী হইলে।

তখন উষাকাল। বিহঙ্গসকল প্রকৃতির জয়গান গাহিতেছিল। উহাদের কণ্ঠরোধ করিবার সাধ্য নাই, অথচ মনুষ্যদিগের নিযত কণ্ঠরোধ করা হয়।

রাষ্ট্র মাড়াইকল। শাসকবৃন্দ পাদুকাবাহী। পুলিশ সেনাবাহিনী ভাড়াটিয়া গুণ্ডা।

উহাদিগের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

যতদিন না। ওইগুলিন ধ্বংস হইতেছে ততদিন নির্বাণ দুঃসম্ভব।

উহাই নির্বাণ, উহাই মোক্ষ, যাহা ব্যক্তিকে স্বরাট করে, সার্ব্বভৌম সত্তাকে পরিণত করে।

যুদ্ধ চলিতেছে যুগযুগান্ত কাল হইতে—

মুক্তির জন্য যুদ্ধ, নির্বাণের জন্য যুদ্ধ. পুদ্গলকে শূন্যতা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ।

যথেষ্ট হইয়াছে। এইবার আরও পূর্বমুখী হও, উহাও গঙ্গার দক্ষিণ তীর।

ছেদন করিতে৩ ছেদন করাইতে২ অঙ্গহীন করিতে২ অঙ্গহীন করাইতে২—

গ্রাম হইতে নগরে২ গঞ্জে২....

প্রথমে লালবাগ।

কালীমোহনগণ কী করিতেছেন দেখিবার নিমিত্ত....

এবং সহপাঠী অমলকান্তি অনুশীলন সমিতি আদি মনে পড়িয়াছিল।

হ্যাঁ, মনে পড়িয়াছিল বটে।

কিন্তু সেখানে সিতারা আছে।

হায় দিওতিমা সে বৃক্ষে পরিণত।

কাল্লু সিপাহী আছে।

সে বধ্য প্রাণী, যেহেতু সিতারাকে গৃহস্থালীর আসবাবে পরিণত করিয়াছে, এবং প্রেমহীনা করিয়াছে বলিয়াই কাল্লু সিপাহী বধ্য ছিল।

'Thou, Nature, art my goddess; to thy law my services are bound'.....

অমলকান্তি বলিল যে অনুশীলন সমিতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। সকলেই ছত্রভঙ্গ।

সে কেল্লাবাড়িতে কেরানী হইয়াছে।

চুল্লু নাই। রহিম বখশ নাই। শুধু কাল্লু আছে।

আব সিতারা আছে।

সিতারা বৃক্ষের ভাষায় সম্মাননা করিল। কিন্তু কাল্লু আসিয়া অবাক হইয়া বলিল যে, শফিসাব ওরফে ছবিলালের নামে হুলিয়া বাহির হইয়াছে।

সতর্কতাহেতু রাত্রে কাল্লু পার্শ্বে শয়ন করিল।

এবং নিঃশব্দে নিহত হইল।....

We live but a fraction of our life.

—Thoreau

ঝাড়ুদারটি আমাকে দেখে প্রথমে পাগল ঠাউরে থাকবে। সে গলিরাস্তার আবর্জনা সাফ করতে-করতে বলল, যাও! ঝামেলা মাত করো। একটু হেসে বললাম, ভাই, একঠো আন্নি লো। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আনিটির দিকে তাকাল। লোভে তার চোখ চকচক করে উঠল। এই ভোরবেলায় চকচকে জিনিসটির বাস্তবতা পরখ করতে একটু সময় লাগল তার। ফের বললাম, আবদুল বারি চৌধুরিকা মোকাম। জজকোর্টকা ভকিলসাব। বহুত নামজাদা আদমি। আনিটি হাতে নিতেই সে রূপান্তরিত হল বান্দায়। মানুষ এমনি শুওরের বাচ্চা। সে জানে না সে কী! রূপান্তরিত ঝাড়ুদার সেলাম ঠুকে বলল, রাম-রাম বাবুজি! হাম মেহনতি আদমি—দেখিয়ে, ইয়ে কিতনি লম্বি গলি হামরে সাফা করনে লাগে। মিজাজ—! বাধা দিয়ে বললাম, আবদুল বাবি চৌধুরি, ভকিলসাব। শুনা, ইয়ে নিমতল্লা গলিমে উনকা মোকাম। ঝাড়ুদার খি-খি করে হেসে সামনের বারান্দাওলা ঘরটি দেখিয়ে বলল, ওহি তো ভকিলসাবকা মোকাম। উও দেখিয়ে, নাম লিখ্খা হ্যায়। আমার মধ্যে অস্থিরতা ছিল। তাছাড়া এমনি হয় জীবনে। যা সারাজীবন খুঁজে হয়রান হচ্ছি, তা হাতের কাছেই পড়ে আছে। বন্ধ ঘরের দরজায় পৌঁছুনোর আগেই ঝাড়ুদারটি জন্তুর গতিতে লাফ দিয়ে কড়া নাড়তে লাগল। একটু পরে দরজা খুলে গেল। ঝাড়ুদার হেঁ-হেঁ করে সেলাম দিয়ে বলল, বাবুজি আপকা মোকাম ঢুঁড় রহা। সে নেমে এসে নিজের কাজে ব্যস্ত হল। আমরা পরস্পরকে চিনতে পারছিলাম না। রুগ্‌ণ, বয়স্ক, পাকা বড়ো-বড়ো চুল, পরনে পানজাবি আর লুঙ্গি — কে ওই মানুষ? তারপর চিনলাম। কিন্তু উনি চিনতে পারলেন না। বললেন, আট বাজকে আইয়ো!

আভি মুহুরিবাবু নেহি হ্যায়। আমার চেহারায় নিশ্চয় হিন্দুস্থানী আদল ছিল। একমুখ গোঁফদাড়ি। অবশিষ্ট শার্ট আর ধুতিটি পরনে ছিল। রক্তমাখা কাপড়চোপড় এবং ভোজালিটি ভাগীরথীতে ডুবিয়ে রেখে এসেছি। অমলকান্তির কাছে শুনেছিলাম, বারিচাচাজি বহরমপুরের গোরাবাজারে থাকেন এবং ওকালতি করেন। আমি এবার বারান্দায় উঠে গিয়ে আস্তে বললাম, আমি শফি—শফি-উজ্জামান। বারি চৌধুরি নিস্পলক চোখে একটু তাকিয়ে থাকার পর বললেন, কোর্টে সারেনডার করতে এসেছ ? বুকের ভেতর ধাক্কা লাগার ফলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ। কয়েক মুহূর্ত তেমনি তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ আমার একটা হাত ধরে টেনে ভেতরে ঢোকালেন ! দরজা বন্ধ করে দিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বললেন, কেন তুমি এমন হয়ে গেলে, শফি ? কিসের অভিমান তোমার ? চুপ করে রইলাম। এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন বারিচাচাজির ? হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, উই লিভ বাট এ ফ্র্যাকশন অব আওয়ার লাইফ ! পরমুহূর্তে আবেগ দমন করে পানজাবির হাতায় চোখ মুছলেন। আমার পাশে এসে বসলেন। আস্তে বললেন সারেনডার করতে আসার আগে মাকে দেখা করে এসেছ ? বললাম, না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, তোমার বিরুদ্ধে বাঢ়ের জমিদারদের অসংখ্য নালিশ কালেকটরসায়েবের কাছে জমা আছে। কৃষ্ণপুরের জমিদারকে খুনের নালিশ আছে। আরও কিছু খুন-খারাপির নালিশও আছে শুনেছি। জানি না তোমাকে বাঁচাতে পারব কি না। সবকিছু জেনে-বুঝে তবে সারেনডার করতে বলব। আপাতত তুমি গোপনে মৌলাহাটে গিয়ে অন্তত মাকে একবার দেখা করে এসো। বললাম, গতরাত্রে লালবাগে কাল্লু সিপাহীকে খুন করে এসেছি। সেই সাতমার কাল্লু খাঁকে। বারিচাচাজি চমকে উঠে বললেন, কেন ? সে কী দোষ করেছিল তোমার ? বললাম, জানি না। তবে মনে হয়েছিল ওকে খুন করা দরকার। বারি চৌধুরি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, দেন ইউ আর এ হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক। তোমাকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়, তোমাকে মানসিক রোগগ্রস্ত প্রমাণ করা। এবং তুমি মানসিক-রোগগ্রস্ত তো বটেই। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বারি চৌধুরি ফের বললেন, তুমি জান কি, হরিণমারার বড়োগাজি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছেন ? উনি এই মহল্লায় থাকেন। সবকারি কর্তাদের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম আছে। ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু তুমি আগে মাকে দেখা করে এসো। বললাম, যাব। বলছেন যখন। বারিচাচাজি দুঃখিত মুখে বললেন, যে জীবন তুমি পেয়েছ, যে-জীবনের জোরে দুনিয়ায় বাহাদুরি দেখিয়ে বেড়াচ্ছ, তা কীভাবে পেলে ভেবে দেখছ না ? মুখ নামিয়ে বললাম, আমি কি দুনিয়ায় আসার জন্য দায়ী ? আমার জীবনের জন্য আমি দায়ী নই। বারি চৌধুরি কষ্টে হাসলেন। বললেন, জীবন তোমাকে কি কিছুই দেয়নি ? আগে এ প্রশ্নের জবাব দাও। বললাম, পৃথিবী দুঃখময়। বাসযোগ্য নয়। বাবিচাচাজি বললেন, বেশ তো ! তাকে বাসযোগ্য করার জন্য লড়াই করো। বললাম, সেটাই তো করছিলাম। বারিচাচাজি বললেন, নিৎসে নামে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক সুপারম্যানের প্রকল্প খাড়া করে গেছেন। বছর পাঁচেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তুমি কি নিজেকে সুপারম্যান ভাব নাকি ? কোনো জবাব দিলাম না। দার্শনিক বিষয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তি ছিল না। বারিচাচাজি জানেন না, আমি এসব বিষয়ে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি জানি আর বুঝি ! চুপ করে আছি দেখে তিনি আর কথা বাড়ালেন না। ডাকলেন, করিম। করিম বখ্‌শ্‌। অবাক হয়ে দেখি, কেল্লাবাড়ির সেই বুড়ো করিম বখ্‌শ্‌ এসে

দরজায় দাঁড়াল। কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারল না। বারিচাচাজি বললেন, নাশতার যোগাড় করো। আগে দু পেয়ালা চা পেলে ভালো হয়! করিম বখ্শ্ চলে গেল। এই সময় বৃষ্টি শুরু হল। আশ্বিন মাস। উলুশরার বিলের রাস্তায় গেলে মৌলাহাট দশ ক্রোশ, কিন্তু এখন ওদিকটা দুর্গম। জিগ্যেস করলাম, আপনার ঘোড়াটা কি আছে? বারিচাচাজি অন্যমনস্কভাবে বললেন, আছে। কেন? বললাম, মৌলাহাট— কথা কেড়ে বারিচাচাজি মাথা নেড়ে বলবেন, না। প্রকাশ্যে ঘোড়ার পিঠে ওই এলাকায় যাওয়া ঠিক নয়। তোমাকে বরং পালকি ভাড়া করে দেব। সেটাই তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে।.....

আমি পালকি নিইনি। পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছিলাম। তুমুল বৃষ্টি সে রাত্রে। সে এক অবিশ্বাস্য যাত্রা। একটা কালো জিন অশ্বরূপে আমাকে বহন করিয়াছিল।.....

'জেলা সমাচার' পত্রিকার সম্পাদকীয় (আংশিক উদ্ধৃতি)

".....বিগত ১৭ই জুন জেলার কুখ্যাত দুর্বৃত্ত ছফিজামান ওরফে ছবিলালকে দয়রা জজ শ্রীযুক্ত জর্জ্জ নীল মহোদয় বেকসুর খালাস দিয়াছেন জানিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। ইংরাজ বিচারব্যবস্থার বিষয়ে আমাদিগের উচ্চ ধারণার কোনও হেতু নাই, উহা পুনরায় প্রমাণিত হইল। বিগত বৎসরে বঙ্গভঙ্গরূপ ঘটনায় মুসলমানদিগের সহিত ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের কিরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহার প্রতি আমরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই দুর্বৃত্ত দস্যু ও হন্তারকের নিস্কৃতিলাভ তাহার আরও একটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইল। অতএব সাধু সাবধান! এই মুসলমানঅধ্যুষিত জেলায় ইহার পর হিন্দুদিগের মানসম্ভ্রম নিরাপদ নহে বিবেচনায় অবশেষে বিভিন্ন স্থানের রাজাবাহাদুর ও জমিদারবৃন্দ কালেকটরবাহাদুর শ্রীযুত ম্যাকফার্সন সাহেবের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা না করিলে কী ঘটিত ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। অতি আনন্দের কথা যে ওই দরখাস্তে নবাববাহাদুর মুসলমান হইয়াও সহি দেন। ইহার ফলস্বরূপ সুবিজ্ঞ কালেকটরবাহাদুর উক্ত দস্যুর প্রতি ৭ বৎসরের জন্য জেলা হইতে নির্বাসনদণ্ড জারি করিয়াছেন। এই ৭ বৎসর মধ্যে ছফি ওরফে ছবিলাল জেলার মাটিতে পদার্পণ করিলেই দৃষ্টি হওয়ামাত্র উহাকে যে কেহ হত্যা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য দুই হাজার টাকা পারিতোষিক লাভ করিবে। ইহা মন্দের ভাল হইল। জেলাবাসী সজ্জন গৃহস্থ বিত্তবান সকলেই কালেকটরবাহাদুরের প্রশংসা গাহিতেছেন। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে আমরা অবগত হইয়াছি যে, কতিপয় নেতৃস্থানীয় মুসলমান ব্যক্তি এবং অতিশয় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, তাহাদিগের সহিত কতিপয় বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহী জয়চাঁদ এবং কালাপাহাড় ওই নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহারের কারণে ষড়যন্ত্র করিতেছে। পুনরায় কহি যে, সাধু সাবধান!....."

'And behold! a Messiah cometh unto them.'

কথিত আছে, একদা পশ্চিমের লোকসকল পূর্বদিগ্বলয়ে একটি কৃষ্ণবিন্দু দেখিতে পায়। বিন্দু শূন্যে ভাসমান এবং কম্পমান ছিল। ক্রমে২ উহা স্ফীত লাভ করতঃ ভূমিসংলগ্ন হয়। 'তিনি' এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের আরোহী। লোকসকল প্রণত হইলে 'তিনি' ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, অই বৃক্ষ দেখ, যাহা ঋজু, যাহা ছেদিত বা দগ্ধ হয়; কিন্তু স্বেচ্ছায় নত হয় না, যাহা ভূমির জন্য কাহাকেও রাজস্ব দেয় না। তোমরা বৃক্ষের নিকট শিখ। আর তোমরা নদীর নিকট শিখ, যাহা গতিশীল। আর তোমরা মেঘের নিকট শিখ, যাহা নিজেকে নিঃশেষিত করিয়া ভূমিকে জীবন দেয়; কিন্তু

বক্ষে বজ্র বহন করে এবং গর্জন করে ॥

কথিত আছে, 'তিনি' কঠিন শিলার ন্যায় দুর্ভেদ্য ছিলেন। আর 'তিনি' অগ্নিবর্ণ ছিলেন। লোকসকলকে উত্তপ্ত করিতেন। তাহারা অনুসরণ করিলে 'তিনি' বলিতেন, যাহা বলিয়াছি, পালন কর। আর একদিবস একটি গোরাবল্টন সেই অশ্বের ভয়ঙ্কর মূত্রস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। দারোগাবাবুদিগের দেখিলে 'তিনি' বলিতেন, উর্দি খুলিয়া ফেল। উহা শৃঙ্খল। উহা আনুগত্যের হেতু। উহা বিদ্রোহ আগুলিয়া রাখে! কিন্তু বিদ্রোহ স্বাধীনতার পথ এবং স্বাধীনতাই জীবন ॥

কথিত আছে, এইরূপে 'তিনি' অসংখ্য গ্রামপরিক্রমা করেন। সেই গ্রামসকল স্বাধীনতাময় হইয়াছিল। সেইসকল গ্রামের মাটি ও নিসর্গ হইতে 'স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!' এই ধ্বনি স্পন্দিত হইত ॥

এবং কথিত আছে, লোকসকলকে স্বপ্নে দেখা দিয়া 'তিনি' বলিয়াছিলেন, 'আমি সেই ছবিলাল'। পরবর্তীকালে প্রাজ্ঞ গ্রামীণেরা ব্যাখ্যা করিত, 'তিনি ছবির ন্যায় রাঙা ছিলেন, সেই হেতু ছবিলাল ॥'....

> 'I will go no more to Apollo's inviolate shrine....The old prophecies about Laius are losing their power; already men are dismissing them from mind, and Apollo is nowhere glorified with honours. Religion is dying....'
>
> Oedipus the Kind—Sophocles.

"বীরভূম জেলার নলহাটি অঞ্চলের দস্যুসর্দ্দার গোবর্দ্ধন ওরফে গোবরা ছিল হাড়িসম্প্রদায়ভুক্ত। লোকে তাহাকে গোবরা হাড়ি বলিয়া জানিত। সে আমাকে 'ঠাকুর' বলিয়া মান্য করিত! সে ভাবিত, আমার কিছু অতিলৌকিক ক্ষমতা আছে। কারণ আমি লাঠি ও তলোয়ার চালনায় দশজন গোবরা হাড়ির অপেক্ষা পারদর্শী ছিলাম। ত্রিশ-চল্লিশ বিঘৎ দূর হইতে বল্লম ছুড়িয়া লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত ছিলাম। তাহার একটি গাদা বন্দুক ছিল। উড়ন্ত পাখি মারিয়া তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সে প্রণাম করিতে নত হইলে তাহার বাবরি চুল ধরিয়া তাহাকে সিধা দাঁড় করাইয়া বলিতাম, খর্বদার! নিজেকে অপমানিত করিবি না। সে বলিত, আপনি ঠাকুর! বলিতাম, ওরে নির্বোধ! ঠাকুর মুসলমানেরও পদবী হয়। তুই গোমূর্খ, তাই জানিস না, উহা মুসলমানী কথা। তুর্কী বাদশাহদের আমলে আমদানি। তুর্কী ভাষায় 'ঠাগরি' অর্থ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরবাহাদুরের মর্ত্যের প্রতিনিধি দ্বিপদ প্রাণীবিশেষ, যাহারা বাদশাহ এবং প্রজাসাধারণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া চক্ষু রাঙ্গায়। উহারা বৃক্ষের পরগাছা। উহারা সহজে উৎপাটনযোগ্য।.....

"গোবরা কিছু বুঝিতে পারিত না। শুধু বলিত, আজ্ঞে, আপুনি ঠাকুর। স্বীকার করি যে, সে রবিনহুড ছিল না? পথিমধ্যে রাজস্ববাহী শকট এবং বণিকদিগের পণ্যসম্ভার-বিক্রয়লব্ধ নগদ অর্থের খবর পাইলে লুণ্ঠন করিত। ইহাও রাষ্ট্রের কাঠামোতে আঘাত বলিয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম।....

"একদিন গোবরার স্ত্রী হীরার কোলে তাহার কন্যাটিকে দেখিয়া করুণা ওরফে ইকরার কন্যাটির কথা স্মরণ হইল। চাঞ্চল্য বোধ করিলাম। বাদশাহী সড়কের ধারে সেই চটীতে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে স্বয়ং গোবরা ছিল। প্রয়োজনে সে নজর রাখিবে। শিশুটিকে হরণ করিবার অভিসন্ধি ছিল। সন্ধ্যার কিছু পরে চটীর শিয়রে দীঘির পাড়ে অবস্থিত মস্তানবাবার আস্তানাটি একদল পথিকের অধিকৃত দেখিলাম। চটীর

মালিককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, মস্তানবাবা তাঁহার সাধনসঙ্গিনীর দেহান্তের পর ডেরা পরিত্যাগ করিয়া যান। সে প্রায় তিন বৎসর পূর্বের কথা। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলাম, তুমি কি অই ঘরটি দখল করিয়া লোকদিগের আশ্রয়স্থল করিয়াছ? সে নির্বিকার মুখে বলিল, ঠিক করিয়াছি। বলিলাম, ভাড়া লও কি? সে পূর্ববৎ ভঙ্গীতে বলিল, লই। আপনারা রাত্রিবাস করিতে চাহিলে এক আনা হারে ভাড়া লাগিবে। এখনও চারিজনের স্থান-সংকুলান হইবে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চপেটাঘাত করিলাম। চটীতে ভোজনরত কতিপয় লোক মুখ ঘুরাইয়া রহিল। চটীদার চড় খাইয়া এক লাফে কুঠুরিতে ঢুকিয়া একখানি প্রকাণ্ড খাঁড়া আনিল এবং আস্ফালন করিয়া তুমুল চীৎকার করিতে থাকিল। একটি খর্বাকৃতি শীর্ণ মনুষ্যকণ্ঠে ওইরূপ তীক্ষ্ণ নাদ বিস্ময়কর। গোবরা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসিতেছিল। সহসা পিছন হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরাশায়ী করিল। খাঁড়া কাড়িয়া লইলাম। গোবরাও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তাহার পর চিত্রবৎ স্থির এবং ভোজনরত লোকদিগের উদ্দেশে বলিল, আমি গোবরা হাড়ি। ইতোমধ্যে দীঘির পাড়ের আস্তানাঘরের লোকগুলি গণ্ডগোল দেখিতে আসিয়াছিল। কথাটি শুনিবামাত্র তাহারা এবং ভোজনরত ব্যক্তিরা আহার ফেলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। চটীদার কাঁপিতে-কাঁপিতে গোবরার সম্মুখে নত হইয়া বলিল, বাবা! মার্জ্জনা করিবেন। গোবরা বলিল, তবিল আন। আমি তাহাকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিয়া বলিলাম, যথেষ্ট হইয়াছে।....

"ইহার পর কিছুকাল মস্তানবাবার সন্ধানে বিস্তর ছোটাছুটি করিয়াছি। লোকটি যেন পৃথিবী হইতে উবিয়া গিয়াছে। অদ্য অকপটে লিখিতেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওই শিশুকন্যাটি আমার পিতার ঔরসজাত! সুতরাং আমার সহিত উহার রক্তের সম্পর্ক ছিল। যদি প্রমাণের কথা বল, দিতে পারিব না। কিন্তু কন্যাটির গাত্রবর্ণ তাহার জননী অপেক্ষা বহুগুণ সমুজ্জ্বল ছিল, এইটুকু বলিতে পারি। আর একটি কথা লিখিবার আছে। সেই মস্তানবাবা সম্ভবত আ....."

একটি কথোপকথন

কচি ॥ এ কী দাদিমা! হঠাৎ এখানেই শেষ কেন? 'আ' লিখেই শেষ!

দিলরুখ বেগম ॥ জানি না!

কচি ॥ (উত্তেজিতভাবে) কোনো মানে হয়? আ লিখে কলম থেমে গেল! মিস্ট্রিয়াস! কামাল স্যারকে দেখাতে হবে।

দি বেগম ॥ (দৃঢ়স্বরে) না। আমার মরা ধড়ের ওপর দিয়ে তবে ওই খাতা বাইরে নিয়ে যাস!

কচি ॥ (অবাক হয়ে) কী অদ্ভুত। ব্যাপারটা তোমায় পড়ে শোনাচ্ছি। তাহলে বুঝবে—

দি বেগম ॥ আমি বুঝতে চাই না। তুই চুপ কর! রেখে দে সিন্দুকে। আর কক্ষনো সিন্দুকে হাত দিবি নে।

কচি ॥ (একটু পরে দুঃখিতভাবে) একটা ব্যাপার ভাবা যায়। হয়তো ঠিক সেই মোমেনটে সেনট্রিরা এসে ছোটোদাদাজিকে ফাঁসি দিতে নিয়ে গিয়েছিল। ফাঁসি শেষরাতে বা ভোরে দেওয়া হয়। হুঁ — তাই হবে। ব্রুট! কাওয়ার্ড! ওরা শেষ

কথাটা লিখতে সময় দেয়নি! দাদিমা, আমি ছেলে হলে এর শোধ নিতাম! এখন বুঝতে পারছি, খোকা যা করছে, ঠিক করছে। ওকে আমি সাপোর্ট করি! দুনিয়া জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া দরকার!

দি বেগম ॥ (শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে) তা তো বলবিই। তোদের যে বদ খুন আছে অজুদে!

কচি ॥ (অন্যমনস্কভাবে) সেই মস্তানবাবা সম্ভবত....(হঠাৎ নড়ে উঠে) দাদিমা! দাদিমা! সেই মস্তানবাবা বড়ো আব্বার ছোটো ভাই ফরিদুজ্জামান নন তো? শা ফরিদ, ও দাদিমা, সেই শা ফরিদ!

দি বেগম ॥ (ফুঁপিয়ে উঠে) আমি জানি না! দোহাই কচি, তুই, চুপ কর!

কচি ॥ কান্নাকাটি করছে কেন? হল কী তোমার? ও দাদিমা!

দি বেগম ॥ কবর খুঁড়তে নেই। গোনা হবে।

কচি ॥ কী আশ্চর্য! ফ্যামিলির হিস্ট্রি জানলে গোনা হবে? রাখো তোমার গোনা।

দি বেগম ॥ আমার বড়ো ডর নাগে! পা ফেললে বাড়ির মাটি টলমল করে। দেয়ালগুলান দেখি, মনে হয়, ধসে যাবে। ঘরের চালের দিকে তাকাই। ভাবি, মচমচ করে ভেঙে পড়বে। সারারাত বাড়ি চারপাশে ফিসফিস করে কারা।

কচি ॥ ডিলিরিয়াম!

দি বেগম ॥ হারামজাদি মেয়ে! দেখছিস না চারদিক থেকে জঙ্গল বাড়িটাকে ঘিরে ধরছে? কিলবিলে সাপের মতন লতাপাতা। চাঁদের আলোয় উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখিস। চারদিক থেকে! চাদ্দিক থেকে!

কচি ॥ কী চারদিক থেকে?

দি বেগম ॥ কালা জিনের মুঠোয় আটকে পড়ছে বাড়িটা। চাদ্দিক থেকে মাকড়সার মতন জাল বুনেছে।

কচি ॥ (হাসতে-হাসতে) বোগাস! দারিদ্র্য! খোকা লেখাপড়া শিখল না। পাস করলে চাকরি পেত। আমি পাস করে বেরুব। চাকরি করব। বাড়ি মেরামত করব। ব্যস!

দি বেগম ॥ ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ ওটা কী?

কচি ॥ (লাফিয়ে ওঠে) সর্বনাশ! সাপের খোলস কোত্থেকে এল? (ঘরের কোণে গিয়ে) এম্মা! ইঁদুরের গর্ত যে! এখানে সাপের খোলস — উরে ব্বাস! নিশ্চয় সাপ আছে গর্তে। বেদে ডাকতে হবে। দাঁড়াও, খাতাটা রাখি। রসুল বেদেকে এক্ষুণি ডেকে আনছি।.....

'......স হোবাচ গার্গি মাতি প্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তৎ—'

কৃষ্ণপুরে চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজনের মেলা বসেছে। বুড়োশিবের মন্দিরের সামনে চটানে 'ভক্তা' সন্নেসি'র দল রাঙা কাপড় পরে বেতের ছড়ি হাতে চক্কর মেরে নাচছে, মধ্যিখানে পালকের সাজপরা একঝাঁক ঢাক -- আকাশ থেকে মেঘের টুকরোগুলি নেমে এসে মানুষজনের ভিড়ে ডাক ছাড়লে এরকমই ঘটত, তারা দুলত, নাচত, গর্জাত, আর হলুদ ছিপছিপে বেতের ঋজু ও বক্রগতি মুহুর্মুহু — ওই মেঘগুলির

দেহনিঃসৃত বিদ্যুৎরেখা বলে ভ্রম হয়, আর উপোসি ভক্তরা তালে-তালে নেচে-নেচে হাঁক মারছে, 'শিবো নামে পুইন্যো করে বোল শিবো বো-ও-ল !' বড়োবানের বছর মাগঙ্গা কামড়ে খেয়েছে একগাল মাটি, বুড়ো শিবকে সে বুকে টানতে চেয়েছিল — বুড়ো চির যুবতী বধূর ছলনা বোঝে, তাই পেছনে ওই শক্ত বটের ঠেকা। মেলায় বড়ো ভিড়। একশো আট পাঁঠা গঙ্গাজলে চুবিয়ে মানুতে লোকেরা হল্লা করছে হাড়িকাঠের কাছে। জনা বিশ কামার রক্তমাখা খাঁড়া তুলে নাচছে, চক্ষু রাঙা, কপালে রক্তের ফোঁটা। চটানের মাটি ও ঘাস রক্তে থকথকে। শৃঙ্খলাহীন, অসম্বদ্ধ, জোর যার বলি তার নীতি, কার পাঁঠার ধড় কার কাঁধে তোলে, কার পাঁঠার মুণ্ডু কারা কুড়োয় — উঁকি মেরে তাকিয়ে ছিলেন এক 'অফসরবাবু' সরে এলেন। মাথায় শোলার টুপি, প্রকাণ্ড গোঁফ, শাদা শার্ট খাঁকি হাফ-প্যান্ট পরনে, পায়ে বুট জুতো। পেছনে হৈ হৈ চিৎকার। সরে যাও ! সরে যাও ! পাইকের দঙ্গল লাঠি নেড়ে ভিড় দুভাগ করে দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। রাজবাড়ির পাঁঠা আসছে, নধর নিখুঁত কালো এক পাঁঠা প্রকাণ্ড এক কালো জ্যান্ত অসুরের বুকে, ওই সেই লখ্না কামার, যে ইচ্ছে করলে একশো আট পাঁঠার মুণ্ড ক্রমাগত কোপে ধড়ছাড়া করতে পারে ; আর লখ্না এখন রাজবাড়ির লোক, পেছনে গরদের শাড়ি পরে স্বয়ং রানীদিদি, 'মালকান্' (মালিকানী) তিনি, আবার রাজবাড়িতে পুজোপার্বণ শুরু তাঁর আমলে, রাজা বাপটি ছিলেন মেলেচ্ছ কেরেস্তান, মোচলমানের বাড়া, আকাশ থেকে দেব্তা নেমে সুদর্শন চক্করে ধড়-মুণ্ডু গঙ্গার এপার-ওপার করেছিলেন। আহা ! আবার কতকাল পরে রাজবাড়ির পাঁঠা খাচ্ছেন বাবা বুড়ো শিব — 'শিবো নামে পুইন্যো করে বোল্ শিবো বো-ও-ল্ !' গর্জন হল দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ — ঢাকের ঝাঁক গর্জাল ঢ্যাঙা ঢ্যাঙ্ ঢ্যাঢাং ঢ্যাং, ভক্তবৎ তাবৎ প্রজাসাধারণ, ভুলুণ্ঠিত, কী অদ্ভুত মায়া ! রানীদিদির নাকটি খাড়া, কোটরগত চোখে জ্যোতি, গায়ের বরন সোমলতার মতো, এলো চুলের দুধারে দুই জবাফুল গোঁজা, একটু পরেই ভ্রূমধ্যে পরবেন ওই রাজপাঁঠার রক্ততিলক — আহা, কতকাল পরে ক-ত-কা-ল স্মরণ হয় না ! রানীদিদির শীর্ণ শরীরে পিচ্ছিল গরদ, দুই বাহু অনাবৃত এবং পীত, দুহাতে বুকের কাছে রুপোর প্রকাণ্ড রেকাবে নৈবেদ্য, পাশে প্রত্যাবর্তিত রক্ষেকর পাণ্ডামশাই, গেরুয়া বসন ও উত্তরীয়, কণ্ঠদেশে রুদ্রাক্ষ, কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল — 'হা গো ঠাকুর এতদিন কতি ছিলেন গো' এই ব্যাকুল প্রশ্ন চোখে-চোখে দীপ্যমান ! 'অফসরবাবু' নির্নিমেষ দর্শন করেন রূপ অথবা মায়া এবং দূরে সরে যান। ঘিনজি দোকানপাট, আড়ত. ঘরবাড়ির ভেতর দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। ডাইনে গঙ্গা বা পদ্মা, জেলেবসতি, তারপর বেড়াঘেরা জঙ্গুলে বাগান। মধ্যিখানে একতালা জরাজীর্ণ দালান। বারান্দায় খাটিয়া। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ার ভেতর খাটিয়াটি শ্মশানের বলে ভুল হয় এবং শায়িত মানুষটিকে মনে হয় মড়া। মড়া জ্যান্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কে ?

'অফসারবাবু' টুপি বগলদাবা করে বারান্দায় উঠে আস্তে বলল, আমি ছবিলাল।

গোবিন্দরাম তাকে দেখছিলেন। তারপর উঠে বসলেন। শ্বাস ছেড়ে বললেন। শ্বাস ছেড়ে বললেন, বসো।

আপনি কি অসুস্থ ?

হাঁপানি। গোবিন্দরাম একটু পরে ফের বললেন, আসা ঠিক হয়নি। তোমার চেহারা লুকোবার নয়, তুমি জান না !

'ছবিলাল' বলল, রত্নময়ীকে দেখলাম — পুজো দিতে যাচ্ছে।
হিন্দুর সংস্কার। এ তুমি বুঝবে না — তোমাকে বলেছিলাম!
আমি ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছিলাম!
গোবিন্দরাম আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, কেন?
আমার কিছু কথা ছিল।
আমাকে বলতে পার, আমি সে-কথা পৌঁছে দেব। আমি রাজবাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছি, তাহলেও অসুবিধা হবে না। মুন্সিজির মারফত—
সে-কথা মুখোমুখি রত্নময়ীকেই বলার।
গোবিন্দরাম হাসবার চেষ্টা করলেন। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হল। বললেন, শফি! হতভাগিনী, মেয়েটা একটা আশ্রয় পেয়েছে এতদিনে। তাকে আশ্রয়চ্যুত করা উচিত নয় তোমার।
শফিও হাসল। বলল, সে-কেমন আশ্রয় যে আমাকে দেখলেই তা ধসে যাবে?
তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু সে তোমাকে দেখলে কষ্ট পাবে। কারণ হয়তো সে—
বলুন!
আমার ভুল হতেও পারে, কিন্তু তোমার মধ্যে একটা কী আছে, প্রচণ্ড চুম্বক! তুমি জান, তোমার নামে গ্রামে-গ্রামে অদ্ভুত সব গল্প চালু আছে? হয়তো বীরপূজা মানুষের সহজাতবৃত্তি। এইসব বীরমানুষরা সেই সুযোগ নিয়ে দস্যুতা করেছে, কেউ রাজা, হয়েছে। তোমার সঙ্গে তাদের একটা বড়ো তফাত — তুমি বাসনাহীন, উদ্দেশ্যহীন। অকপট।
তাহলে রত্নময়ীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে ভয় কিসের, গোবিন্দবাবু?
ভয় তোমার জন্য নয়, তার জন্য। সে সত্যিই মানসিক বিকারগ্রস্তা। সেজন্য মনে হয়, একমাত্র ধর্মের আশ্রয় ছাড়া তার বিকার ঘুচবে না। কিন্তু সবে সে মন্দিরের সোপানে পা রেখেছে, তাকে কিন্তু ডেকো না, শফি!
শফি চুপ করে থাকল। গোবিন্দরাম খাটিয়ার তলা থেকে লণ্ঠন বের করলে সে বলল, থাক। আমি যাই।
কিছু খাও। একটু বিশ্রাম করো। রাত হলে যেও। বলে গোবিন্দলাল শলাইকাঠি হুকে লণ্ঠন জ্বেলে ঘরে ঢুকলেন। একটু পরে পাথরের থালায় ভিজে চিঁড়ে, গুড়, দুটি পাকা কলা নিয়ে এলেন। বললেন, রাতে আমি কিছু খাই না। তাই এগুলোই খাও!
শফির খিদে পেয়েছিল। দ্রুত খেয়ে ফেলল। ঘটি মুখের ওপর তুলে জল ঢেলে দিল গলায়, যা মুসলমানরা অনভ্যাসে পারে না। কিন্তু সে হিন্দু জীবনে অভ্যস্ত। আঁচিয়ে এল উঠোনের কোণে। কিন্তু গোবিন্দরাম তাকে থালাটি ধুতে দিলেন না। শফি মৃদু হেসে বলল, ব্রহ্মপুর আশ্রমে আমরা যে যার থালা ধুয়ে রাখতাম!
গোবিন্দলাল বললেন, তোমার পক্ষে দরখাস্তে হৃদয়লাল শাস্ত্রী স্বাক্ষর দেননি জান? দেববাবু তো কলকাতায় থাকেন। শুধু মাঘোৎসবে আসেন! তবে উদ্দেশ্য খাজনা আদায়।
শফি বলল, কিসের দরখাস্ত?
তুমি জান না? বারি চৌধুরি উকিল, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান গাজিসাহেব, হরিণমারার জমিদার বিজয়েন্দুবাবু, আরও অনেক লোক তোমার নির্বাসনদণ্ড

প্রত্যাহারের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। রত্নময়ীও সই দিয়েছিল। শুধু তোমার—

উঁ? শফি ভুরু কুঁচকে তাকাল!

গোবিন্দবাবু আস্তে বললেন, পিরসাহেব সই দেননি। আমি গিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। উকিলসাহেবকেও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শফি হিন্দু। তাই মুর্দা (মৃত)। কিন্তু আমরা জানি, তুমি কী।

শফি বলল, উঠি।

একটু পরে বেরিও।

না। এখনই যেতে হবে। বলে শফি একমুহূর্ত ইতস্তত করল। বলল, আমি বহু বছর থেকে কারুর সামানে নত হই না। প্রণাম করি না। কিন্তু আপনাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে।

গোবিন্দরাম দ্রুত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমার প্রণামযোগ্য নই। তুমি বয়সে বড়ো হলে আমিই তোমাকে প্রণাম করতাম।

শফি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বারান্দা থেকে বেগে নেমে গেল। বেড়া পেরিয়ে গিয়ে শোলার টুপিটি ফের পড়ল। সে গাজনতলায় গেল। তখনও বলিদান চলেছে। কিন্তু রত্নময়ী নেই। তার পাইকরা নেই। খুঁটিতে-খুঁটিতে মশাল জ্বলছে, আর সেই দপকে-ওঠা আলোয় মাতাল বিশৃঙ্খল ভিড়, হাজার-হাজার বছরের পুরনো মন্দির-দেয়ালেব টেরাকোটা খণ্ডগুলি থেকে ছিটকে-পড়া মূর্তিগুলির নড়াচড়া — রাত নিশুতি হলে যারা ফিরে যাবে দেযালের গায়ে চতুষ্কোণ, স্তরবদ্ধ, পৌরাণিক চরিত্রসমূহের জোটে, অতীতে। আশ্চর্য এদের মধ্যে কিছুক্ষণ আগে রত্নময়ীও ছিল! বিমূর্ত, ধূসর, অথচ একটি চোখেপড়ার মতো গঠন, দেশজ শৈলী-বহির্ভূত বর্ণিকাভঙ্গে ধৃত সেমিতীয় আদল কীভাবে যেন অনুপ্রবিষ্ট অথবা আরোপিত হয়েছিল ওই হিন্দু টেরাকোটায় এবং ক্রমশ সময়ের প্রহারে জর্জবিত হতে-হতে বেরিয়ে পড়ল আদি রূপ এবং সেও যূথের অনুগামী হল, নেমে এল প্রাচীন দেয়াল থেকে জীবন্ত হয়ে — ভাবলে বিস্ময়কর! মুন্সি আবদুর রহিম! আপনারই কারচুপি সবই — সেমিতীয় আদল আরোপকাবী ওহে বুড়ো ক্রান্তদর্শী, এবার দাড়ি ছিঁড়ুন, নিজের গালের থাপ্পড মারুন, আপনার সেমিতীয নমস্যকে বলুন, 'এ কী হৈলা বাপা?' শফি নিঃশব্দে হাসতে-হাসতে ভিড় ঠেলে হাঁটছিল। Love begins in shadow, ends in light?

রাজবাড়িব উত্তরের ফটক খোলা ছিল। দুধারে দুটি কাঠের খুঁটির মাথায় চৌকো কাঠের ভেতর বাতি জ্বলছিল। দারোয়ানটিকে চেনে শফি। তাব নাম মুঙ্গেশ্বর সিং, দ্বারভাঙ্গার লোক, ভাংখোর। গাজনের দিনে ফটকের লাগোয়া ঘুপচি ঘরে খাটিয়ায় বসে প্রচুর ভাঙের শরবত খেয়ে পেট ঢোল করেছে, ঢুলছে, শফির মনে পড়ল, গোবরা হাডি কতবার কৃষ্ণপুর রাজবাড়িতে যখন-তখন ডাকাতি কত 'তুচ্ছ কম্ম' বলে বর্ণনা করেছে, 'তমে কথা কী জানেন ঠাকুর? মৌলাহাটের পিরছায়েরের পোযা চ্যাড়াগুলিন আজবাড়ি পাহরা দ্যায়, উদের সঙ্গেতে আঁটা কঠিন — ক্যানে কী, উয়ারা তো ছেঁয়া ঠাকুরমশাই! ছেঁয়ার শরীলে কোপ মারা যায় না গো! নৈলে পরে অ্যাদ্দিন কবে — হুঁ হুঁ......অদ্ভুত হাসে গোবরা ডাকাত।

ডাকাত! ডাকাতরাও ঘর বাঁধে স্ত্রীলোক নিয়ে। প্রেমিক হয়। পিতা হয়। সন্তানেব মুখে চুমু খায় স্নেহে। এ মুহূর্তে বড়ো অবাক লাগে ভাবতে। *Oh! faciles nimium qui tristia crimina caedis / Flumina tolli posse putatis aqua!*

ম্যানেজারবাবু নাকি ?

অন্ধকার থেকে চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল শুকনো ফোয়ারার কাছে। শফি বলল, মুন্সিজি !

কে ? কে আপনি ?

ছবিলাল।

কিছুক্ষণ পরে মুন্সি আবদুর রহিম কাছে এলেন ! রুক্ষ কণ্ঠস্বরে বললেন, কী চাই ?

আপনার জহরত-আরাকে।

বেশরম !

তাকে খবর দিন, আমি এসেছি।

চলে যাও। নৈলে দারোয়ান ডাকব।

খবর দিন রত্নময়ীকে, আমি এসেছি।

কণ্ঠস্বর শুনে মুন্সিজি একটু ভয় পেলেন। আস্তে বললেন, কেন — কী দরকার ?

প্রশ্ন করবেন না, খবর দিন।

কেন, আগে বলো !

জানতে চাইবেন না। সবকিছু জানতে নেই। বেশি জানতে চাইলে মাথা খসে যায় ! মুর্ধা ব্যপপ্তৎ ! মুন্সি আবদুর রহিম শ্বাসক্লিষ্ট স্বরে গর্জন করলেন, বলতে হবে ! কেন এসেছ তুমি ? কিসের জন্য ?.... তারপর সত্যিই তাঁর মুণ্ডুটি খসে পড়ল ফোয়ারার বেদীর নীচে। শুকনো ঘাসে রক্ত উপচে পড়ল। চূড়ান্ত প্রশ্নের দিকে ধাবিত হওয়ার দরুন ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল রাত ৮-১০ মিনিটে এক সেমিতীয় বৃদ্ধ দার্শনিক শহীদ হন।.....

'O Satan, prends pitie de ma longue misere!'

"রফিকুজ্জামানের সহিত জুলেখার শাদির দিন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই স্থলে তাহার বিবরণ পেশ করিতেছি। কারণ আমার মনে সেই ঘটনাটি ধোকা সৃষ্টি করিয়াছে। আর শয়তান সর্বত্র ওত পাতিয়া বেড়ায়। বনু আদমের জীবনের সমুদয় ক্ষেত্রে সে ফাঁদ পাতে।.....

"জোহরের নমাজের সময় শাদির মজলিশ বসিয়াছিল। মসজেদের ভিতর এবং

বাহিরে কাতারে২ ইলাকার মোছলেমগণ দাওয়াত এবং বিনা-দাওয়াতেই হাজের ছিলেন। হরিণমারার ছোটগাজি মইদুর রহমান সকল আয়োজনের তদারক করিতেছিলেন ! বড়গাজি সইদুর রহমান তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন। খত লিখিয়া জানান জে, পরে আসিয়া দুলহা-দুলহিনের নজরানা পেশ করিবেন। প্রকৃত কথা কী, এতিমখানার ওই খুবছুরত লড়কিকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাহার প্রতি খোশ ছিলেন।....

"শাদির সময় দুলহিন আনিসুর রহমানের বাড়িতে ছিল। তিনিই তাহার মুরুব্বিপদে বহাল, ফলে দুলহিনের এজিন (সম্মতি) লইবার নিমিত্ত উকিল ও দুইজন গাওয়াহ, (সাক্ষী) তাঁহার বাড়ি রওনা হইয়াছেন। এমত সময়ে বাহিরে হল্লা শুনিতে পাইলাম। লোকসকল 'ধর ধর ! মার মার !' বলিয়া চিৎকার করিতেছিল। কী হইয়াছে জানিতে চাহিলে ছোটগাজি বাহিরে গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়ে আসিয়া কহিলেন, এক বেশরা মস্তান জোর করিয়া মসজেদে ঢুকিতে চেষ্টা করে। লোকে তাহাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ভাগাইয়া দেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মস্তানটি রুগ্ণ ছিল বলিয়াই বোধ করি মারা পড়িয়াছে।....

"শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম। দেলে আচানক ধাক্কা বাজিল। আমার মুখের চমক ছোটগাজিছাহেবের নজরে পড়িয়া থাকিবে। তিনি আমার পার্শ্বে বসিয়া অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, কোনও প্রকার ঝামেলার ডর নাই। বাদশাহী শড়কে এইরূপ দৃশ্য অভাবিত নহে জে, কখনও-কখনও ফকিরমস্তান-হিন্দুসাধুদিগেরও লাস দেখা যায়। বিমার, পেরেশানি বিবিধ কারণে উহারা পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করে। এই কথা বলিয়া ছোটগাজিছাহেব উচ্চহাস্য করিলেন। মজলিসের উদ্দেশে ফের কহিলেন, বেশরা মস্তান দেখিলেই হজরত তাহাদের ভাগাইয়া দিবার ফতোয়া জারি করেন নাই কি ? মোছলেমবৃন্দ সমস্বরে সায় দিলেন।.....

"শাদি চুকিয়া গেলে লোকসকল খানায় বসিল। সেই সময় ছোটগাজিছাহেবকে নিরাশায় ডাকিয়া পুছ করিলাম, মস্তানের লাস কোথায় পড়িয়া আছে, একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি ঈষৎ বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত মোজেজাদর্শনের ইচ্ছায় কহিলেন, হজরতের ইচ্ছা হইলে আপত্তি করি, সাধ্য কী ? তবে মস্তানটি অর্দ্ধ-নাঙ্গা ! একটু অপেক্ষা করুন। লাসটি ঢাকা দিতে একটুকরা কাপড় সংগ্রহ করি। পশ্চাতে উহার নিকট যাইবেন।....

"হা খোদা ! কাকে দেখিয়াছিলাম ? কাপড় তুলিতে মুখখানি দেখামাত্র আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল। সারা অজুদ শিহরিয়া উঠিল। অতি কষ্টে মনোভাব দমন করিলাম। ছোটগাজিছাহেব হয়ত ভাবিয়াছিলেন, লাসটিকে আমি জিন্দা করিব ! তাঁহাকে হতাশ দেখাইতেছিল। মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছি, আত্মসম্বরণ করিতেছি, ছোটগাজিছাহেব কহিলেন, বেশরা মস্তান রাত্রে এখানে পড়িয়া থাকিলে শৃগাল-কুক্কুরে ছিঁড়িয়া খাইবে। জবাবে কহিলাম, জন্মকালে উহার কানে নিশ্চিত আজান শোনানো হইয়াছিল। সেকারণে বেশরা হইলেও এ-ব্যক্তি মোছলেম গণ্য হইবেক। উহার দাফন-কাফন করা কর্ত্তব্য। ছোটগাজিছাহেব ঘন২ মাথা নাড়িয়া আমার ফতোয়ায় সায় দিলেন।.....

"সেইদিন সন্ধ্যার মধ্যে শরা-ভ্রষ্ট বেচারা ফরিদ-উদ্-জামান-এর লাসের দাফন-কাফন হইল। শাদি-মহফিলের তাবৎ লোক লাসের জানাজায় সমবেত হইয়াছিল। তাহারা নিশ্চয়ই আমার এই ফতোয়ায় বিস্মিত হইয়াছে ভাবিয়া এশার নমাজে

কৈফিয়ত দিব ভাবিলাম। কিন্তু মুখে কথা সরিতেছিল না। বেরাদানে এছলাম। সম্বোধন করিয়াই কান্না আসিল। তাহা দেখিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল।—

"রাত্রে চাঁদনী ছিল। এবাদতখানায় দাঁড়াইয়া আছি, সেইসময় দেখিলাম পুষ্করিণীর পানির উপর দিয়া একটি ছায়া হাঁটিয়া আসিতেছে! ঘাটের সোপানে উঠিয়া ছায়াটি হাওয়ার স্বরে কহিল, এইবার তুমি সত্যই বদি-উজ-জামান হইলে!.....

"কহিলাম, কেন একথা কহিতেছ?.....

"সে কহিল, তুমি আলেম লোক। বদি কথার অর্থ জান না? বদি হইল পাপ। তুমি এতদিনে জমানার পাপ হইলে।—

"ক্রুদ্ধভাবে কহিলাম, আমার নাম ওয়াদি-উজ্-জামান। জমানার (কালের) নদী। বাঙ্গালায় ওয়াদি বদিতে পরিণত হইয়াছে। ওয়াদি অর্থ নদী। আমার নামের অর্থ....

"সে বাধা দিয়া পূর্ব্ববৎ হাওয়ার স্বরে কহিল, খামোশ। তুমি কী করিয়াছ, জান না।....

"কী করিয়াছি, তুমিই বলো।....

"ওই লড়কির দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারিবে। উহার চুল, উহার চক্ষু, উহার চাহনি.....

"এ কী বলিতেছ?....

"বদি-উজ-জামান! তুমি আজ হইতে জমানার বদি। তোমার জন্য সুনিশ্চিত দোজখ।

"আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম, ফরিদুজ্জামান! তুমি কি সেই কথা বলিবার নিমিত্ত শাদির মজলিশে ঢুকিতে গিয়েছিলে?....

"ছায়া হাওয়ার আওযাজে হাসিতে২ মিলাইয়া গেল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম।.....

"ভাবিয়াছিলাম, সাইদাকে এই গোপন তত্ত্ব জানাইব এবং রফিকুজ্জামানকে নির্দেশ জারি করিব জে, জুলেখাকে তালাক দিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য কী কৈফিয়ত দিব খুঁজিয়া পাই নাই। রফিকুজ্জামান আমার হুকুম তামিল করিবে কি? যদি সে তাহা করে, সাইদা বাধা দিবে। সাইদা ওই লড়কিকে জান দিয়া রক্ষা করিবে। সাইদা আর সে-সাইদা নহে। অধিকন্তু এই গোপনীয় তত্ত্ব শুনিয়া সে আরও হিংস্র হইয়া কলঙ্ক বাধাইতে পারে।.....

"পবিত্র কেতাবে বর্ণিত আছে জে, এইপ্রকার গোনাহে সাদ ও গোমরাহ্ নামক দুইটি শহর খোদা জ্বালাইয়া দেন। আমি সেই গোনাহ করিয়াছি সন্দেহ হয়। নাকি নিতান্ত মানসিক ভ্রম?.....

"পরদিবস হইতে এবাদতখানায় ইত্তেকাফ হইলাম। সাইদা বিস্মিত হইয়াছিল কি? জানিতে পারি নাই। কালো মশারির ভিতর আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। পার্শ্বে সাইদা বা অন্য কেহ আসিয়া খাবার রাখিয়া যাইত। খাইতে পারিতাম না। দুনিয়া আঁধারে ঢাকিয়া যাইতেছিল।......

"কালো মশারির ভিতরে গোপনে ক্রন্দন করিতাম। আমার জন্য এক্ষণে মউত বরাদ্দ হউক। কারণ জিন্দেগীতে ধোকা সৃষ্টি হইলে উহা নিদারুণ ক্ষতস্বরূপ। এক্ষেত্রে মউতই নিষ্কৃতি।......

জেলা সমাচার পত্রিকার সম্পাদকীয়

"এ হে হরিষে বিষাদ হইল দেখিতেছি! পূর্বসংখ্যায় আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকদিগের জানাইয়াছিলাম যে, কুখ্যাত নরঘাতক দস্যু ছফিজামান ওরফে ছবিলালের ফাঁসির দণ্ড মহামান্য হাইকোর্টে বহাল করিয়াছেন এবং নির্লজ্জ কতিপয় চক্রান্তকারীর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। গতকল্য নরাধমের ফাঁসিরূপ পুণ্যকর্ম্ম ঘটিলে আমরা আনন্দসম্বাদ দিবার নিমিত্ত লেখনী ধারণ করি। কিন্তু ভয়ানক পরিতাপের বিষয়, নগরীর রাজপথে এ কী অদ্ভুত দৃশ্য আমাদিগের দেখিতে বাধ্য করা হইল? দেশে শাসনের নামে দুঃশাসন চলিতেছে; অথবা শাসকবৃন্দের কুম্ভকর্ণদশা ঘটিয়াছে; নতুবা ইহা সম্ভব হইত না। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে ওই ছবিলাল বিস্তর কিংবদন্তীর নায়করূপে নিজেকে গ্রাম্য নিরক্ষরদিগের আদিম মানসে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাও সত্য হওয়া সম্ভব যে, সে জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাই বলিয়া ছবিলালের ঘৃণ্য শবদেহে পুষ্পসজ্জা, শোভাযাত্রা, বিবিধ ধ্বনি-নির্ঘোষ প্রভৃতি ঘটনা কল্পনাও কবি নাই। বহুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে চাষাভুষা বন্যপ্রকৃতির লোকসকল আসিয়া এই নগরীতে সমবেত হইল। তাহাদিগের সঙ্গে বহু তথা কথিত শিক্ষিত (?) ভদ্রলোকবেশী কতিপয় ব্যক্তিকেও দেখা গিয়াছে। আরও দুঃখ ও ঘৃণার কথা, শবদেহের উপর পুষ্প এবং খৈ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আমরা উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদও শুনিয়াছি বলিয়া ভ্রম হয়। অবলা নির্বোধ স্ত্রীলোকেরা কাহাদের প্ররোচনায় কুখ্যাত নবঘাতককে বীর বলিয়া গণ্য করিল, ইহা বুঝা কঠিন। ইহার মধ্যে মীরজাফর-জয়চাঁদদিগের তৎপরতা অনুমান কবা যায়। আশ্চর্য্য এমন কথাও কেহ-কেহ রটাইতেছে যে, ছবিলালের শবদেহ জীবিত ব্যক্তির ন্যায় কোনও-কোনও স্থলে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং মৃদুহাস্যে অভ্যর্থনাগুলিন গ্রহণ করে। দেশে গাঁজাখোরদের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে বটে! তবে আরও মর্ম্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পুলিশবৃন্দ চিত্রার্পিত বৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান ছিল। মাননীয় কালেক্টর বাহাদুরকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ মতিচ্ছন্ন দশার কারণ কী? আমরা শুনিয়াছি, দস্যু ছবিলালের পিতা নাকি মৌলাহাট গ্রামের একজন মুসলমান ধর্ম্মগুরু পীর ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিও নাকি বিস্তর কেরামতি দেখাইতে সমর্থ ছিলেন। সেইহেতু অনুমান করা চলে, তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবিত শিষ্যগণ এই দুষ্কর্মের আয়োজন করিয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া ঘটনার ভিন্ন ব্যাখ্যা হয় না। ধর্ম্মগুরু পীর এক্ষণে জীবিত নহেন শুনিয়াছি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে তাঁহার প্রভাব ছিল। তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া চলে যে, তিনি তাঁহার দস্যু পুত্রকে মৃত গণ্য করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় আমরা ধন্দে পড়িয়াছি। যে দৃশ্য দেখিলাম, উহার প্রকৃতি হেতুগুলিন কী? পরবর্তী সম্বাদে এই রহস্য ফাঁস করিবার আশা রাখি। পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ, তাঁহারা ধৈর্য্য ধবুন। শীঘ্রই দস্যু ছবিলালের শবদেহ লইয়া পৈশাচিক শোভাযাত্রা এবং বিলাপের রহস্য-যবনিকা উন্মোচিত করিব বলিয়া আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ রহিলাম।......'

In strange and hidden places thou dost move
Where women cry for torture in their love.
Satan! at last take pity on our pain.

—Baudelaire

বৃদ্ধা দিলরুখ বেগমের আজকাল হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়। নাতনি কচির বকাঝকায় পাতাকুড়ুনি স্বভাবটি ছাড়তে হয়েছে। অথচ শ্বশুর-হজরতের এবাদতখানার ধ্বংসস্তূপ ও জঙ্গলটিতে তিনি প্রতিদিনই দুপুরবেলা চুপিচুপি যান। নির্জনে বসে থাকেন একটুকরো লাইমকংক্রিটের চাঙড়ের ওপর। পুকুরের বাঁধানো ঘাটটি ভেঙেচুরে জঙ্গল গজিয়েছে। সেদিকে তাকাতে তাঁর ভয় করে। জলের ভেতর একটা উলটো দুনিয়া আছে। সেই উলটো দুনিয়ার দিকে তাকালে হয়তো সেই উলটো মানুষটিকে দেখে ফেলবেন।

দিলরুখ বেগম জঙ্গলে ঢাকা ধ্বংসস্তূপটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর সামনে তাঁর শ্বশুর-হজরতের কবর, যেটিকে 'মাজার' বলে লোকেরা। মাজারের উত্তর শিয়রে সেই অজানা দীর্ঘ গাছটির দিকে তাকিয়ে তাঁর গা ছমছম করে। কচি বলেছিল, গাছটির গায়ে হাত রাখলে জ্যান্ত মনে হয়। হয়তো সত্যি। বৃদ্ধা মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদেন। এ কান্না অপরাধবোধে। ল্যাংড়া-ভ্যাংড়া এক মানুষ, ওই এবাদতখানায় একা পড়ে থাকতেন। এক সকালে তাঁকে মৃত দেখা গিয়েছিল। সেই মৃত্যু নিয়ে কত গুজব রটেছিল। হজরত পিরসাহেবকেও কালো মশারির ভেতরে একইভাবে মৃত দেখা গিয়েছিল এবং একইভাবে গুজব রটেছিল। কালো জিনের হাতে মৃত্যু। সত্যিই কি কালা জিনের মানুষকে বাগে পেলে মেরে ফেলে ? তাহলে তাঁকে তারা মেরে ফেলছে না কেন ? এভাবে তিনি একা এসে বসে থাকেন, সেই কালা জিনেরা তাঁকে মেরে ফেলুক এই ইচ্ছা নিয়ে। সহসা পূর্বের জঙ্গল থেকে এক দমক হাওয়া আসে। ঝরঝর করে পাতা খসে পড়ে শেষ শীতের গাছপালা থেকে। চমকে ওঠেন, ওরা কি আসছে তাহলে ? হাওয়া থেমে যায়। আবার হঠাৎ শুকনো পাতায় খসখস শব্দ। ঘুরে দেখেন একটা কাঠবেড়ালি। অথচ কোনও-কোনও সময় এই জনহীন পারিপার্শ্বিকে ফিসফিস কথা শুনতে পান, কারা কিছু বলতে চায়, যে-ভাষা তিনি বোঝেন না সেই ভাষায়।

দিলরুখ মুখ নামিয়ে বসে থাকেন। এতকাল পরে বুঝতে পারেন, তাঁর অর্ধমানব স্বামী তাঁকে আসলে পরিত্যাগ করেছিলেন। মাথাকোটার মতো করে মনে-মনে বলেন, আমাকে ক্ষমা করো! আমাকে ক্ষমা করো!

...তুমি কি সন্দেহ করেছিলে আমি তোমার ছোটো ভাইয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম ? দেখো, ফাঁসির আগে তিনি শুধু আমারই সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন ? আমি তো যাইনি! বারিচাচাজি বলেছিলেন, নিজের মুখে সব দোষ কবুল করলে কোন্ আইন দিয়ে তাকে বাঁচাব আমরা ? এমন কী জজ তাকে যখন বললেন, যে-কাজ আপনি করেছেন, তার জন্য আপনি কি অনুতপ্ত ? শফি বলল, যা করেছি সজ্ঞানে করেছি। বলল, জজসাহেব! আপনাকেও খুন করতে বড়ো ইচ্ছা, কিন্তু আমার হাতে-পায়ে ভারী শেকল। আরও সাংঘাতিক কথা, সে থুতু ছুড়ল জজসায়েবের দিকে।

....মওলানা ভাসুরসায়েব ফতোয়া জারি করেছিলেন, শফি হিন্দু ছবিলাল। তার দাফনকাফন হারাম। তার লাস যেন মৌলাহাটে না আসে। খবর পেয়ে হাঙ্গামার ভয়ে বারিচাচাজি দেওরসায়েবের লাস সদর শহরে দাফন-কাফন করেন। উনি চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, রুকু, তুমি কি কবরজেয়ারতে (মৃতের জন্য শান্তি-প্রার্থনায়) যেতে চাও ? দেখো, আমি যাইনি। শাশুড়িসায়েরা বেঁচে থাকলে হয়তো যেতেন। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিতে চাইলে আমি যেতাম না। তুমি বিশ্বাস করো,

আমি যেতাম না। তাঁকে আমি ঘৃণা করতাম।

বৃদ্ধা মনে-মনে এইসব কথা বলেন। শেষে প্রার্থনার মতো নিজেকে নত করে বলেন, আমাকে মাফ করো! আমাকে মাফ করো। তিনি কখনও ঘাসে শুকনো পাতার স্তূপে বসে অঝোরধারায় কাঁদেন। গোপনে, শব্দহীন ক্রন্দন। সহসা আবার পিছনে খসখস শব্দ হয়। ঘুরে দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু শরীর পাষাণভার। দম আটকে আসে। আর এভাবে এক দুপুরে পারিপার্শ্বিকের চুপিচুপি উচ্চারিত কথাগুলির ভাষা তাঁর বোধগম্য হয়। তিনি স্পষ্ট শুনতে পান শফির কণ্ঠস্বর, রুকু! রুকু! রুকু!

অমনি দিলরুখ বেগম চিৎকার করে ওঠেন, না! তারপর শুকনো পাতার ওপর লুটিয়ে পড়েন।.....

উপসংহার

কচি প্রাইভেট পড়ে ফিরে আসছিল। বাজারে ডাকপিওন তাকে একটি পোস্টকার্ড দিল। পোস্টকার্ডটি পড়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল সে। চিঠিটি লিখেছেন তার বড়ো দাদাজি মওলানা নুরুজ্জামান। বাঙলায় লেখা চিঠি, কিন্তু উরদুতে নামসই। গত বছর ওঁরা সম্পত্তি বিনিময় করে খুলনা চলে গেছেন। যাওয়ার আগে দিল আফরোজ বেগম বোনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দিলরুখ বেগম যাননি। পরে লোকমারফত খবর আসে, পুবের মাঠের তিনবিঘে জমি দিল আফরোজ বোনের জন্য রেখেছেন। দিলরুখ শক্তমুখে বলেছিলেন, ও জমি হারাম। শ্বশুর-হজরতের হুকুম অমান্য করতে পারব না। কচি গোপনে কামালস্যারের সাহায্য জমি ভাগচাষে দিয়েছিল। এ বছর সেই ফসলবেচা টাকা সে ডাকঘরে জমা রেখেছে মাঝে মাঝে প্রয়োজনে টাকা তোলে এবং দাদিমাকে বলে, সরকারি বৃত্তির টাকা। দাদিমা কিছু টের পান না। সেকেলে মানুষ। পৃথিবীর কোনও খবরই রাখেন না। শুধু স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকেন। স্মৃতির ভেতর থেকে কথা বলেন। কিন্তু এই চিঠিটির খবর কীভাবে দাদিমাকে জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না কচি। খুলনায় সম্প্রতি দিল আফরোজ বেগমের মৃত্যু হয়েছে।

বাড়ির কাছে এসে কচি পোস্টকার্ডটি ছিড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিল।

বাড়ির আবরু রক্ষার দেয়ালগুলি ভেঙে পড়েছে। খড়ের চাল সেই জমির খড় দিয়ে মেরামত করিয়েছে কচি। দাদিমাকে জানায়নি এ খড় কোন্ জমির। ভাঙা দেয়ালের ভেতর উঠোন বাইরে থেকে দেখা যায়। কচি থমকে দাঁড়াল। খোকা জলের বালতি থেকে উঠোনে জল ছেটাচ্ছে। অনেকদিন পরে খোকাকে ফিরতে দেখে নয়, ওর কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছিল কচি। ছুটে বাড়ির ঢুকে সে আবার থমকে দাঁড়াল।

উঠোন জুড়ে ছাই। চাপচাপ ছাই। খোকা খাপ্পা হয়ে বলল, হঠাৎ এসে না পড়লে কী হত দেখছিস? দাদিমা একেবারে বেহেড, বুঝলি রে? কী সব কাগজপত্তর পুড়িয়েছেন উঠোনে। এসে দেখি, আগুন জুগজুগ করছে। হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। একটু হলেই চালে গিয়ে পড়ত, আর ব্যস!

কচি ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর হন্তদন্ত ঘরে ঢুকল। সামনের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে দাদিমা নেই। পাশের ঘরও খোলা। সেখানেও উনি নেই।

সে চিৎকার করে ডাকল, দাদিমা!

সাড়া না পেয়ে আবার আগের ঘরে গেল। আবিষ্কার করল, সিন্দুকের ডালা খোলা। ভেতরে হাত ভরে কচি প্রথমে সেই রোজনামচাগুলি খুঁজল, তার সন্দেহ হয়েছিল।

সেগুলি নেই। তার মানে, দাদিমা পুড়িয়ে ফেলেছেন। সে ডাকল, খোকা!

খোকা জবাব দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় একটা লোক এসে হন্তদন্ত বলল, খোকামিয়া! এবাদতখানার জঙ্গলে তোমার দাদিজি মরে পড়ে আছেন। শিগগির যাও!

ভাইবোন ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

নিঃশব্দ নির্জন এবং অত্যন্ত গোপন একটি মৃত্যু, অথবা চরম আত্মসমর্পণ। ভাই-বোন থমকে দাঁড়িয়েছিল অতর্কিত একটি পতনের সামনে, বিমূঢ় ও বাকহারা। আর ভিড়টিও ছিল ছোট্ট। মড়কদফতরের এক শ্রমিক দৈবাৎ জৈবকর্মে এই খণ্ডহরু-কীর্ণ প্রকৃতিতে ঢুকেছিল, এক কাঠকুড়োনি মেয়ে অন্যমনস্ক পা ফেলে বন্যতাময় আনার গাছটির কাছে এসে পড়ে, যেটি একদা পবিত্র ঐশী সভ্যতার প্রতীক ছিল এবং এখন বন্ধ্যাত্বের অভিশাপে হিংস্র দেখায়, দুজন খেতমজুর বাজারে চা খেতে খেতে সর্টকাট করেছিল, আর এক বৃদ্ধ বিশ্বাসী হুজুর পিরসাহেবের বিধ্বস্ত সমাধিতে ভক্তি জানাতে আসেন, তাঁর মাথায় টুপি ছিল, মোটমাট এই পাঁচজন মানুষ। সকলেই স্তব্ধ, মৃত্যুর তীব্র গন্ধে জর্জরিত। ঘনঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়া একখানি শীর্ণ লোল হাত প্রতিবন্ধী স্বামীর কবরের দিকে প্রসারিত, মৃতদেহটি তারা দ্রুত সনাক্ত করেছিল। আর বহুবছর পরে আবার একটি 'মোজেজা' ঘটছিল, অথবা বিভ্রম, হুজুর হজরত মৌলানা সৈয়দ বদিউজ্জামান আল-হুসায়নি আল-খোরাসানির পবিত্র মাজারের শিয়রে দাঁড়ানো ঋজু ও উদ্ধত অজ্ঞাতপরিচয় সেই গাছটি থেকে একটি কালো 'সাপ নেমে এসে মৃতদেহের কপাল চুম্বন করে চলে যায়, তারপর সহসা একটি ঘূর্ণি হাওয়া আসে, শুকনো পাতার রাশি মৃতদেহ ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে, পারিপার্শ্বিকে বৃক্ষলতাগুল্মে শ্বাসপ্রশ্বাসে কী এক বার্তার ঘোষণা ছিল, প্রকৃতির গভীরতম কেন্দ্র থেকে কোনও উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। তারপর সেই অমর্ত্য মায়ার ওপর আছড়ে পড়ে 'দাদিমা' এই মানবিক ও তীব্র বাস্তবতার আর্তচিৎকার,কচি তার দাদিমার কাছে নত হয়, এবং তখন বৃদ্ধ বিশ্বাসী অনুচ্চস্বরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন মৃতদের আত্মার জন্য আরবি শান্তিবাক্য, তিনি হাত দুখানিও ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্থিত করেছিলেন।

দিলরুখ বেগমের মৃতদেহ তার প্রতিবন্ধী স্বামীর কবরের দক্ষিণে, পায়ের দিকে কবর দেওয়া হয়েছিল, কচির ইচ্ছা অনুসারেই। বৃদ্ধ বিশ্বাসী শেষাবধি উপস্থিত ছিলেন। কবর হতে বেলা পড়ে যায়। লোকসকল যখন প্রথা অনুযায়ী কবরের দিকে আর পিছু না ফিরে চলে যাচ্ছে, তখন বৃদ্ধ খোকার কাঁধে হাত রেখে আস্তে বলেন, আমি জালালুদ্দিন। খোকা অবাক হয়ে তাঁকে দিকে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ কাতর একটু হেসে পুনঃ বলেন, হুজুর আমার হাতেই তোমার মাকে তালিমের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তোমার মা জুলেখা বেগম—

খোকা দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, শুনেছি।

লোকসকল ততক্ষণে মাজার এলাকা থেকে সড়কে পৌঁছেছে। একদা যেখানে এবাদতখানার ফটক ছিল, সেখানে ধ্বংসস্তূপের কেন্দ্র থেকে একটি প্রকাণ্ড কাঠমল্লিকার

গাছ মাথা তুলেছে। বৃদ্ধ জালালুদ্দিন সহসা খোকার দুটি হাত চেপে ধরে বলেন, আমাকে মাপ করো। আমি এক গোনাহ্‌গার।

তাঁর চোখে জল ছিল। তিনি আত্মসম্বরণের চেষ্টা করছিলেন। বিস্মিত খোকা বলে, একথা কেন?

জালালুদ্দিন বলেন, আমার মনে পাপ ছিল। তোমার ছোটদাদাজি শফিউজ্জামান এক রাত্রে মৌলাহাট এসেছিলেন। এতিমখানায় আমার ঘরে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। তিনি হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুজুর তখন এই এবাদতখানায় 'ইত্তেকাফে', দেখা হওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু আমার খুব ভয় হয়েছিল শফিসাহেবকে দেখে। জালালুদ্দিন কান্নাজড়িত স্বরে বলেন, জানতাম উনি এক খুনী মানুষ। তাঁর নামে হুলিয়া ছিল। আমি পুলিশে খবর দিয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিই। ভেবেছিলাম, হুজুরের কোনও ক্ষতি করতেই এসেছেন।

খোকা তাঁকে আঘাতের জন্য হাত তুলেই নামিয়ে নেয়। তারপর দ্রুত চলে যায়। জালালুদ্দিন তাকে ডাকছিলেন, আরও কিছু বলার কথা ছিল, কিন্তু খোকা পিছু ফেরে না। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা বাড়াল। সন্ধ্যার বাসে বহরমপুর, তারপর ট্রেনে রানাঘাট হয়ে তিনি কুষ্টিয়া যাবেন। সেখানে তাঁর একটি বড় সংসার আছে। বহু বছর পরে তিনি হুজুরের মাজার দর্শনে এসেছিলেন। হুজুরকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়েন। বিশেষ কথা, তাঁর কাছে পাশপোর্ট-ভিসা ছিল না। তাই এই সফরটিও ছিল অত্যন্ত গোপনীয়।